জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

প্রতিবেদন

ব্যানবেইস
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

প্রতিবেদন

For Banbeis Documentation Centre
M. Zaman
27.7.04

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষা কমিশন '২০০৩

ঢাকা

মার্চ, ২০০৪

প্রতিবেদন
জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

প্রকাশকাল
মার্চ ২০০৪

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
সংযোজন সংখ্যা ... 2170
তারিখ ... 11.9.04

প্রকাশক
মো: আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব
জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

কপিরাইট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রচ্ছদ
সিকদার আবুল বাশার

মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৭৫১৫

ভূমিকা

সরকার ২০০২ সালের ২১শে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাবলি চিহ্নিত করে এর উন্নতিকল্পে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিশনের চেয়ারম্যানকে ১৫ই জানুয়ারি ২০০৩ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকারের কমিশন গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এ কমিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল চেয়ারম্যানসহ ২৪ জন। পরবর্তী পর্যায়ে ২০০৩ সালের মে মাসে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষকে সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয়। কিছুদিন পরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান কমিশনের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। অর্থাৎ সদস্যপদ ২৪ জনেই সীমিত থাকে (কমিশনের গঠন পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া হল)।

কমিশন যে পদ্ধতিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে তা বলা প্রয়োজন। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবের হাতে কমিশনগঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি এসে পৌঁছালে জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কমিশনের একটি সভা আহ্বান করা হয়। এ সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব মহোদয়কে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয় এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে তাঁদের সাথে আলোচনা হয়। কমিশনের পরবর্তী সভায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ১২টি উপকমিটি গঠন করা হয়। উপকমিটিগুলির গঠন পরিশিষ্ট-২-এ উল্লেখ করা হয়েছে। উপকমিটির যে সব সদস্য প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশের খসড়া রচনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন তাঁদের নাম প্রত্যেকটি প্রতিবেদনের শেষে (উচ্চশিক্ষা অংশে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে) উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে উপকমিটির সকল সদস্যই প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে অবদান রেখেছেন। কমিশনের কাজ আরম্ভ হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপকমিটিতে অন্তর্ভুক্ত নন এমন কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে পরামর্শক হিসেবে প্রতিবেদনের অংশবিশেষ প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্বসহ পরামর্শকদের নামের তালিকা সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-৩) করা হল।

কমিশনের ও উপকমিটিগুলির সদস্যদের ও পরামর্শকদের প্রতিবেদনের কাঠামোর মধ্যে যাতে সাদৃশ্য থাকে সে জন্য চেয়ারম্যান প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি নমুনা কাঠামো দেন। এছাড়া প্রথম দিকে চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে কমিশনের সকল সদস্যের নিকট ৩০টি মৌলনীতি সম্বলিত অপর একটি পরামর্শমালা বিতরণ করা হয়। এই নীতিগুলি কমিশনের পূর্ণাঙ্গ সভায় আলোচিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনীসহ গৃহীত হয়। প্রতিবেদন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে এসব নীতি পরিশীলিত করেন এবং এগুলোকে চূড়ান্তরূপ দেন। নীতিগুলি এ সাথে সংযুক্ত করা হলো।

বিগত দিনে যেসব শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে তার থেকে এ কমিশনের গঠন ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাদা ছিল। এসব বিষয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অপরাপর সদস্যবৃন্দ সকলেই কোথাও না কোথাও পূর্ণকালীন দায়িত্বে নিয়োজিত। এমনকি এর সদস্যসচিবও ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পূর্ণকালীন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং মন্ত্রণালয়েই তাঁর কার্যালয় অবস্থিত ছিল। কমিশন দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে কোন সফরে যায় নি, তবে কমিশনের সদস্যবৃন্দ মূলত তাঁদের জ্ঞান, দেশ-বিদেশের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের দূরদৃষ্টি সবকিছুরই পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। কমিশনের বিভিন্ন সভায় মাননীয় সদস্যবৃন্দ সম্পূর্ণ খোলামেলা পরিবেশে তাঁদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কমিশনের সকল সভার আলোচনাই ছিল প্রাণবন্ত।

এদিকে ২০০৩ সালব্যাপী বিভিন্ন সময়ে যে সব শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অন্য যে সব ব্যক্তি নায়েমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এসেছেন, কমিশনের চেয়ারম্যান সে সব প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শিক্ষাসমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেছেন। যে সব গ্রুপের সাথে এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হল (পরিশিষ্ট-৪)।

এছাড়া বিভিন্ন উপকমিটির প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার পর চেয়ারম্যান প্রত্যেক উপকমিটির আহবায়ক ও অপরাপর সদস্যদের সাথে এক বা একাধিকবার বৈঠক করে মতবিনিময় করেছেন ও প্রতিবেদনগুলির সংশোধনকাজে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিবেদনের খসড়া সংশোধনের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে বিষয় বিশেষজ্ঞদের সামনে সুপারিশমালা পেশ করে তা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে চেয়ারম্যান প্রতিবেদনগুলি সম্পাদনা করেছেন। সর্বশেষ পর্যায়ে কপি রাইটারদের সাহায্যে বানান ও ভাষাগত শুদ্ধি নিবিড়ভাবে দেখা হয়েছে। সাধারণভাবে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নের মতো দায়িত্বপূর্ণ একটি কাজ সম্পাদন করা কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। স্বভাবতই বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্য নিতে হয়েছে। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রথমেই আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি কমিশনের সকল সদস্যের অকৃপণ সাহায্য। কমিশন সর্বমোট ১৫টি সভায় মিলিত হয়। বিভিন্ন সভায় উপস্থিত হয়ে সদস্যদের আলোচনায় অংশগ্রহণের ফলে প্রতিবেদনটি অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। উপকমিটির যে সব সদস্য রিপোর্টের মূল রচনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং অপরাপর সদস্য যাঁরা তাঁদের বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে এগুলোকে চূড়ান্তরূপ দিয়েছেন তাঁদের সহায়তা না পেলে এ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। আমি তাঁদের প্রত্যেককে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে সব পরামর্শক প্রতিবেদনের অংশবিশেষ রচনায় অবদান রেখেছেন তাঁদের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। চেয়ারম্যান হিসাবে আমি তাঁদের অকুণ্ঠচিত্তে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ময়মনসিংহ এ. এম. কলেজের প্রভাষক মো: আফজালুর রহমান কতিপয় সরকারি কলেজ সম্পর্কে সমীক্ষা ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন তৈরি করে দিয়েছেন। সমীক্ষাটি প্রণয়নে আর্থিক সহায়তা করেছেন এ. এম. কলেজের অধ্যক্ষ। আমি তাঁদের উভয়কে সবিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কমিশনের সদস্য-সচিব জনাব মো: আবদুল ওয়াহাব প্রতিবেদনগুলির সারাংশ তৈরি করে দিয়ে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কপিরাইটারদের সাহায্য ছাড়া এ প্রতিবেদনের পরিশোধন সম্ভব হতো না। আমি তাঁদের সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গবেষণা সহকারী, কম্পিউটার অপারেটরদ্বয়, মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) ও অফিস স্টাফ প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মোট কথা, প্রত্যেকেই তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দায়িত্বে বিরাট অপূর্ণতা রয়ে যাবে যদি সরকার পক্ষ থেকে কমিশনকে যে সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ না করা যায়। একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক যে ১৯৯১-৯৬ সালে এবং পুনরায় ২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বি.এন.পি সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার সুফলও দৃশ্যমান হচ্ছে। এ সব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলির সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছে। আমাকে শিক্ষা কমিশনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ এ কমিশনের চেয়ারম্যান মনোনীত করে আমার প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছেন সেজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ডঃ এম. ওসমান ফারুক, প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আ.ন.ম এহছানুল হক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকলে আমাকে সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। আমি সবার ঋণ অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করছি।

অনেক চেষ্টা করেও প্রবাদের সেই ছাপাখানার ভূত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নি। আশা করি এ প্রতিবেদনের বিশিষ্ট পাঠকেরা তা বুঝবেন।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে তা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলেই এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম সার্থক হবে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা
চেয়ারম্যান,
জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩
ঢাকা, মার্চ, ২০০৪।

মৌলিক নীতিসমূহ

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে কতগুলো মৌলনীতির ভিত্তিতে, যা কমিশনের কাজের প্রথম দিকেই আলোচিত ও গৃহীত হয়েছিল, এ প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

এগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. মূল লক্ষ্য : শিক্ষার মূল লক্ষ্য সমগ্র জনগোষ্ঠীকে স্বল্পসময়ের মধ্যে সম্পদে পরিণত করা।

২. শিক্ষার সুযোগ : ধর্ম-গোষ্ঠীসংস্কৃতি, নারী-পুরুষ বা ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে শিক্ষার সুযোগ, বিশেষভাবে মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে, সমবন্টনের নীতি অনুসরণ।

৩. শিক্ষার গুণগত মান : শিক্ষার গুণগত মান সর্ব পর্যায়ে সমুন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স : যেদিন শিশুর বয়স ৫ বছর হবে সেদিনই তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার প্রক্রিয়া চালু করা।

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ : সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি আওতায় আনয়ন করতে হবে।

৬. শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত : প্রাথমিক বিদ্যলয়ে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত ১:৩০ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই অনুপাত ১:৪০-এ নামিয়ে আনা।

৭. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সকল পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৮. শিক্ষাকাঠামো : বর্তমানের শিক্ষাকাঠামো অপরিবর্তিত রাখা বাঞ্ছনীয়।

৯. শিক্ষার বিভিন্ন ধারার সমন্বয়সাধন : বর্তমানে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষার ধারা সমাজে আর্থ-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অসমতা সৃষ্টি করছে, যা সামাজিক সংহতি বিরোধী। হঠাৎ করেই আজ যেহেতু এসব ধারা পরিবর্তন করা বাস্তবসম্মত নয় সেহেতু অন্তত বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিস্তৃত অংশ যাতে সমসত্ত্ববিশিষ্ট হয় সে লক্ষ্যে কারিকুলাম প্রণয়নের প্রচেষ্টা।

১০. একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা : একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা চালুকরণ।

১১. গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃতকরণ : এ উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থে পরিচালিত নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বল এলাকায় অর্থাৎ যে সব এলাকায় শিক্ষার সুযোগ কম সেসব জায়গায় স্থাপনা।

১২. মফস্বলে মডেল হাইস্কুল : স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেকটি উপজেলায় একটি করে মডেল হাইস্কুল স্থাপন।

১৩. শিক্ষক নির্বাচন : বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ।

১৪. শিক্ষার গুণগত মান: শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নকল্পে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা। বিশেষভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান। স্বল্পসময়ে প্রশিক্ষণের জন্য দূরশিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার।

১৫. শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার : কমিশনের বিবেচনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহার ছাড়া স্বল্পসময়ে শিক্ষার মান উন্নত করার অন্য কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে একটি টি-ভি চ্যানেল শিক্ষার জন্য নিবেদিত (dedicated)করা যেতে পারে।

১৬. জীবনমুখী শিক্ষা : মাধ্যমিক শিক্ষা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন ঝরেপড়া শিক্ষার্থীরাও সমাজের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতে পারে।

১৭. শিক্ষা ও জনশক্তি : দেশের জনশক্তি ব্যবহার সম্পর্কে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক যাতে কোন শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি না হয়।

১৮. শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি : বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক ও অব্যাহত শিক্ষাদানের জন্য দূরশিক্ষণ পদ্ধতি (টি-ভি র সাহায্যে) ব্যবহার করতে হবে।

১৯. শিক্ষকের মর্যাদা : শিক্ষকদের বেতনকাঠামো, পদোন্নতির নিয়মাবলি, চাকুরির শর্তাবলি ইত্যাদি এমন হতে হবে যেন তা সম্মনজনক হয়।

২০. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি :

(ক) সকল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুরূপ রাখার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে (দশম শ্রেণীর শেষে এস.এস.সি পরীক্ষা ব্যতিরেকে) পরীক্ষার ফল কোন শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য ঘোষণার জন্য নয়। বরং শিক্ষাজীবনের প্রথম নয় বছর পরীক্ষা নিতে হবে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর অর্জন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছে কিনা তা দেখার জন্য এবং তা অর্জিত না হলে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে তার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

২১. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : ঢাকাকেন্দ্রিক প্রশাসনকে (বিশেষ করে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ক্ষেত্রে) বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে যাতে–

(ক) কোন এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না থাকে;

(খ) বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষমতার মধ্যে সংঘাত না থাকে;

(গ) অধিকতর দ্রুতগতিতে এবং স্থানীয়ভাবে সমস্যার সমাধান হয় এবং

(ঘ) বিদ্যালয়/কলেজ কর্তৃপক্ষ বা প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের সকল কাজে রাজধানীতে আসতে না হয় বা অমর্যাদাকর অবস্থায় পড়তে না হয়।

২২. তথ্যপ্রযুক্তি : তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার জন্য প্রণীত জাতীয় নীতি স্বল্পসময়ে বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৩. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন : সরকারি ব্যয়ে একক বিষয়ভিত্তিক (যেমন- কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা প্রভৃতি) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিরুৎসাহ করতে হবে, কেননা তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ও অপচয়ী।

২৪. বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা : উচ্চশিক্ষা যেহেতু ব্যয়বহুল সেহেতু বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা : বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রেখে ১৯৭৩-এর আইনদ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা।

২৬. গবেষণায় উৎসাহদান :

(ক) প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের গবেষণায় উৎসাহদানের জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে Centres of Excellence গড়ে তোলাসহ অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ।

(খ) পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্রে (কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা) গবেষণার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২৭. ভাষানীতি : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় ভাষানীতি প্রণয়ন প্রয়োজন।

২৮. বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন : সর্বাধুনিক জ্ঞানের আলোকে জাতীয় বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন এবং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্বল্পসময়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৯. অব্যাহত শিক্ষাদান : প্রযুক্তি (রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট) ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য বাস্তবভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চালুকরণ।

৩০. স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন : দেশে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা দরকার। কমিশনের কাজ হবে মূলত:

(ক) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) চলমান গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা নিরুপণ ও তার প্রতিকারের সুপারিশ করা;

(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন চিন্তাচেতনার উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগসম্পর্কে সুপারিশ করা।

সারসংক্ষেপ

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেই শিক্ষার ভিত রচিত হয়। তাই এই পর্যায়ে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা উপকমিটি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময় করেছে। প্রতিবেদনের খসড়া প্রণীত হওয়ার পর এর বিভিন্ন দিক নিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে কয়েকদফা বৈঠক করেছে। প্রকৃতপক্ষে, চেয়ারম্যান মহোদয়ের মতামত প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত করেছে। এই রিপোর্টে মোট ১৬টি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলিতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, আলোচ্যক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে বেশকিছু সুপারিশ সংযোজন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা। এই সব লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত প্রাথমিক শিক্ষার ২২টি উদ্দেশ্য কোনরূপ পরিবর্তন না করেই গ্রহণ করা হয়েছে।

উপকমিটি মূল কমিশনের সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর রাখার সুপারিশ করেছে। তবে এ পর্যায়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ৫ বছর বয়োপ্রাপ্ত সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্কুল পরিচালনা পর্ষদকে দায়িত্ব দিয়েছে এবং প্রতিটি শিশু যাতে ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সুচারুরূপে শেষ করতে পারে তা বলা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের অধিকতর দায়িত্বগ্রহণের সুপারিশও করা হয়েছে।

এদিকে ধর্ম-গোষ্ঠী নারী-পুরুষ ও অঞ্চলভেদে যাতে ৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা যায় এবং সকলকে একই মানের শিক্ষাদান করা যায় সে বিষয়ে স্কুল পরিচালনা পরিষদ এবং সরকারকে উৎসাহী হতে সুপারিশ করেছে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে :

১. স্কুল ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে সরকারকে আগামী ১০ বছর প্রতিবছরে ১০০টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে সুপারিশ করা হয়েছে। নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়বিহীন, দুর্গম ও নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তা অধ্যুষিত এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং ৬টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করতে হবে।

৩. দেশে প্রচলিত ১১ ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬ ধরনের বিদ্যালয়ের উপর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এ সব বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান কার্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত করতে সুপারিশ করা হয়েছে। একই সাথে বেসরকারি, কিন্ডারগার্টেন ও এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠ্যক্রম অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর বহুলাংশে নির্ভর করছে শিক্ষার মান। এদিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দেশে ত্রিধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। এই ত্রিধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমতা আনয়নের উদ্দেশ্যে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে কয়েকটিকে মূল-পাঠ্য বিষয় (Core Curriculum) হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আরও যে সব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. আগামী ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০-এ এবং পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে ১:২৫-এ নামিয়ে আনতে হবে।

২. ছাত্র-শিক্ষক সংযোগকাল বছরে ২২০টি কার্যদিবস ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ন্যূনতম ৭২০ ঘণ্টা এবং তৃতীয় থেকে ৫ম শ্রেণীর জন্য ১২৭৫ ঘণ্টা নির্ধারণ করতে হবে।

৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৪. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন শেখানো সামগ্রী প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। এ সব বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে।

৫. মূল্যায়ন পদ্ধতিতে নতুন ধারণা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

সুপারিশ যতই ভাল হোক না কোন শেষবিচারে এ সবের বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার মান নির্ভর করবে শিক্ষকদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং আন্তরিকতার উপর। অন্যদিকে সমগ্র সমাজকে শিক্ষকদের যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে :

১. শিক্ষকগণ নিরপেক্ষ একটি কর্মকমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।
২. শিক্ষকদের বেতনস্কেল এবং বেতন নির্ধারিত হবে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিবেচনায়।
৩. প্রাথমিক পর্যায়ের কোন শিক্ষক যথোপযুক্ত কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করলে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক পদে অথবা শিক্ষক ক্যাডারের উচ্চতর পদে যাতে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. শিক্ষকদের পেনশন-গ্রাচ্যুয়িটি ইত্যাদি পাওনা অবসর গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করে শিক্ষকের ব্যাংক হিসাব নম্বরে জমা দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের কাঠামো পরিবর্তন করে বর্তমানের ১১ সদস্য বিশিষ্ট স্কুল পরিচালনা পর্ষদে অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় শিক্ষক, চিকিৎসক, ধর্মীয় নেতার মধ্য থেকে ২ জনকে মনোনয়ন দান করে ১৩ জনের পরিচালনা পর্ষদ গঠন করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত) পাঠদানের জন্য মোট ১৬১৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭৮৮৭০১০ জন এবং শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ১,৮৩,২৭৭ জন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনার বিষয়ে মূল নীতিমালা প্রণীত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এবং এ সব নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, নিরীক্ষা পরিদর্শন অধিদপ্তর) ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর মাধ্যমে নীতিমালা বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় নানা সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার ফলে সৃষ্ট জটিলতা শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠ পরিবেশ ব্যাহত করছে।

মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে শিক্ষক নির্বাচন করা হয় না বলে অনেক অভিযোগ আছে। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একই নিরপেক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ আবশ্যক, তাই সরকারি কর্মকমিশনের মতো একটি নিরপেক্ষ কর্ম কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষকের মর্যাদা নির্ভর করবে তার শিক্ষার মান ও জ্ঞান এবং চারিত্রিক গুণাবলির উপর। যদি শিক্ষক নির্বাচন স্বচ্ছ হয় তা হলে তার দ্বারাই শিক্ষকের মান পরিমাপ করা যাবে। শিক্ষক তাঁর আচরণ ও কার্যে নীতিবোধের পরিচয় দেবেন এটিই কাম্য।

সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম, যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের উপর শিক্ষার গুণগত মান নির্ভরশীল। এই নিয়ন্ত্রকগুলোর মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে দেশে ১১টি সরকারি ও ৫৪টি বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানে নিয়োজিত। সরকারি কলেজগুলোতে শতকরা ৪০ভাগ পদের শূন্যতা এবং বেসরকারি কলেজগুলোতে নিয়মিত শিক্ষকের অপ্রতুলতার কারণে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের মাত্র শতকরা ৪৩.ভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ অবস্থার নিরসন অত্যাবশ্যক। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের বিকল্প নেই।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ করে ৬ষ্ট থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে কী কী বিষয় পড়ানো হবে এবং কোন বিষয়ে পরীক্ষায় কত নম্বর থাকবে তার একটি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ছাড়া সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষা বিষয়ক কোর্স অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ রয়েছে। তাছাড়া আমাদের দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনায় কতগুলো ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রস্তাব রয়েছে।

শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের তদারকির দায়িত্ব থাকবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকবে মাধমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। শুধুমাত্র পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলো। কেবল শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম তদ্‌রাকির দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম বোর্ড (এন.সি.টি.বি)। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনকে বিভাগ, জেলা ও শাখা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল ও কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে।

প্রত্যেক উপজেলায় আগামী ১০ বৎসরে একটি আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্কুল ম্যাপিং-এর ভিত্তিতে প্রতি বছরে ২৫টি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন, বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ উন্মুক্ত করা, শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতনকাঠামো, শিক্ষকদের জন্য পেনশন গ্র্যাচ্যুইটির ব্যবস্থা, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১:৪০-এ রাখার ব্যবস্থা, কোচিং সেন্টার ও নোট বই নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষকতা পেশায় দক্ষতা অর্জনের জন্য চাকুরিপূর্ব ও চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ, প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ খোলা ও এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে সমমানের পাঠদান করতে হবে। বর্তমানের উচ্চমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা, খেলাধূলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, স্থানীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতা নেওয়ার ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান জোরদারকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

দশম শ্রেণীর পর-এস.এস.সি পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা থাকবে। এর মধ্যে শতকরা ২৫% নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে। কোন শিক্ষার্থী এস.এস.সি পরীক্ষায় একবারে উত্তীর্ণ না হতে পারলে তাকে তিন বৎসরের মধ্যে অকৃতকার্য বিষয়গুলো পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে সকল শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ভূগোল পড়তে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকবে। দরিদ্র মেধাবি শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক পর্যায়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী দুটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তর হিসাবে পরিচিত। দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য ৩৭২টি বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল(যেগুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী রয়েছে), ১০টি সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ১১৩৬টি বেসরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সম্বলিত সরকারি ও বেসরকারি ৮৬৮টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে।

এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা খুবই দূর্বল। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের অভাব, শিক্ষকের অভাব, অনেক প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের পদ শূন্য। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা হবে উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর উত্তরণের পর শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ প্রবণতা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী বহুমুখী উচ্চ শিক্ষাক্রমের যে কোন একটিতে অংশগ্রহণে করতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা যেহেতু উচ্চ শিক্ষা প্রস্তুতির ধাপ সেজন্য এর কোর্স কারিকুলামও সেভাবে প্রণয়ন করতে হবে। সুষ্ঠু শিক্ষাদানের লক্ষ্যে এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪০ মধ্যে রাখা প্রয়োজন। বেসরকারি কলেজ ও সরকারি কলেজের শিক্ষকের মধ্যে বেতন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধার যে পার্থক্য রয়েছে তার নিরসন করতে হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিকায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে হবে।

সুশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কর্মকমিশন গঠন করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং পরবর্তীকালে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ধাপটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে না রেখে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচালিত হলে শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত সকল স্তরের কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয় জেলা ও থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বর্তমান গভর্নিং বডি/স্কুল ম্যানেজিং কমিটি থেকে ব্যক্তি/গোষ্ঠী স্বার্থ মুক্তকরণের লক্ষ্যে সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি প্রদানের নীতিমালা দেশের সার্বিক প্রয়োজনে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রত্যেক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার থাকতে হবে। যথেষ্ট সংখ্যক রেফারেন্স বই এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রত্যেকটি কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষসহ ছাত্রাবাস থাকতে হবে। শিক্ষকদের কলেজে উপস্থিতি অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে এবং কলেজসংলগ্ন অথবা স্বল্পদূরত্বে আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা

আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য ২১টি সরকারি বিশ্বদ্যিালয়, ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১২৯৭টি কলেজ রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৯২,৫৬২ জন এবং শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা ৫,১৪৭ জন। বেসরকারি ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৫,৯৬৮ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৮,১৭,০০০ এবং শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা ৩২, ২৭৮ জন।

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পৃথক পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারি এবং বেসরকারি কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নিয়মে পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকারি কলেজগুলো পরিচালনার বিষয়ে যথেষ্ট প্রশাসনিক, আর্থিক, একাডেমিক ও সামাজিক সমস্যা রয়েছে।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কাম্য মান অর্জিত হচ্ছে না। এর কারণগুলো হলো ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষাজ্ঞানের অভাব, বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার বিপর্যয়, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ও মানসিক প্রস্তুতির অভাব, শিক্ষা জীবন শেষে চাকুরি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা, শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক প্রতিকুল পরিবেশ, ইত্যাদি। তাছাড়া শিক্ষার্জনের পরিবেশ অনুকূল রাখার জন্য শিক্ষকদের যে ভূমিকা পালন করার কথা সেটা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার মান সুসংহতকরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পর প্রথম ছয় মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য তাদের উপযোগী করে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহত্তর পরিবেশে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা যেন হারিয়ে না যায় সেজন্য অনুষদের ডীন, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাগণ তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করবেন। খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লেখাপড়ায় আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষা-বর্ষের প্রথম থেকেই তাদেরকে একাডেমিক ক্যালেণ্ডার প্রদান, ক্যালেণ্ডার অনুসরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিভাগীয় কার্যক্রম সুসংহত করার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয়েছিল। ১৯৭৩ এর বিধিবিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ কোন কোন ক্ষেত্রে কলুষিত হচ্ছে বলে লক্ষ্য করা গেছে। এ প্রেক্ষাপটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন, ডীন নির্বাচন এবং ভাইস চ্যান্সেলর নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এসব বিষয়ে শিক্ষকদের সাথে আলোচনার সুপারিশ করা হয়েছে।

সেশন জ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমে এক বিরাট সমস্যা। এ সেশন জ্যামের প্রধান কারণগুলো হল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্ধারিত বন্ধ, ভর্তি পরীক্ষায় বিলম্ব, সময়মত পাঠ্যসূচি সমাপ্ত না হওয়া, ছাত্রদের পরীক্ষা পিছানোর দাবি, পরীক্ষা গ্রহণে দীর্ঘ সময় ব্যয়, পরীক্ষার ফল প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব। এ সেশন জট কমাতে হলে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপ্তিকাল কমিয়ে আনতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডগুলো জুন মাসের মধ্যে পরীক্ষার

ফালপ্রকাশ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তিপরীক্ষা সমন্বিত কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। বছরে দুইবার পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাবর্ষের প্রথমেই শিক্ষা কার্যক্রমের একটি পঞ্জি তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে সেমিস্টার পদ্ধতি প্রচলন, সাবসিডিয়ারির পরিবর্তে সমন্বিত পদ্ধতির প্রচলন, চার বছরের স্নাতক (সম্মান) কোর্সের প্রচলন এবং শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সে বিষয়গুলো পর্যালোচনায় যে সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো হল–প্রচলিত বাৎসরিক কোর্স পদ্ধতি চালু রাখা, বিভাগে বিভাগে অন্য বিষয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি রহিত করা, চার বছরের অনার্স কোর্স চালু রাখার ব্যবস্থা করা। মাস্টার পর্যায়ের পূর্ণ নম্বরের অর্ধেক হবে লিখিত এবং বাকি অর্ধেক গবেষণামূলক রচনাভিত্তিক হবে। শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিবিধানের বিষয়ে কমিশন মনে করে শিক্ষক পদ সৃষ্টি ও নতুন বিভাগ খোলার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। মঞ্জুরী কমিশন প্রতি তিন বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে পারবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সংবিধি অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডি গঠিত হওয়া উচিত। সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার কলেজে শিক্ষক নির্বাচন আলাদা কমিশনের মাধ্যমে হওয়া আবশ্যক।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা ব্যতীত কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে হলে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ গবেষকদল গড়ে তুলতে হবে এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। গবেষণা পরিচালনার নিমিত্তে বৃত্তি সংগ্রহ, ইন্টারনেট সুযোগ বৃদ্ধি ও গবেষকদের জন্য একাডেমিক ফ্রিডম নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অপচয় বন্ধ করে গবেষণা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। দেশে-বিদেশে সেমিনার/কনফারেন্সে শিক্ষকদের যোগদানের ব্যাপারে সকল বাধা অপসারণ, স্বীকৃত মানের গবেষণা/প্রকাশনার জন্য বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতির অগ্রাধিকার প্রদান, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারের উন্নয়ন, আন্ত:বিষয় গবেষণা জোরদারকরণ, মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গবেষণার কাজে আকৃষ্টকরণ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন প্রতিষ্ঠানকে সম্মান ও মাস্টার্স কোর্স এর অনুমতি প্রদানের পূর্বে অবকাঠামো সুবিধা, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক এর বিষয়টি যাচাই করে দেখবে। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের জন্য Summer Course এম.ফিল ও পি.এইচডি কোর্স চালু করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গবেষকদের সুবিধার্থে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও গষেণাগার গড়ে তুলতে পারে। দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসার স্বার্থে গবেষণার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন।

একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান শতাব্দীতে যে প্রযুক্তি আধিপত্য করবে সেগুলো হল-নতুন বস্তু, ন্যানো প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি, মহাকাশ প্রযুক্তি, জেনেটিক প্রকৌশল, ন্যানো চিকিৎসা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীকে উপরোক্ত বিষয়সমূহে গবেষণা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিশ্ববিদ্যালয় হবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, আইন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের রাজ্যের এক বর্ণালী প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতির উপর আলোকপাত করবে। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাদান যুগোপযোগী করে তোলা, বিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় শিক্ষা মানদণ্ড প্রস্তুত করা, তরুণ শিক্ষকদের জন্য মফস্বলে আবাসনের ব্যবস্থা, বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য মোবাইল ভ্যানের ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নেটওয়ার্কিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিজ্ঞান পার্ক ও নভোথিয়েটার স্থাপন, টিভি চ্যানেলগুলোতে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম চালু, ভৌত বিজ্ঞানের অলিম্পিয়াড চালু, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষ বিষয়ের সেন্টার অব একসেলেন্স স্থাপন, প্রতিটি কলেজ ও স্কুলে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

কৃষি শিক্ষা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের জনগোষ্ঠীর ৬৫% ভাগ তাদের জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান শতকরা ৩১.৬ ভাগ, দেশের শ্রমশক্তির শতকরা ৬২ ভাগ পুরুষ এবং ৫৫ ভাগ মহিলা কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত। খাদ্যঘাটতি একটি জাতীয় সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বাড়িঘর ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি কৃষি উৎপাদন থেকে অকৃষি কাজে স্থানান্তরিত হচ্ছে। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে তা হলো সংকুচিত কৃষিজমি থেকে অধিক সংখ্যক জনসংখ্যার খাদ্য জোগানো। এর জন্য প্রয়োজন হবে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মেধাবী, সুশিক্ষিত, দক্ষ, দায়িত্বশীল ও কর্মনিষ্ঠ কৃষিবিদের।

বর্তমানে দেশে কৃষি শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন স্তরের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো হলো কৃষিতে ডিপ্লোমা প্রদানের জন্য ১২টি সরকারি ও ১২টি বেসরকারি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ATI) এবং কৃষি ও কৃষি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি) প্রদানের জন্য ২টি বিশেষ কলেজ এবং ১০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যালোচনা করে কৃষি শিক্ষার বিষয়ে যে সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো হল :

মাধ্যমিক স্তরে কৃষি একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত বিধায় নবম ও দশম শ্রেণীর নিম্নে কৃষি বিষয় হিসাবে পড়ানো সমীচীন নয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে কৃষি বিষয়টি পড়ানো যেতে পারে। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ATI) থেকে ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের মেধার ভিত্তিতে কৃষিতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

সময়ের সাথে সংগতি রেখে কৃষি শিক্ষার উচ্চ স্তরে বিশেষ করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক আধুনিক বিষয়গুলো যেমন-Bio Technology, Genetic Engineering, Molecular Techniques, Tissue Culture এগুলো সংযুক্ত করে কোর্স কারিকুলাম পুনর্গঠন করতে হবে।

কৃষি একটি প্রায়োগিক বিষয় বিধায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান, গবেষণা এবং সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণে ব্যবহার উপযোগী প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন খামার/মাঠ থাকতে হবে। Bio Technology and Genetics Engineering, Molecular Techniques, Tissue Culture, ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা সম্পাদনের জন্য একটি আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন করা যেতে পারে যা সকল বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করতে পারবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত লাইব্রেরি ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা থাকা দরকার।

কৃষি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে অভিন্ন কোর্সে কারিকুলাম চালু করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য Course Credit System চালু করা যেতে পারে এবং মূল্যায়নের জন্য জিপিএ পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাঠ্যসূচির মধ্যে বাস্তব জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে স্নাতক পাশের পর ইন্টার্নশিপ বা ফার্ম প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা খাতে প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার সাথে জাতীয় গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজের সমন্বয় থাকতে হবে।

বাংলাদেশে যেহেতু চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে সুতরাং নতুন কৃষি বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করে বিদ্যমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজসমূহের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তি হস্তান্তর, নব নব প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং এগুলোকে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, কারিগর ও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষকর্মী তৈরির জন্য বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাদানের জন্য ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ডিপ্লোমাধারী টেকনিসিয়ান তৈরির জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং উচ্চতর স্তরে প্রকৌশলী তৈরির জন্য ২টি বিশেষ কলেজ ও ৫টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। একাডেমিক সনদপত্র লাভের ব্যবস্থা না করার ফলে ভি.টি.আই ও টিটিসি-এর প্রচলিত বৃত্তিমূলক কোর্সসমূহ জনপ্রিয়তা পায় নি। ডিপ্লোমা প্রদানের জন্য যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে সেগুলোতে মানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির অনুকূল পরিবেশের অভাব এবং ডিপ্লোমা প্রাপ্তির পর কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতমানের প্রকৌশলী তৈরি করছে যদিও গবেষণা

কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে সক্ষম হয় নি। চারটি সাবেক বিআইটি (বতর্মানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত), কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি এবং কলেজ অব লেদার টেকনোলজি বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে কোর্স পরিচালনা করছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্স পরিচালনায় যে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে সেগুলো হল–শ্রমবাজারের চাহিদা এবং কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমাধারী/সার্টিফিকেটধারীদের গুণগত বৈসাদৃশ্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থবিরতা, কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে পরিবর্তনশীলতার (flexibility) অভাব, প্রশিক্ষণের জন্য কাঁচামালের অপ্রতুলতা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দের অপ্রতুলতা, শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সরকারি সহায়তার অভাব এবং সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির সহায়ক কোর্স কারিকুলাম সংযোজনে অনীহা দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়।

দেশে দক্ষ শিল্পকর্মী, টেকনিশিয়ান ও প্রকৌশলী তৈরির জন্য যে সুপারিশ পেশ করা হয়েছে সেগুলো হল–প্রকৌশলী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে ২০% উন্নীতকরণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬৫ বৎসর পর্যন্ত চাকুরি করার সুযোগ প্রদান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:১৫ তে উন্নীতকরণ, সর্বস্তরের শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, টি.টি.সিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর স্নাতকোত্তর কোর্স চালুকরণ এবং ছাত্রদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও কারিগরদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল বিদ্যায়তন/ইনস্টিটিউটগুলোকে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, অনুদান ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থার সুপারিশও করা হয়েছে।

বৃত্তিমূলক পেশায় অধিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীকে "মাস্টার ক্রাফটসম্যান" এবং টেকনিসিয়ানদের মর্যাদা "মাস্টার টেকনিসিয়ান" হিসাবে জাতীয় স্বীকৃতি দিয়ে শ্রমবাজারে গ্রহণযোগ্য মানের দক্ষতাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, ভিটিআই/টিটিসি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অন্যান্য ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকৌশল বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্তে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ কাউন্সিল গঠন করা একান্ত জরুরি। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ এবং পেশাগত সংগঠন আইইবিকে শক্তিশালী করার প্রস্তাবও রয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষা

বর্তমানের বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃটিশ শাসনামলে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও ময়মনসিংহে একটি করে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়। ১৯৪৬ সালে ঢাকায় এতদঞ্চলে দেশের প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি চালু হয়। বর্তমানে সারাদেশে ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ২০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশে দুই স্তর বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতক পূর্ব কোর্স এবং বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক স্নাতকোত্তর কোর্স প্রদান করা হয়।

এ দেশে মেডিকেল শিক্ষা শহরস্থিত নিরাময়মুখী হাসপাতালকেন্দ্রিক। ফলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকালে জনগণের প্রকৃত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি জানা ও সমাধানে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয় না। মেডিকেল শিক্ষার পাঠ্যসূচি বিষয়ভিত্তিক, তথ্যনির্ভর নয়। কারিকুলাম বেশিরভাগ তাত্ত্বিক, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সীমিত। ক্লিনিক্যাল বিষয়ে মেডিকেল শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডের বেশিরভাগ হাসপাতালে রোগীকে সেবাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিক্ষাদানের সময় তুলনামূলকভাবে কম। মেডিকেল কলেজসমূহের ভৌত অবকাঠামো, লোকবল, শিক্ষার প্রযুক্তিগত মান ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের অভাব এবং প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ড ও গবেষণা কার্যক্রম অপর্যাপ্ত।

বর্তমানে দেশে কর্মরত চিকিৎসাবিদের সংখ্যা ২৮৫৩৭ জন। চিকিৎসক ও জনসংখ্যার অনুপাত ১:৪৬৫৪। ২০২০ সালে দেশের জনসংখ্যা ১৭.২ কোটিতে পৌঁছাবে। তখন চিকিৎসক ও জনসংখ্যার অনুপাত ১:৩০০০ এ নিশ্চিত করতে হলে চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ৬৩,০০০ বৃদ্ধি করতে হবে। এর জন্য চিকিৎসা শিক্ষাক্ষেত্রে কাঠামোগত,

ব্যবস্থাপনা, কারিকুলাম ও বিষয়বস্তুতে যে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন, তার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ কাঠামোর আওতায় একটি জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্তৃত্ব থাকবে। মেডিকেল কলেজগুলোর ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রতিটি কলেজে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল এডুকেশন বিভাগ স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া মেডিকেল শিক্ষাকে অধিকতর কার্যকরী করে তোলার জন্য শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের পদায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন, কলেজগুলোতে অবকাঠামোগত পরিবর্তন, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, কারিকুলামকে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

এদেশে চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার সূচনা ১৯৬৫ সালে আইপি.জি এম.আর ও কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এন্ড সার্জন্স এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। উচ্চতর শিক্ষার মূলত দুটি ধারা প্রচলিত রয়েছে। ক্লিনিক্যাল ও প্রি-ক্লিনিক্যাল বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিপ্লোমা, মাস্টার্স, এম.ফিল, পি-এইচ.ডি কোর্স এবং বাংলাদেশে কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এন্ড সার্জনস কর্তৃক মেম্বারশিপ ও ফেলোশিপ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিএসএম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সসমূহ পরিচালনা করে।

চিকিৎসা উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিসিপিএস পরিচালিত দুটি ধারা, অবকাঠামোভেদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ভিন্নতা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, অনেক ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সুবিধাদি না থাকায় প্রশিক্ষণের কাম্যমান অর্জিত হচ্ছে না। বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না থাকার কারণে উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি হস্তান্তরে সমস্যা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণকে কার্যকর করার জন্য চিকিৎসা সেবার সাথে প্রশিক্ষণের একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। প্রশিক্ষণকাল যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন করতে হবে।

দেশে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান NIPSOM। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত। এ প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করা যেতে পারে।

দেশের ডেন্টাল শিক্ষা ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। একটি সরকারি ডেন্টাল কলেজ এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে সংযুক্ত একটি করে ডেন্টাল ইউনিট স্নাতকপূর্ব কোর্স পরিচালনা করে। বেসরকারি কয়েকটি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও ভৌত অবকাঠামোর বিবেচনায় মানসম্মত নয়। ডেন্টাল শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অনুষদ গঠন ও সংরক্ষণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

নার্সিং চিকিৎসা সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমাদের দেশে নার্সিং শিক্ষায় প্রশিক্ষিত লোকবলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। নার্সিং পেশায় লোকবলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুসংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রশিক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবায় মেডিকেল কৌশলীদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা

ইংরেজ আমলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থা এরই ধারাবাহিকতা হিসাবে চলে আসছে। কাল পরিক্রমায় এ ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ শিক্ষাধারার উন্নয়ন সাধন এবং সাধারণ শিক্ষার সাথে এ শিক্ষাধারার দূরত্ব ও বৈষম্য নিরসনকল্পে অনেক কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০০২ সালে একটি মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করেছিলেন। উক্ত কমিটির বিবেচিত বিষয়সমূহ শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

সারাদেশে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা ১৮,২৬৮টি, দাখিল মাদ্‌রাসা ৯,২০৬টি, আলিম মাদ্‌রাসা ১,১৮০টি, ফাযিল মাদ্‌রাসা ১,১৮০টি এবং কামিল মাদ্‌রাসা ১৮০টি রয়েছে। এ মাদ্‌রাসাগুলো পরিচালনার জন্য যে পরিচালনা পরিষদ রয়েছে তা সঠিকভাবে কাজ করছে না বিধায় বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি পরিচালনা পরিষদ গঠিনের সুপারিশ করা হয়। মাদ্‌রাসাগুলো পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য বর্তমানের প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে

যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে বিধায় সেগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে নিবিড় পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ একান্ত জরুরি। স্কুল/কলেজের স্টাফিং প্যাটার্নের সাথে মাদ্‌রাসার স্টাফিং প্যাটার্নের যে বৈষম্য রয়েছে তা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ যে সুবিধা পান মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের জন্য যে সুবিধা প্রদান। পর্যায়ক্রমে ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা জাতীয়করণ, ইবতেদায়ি ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই পুস্তক প্রদান, হিফয শাখাকে ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ, মাদ্‌রাসার ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করে মাধ্যমিক স্কুলের অনুরূপ করা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম ও টেক্সট বোর্ড উইং শক্তিশালীকরণ, মাদ্‌রাসা প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স প্রবর্তন, মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, বি.সি.এস (মাদ্‌রাসা শিক্ষা) প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়াদি সুপারিশ করা হয়েছে।

মাদ্‌রাসা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কামিল ডিগ্রিকে ব্যাচেলর এবং কামিলকে মাস্টার ডিগ্রির সমতুল্য গণ্য করার সুপারিশ করা হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রশিক্ষিত শিক্ষক ব্যতীত গুণগত শিক্ষা প্রদান সম্ভব নয়। মাদ্‌রাসা শিক্ষককের জন্য প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাদের জন্য সি-ইন.এম.এড, বি-এম.এড, এম.এস.এড শিক্ষাক্রম প্রয়োজনীয়। প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে পর্যায়ক্রমে সকল মাদ্‌রাসা শিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া সরকারি বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা কার্যক্রমে গবেষণার কোন ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে মাদ্‌রাসা শিক্ষা গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা করে মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যক্রমে গ্রহণ করতে হবে।

নারীকে শিক্ষার মূল ধারায় আনয়ন

বাংলাদেশ সংবিধানে নারীর সম অধিকার নিশ্চিত করা সহ নারীর জন্য সমতাভিত্তিক, গুণগত ও সমমানের শিক্ষালাভের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ জারি করা হয়। ১৯৯০ সালে জমতিয়নে অনুষ্ঠিত সার্বজনীন বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন, ১৯৯৫ সালে বেইজিং ঘোষণাপত্রে এবং ২০০০ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা ঘোষণাপত্রে নারীশিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নারীর শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরা বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে সমাজে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে। এতদ্‌সত্ত্বেও নারীশিক্ষার চিত্র আশানুরূপ পর্যায়ে উন্নীত হয় নি।

নারীশিক্ষা প্রসারে তুলনামূলক চিত্র খুব আশাব্যঞ্জক নয়। মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদি, ছাত্র-ছাত্রীদের আনুপাতিক হার এখন পর্যন্ত আলাদা করা সম্ভব হয় নি। নারীকে শিক্ষার মূল ধারায় আনয়নের জন্য শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ও ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য নীতি, বিধান ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করাসহ আরও কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি

দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজে এবং বেসরকারি ও পাবলিক বিশ্ববদ্যিালয়সমূহে বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। তবে শিক্ষাগ্রহণের পরে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণলাভের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় দেশে প্রকৃতপক্ষে সফট্‌ওয়্যার বিশেষজ্ঞ সৃষ্ট হচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান :

১. সরকারগৃহীত নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

২. প্রাথমিকভাবে সরকারি কাজগুলো বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিয়ে তাদের সাথে বাংলাদেশের Computer Graduate-দের সম্পৃক্ত করে দেশীয় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা;

৩. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অফিস এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে automation-এর আওতায় এনে ICT sector-কে দেশের মধ্যে উৎসাহিত করা। পরবর্তী পর্যায়ে High speed communication backbone-এর মাধ্যমে বিদেশের কাজগুলোকে নিয়ে আসা;

৪. বিদেশে যে-সব বাংলাদেশী সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ আছেন তাঁদের স্বল্পকালীন (৬ মাস) সময়ের জন্য দেশে আমন্ত্রণ করে এনে এখানকার কম্পিউটার ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা;

৫. দেশে শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের মধ্যে চাকুরিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।

শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি

বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার ঘটে নি এবং যে দেশের অঞ্চলভেদে শিক্ষার সুযোগে ও পরিবেশে বিস্তর তারতম্য রয়েছে সেখানে দূরশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণের জন্য বিস্তৃত অবকাঠামো রয়েছে। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সব সুযোগ ব্যবহার করে সাক্ষরতা অভিযান, জনগণের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান, অব্যাহত শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোর সাথে যদি কেবল কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যায় এবং একটি টিভি চ্যানেল নিবেদিত করা যায় তাহলে স্বল্পসময়ে একটি জ্ঞাননির্ভর সমাজনির্মাণ দুরূহ হবে না।

গ্রন্থাগার শিক্ষা

গ্রন্থাগার শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগার সুবিধা অপরিহার্য। শিক্ষার সকল স্তরে (প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত) সুদৃঢ় শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত লোকবল দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালনার বিকল্প নেই। আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, পেশাগত শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে গ্রন্থাগার রয়েছে সেগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তকের অভাব, পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত লোকবলের অভাব, আধুনিক সুবিধাদির (কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ইত্যাদি) অভাব, গ্রন্থাগারে বসে পড়ার জন্য স্থানের অভাব এবং গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য যে সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো হল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে একহাজার পুস্তক সম্বলিত ১টি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা এবং সেটি ব্যবস্থাপনার জন্য একজন শিক্ষককে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, পিটিআইগুলোতে জনবল কাঠামোসহ একটি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা, নেপ (NAPE) এ জাতীয় মানের একটি গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ; মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো সৃষ্টিসহ একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা; উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজগুলোতে গ্রন্থাগারিক ও সহায়ক লোকবলসহ উন্নতমানের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা; বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরী ও গবেষণা গ্রন্থাগারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত জনবল, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সম্বলিত উন্নত মানের গ্রন্থাগার সুবিধাদি সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এতদসংগে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষায় পেশাজীবি তৈরির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম আরো উন্নত করতে হবে।

সূচিপত্র

প্রথম অংশ : সাধারণ শিক্ষা

		পৃষ্ঠা
১.	প্রাথমিক শিক্ষা	০১
২.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	৬৬
৩.	উচ্চ শিক্ষা	১০৬

দ্বিতীয় অংশ : পেশাগত শিক্ষা

১.	কৃষি শিক্ষা	২০১
২.	প্রকৌশল শিক্ষা	২১৪
৩.	চিকিৎসা শিক্ষা	২৩৬

তৃতীয় অংশ : বিশেষায়িত শিক্ষা

১.	মাদ্‌রাসা শিক্ষা	২৭০
২.	নারীকে শিক্ষার মূল ধারায় আনয়ন	২৮১
৩.	তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা	২৮৬
৪.	শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি	২৮৯
৫.	গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষা	২৯৫

শেষের কথা ৩০৮

পরিশিষ্ট

১.	পরিশিষ্ট-১ : জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ এর গঠন	৩০৯
২.	পরিশিষ্ট-২ : উপকমিটি	৩১১
৩.	পরিশিষ্ট-৩ : পরামর্শক	৩১৫
৪.	পরিশিষ্ট-৪ : আলোচনা সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ	৩১৬
৫.	পরিশিষ্ট-৫ : জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ সচিবালয়	৩৪২

প্রথম অংশ : সাধারণ শিক্ষা

	পৃষ্ঠা
প্রাথমিক শিক্ষা	১-৬৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	৬৬-১০৫
উচ্চ শিক্ষা	১০৬-২০০

সূচিপত্র

প্রাথমিক শিক্ষা

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন /কমিটি প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়নে অগ্রগতি	৪
তৃতীয় অধ্যায়	
প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৯
চতুর্থ অধ্যায়	
মানসম্মত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা	১১
পঞ্চম অধ্যায়	
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	১৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	
প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ	২৪
সপ্তম অধ্যায়	
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫
অষ্টম অধ্যায়	
শিক্ষক নিয়োগ	৩২
নবম অধ্যায়	
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৩৬
দশম অধ্যায়	
প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন	৪১
একাদশ	
পরিদর্শন ব্যবস্থা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং একাডেমিক সুপারভিশন	৪৭
দ্বাদশ অধ্যায়	
প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখনশেখানো সামগ্রী	৫১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
পরীক্ষা ও মূল্যায়ন	৫৫
চতুর্দশ অধ্যায়	
প্রাথমিক শিক্ষায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা	৫৭
পঞ্চদশ অধ্যায়	
প্রাথমিক স্তরের অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি চালুকরণ	৫৮
ষোড়শ অধ্যায়	
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	৬০

প্রথম অধ্যায়
পূর্বকথা

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। কেননা এ স্তরে শিক্ষার মূল ভিত রচিত হয়। সেজন্যে প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা নিখুঁত হওয়া দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন সময়ে এর সংস্কার ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা হয়েছে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে এ যাবত বহু কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়গুলোকে আলোচনার সুবিধার্থে মোট ১৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা, সমস্যা সনাক্তকরণ ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১ প্রাক-বাংলাদেশ আমল

শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের জন-মানুষের অনুরাগ ও আগ্রহ চিরন্তন। প্রাক-বৃটিশ যুগে একসময় এদেশের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। দেশীয় শিক্ষার অংশ হিসেবে তখন সারা দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রতি ৪০০ জনের জন্য একটি করে বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল[১]। বৃটিশ শাসনামলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় এবং তার স্থলে ১৮৫৪ সালের পর থেকে এখনকার শ্রেণী ও স্তর ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সময় ও সমাজের প্রয়োজনে, পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে। পুরো বৃটিশ আমলে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার, উন্নয়ন ও বিস্তারের লক্ষ্যে বহু কমিশন, কমিটি এবং আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু তার বাস্তবায়নে তেমন কিছুই করা হয় নি। অন্যদিকে ২৩ বছরের পাকিস্তানি আমলে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৪ বছর থেকে ৫ বছরে বৃদ্ধি ব্যতীত, গণমুখী শিক্ষার বিস্তার ও সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি।

১.২ বাংলাদেশ আমল

মৌলিক শিক্ষালাভ একজন মানুষের জন্মগত অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে এদেশের নাগরিকদের মৌলিক শিক্ষার অধিকার সমুন্নত রাখা হয়েছে। একজন মানুষকে তার ব্যক্তিগত চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানো, পরিবার ও সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তার যথার্থ ভূমিকা পালন, নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, ধর্মীয় কর্তব্য পালন এবং দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, বিশ্বমানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা, মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ সৃষ্টি এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য ন্যূনতম মৌলিক শিক্ষা একান্ত আবশ্যক।

দেশের সকল মানুষকে ন্যূনতম মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে, সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা দান করা। প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৮০ সালে দেশে সর্বজনীন এবং ১৯৯৩ সালে ৫ বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। ধর্ম, বর্ণ, দারিদ্র্য, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি যাতে দেশের সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষালাভে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই, শিক্ষার জন্য খাদ্য এবং বর্তমানে উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৯৭.৫%-তে এসে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি ৫ বছরের শিক্ষা সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭% হয়েছে। অর্থাৎ ঝরে পড়ার হারও হ্রাস পেয়ে ৩৩% -এ নেমে এসেছে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ে বালক-বালিকার ভর্তির অনুপাত ৫১ঃ৪৯ -এ দাঁড়িয়েছে(১)। বস্তুত আশি এবং নব্বইয়ের দশকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ও সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কারণে এর পরিমাণগত লক্ষ্য যে প্রায় অর্জিত হয়েছে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রচেষ্টায় আর মাত্র ১% বা ১.৫% শিশুকে বিদ্যালয়ভুক্ত করা সম্ভব হবে। অবশিষ্ট ১% বা ১.৫% শিশুদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে দেশে ১%-১.৫% বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু থাকাই স্বাভাবিক। প্রতিবন্ধী এই শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ডাকার (Dakar) ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মানসম্মত শিক্ষা ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিষয়ে আমাদের এখন বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে। বিষয়টি এড়িয়ে গেলে সর্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ম্লান হতে বাধ্য। অবশ্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় (PEDP II) এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত লক্ষ্য ইতোমধ্যে প্রায় অর্জিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা এবং প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পেছনে আছি। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জিত পরিমাণগত সাফল্যকে ধরে রেখে আগামীতে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা আবশ্যক।

মানসম্মত শিক্ষার প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। কারণ, মানসম্মত শিক্ষার সঙ্গে বহু উপাদান সংশ্লিষ্ট। তবে উপাদানগুলো মোটামুটিভাবে আমাদের জানা। উপাদানগুলো যথাস্থানে আলোচিত হবে।

---

১. Primary Education Statistics in Bangladesh-2001, DPE Dhaka May 2002.p-7, &10.

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন/কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়নে অগ্রগতি

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বহু কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে। এসব কমিশন/কমিটির রিপোর্ট কোনটিই সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয় নি। কোন্ রিপোর্ট কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তার একটি ধারণা দেয়ার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের অবস্থা নিম্ন ছকে দেখানো হল :

শিক্ষা কমিশন/কমিটি		সুপারিশ	বাস্তবায়ন অবস্থা
১.	**শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি। জুলাই ২০০২**	১. মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল শিক্ষকের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা একইরূপ নির্ধারণ (উচ্চ মাধ্যমিক)।	বাস্তবায়িত হয় নি।
		২. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা বহাল রাখা। তবে নিয়োগের স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং উচ্চ মেধাসম্পন্ন ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য ১০০ নম্বরের নির্বাচনী পরীক্ষার লিখিত অংশে ৯০ এবং মৌখিক অংশে ১০ নম্বর নির্ধারণ করা। নির্বাচনী পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান এই ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রাখা।	আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৩. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি কর্তৃক বিদ্যমান শূন্যপদ পূরণসহ ১ বছরের জন্য উপজেলা ভিত্তিক নিয়োগ-প্যানেল প্রস্তুত করে পত্রিকায় প্রকাশ করা। প্রতি বছর একবার এ ধরনের নির্বাচনী পরীক্ষার আয়োজন করা।	আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে।
		৪. শিক্ষকদের শিক্ষাদান কর্ম বা কৃতি (Performance) মূল্যায়নের জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ব্যবস্থা চালু করা।	হয় নি।
		৫. প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ২ বছর থেকে ৩ বছরে উন্নীত করাসহ অভিভাবক সদস্য সংখ্যা ৬-এ বৃদ্ধি এবং তার অর্ধেক মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ করা।	হয় নি।
		৬. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োগকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রাথমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রয়োজনে নিয়োগের পর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে (NAPE)- একটি ওরিয়েন্টশনের ব্যবস্থা করা।	হয় নি।
		৭. আইনের দ্বারা প্রাথমিক পর্যায়ের সকল প্রকার নোট/গাইড বই প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ এবং আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।	হয় নি।
		৮. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে বিভক্ত করে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কাজকে পৃথক সংস্থায় রূপান্তরিত করা।	হয় নি।
		৯. শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-কে কার্যকর ভাবে গড়ে তোলা এবং সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণকে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের আওতায় আনা।	আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে (প্রক্রিয়াধীন)।

শিক্ষা কমিশন/কমিটি	সুপারিশ	বাস্তবায়ন অবস্থা
	১০. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	১১. দেশের সকল পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন আবশ্যিক বা মূল (Core) কারিকুলাম তৈরি করা এবং তা অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা।	হয় নি।
	১২. কেজি স্কুলগুলিকে রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৬২'র আওতায় আনা।	হয় নি।
	১৩. প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৬টি শ্রেণীকক্ষ এবং ৬ জন শিক্ষকের সংস্থান করা।	হয় নি।
	১৪. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি পৃথক কর্ম কমিশন গঠন করা।	হয় নি।
	১৫. প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি শ্রেণী প্রবর্তন করা।	হয় নি। (বর্তমানে BRAC-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে)।
	১৬. জেলা পর্যায়ে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল প্রস্তুতের জন্য নির্বাচনী কমিটি গঠন।	হয় নি।
	১৭. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা (Professionalism) বিকাশের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠন।	প্রক্রিয়াধীন।
	১৮. উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চম শ্রেণীর পর একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা প্রবর্তন।	হয় নি।
	১৯. জেলা/উপজেলা/সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার/প্রধান শিক্ষকের নিয়োগবিধি ও চাকুরির বিবরণ(Job Description) পরিমার্জন/পরিবর্তন/ সংশোধন।	হয় নি।
২. **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০**	১. প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি করা।	হয় নি।
	২. সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৫টি কক্ষের ব্যবস্থা করা।	হয় নি।
	৩. শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩৫ নির্ধারণ করা।	হয় নি।
	৪. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।	প্রচেষ্টা চলছে।
	৫. প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা।	হয় নি।
	৬. তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি এবং ধর্ম (জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্বসহ) পাঠ অন্তর্ভুক্ত থাকা।	১ম শ্রেণী থেকে ইংরেজি ও ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।
	৭.নিম্ন প্রাথমিক স্তরের জন্য শিক্ষকের যোগ্যতা একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ মহিলা এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ।	হয় নি

শিক্ষা কমিশন/কমিটি	সুপারিশ	বাস্তবায়ন অবস্থা
	৮. সরাসরি প্রধানশিক্ষক নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা দ্বিতীয় বিভাগ স্নাতক এবং তিন বছরের মধ্যে সিইনএড বা বিএড প্রাইমারি অর্জন।	আংশিক বাস্তবায়িত।
	৯. শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা।	হয় নি।
	১০. শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।	হয় নি।
	১১. এইচ এসসি পাশ শিক্ষকদের এক বছরের সি-ইন- এড এবং স্নাতক শিক্ষকদের একবছর মেয়াদি বিএড(প্রাইমারি) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	প্রথম অংশ বাস্তবায়িত হয়েছে।
	১২. কিছু সংখ্যক পিটিআই-তে বিএড প্রাইমারি কোর্স প্রবর্তন করা।	হয় নি।
	১৩. নেপ-কে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষমতাসহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	১৪. ২০০৫ থেকে ৫+ শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ।	আপাতত BRAC-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
	১৫. প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আংশিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা।	যুগের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে সংশোধিত হয়েছে।
	১৬. জন্ম নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা।	করা হয়েছে।
	১৭. ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রচলন।	১ম থেকে ৫ম শ্রেণীতে পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে।
৩. **বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৬**	১. ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা।	বাস্তবায়িত হয়েছে।
	২.প্রাথমিক শিক্ষাকে ২০০০ সালের মধ্যে ৮ বছর মেয়াদি করা।	হয় নি।
	৩. শিক্ষার্থীদের দুপুরের টিফিনের ব্যবস্থা করা।	হয় নি।
	৪. প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফিডার প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা।	আংশিক হয়েছে।
	৫. বিদ্যালয়ের ছুটি এমনভাবে সমন্বয় করা যাতে কাজের মৌসুমে শিক্ষার্থীরা ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে পারে।	হয় নি।
	৬. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	হয় নি। (আপাতত BRAC-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে)।
	৭. কর্মমুখী শিক্ষা চালু ও পুথিগত বিদ্যার চেয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া।	আংশিক বাস্তবায়িত।

শিক্ষা কমিশন/কমিটি		সুপারিশ	বাস্তবায়ন অবস্থা
		৮. তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি চালু।	১ম শ্রেণী থেকে ইংরেজি চালু হয়েছে।
		৯. প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা কমপক্ষে এইচ এস সি পাশসহ দ্বিতীয় বিভাগ।	হয়েছে।
		১০. যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০০ তদূর্ধ্ব- শিক্ষার্থী আছে সেখানে সহকারী প্রধানশিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা।	হয় নি।
		১১. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীকে শক্তিশালী করা।	করা হয়েছে।
		১২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা।	করা হচ্ছে।
৪.	জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি ১৯৭৯	১. প্রাথমিক শিক্ষাকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করা।	হয় নি (১৯৯২ সন থেকে করা হয়েছে)
		২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ করা।	হয় নি।
		৩. ইউনিয়ন শিক্ষাকমিটি কর্তৃক দরিদ্র শিশুদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।	কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
		৪. প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দান ও পুষ্টি সম্পূরক খাবারের ব্যবস্থা করা।	হয় নি।
		৫. দীর্ঘ ছুটির সময়ে শিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	হয় নি।
		৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, প্রয়োজনে যোগ্যতা সাময়িকভাবে শিথিল করে, মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা।	হয়েছে।
		৭. প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থানীয় সরকারের দায়িত্বে ন্যস্ত করা এবং এজন্য একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা।	হয় নি।
		৮. ইউনিয়ন কমিটির অধীনে প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন করা।	হয় নি।
		৯. প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করা।	হয়েছে।
		১০. প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা।	হয়েছে।
		১১. শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রত্যেক জেলায় একটি স্বায়ত্তশাসিত জেলা কর্তৃপক্ষ গঠন করা।	হয় নি।
		১২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকদের উচ্চতর বেতনক্রম বা বিকল্প বেতনের ১০% অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা।	হয়েছে।
		১৩. স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, উৎপাদন, মৌসুম, হাট বাজার, অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠান বিবেচনায় বিদ্যালয়ের সময়সূচি নির্ধারণ করা।	হয় নি।

শিক্ষা কমিশন/কমিটি		সুপারিশ	বাস্তবায়ন অবস্থা
		১৪. ইউনিয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।	হয় নি।
		১৫. প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনভাতা, দ্রব্যমূল্যের সূচকের এবং সমযোগ্যতা সম্পন্ন অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।	হয় নি।
		১৬. স্থানীয়ভাবে গ্রাম ও ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক স্থানীয় জনসাধারণকে বিশেষভাবে অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করে অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ করা এবং তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ, মেরামত, শিক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয় করা।	হয় নি।
৫.	বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪	১. ১৯৮০ সালের মধ্যে ১-৫ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা।	হয় নি (১৯৯২ সন থেকে করা হয়েছে)।
		২. ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা।	হয় নি।
		৩. প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় চালু করা।	হয় নি।
		৪. প্রয়োজনে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা শিথিল করে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দান এবং প্রয়োনবোধে মেয়েদের জন্য পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।	আংশিকভাবে বাস্তবায়িত (মহিলাদের নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হয়েছে, তবে পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় নি।
		৬. ১-৮ম শ্রেণীর শিক্ষার সঙ্গে কর্মঅভিজ্ঞতা এবং পুস্তকনির্ভর জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া।	আংশিক হয়েছে।
		৭. ১-৫ শ্রেণীর শিক্ষাদনের জন্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা।	হয়েছে।
		৮. একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী স্থাপন।	হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এখানে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (২০০২সাল) প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল। উপকমিটি এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন/সংশোধন/পরিমার্জন প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না।

৩.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য :

শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.২ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য :

৩.২.১ শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।

৩.২.২ স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা।

৩.২.৩ শিশুর মনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগানো এবং তাকে শান্তিময় পরিবেশের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

৩.২.৪ শিশুর মনে মানবাধিকার, পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আর্ন্তজাতিকতাবোধ এবং বিশ্বশান্তি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

৩.২.৫ শিক্ষার্থীকে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহী করা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গঠন এবং অর্থপূর্ণ শ্রমের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

৩.২.৬ পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুকে তার নিজের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

৩.২.৭ শিশুকে পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলনের অভ্যাস গঠনে সহায়তা করা।

৩.২.৮ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিশুর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং দেশগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.২.৯ জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

৩.২.১০ শরীরচর্চা ও খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৩.২.১১ জীবনের সর্বস্তরে কার্যকর ব্যবহারের জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

৩.২.১২ শিশুকে গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা এবং যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

৩.২.১৩ বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজির সাথে প্রাথমিক পরিচিতি লাভ, এ ভাষার প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনে ও ব্যবহারে সহায়তা করা।

৩.২.১৪ শিখন-দক্ষতা ও জ্ঞানের যথার্থ কৌতূহল সৃষ্টি করে আজীবন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করা।

৩.২.১৫ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৩.২.১৬ তথ্যের উৎস, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণালাভে সহায়তা করা।

৩.২.১৭ শিশুকে পরিবেশ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা এবং পরিবেশের দূষণরোধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এর উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.২.১৮ সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, নান্দনিকবোধ ও বুদ্ধির বিকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সহায়তা করা।

৩.২.১৯ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করা।

৩.২.২০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি বাঞ্ছিত নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা।

৩.২.২১ মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের উপর জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভে এবং এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

৩.২.২২ সামর্থ্য, প্রবণতা ও আগ্রহ অনুসারে শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা এবং পরবর্তী স্তরে তাকে শিক্ষালাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

চতুর্থ অধ্যায়
মানসম্মত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

৪.১ সার্বজনীন শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বজনীনতা আনতে হলে নির্দিষ্ট বয়সের (৫ ± ১০ বছর) সকল শিশুর বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ থাকতে হবে। অর্থাৎ ৫ বছর বয়সের শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র যাতে সকল শিশুই সম্পন্ন করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে এসব শিশু যেমন পড়তে, গুছিয়ে কথা বলতে, লিখতে ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় হিসেব-নিকেশ করতে পারবে তেমনি নির্ধারিত অন্যান্য প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোও অর্জন করবে ।

১৯৭৪ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ১৯৮০ সালের মধ্যে ৫ বছরের এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ বছরের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয় । কিন্তু এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় নি। স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। ১৯৯০-এর শেষ দিকে আইন বলবৎ করার লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট গঠন করা হয়। এবং ১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে ৬৮টি থানায় এই আইনের বাস্তবায়ন সূচিত হয়। এ কাজকে বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ডিভিশন কার্যক্রম শুরু করে। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৯০-৯৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা হিসেবে ঘোষণা করা ছাড়াও নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য র্নিধারণ করা হয় :

- সকল এলাকায় সমতাভিত্তিক শিক্ষার নতুন সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা ও বর্তমান সুযোগসুবিধার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- অধিকতর হারে মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্তকরণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য চাকুরীকালীন উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা;
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা;
- একাডেমিক সুপারভিশন ও প্রশাসনিক পরিদর্শন চালু করা।

৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার ৬০% থেকে ৭০%-এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও সকল ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। তাই ১৯৯০-৯৫ সাল ব্যাপী ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ দুটি বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৮-২০০২) লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ভর্তিহার ৯৫% ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নের হার ৭০% ধরা হয়। মেয়াদ শেষে ভর্তি-হারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার হার অর্জিত হয় নি। ১৯৯১ সালে এ হার ছিল ৪০.৭% অর্থাৎ ঝরে পড়ার হার ৫৯.৩%। ২০০১ সালে শিক্ষাচক্র সম্পন্নের হার ছিল ৬৭% । এ পরিসংখ্যান যথাযথ ধরে নিলেও বলা যায় যে ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এক্ষেত্রে অদ্যাবধি অর্জিত হয় নি। তবে নির্ধারিত লক্ষ্য সব ক্ষেত্রে অর্জিত না হলেও পরিসংখ্যানগত ফলাফলে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্তকারী শিশুদের জন্য নির্ধারিত যে যোগ্যতা অর্জন করা কাম্য তারা তা অর্জন করলে তা হবে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা । প্রাথমিক শিক্ষার এ দিকটি অর্থাৎ নির্দিষ্ট মানের বিষয়টি এ পর্যন্ত অবহেলিত থেকে গেছে। এ যাবৎ অবকাঠামো উন্নয়ন, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্জিত উন্নতি অর্থহীন হবে যদি শিক্ষার মান একটি ন্যূনতম পর্যায়ে উন্নীত করা না যায়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৪র্থ ও ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্বর্তীকালীন দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের দিকটি গুরুত্ব পায় এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলোর কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হল :

- পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) স্থাপন ও সুসজ্জিতকরণ;
- শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণপদ্ধতি প্রবর্তন ;

- নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, ভবন নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার;
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা-উপকরণ বিতরণ;
- প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ;
- দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও সে মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন;
- কর্মকর্তা, শিক্ষক, ইনস্ট্রাক্টর ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (এস এম সি) সদস্যদের জন্য উন্নত মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- পরিদর্শন ও মনিটরিং কাজ জোরদারকরণ ও একাডেমিক সুপারভিশন চালুকরণ;
- ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পিটিআই ও নেপ-এর প্রশিক্ষকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- সর্বমোট ভর্তির গ্রস হার ১১০% ও নীট হার ৯৫%-এ উন্নীত করা;
- প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নের হার ৭৫% করা।

৪.২ মানসম্মত শিক্ষার সূচক

বর্তমানে শিক্ষার গুণগত উৎকর্য সাধনের বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। শিক্ষাসংক্রান্ত যে কোন প্রকল্প বা কর্মকাণ্ড হাতে নিতে গেলেই বলা হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষার কথা। শিক্ষা মানসম্মত হয়েছে কিনা তা কতগুলো সূচক দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে, যেমন :

৪.২.১ শিক্ষার্থী সূচক

প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষাগ্রহণ যথার্থ হলে একজন শিক্ষার্থীর স্বনির্ভর পাঠদক্ষতা; গুছিয়ে কথা বলা ও লেখার দক্ষতা ও দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ সংখ্যাভিত্তিক হিসাব করার সক্ষমতা অর্জিত হবে। এছাড়া বিজ্ঞানমনস্কতা ও নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে উঠবে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন তার মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে। শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে শিখবে এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ে কৌতূহলী হবে; নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আদর্শে উজ্জীবিত হবে। ৫ বছর শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করে নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে।

৪.২.২ শিক্ষক সূচক

শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকা সর্বাধিক। "Teacher is the best method" কথাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য মানসম্মত শিক্ষককেই নির্দেশ করে। শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, উন্নত ও প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ, শিখন কার্যের জন্য মানসিক প্রস্তুতি ইত্যাদি একজন শিক্ষকের মান নির্ধারণের প্রধান সূচক হিসেবে গ্রহণ করা যায়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়গুলোকেও মানসম্মত শিক্ষার সূচক ধরা যায়।

৪.২.৩ শ্রেণী ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যালয় পরিবেশ

শুধু শ্রেণী ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যালয়ের মনোরম পরিবেশ একটি শিশুকে যেমন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে উৎসাহিত করে তেমনি পাঠে মনোযোগী হতেও সমভাবে সাহায্য করে। পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও শ্রেণীকক্ষ এবং সহৃদয় শিক্ষকমণ্ডলী বিদ্যালয়কে একটি শিশুর কাছে আকর্ষনীয় করে তোলে। এছাড়া শিখন শেখানোর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শ্রেণী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনেক। ক্লাশে বসে শিক্ষার্থী যদি বাড়ির কথা মনে করে মন খারাপ না করে বরং শ্রেণীর কর্মকাণ্ডে উৎসাহী হয় তাহলে তার শেখার কাজটি সহজ হয়ে যায়। মানসম্মত শ্রেণী ব্যবস্থাপনার সূচক হবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত; শ্রেণীকক্ষের সজ্জা; শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক; সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার; দলগত শিক্ষা; একক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে কাজ করানো; পাঠশেষ ও পাঠমধ্য মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; আর্কষণীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার এবং সর্বোপরি কার্যকর ও সুশৃঙ্খল পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে শ্রেণীব্যবস্থার মানের সূচক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৪.২.৪ শিখন শেখানো সামগ্রী

পাঠ্যপুস্তক শিখন শেখানো সামগ্রীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য পাঠ্যপুস্তককে হতে হবে আকর্ষণীয় ও মানসম্মত । শিক্ষার্থীরা বই হাতে নিয়ে যেমন আনন্দ পাবে তেমনি শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত যোগ্যতাগুলোও যাতে অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক কতটা সহায়তা করছে তার ওপরও শিক্ষামান নির্ভরশীল। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। অবশ্য কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক কিনতে পারে সে জন্য কম মূল্যে পাঠ্যপুস্তকও বাজারজাত করা হয়ে থাকে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের জন্য সরকারকে যে বিরাট অঙ্কের অর্থ লগ্নি করতে হয় তার অংশ বিশেষ দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য/ঋণ থেকে প্রাপ্ত। কোটি কোটি পুস্তকের মান উন্নয়নে যে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান হচ্ছে না বলে পাঠ্যপুস্তকের সার্বিক মান উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে না। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাইলে অবশ্যই পাঠ্যপুস্তকের সার্বিক মান উন্নয়ন করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের পুনঃব্যবহার কোন নতুন ব্যাপার নয়। বিশ্বের উন্নয়নকামী বহু দেশে এমনকি উন্নত দেশগুলোতেও পাঠ্যপুস্তকের পুনঃব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে পার্থক্য এই যে, আমাদের পাঠ্যপুস্তকের উৎপাদন-মান তুলনামূলকভাবে খুবই নিচু। এক বছর ব্যবহারের পর এসব পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশই ব্যবহার উপযোগী থাকে না। এ ধরনের নিম্ন মানের, পুরাতন, ছেঁড়া ও ক্ষতিগ্রস্ত পাঠ্যপুস্তক শিশুরা হাতে নিয়ে বছরের প্রথম দিনই মন খারাপ করে । শিশুর এহেন মানসিক অবস্থা মানসম্মত শিক্ষার পরিপন্থী। উল্লেখ্য, রেজিস্ট্রেশনবিহীন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয় না ।

চার্ট, মডেল, বিল্ডিং, ব্লক, কাঠ, প্লাস্টিক বা মাটির তৈরি বর্ণমালা ও বিভিন্ন সম্পূরক ও সহায়ক সামগ্রী শিখন-শেখানো সামগ্রীর অন্তর্গত। এসব সামগ্রী কখনও কিনতে হয় আবার কখনও শিক্ষকগণ নিজেরাই অথবা ছাত্রদের সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত করতে পারেন। এসব কাজে শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণ কতটুকু বা সার্বিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি শেখার ব্যাপারে ছাত্র/ছাত্রীদের অধিক আগ্রহী করে তুলছে কিনা ইত্যাকার বিষয়গুলো সূচক বলে গণ্য হবে। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকবৃন্দ এ ব্যাপারে যত বেশি যত্নবান হবেন সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান হবে তত উচ্চ। মানসম্মত শিখন সামগ্রীর সূচকগুলো কতটা আকর্ষণীয়, সংগতিপূর্ণ, সহজলভ্য, কৌতূহলোদ্দীপক, স্বল্পব্যয়ী, বয়সভিত্তিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। শিখন সামগ্রী বা শিক্ষা-উপকরণ হচ্ছে এমন সব বস্তু যার ব্যবহারে একটি শিশুর কোন বিষয় সম্পর্কে অতি সহজে জ্ঞান লাভ হয় এবং এমন কিছু দক্ষতা অর্জিত হয় যার ফলে সে নিজে ঐ বিষয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করতে পারে ও যুক্তি প্রদানে সক্ষম হয়।

উন্নত ও আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তকের সাথে সম্পূরক পুস্তকপাঠে শিশুকে উৎসাহী করতে সব বিদ্যালয়ে স্বল্প পরিসরের হলেও একটি গ্রন্থাগার থাকতে হবে। সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় মলাটের ও চিত্তাকর্ষক গল্প, কাহিনী, ছড়া ও কবিতার বইয়ের লভ্যতা ইত্যাদিও মানসম্মত শিক্ষার সূচক।

সাধারণত কোন বিদ্যালয়ে কোন ধরনের শিক্ষা-উপকরণই পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকে না। ফলে অনেক সময়ই ওগুলো শিশুদের ধরতে দেওয়া হয় না। শিশুদের প্রতি এহেন ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি একটিই যে, শিশুদের ব্যবহার করতে দিলে এসব সামগ্রী নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাবে। এ বক্তব্যে কিছুটা যুক্তি থাকলেও এর ফলে যে শিক্ষা-উপকরণ সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্যটিই পণ্ড হয়ে যায় তা অনেকেই অনুধাবন করেন না।

৪.২.৫ শিক্ষাক্রম

শিক্ষাক্রম শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ। একজন শিক্ষার্থী কী পড়বে; কীভাবে পড়বে; কে পড়াবে; কোথায় পড়াবে; কতদিন ধরে পড়াবে, পাঠ্যপুস্তক কীরূপ হবে, কী ধরনের শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়। শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের দক্ষতা ও আচরণিক স্তর কী হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হয়। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে এবং মোট ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ

করে সে মোতাবেক শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষাক্রমের সূচক হতে পারে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক; সর্বজনীন এবং জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিত্তিক; জ্ঞানের আন্তঃশাখা সম্পর্কযুক্ত; কর্মমুখী; পরিবেশ সচেতনতাভিত্তিক; জীবনমুখী দক্ষতাভিত্তিক; ধর্মীয়, মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির স্ফূরণভিত্তিক ইত্যাদি।

৪.২.৬ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যেহেতু কয়েকটি স্তর রয়েছে সেহেতু এর সূচক আলোচনাও স্তরভিত্তিক করা হল।

৪.২.৬.১ বিদ্যালয় পর্যায়: এ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রধানত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর বর্তালেও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও এ দায়িত্ব সমগুরুত্ব দিয়ে পালন করেন। এ পর্যায়ের সূচক হতে পারে কার্যকর বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি; স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহ ও কার্যকর অংশগ্রহণ; প্রধানশিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের আন্তরিক ও বিদ্যালয়ের কাজে উদ্যোগী হওয়া; শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের জাতীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি। কোন্দলবিহীন, আন্তরিক মনোভাবাপন্ন ও সক্রিয় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একটি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবক কমিটিগুলো কতটা সক্রিয় তার উপর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান নির্ভরশীল ।

৪.২.৬.২ ক্লাস্টার পর্যায়

১৫-২০টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ক্লাস্টার গঠিত হয় । প্রতিটি ক্লাস্টারের দায়িত্বে থাকেন ১ জন সহকারী উপজেলা কর্মকর্তা । এ পর্যায়ে প্রধান কর্মকাণ্ড হল সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক বিদ্যালয়গুলো নিয়মিত পরিদর্শন ও একাডেমিক সুপারভিশন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তরিক ও দক্ষ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান এ পর্যায়ের সূচক বলা যায়।

৪.২.৬.৩ থানা ও জেলা পর্যায়

থানা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধানত দায়ী। বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টির দিকনির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব এ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপর বর্তায়। বিদ্যালয় পর্যায়ের পরিদর্শন, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসরণ ও একই সাথে মানবিক দিক বিবেচনা করণ, শিক্ষকদের পদোন্নতি, বেতনভাতা, ছুটি, টাইমস্কেল ইত্যাদি বিষয়গুলোর যথাযথ ব্যবস্থা ও যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি এ পর্যায়ের সূচক হতে পারে।

৪.২.৬.৪ কেন্দ্রীয় পর্যায়

অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে থাকেন। সঠিক পরিকল্পনা ও নির্ভুল নির্দেশনা এ পর্যায়ের প্রধান সূচক । পরস্পরবিরোধী আদেশ জারি না করা, সময়মত অর্থছাড় করা, কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যালয়।

ভবন নির্মাণ ও মেরামত করা, কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজকর্ম নিয়মিত মনিটরিং করা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা, মাঠপর্যায়ের কার্যালয় থেকে আগত পত্রের সময়মত জবাব দেওয়া, কর্মচারী কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, টাইমস্কেল, এলপিআর ও পেনশন নিষ্পত্তি করা ইত্যাদি যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্মের সঠিক ও সময়মতো কার্যক্রম গ্রহণকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মানসম্মত ব্যবস্থাপনার সূচক ধরা যায়।

ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। এ পরিকল্পনায় যেমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে তেমনি তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া, লোকবল, অর্থসংস্থান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা থাকবে। বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাবাসী ঐ বিদ্যালয়ের সমস্যা ও চাহিদা

চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'বিদ্যালয়ভিত্তিক পরিকল্পনা' ও 'বটমআপ প্লানিং' কথা দুটো বর্তমানে খুব পরিচিত হয়ে উঠেছে। এ ধরনের পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম, তবে এ প্রক্রিয়া সম্পন্নকালে দক্ষ সহায়তাকারীর উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করা দরকার।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণ করে স্থানীয় জনসাধারণকে বিদ্যালয়ের প্রতি অধিক আগ্রহী করে তোলা যায়। তবে কোন্ কোন্ বিষয় স্থানীয় সরকার বা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া যায় তা খুব সাবধানে নির্ধারণ করা দরকার।

৪.২.৭ বৃত্তি পরীক্ষা

এ পরীক্ষার ফলাফলকে শিক্ষামানের সূচক হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তবে ভবিষ্যতে এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের সকল স্তর মূল্যায়নের আওতায় নিয়ে আসা দরকার।

৪.২.৮ উপস্থিতি, ঝরে পড়া ও ৫ বছরের শিক্ষাক্রম

নিয়মিত উপস্থিতি, ঝরে পড়া ও ৫ বছরের শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক । শিক্ষাগ্রহণের প্রথম ধাপ হিসেবে স্কুলে ভর্তি হওয়াকে চিহ্নিত করা যায় । শতকরা কত ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তির পর নিয়মিত উপস্থিত হল ও ৫ বছর অবস্থান করল তার উপর শিক্ষা অর্জনের মান নির্ভর করে। ভর্তির পর শিশুটি নিয়মিত বিদ্যালয়ে না এলে তার শিক্ষামান নিম্নগামী হবে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

৪.৩ বিরাজমান সমস্যা ও চাহিদা

বিরাজমান সমস্যা নানাবিধ। সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যথাযথভাবে সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচেছ না। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থাই যে-কোন ধরনের সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার আধিক্য জীবনমান উন্নয়নের পথে যে বাধার সৃষ্টি করে তা নি:সন্দেহে মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি করে। আলোচনার সুবিধার জন্য সমস্যাগুলোকে আর্থসামাজিক, শিশুকেন্দ্রিক, শিক্ষককেন্দ্রিক, ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাক্রম কেন্দ্রিক ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

৪.৩.১ আর্থসামাজিক

দারিদ্র্য যে-কোন কাজের অন্তরায়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই দরিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে। সে মোতাবেক বলা যায় যে, বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুবেলা আহার যোগানো যেখানে প্রাণান্তকর ব্যাপার সেখানে শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি শিশুদের পিতামাতার কাছে গৌণ হয়ে বরং তাদের দ্বারা রোজগার করানোর চিন্তাই মুখ্য হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। ছেলে বা মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে রোজগারে পাঠাতে পারলে অবশ্যই দারিদ্রক্লিষ্ট পরিবারটি আপাতদৃষ্টিতে আর্থিকভাবে উপকৃত হয়। এ সব কারণ সত্ত্বেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি অংশ বর্তমানে শিশুদের অধিকতর হারে বিদ্যালয়ে পাঠাচেছ। এটি নি:সন্দেহে একটি ভাল দিক। অভিভাবকদের সাক্ষরতার অভাবে এসব শিক্ষার্থী বাড়িতে পড়া তৈরি করতে কোন সহযোগিতা পায় না। স্কুলের পোষাক বা প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগান দেওয়াও কোন কোন অভিভাবকের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। মা বছর বছর সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে বিশেষ করে মেয়েশিশুকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়; ফলে তাকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকতে হয়।

৪.৩.২ শিশুকেন্দ্রিক : বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ

শিশুরা প্রকৃতিগত ভাবে খেলাধুলা ও আনন্দস্ফূর্তি করতে ভালবাসে। জীবনে প্রথম যখন সে বিদ্যালয়ে আসে তখন তার কল্পনার জগতে বিদ্যালয় একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুদের মনোজগতের এ-চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। এর সাথে যখন বিদ্যলয়ের কড়া অনুশাসনযুক্ত হয় তখন পুষ্টিহীন-ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুটি হতোদ্যম হয়ে পড়ে; ফলে সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে চায় না। এর ফলে তার নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়; সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ও হীনমন্যতায় ভোগে। এ ধরনের পরিস্থিতি শিশুর শেখার গতিকে মন্থর করে দেয়; ফলে অন্যান্য শিশুর তুলনায় সে পিছিয়ে পড়ে।

৪.৩.৩ শিক্ষককেন্দ্রিক

যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক মানসম্মত শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। একজন শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সাথে শিক্ষক হওয়ার অন্যান্য গুণ থাকা প্রয়োজন। তার-মন মানসিকতা, চালচলন, ও আচার আচরণ একটি শিশুকে আকর্ষণ করবে। তিনি শিশুর মন-মানসিকতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। শিশুর প্রতি তাঁর থাকবে বিশেষ ভালবাসা, সহানুভূতি ও সহায়তার মানসিকতা। একজন শিক্ষকের পাঠদানের বিষয়টি সম্পর্কে যেমন ভাল ধারণা রাখা আবশ্যক, তেমনি তাঁকে পাঠ উপস্থাপনা, শিক্ষা-উপকরণের ব্যবহার, মূল্যায়ন ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে। বর্তমানে নিয়োজিত শিক্ষকদের বিরাট একটি অংশ শিক্ষকতা পেশায় আসেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে। কাজেই উল্লিখিত মানসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল বিধায় এ পেশাকে মনেপ্রাণে খুব কম শিক্ষকই গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষকতা পেশায় যাঁরা আসেন তাদের অনেকেই বিষয়জ্ঞানে দুর্বল থাকেন। ৩-৫ শ্রেণীতে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান (পরিবেশ বিদ্যা) পড়ানোর মত শিক্ষকের খুবই অভাব। বর্তমানে বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম, ফলে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচেছ। ৩-৫ শ্রেণীতে ইংরেজি পড়ানোর মতো যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষক নিয়োগকালে এ বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। স্থানীয় কোন্দল ও রাজনীতি অনেক সময় শিক্ষকদের নিয়মিত পাঠদান কাজের অন্তরায় সৃষ্টি করে। এ ছাড়া বিদ্যালয় পর্যায়ে অতিরিক্ত কর্মচারী বা শিক্ষক না থাকায় একটানা ক্লাস নিয়ে শিক্ষকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন; ফলে ২/১টি ক্লাশের পর পাঠদানের গুণগত মান তাঁরা বজায় রাখতে পারেন না। এ ছাড়া শিক্ষা বিভাগের বাইরের দায়িত্বও তাদের পালন করতে হয়। প্রধানশিক্ষক প্রতিমাসে প্রচুর পত্র আদানপ্রদান করেন ও তথ্য ফরম পূরণ করেন অথচ এ জন্য তার কোন সহকারী নেই। শিক্ষার মানের নিম্নগতিতে এসব বিষয়গুলোও প্রভাব ফেলে থাকে।

৪.৩.৪ শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত মানসম্মত শিক্ষার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বর্তমানে এ অনুপাত ১ঃ৫০ বা ক্ষেত্র বিশেষে ১:৬০। এ অনুপাত অবশ্যই ১:৩০ বা তার নিচে নামিয়ে আনতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ সময় (Contact hour) আরও একটি শর্ত যার বৃদ্ধিতে অবশ্যই শিক্ষার মান বেড়ে যাবে । উল্লেখ্য শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত সিঙ্গাপুরে ১:২৫ (১৯৯৫); মালয়েশিয়ায় ১:১৯ (১৯৯৬); কোরীয় প্রজাতন্ত্রে ১:৩১ (১৯৯৭); এবং যুক্তরাজ্যে ১:২৪ (১৯৯৭-৯৮)।

৪.৪.৫ ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মাসিক আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে যে-অর্থ সরকারি তহবিল থেকে দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ঐ অর্থে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, খাতাপত্র, চক ইত্যাদি ক্রয় করা সম্ভব হয় না। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানোর অর্থ যোগাতে শিক্ষকদের হিমসিম খেতে হয়।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির তদারকি যথাযথ নয়। এ কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একটি কঠিন ব্যাপার । প্রায় মাসেই এ কমিটি সভায় মিলিত হতে ব্যর্থ হয়। প্রভাবশালী ব্যক্তি কমিটিতে থাকলে তার কথায় সভার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে । কথায় কথায় বদলির হুমকি মাথায় নিয়ে শিক্ষকদের চাকুরি করতে হয় । শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে অনেক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু তদন্ত ছাড়াই প্রাথমিক ভাবে তাদের বদলি করে দেওয়া হয় । এহেন পরিস্থিতি শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিপন্থী ।

৪.৪.৬ প্রশিক্ষণ

শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশিত ফল আনতে ব্যর্থ হচেছ । প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের আন্তরিকতা, পরিকল্পনার অভাব, স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, সরঞ্জামের অপ্রতুলতা, বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন প্রশিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণের সাথে চাকুরির উন্নতি বা আর্থিক সুবিধার সংশ্লিষ্টতা না থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রশিক্ষণের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের বাধাস্বরূপ। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ চাকুরির পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় এ পেশায় আগত ব্যক্তিবর্গ শিক্ষকতাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন না । তাদের মানসিক প্রস্তুতি না থাকায় চাকুরিকালীন সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ যেমন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন না তেমনি শ্রেণীকক্ষেও তা প্রয়োগের চেষ্টা করেন না বা করতে পারেন না। কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে পারেন না।

৪.৪.৭ শিক্ষাক্রমকেন্দ্রিক

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি প্রয়োজনের নিরিখে পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে হবে । এ ক্ষেত্রে সমস্যা প্রধানত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ভিত্তিক । শিক্ষাক্রমের অন্তর্নিহিত বার্তা শিক্ষকবৃন্দ প্রায় সময়ই যথার্থ ভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হন। অধিকাংশ শিক্ষকই এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পড়ার সুযোগ পান না। এমন কি ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়েও অধিকাংশ শিক্ষক সম্পূর্ণ ধারণা রাখেন না। শ্রেণী পাঠদানের সময় এসব নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে পাঠের সমন্বয় সাধন তাই প্রায় সময়ই ঘটে না। ফলে শিক্ষাক্রমে ত্রুটি না থাকলেও তা অভীষ্ট ফললাভে সম্পূর্ণ সফলকাম হয় না।

সুপারিশ : মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে কিছু স্বল্পমেয়াদি ও কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এ লক্ষ্যে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

শিশু সম্পর্কে মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন- "Pygmy in size giant in thought"। অর্থাৎ আকৃতিতে ক্ষুদে কিন্তু চিন্তায় দৈত্য। কথাটা যে কত সত্য তা মনস্তত্ত্ববিদেরা আমাদের জানিয়েছেন। ইউনিসেফের ২০০১ সালের পৃথিবীর শিশুদের সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক শিশুর মস্তিস্কে প্রায় ১০০ বিলিয়ন বা ১০ হাজার কোটি কোষ আছে। আর অসংখ্য এই কোষ নিজেদের মধ্যে নানান ঢঙে প্রতিস্থাপিত হয়ে লক্ষ লক্ষ (ট্রিলিয়ন) গুণ বেশি অবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মানবশিশুর মস্তিস্কের এই কোষগুলি শিশুর ৩ বৎসর বয়সেই সক্রিয় হয়। যেহেতু এই বয়সেই শিশুর জীবনের ধারা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রূপ নিতে আরম্ভ করে সেহেতু প্রত্যেকটি শিশুকে এমন একটি পরিবেশ দিতে হবে যাতে তার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এই দায়িত্ব যেমন অভিভাবকের, তেমনি সরকারেরও। প্রকৃতপক্ষে, শিশুর প্রতি দায়িত্ব যদি সমগ্র সমাজ পালন না করে তাহলে তা হবে বিরাট একটি অপরাধ। কেননা শৈশবকালে শিশু যে শিক্ষা পায়, যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চিত করে এবং যে পরিবেশে সে বেড়ে ওঠে তা তার সমগ্র জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। আর শিশুর জন্য এ সব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বড়দের।

২. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে :

(ক) শিশুকে দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলা;
(খ) খেলাধুলা এবং শিশুউপযোগী কাজকর্মের মাধ্যমে শিশুর সামাজিকীকরণ করা;
(গ) আনন্দদায়ক পরিবেশে বিদ্যালয় ও সমাজের রীতিনীতি, নিয়মশৃঙ্খলা, আচার-আচরণে শিশুকে অভ্যস্ত করা;
(ঘ) বিদ্যালয় ও শ্রেণীর সকল সহপাঠীর সঙ্গে মিলে মিশে লেখাপড়া, খেলাধুলা করাসহ উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি করা ;
(ঙ) ছড়া, নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, ছবি আঁকা, গল্প বলা, বর্ণ পরিচয়, সংখ্যাজ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা;
(চ) বিদ্যালয়,শিক্ষক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি শিশুর আগ্রহ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা;
(ছ) শিশুর মনে সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করা;
(জ) শিশুকে তার মস্তিস্ক, হৃদয় ও হাতকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সক্রিয় নাগরিক হিসেবে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে সহায়তা করা।

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম

শিশু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের জীবনের দক্ষতা অর্জনের ধারাকে প্রধানত ৫টি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হচ্ছে সংবেদনশীলতা, ভাষাগত যোগ্যতা, সামাজিকীকরণ, শারীরিক যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা। এই সব দক্ষতার একটি নমুনা নিচের ছকে প্রদত্ত হলো।

৪-৫ বৎসর বয়সের শিশুদের অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ

১. সংবেদনশীলতা (Sensory Competency)	
(ক) শ্রবণ (Listening)	১. একটি পুরো বাক্য অনুকরণ করতে পারা; ২. পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত শব্দ এবং সংখ্যা অনুকরণ করতে পারা; ৩. একটি ছোট গল্প শোনার পর তা বলতে পারা।
(খ) দর্শন (Seeing)	১. বিভিন্ন ধরনের আকার, আকৃতি ও রঙের বস্তু মিলাতে পারা; ২. একই ধরনের কিন্তু একটু জটিল ছবি, বস্তু, রং ও সংখ্যা মিলাতে পারা; ৩. যে কোন বস্তু বা ছবির হারিয়ে যাওয়া অংশ শনাক্ত করতে পারা; ৪. দুই বা ততোধিক অংশ জোড়া দিয়ে আকৃতি গঠন করতে পারা।

(গ) স্পর্শ (Touching)	১. বিভিন্ন ধরনের আকৃতি শনাক্ত করতে পারা; ২. বড় ও ছোট শনাক্ত করতে পারা; ৩. উপর ও নিচ শনাক্ত করতে পারা; ৪. মসৃণ ও খসখসে বস্তু শনাক্ত করতে পারা; ৫. নরম ও শক্ত বস্তু শনাক্ত করতে পারা; ৬. গরম ও ঠাণ্ডা শনাক্ত করতে পারা।
(ঘ) ঘ্রাণ (Smelling)	১. সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ বুঝতে পারা; ২. পোড়া খাবারের গন্ধ বুঝতে পারা; ৩. একই অথবা ভিন্ন ধরনের বস্তুর গন্ধ শনাক্ত করতে পারা।
(ঙ) স্বাদ (Tasting)	১. ঝাল-মিষ্টি শনাক্ত করতে পারা; ২. টক ও তেতো শনাক্ত করতে পারা; ৩. কতিপয় স্বাদের কম-বেশির মধ্যে পার্থক্য করতে পারা। যেমন বেশি মিষ্টি ও কম মিষ্টির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা।
২. ভাষাগত যোগ্যতা (Language Competency)	
(ক) শোনা এবং বোঝা (Listening and Understanding)	১. বর্ণনা শুনে বিভিন্ন ধরনের বস্তু শনাক্ত করতে পারা। যেমন: বিভিন্ন ধরনের খাবার, ফুল, গাছ-পালা, যন্ত্রপাতি, পাথর, কাঠ ইত্যাদি; ২. মৌখিক নির্দেশ অনুসরণ করতে পারা। যেমন: (ক) হাত উঠাও (খ) সোজা হয়ে দাঁড়াও (গ) আমার চারপাশ দিয়ে একবার ঘুরে এসে বসে পড় এবং হাত নামাও, (ঘ) পাথরগুলি উঠিয়ে এনে বাক্সে রাখ; ৩. দিক সম্পর্কিত কাজ অনুসরণ করতে পারা। যেমন: ডান দিকে তাকাও, সামনে এসে বস ইত্যাদি; ৪. বিভিন্ন শ্রেণীর ছবি/বস্তু এক সাথে এবং আলাদা করার নির্দেশ অনুসরণ করতে পারা যেমন: ফলের ছবিগুলো এক জায়গায় রাখ, লাল রং এর ব্লকগুলো আলাদা রাখ ইত্যাদি।
(খ) কথা বলা (Speaking)	১. সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা; ২. কবিতা আবৃত্তি করতে পারা এবং গান গাইতে পারা; ৩. ছবির সহজ ব্যাখ্যা করতে পারা; ৪. গল্প শোনার পর সে সম্পর্কে সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা; ৫. নিজের পরিবার ও চারদিকের বাস্তব ঘটনার অংশ বিশেষ সম্পর্কে বলতে পারা।
(গ) প্রাক-পঠন (Pre-reading)	১. বিভিন্ন এবং একই ধরনের বস্তু, ছবি, শব্দ, অক্ষর, ও সংখ্যা শনাক্ত করতে পারা; ২. ছবির গল্প অনুসরণ করতে পারা।
(ঘ) প্রাক-লিখন (Pre-Writing)	১. বিভিন্ন ধরনের সহজ ছবি ক্রেয়ন বা রঙ্গীন পেন্সিল দিয়ে রং করতে পারা; ২. কার্ড বা মন্ড দিয়ে সহজ মডেল তৈরি করতে পারা; ৩. বিভিন্ন বিন্দু পর পর জোড়া দিয়ে ছবি বানাতে পারা; ৪. কতিপয় সহজ ছবি আঁকতে পারা। যেমন: গাছ, ফুল, সূর্য ইত্যাদি; ৫. কাগজ ছিঁড়তে ও ভাঁজ করতে পারা।
৩. সামাজিকীকরণ (Socialization)	
(ক) অংশগ্রহণ (Participation)	১. ছোট দলে অংশগ্রহণ করতে পারা; ২. সহজ ধরনের দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারা। যেমন: হাত তালি দেয়া, ছড়া বলা, গান গাওয়া ইত্যাদি; ৩. নিজের অনুভূতি ও মতামত খোলাখুলিভাবে বলতে পারা।

(খ) পালাক্রম (Turn taking)	১. অন্যের সাথে আলাপ করতে বা পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য নিজে উদ্যোগী হতে পারা; ২. শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যকে কাজের সুযোগ করে দিতে পারা; ৩. খেলা বা কাজের সময় অথবা বলার সময় নিজের পালার ক্রমের (Turn) জন্য অপেক্ষা করতে পারা।
(গ) সহযোগিতা (Co-operation)	১. শিক্ষক এবং অন্যদের সাথে সম্ভাষণ বিনিময় করতে পারা; ২. খেলার সময় অন্যদের সহযোগিতা করতে পারা; ৩. খেলা বা দলীয় কাজের সময় জিনিসপত্র অন্যদের সাথে ভাগ করে ব্যবহার করতে পারা।
(ঘ) দায়িত্বশীলতা (Responsibility)	১. যে কোন ধরনের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাতে পারা; ২. শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সহজ ধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারা।
(ঙ) শৃংখলা (Discipline)	১. নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজে উপস্থিত থাকতে পারা; ২. স্কুলের সাধারণ নিয়ম ও নির্দেশ মেনে চলতে পারা; ৩. গল্প বলার সময়, খেলার সময় এবং অন্যান্য কাজে শিক্ষকের কথা মেনে চলতে পারা; ৪. খেলা বা কাজের শেষে সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখতে পারা; ৫. ছেঁড়া কাগজ ও ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারা।
(চ) আবেগ (Emotion)	১. অন্যদের প্রতি ভালবাসা অনুভব করতে পারা; ২. নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারা; ৩. অন্যদের সহজ সমস্যাগুলো বুঝতে পারা; ৪. অন্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারা; ৫. নিজের রাগ, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি আবেগগুলো গ্রহণযোগ্য উপায়ে প্রকাশ করতে পারা।
(ছ) নৈতিক শিক্ষা (Moral Education)	১. শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে, বাইরে যেতে বা পানি পান করতে অনুমতি নিতে পারা; ২. অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিসপত্র না দেওয়া; ৩. অন্যের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিতে পারা; ৪. অন্যদের অহেতুক বিরক্ত না করা।
৪. শারীরিক যোগ্যতা (Physical Competency)	
(ক) বৃহৎ সঞ্চালনমূলক কার্যাবলি (Gross Motor)	১. দৌড়াতে এবং লাফ দিতে পারা; ২. বেয়ে উঠতে পারা; ৩. চোখ এবং পায়ের সমন্বয় করতে পারা।
(খ) সূক্ষ্ম সঞ্চালনমূলক কার্যাবলি (Fine Motor)	১. সহজ ধরনের ছবি আঁকতে পারা; ২. কাদা মণ্ড দিয়ে নানান ধরনের নকসা তৈরি করা; ৩. ব্লক দিয়ে খেলা এবং দক্ষতার সাথে নানান ধরনের আকার তৈরি করতে পারা; ৪. ক্রেয়ন, তুলি, পেন্সিল, সঠিকভাবে ধরে আঁকতে, রঙ করতে এবং লিখতে পারা; ৫. বর্ণ, অক্ষর, নম্বর ও শব্দ লিখতে পারা; ৬. কাগজ নানা আকারে ছিঁড়তে ও কাঁচি দিয়ে কাটতে পারা।

৫. সামাজিকীকরণ (Socialization)	
(ক) স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (Health and Personal Hygiene)	১. খাওয়ার আগে এবং পরে হাত ধুতে ও মুছতে পারা; ২. টয়লেট ব্যবহার করার পর ধোয়া মোছা করতে পারা; ৩. দাঁত মাজতে পারা; ৪. নিজে কাপড় পরতে পারা; ৫. নখ ও চুল পরিষ্কার রাখতে পারা; ৬. বিশুদ্ধ পানি পান করা।
৬. বুদ্ধিবৃত্তিগত যোগ্যতা (Cognitive Competency)	
(ক) মনোযোগ (Concentration)	১. যে কোন নির্দেশ শোনার পর কার্যক্রম অনুসরণ করতে পারা। যেমন: লাইন করা, গোল হয়ে দাঁড়ান ইত্যাদি; ২. সহজ ছড়া বা গল্প শোনার পর সেই গল্পসংক্রান্ত সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা।
(খ) পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Planning and Decision Making)	১. অনেক বস্তু থেকে একটি পছন্দ করতে পারা; ২. অনেক কার্যক্রম বা খেলার মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারা।
(গ) স্মৃতি (Memory)	১. দেখা এবং শোনার পর যে কোন ধরনের ঘটনা, ছড়া, গল্প ইত্যাদি স্মরণ করতে পারা।

৪. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শহর, নগর এমনকি উপজেলা পর্যায়েও অনেক কিন্ডারগার্টেন ও নার্সারি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ ব্যক্তি মালিকানায় ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আবাসিক এলাকায় সচরাচর ভাড়া বাড়িতে এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয়। সীমিত খোলামেলা স্থান, আলো বাতাসহীন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশুদের স্বাভাবিক বিচরণ-প্রতিকূল অবস্থায় এই বিদ্যালয়গুলি চলে, যা শিশুর বিকাশ ও বর্ধনের পরিপন্থী। এই বিদ্যালয়গুলির উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষাক্রম বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মত ও ইচ্ছানুসারে নির্ধারিত হয়। এমনকি অনেক সময় বিজাতীয় ভাবধারার বইপত্র পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতেও দেখা যায়। আবার এসব বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষকমণ্ডলী শিশুবিকাশ, শিশু-মনোবিজ্ঞান ও শিশুশিখন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত নন। ফলে শিশুদের স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতার বাইরে অসম্ভব পাঠের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের সাবলীল শিক্ষার ধারাকে শ্লথ, এমনকি রুদ্ধ করে। এখানকার ছাত্রবেতনের হারও অনেক বেশি। বিত্তশালী পিতামাতার শিশু ব্যতীত সাধারণ পরিবারের শিশুরা এসব বিদ্যালয়ে পড়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

আমাদের দেশে সরকারি উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ অনুপস্থিত, যদিও এই শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ঢাকা শহরে এবং এ দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরে ব্যক্তি উদ্যোগে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষাক্রম অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মতানুসারে নির্ধারিত হয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুশিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন সেহেতু এসব বিদ্যালয়ের সময়সূচি, শিক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষা ও মূল্য যাচাই ত্রুটিপূর্ণ ও শিশুর বিকাশের সহায়ক নয়।

৫. সুপারিশ

(ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি শাখা খোলা প্রয়োজন।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষার মতো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করবে। একাজে ইউনিসেফ ও বৃটিশ কাউন্সিলের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

(গ) প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের জন্য ৩ মাস মেয়াদি স্বল্পকালীন সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করবে। পরবর্তীকালে এই কোর্সকে উন্নত পর্যায়ে নেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে এবং তাদের বেতনকাঠামোও স্থির করবে।

(ঙ) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোর নিবন্ধীকরণ করতে হবে এবং সেগুলোতে শিশুশিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শহরাঞ্চলের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোকে মিউনিসিপালিটি কর্তৃপক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে ইউনিয়ন বোর্ড আর্থিক সহায়তা দিতে পারে। অনুন্নত অঞ্চলগুলোর বিদ্যালয়গুলোর জন্য ইউনিসেফের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। এই সকল বিদ্যালয়ের মাননিয়ন্ত্রণের ভার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং আঞ্চলিক অধিদপ্তরগুলোর উপর দিতে হবে।

(চ) শ্রমজীবী মা-বাবার শিশুদের যাতে বিরূপ পরিবেশে সারাদিন কাটাতে না হয় সে জন্য শহরে ও শিল্পাঞ্চলে প্রয়োজন মতো শিশুদের জন্য শিশুনীড় গড়ে তোলা আবশ্যক। এই সব শিশুনীড়ে অবশ্যই শিশুদের জন্য খেলাধুলা এবং পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে।

(ছ) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্ততপক্ষে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের সমমানের হবে এবং প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ থাকবে। এই সকল শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণে শিশু মনোবিজ্ঞান, শিশুশিক্ষণ পদ্ধতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, নৈতিক শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশুসাহিত্য, গান, বাজনা, অঙ্কন, নিজের ছোটখাট কাজ, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

(জ) বর্তমানে শহরাঞ্চলে যে সকল কিন্ডারগার্টেন রয়েছে সেগুলির সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে একটি ইতিবাচক মনোভাব ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন;

২. শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তার পরিদর্শন এবং শিক্ষিত জনগণ ও পিতামাতাকে শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;

৩. সরকার অনুমোদিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন;

৪. শিশুশিক্ষার জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন ও স্বল্পমূল্যে বিক্রয়;

৫. শিশুশিক্ষার উপযোগী ঘরবাড়ি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও খেলাধুলার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

৬. প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

৭. শিক্ষকদের জন্য বেতনক্রম ও নিয়োগনীতি/নিয়োগবিধি প্রবর্তন;

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যা অবিলম্বে অবশ্য করতে হবে :

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরের করণীয় :

- এ স্তরের শিক্ষার্থীগণের যোগ্যতা ও প্রবণতা বিবেচনা না করে অতিরিক্ত পরিমাণে লেখা, পড়া ও গণিতের জ্ঞান আয়ত্ত করতে কেউ যেন রুচিহীন বল প্রয়োগ না করে তা নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুশিক্ষা সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করার পদক্ষেপ নিতে হবে;
- শিশুশিক্ষার মূল কথা হলো শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে খেলাধুলা ও কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করা এবং বিশ্রামের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক ছন্দ ও তাল সৃষ্টি করা। শিক্ষকদের এটা উপলব্ধি করতে হবে এবং শিক্ষাদানে তা মেনে চলতে হবে;
- প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য সর্বপ্রকার পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের করণীয় :

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে শিশুর স্বাভাবিক বর্ধন ও বিকাশ, আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া নয়;
- প্রত্যেক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে;
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য উন্মুক্ত স্থান, খেলাধুলার সুযোগসুবিধা ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা;
- শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্য নিয়মিত আলোচনা ও তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা যেন তারা শিশুশিক্ষা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

পিতামাতার করণীয় :

- পিতামাতা শিশুদের জন্য সেরকম স্কুল নির্বাচন করবেন যেখানে খেলাধুলা ও নানাধরনের সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে শিশুদের শেখান হয়। যেন প্রাথমিক স্কুলের মতো লেখাপড়া না হয়;
- তাঁরা ঐ সকল প্রাক-প্রাথমিক স্কুলকে সহায়তা করবেন এবং তাদের কর্মকাণ্ড উপলব্ধি করতে ও প্রচার করতে সাহায্য করবেন যারা স্কুলে খেলাধুলা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা রেখেছে এবং বাসাতেও তা সম্প্রসারণের প্রয়াস পাচ্ছে;
- তাঁরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন যে প্রাক-প্রাথমিক স্কুলকে "শিক্ষার ব্যবস্থা" হিসাবে গণ্য করা নিত্যন্ত ভুল এবং শিশুবিজ্ঞানের পরিপন্থী। পিতামাতাকে মনে রাখতে হবে যে, শিশুদের প্রধান ও যথার্থ পথ প্রদর্শক হচ্ছেন, তাদের মাতাপিতা।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন করতে হবে :
    - শিক্ষক - প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণ;
    - দেশের কিন্ডারগার্টেন ও নার্সারি বিদ্যালয়গুলির উপর সরকারের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা;
    - এসব বিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত করা;
    - প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনায় প্রাথমিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এনজিওদের এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ

৬.১ বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত গঠিত অধিকাংশ শিক্ষা কমিশন ও কমিটি ৫ বছরের স্থলে ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা প্রর্বতনের সুপারিশ করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এও ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী কতিপয় দেশ, যেমন, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ায় ৬ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে। যাই হোক না কেন, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ৮ বছর মেয়াদি করার যুক্তিযুক্ত কারণ; -প্রাথমিক শিক্ষা দেশের একটি বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য সমাপনী স্তর। এই স্তরের শিক্ষাশেষে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে জীবন ও জীবিকার জন্য বিভিন্ন পেশা গ্রহণসহ শ্রমবাজারে প্রবেশের চিন্তা করতে হয়। খুব সম্ভবত এসব বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি করার বিষয় সুপারিশ করা হয়েছিল। তবে এ মুহূর্তেই সম্ভবত তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। নিম্নোক্ত পর্যালোচনা থেকে এখানে প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে এ অপারগতার কারণ সহজেই প্রণিধানযোগ্য বলে ধারণা করা যায়।

৬.২ মেয়াদ বৃদ্ধির সমস্যা

বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এদের সর্বমোট সংখ্যা ৭৮,১২৬টি। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়। এই দুই প্রকার বিদ্যালয়ের অবস্থা পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হবে যে, দেশে এখনও প্রাথমিক শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির একটি বিরাট অংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়গুলির প্রায় তিনকক্ষবিশিষ্ট এবং ৩/৪ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। শ্রেণীকক্ষ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়গুলি ২ শিফ্‌টে পরিচালিত হয়। ফলে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ-ঘণ্টা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ে রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা ৫টি এবং ক্ষেত্রবিশেষে ৬টি এবং সে অনুপাতে শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলে ১ শিফ্‌টেই বিদ্যালয় পরিচালনা করা সম্ভব হবে, সংযোগ-ঘণ্টাও তখন বৃদ্ধি পেয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা করা সম্ভব হয় নি। এ সবের সঙ্গে বিপুল অর্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

সুপারিশ :

- বর্তমান অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫-বছর রেখে তা সুসংহত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বিধায় ৫-বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা সুপারিশ করা হচ্ছে।

সপ্তম অধ্যায়
প্রাথমিক বিদ্যালয়

৭.১ বিদ্যালয়ের ধরন

বর্তমানে দেশে ১১ ধরনের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে,

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- কমিউনিটি বিদ্যালয়;
- আনরেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- উচ্চ মাদ্রাসাসংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা;
- এবতেদায়ি মাদ্রাসা;
- পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়;
- স্যাটেলাইট বিদ্যালয়;
- কিন্ডারগার্টেন স্কুল;
- এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বর্ণিত ১১ ধরনের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য সকল বিদ্যালয়ে ৫ বছরের শিক্ষাক্রম অনুসৃত হয়। স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের ব্যবস্থা আছে। শেষোক্ত বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ছোট ছোট শিশুদের বাসস্থানের কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজ করা এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করে তোলা। স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে ঐ বিদ্যালয়ের মাদার স্কুল হিসেবে অভিহিত করা হয়। স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করে শিশুরা এসব মাদার স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হবে বলে ধারণা করা হয়।

৭.১.১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক দায়দায়িত্ব সরকারের। শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়গৃহের নির্মাণ ও সংস্কার ইত্যাদি দায়িত্বও সরকারের। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতনভাতা সরকারই বহন করে থাকে। এসব বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। তবে স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির।

৭.১.২ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধানত ব্যক্তি উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় এ ধরনের বিদ্যালয়গুলো গড়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ের দানকৃত জমিতে কাঁচাঘর নির্মাণ করে এবং স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্থানীয়ভাবে জনগণের দানের অর্থে আসবাবপত্রসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মালামাল সংগ্রহ ও শিক্ষকদের বেতনভাতা মেটানো হয়।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন দাখিল করে থাকে। বর্তমানে কার্যকর নির্বাহী আদেশ মোতাবেক বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বেই **'বিদ্যালয় স্থাপন ও চালু'** করার অনুমতি পাবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হয়। প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদনপ্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে মতামত জানানোর জন্য

এ আদেশে বলা হয়েছে। এজন্য নির্ধারিত প্রাথমিক সকল শর্ত পূরণ করা হলে রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বিদ্যালয়টি **'স্থাপন ও চালু'র** জন্য অনুমতি দেয়। উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ১ বৎসর পরে এবং এ আদেশে উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ হলে বিদ্যালয়টি **অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের** জন্য আবেদন করতে পারে। শর্ত পূরণের বিষয়টি সরকারি পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই করে সব ঠিকঠাক পাওয়া গেলে বিদ্যালয়টিকে প্রাথমিক ভাবে ৩ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়টিকে এভাবে আরও দু'বার ৩ বছর মেয়াদি **অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন** গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ বর্তমান অবস্থায় বিদ্যালয়টি **'স্থাপন ও চালু'** করার অনুমোদন পাওয়ার মোট ১০ বছর পরে একটি বিদ্যালয় স্থায়ীভাবে রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এসকল বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করার জন্য বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৬২ ও ১৯৮৯-তে (সংশোধিত) উল্লেখকৃত ধারাসমূহের সঙ্গে সরকারকর্তৃক জারিকৃত এই নির্বাহী আদেশের কিছু অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে ছাত্রসংখ্যা, আন্তঃবিদ্যালয় দূরত্ব ও নিজস্ব জমি থাকার শর্তগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়। বিদ্যালয়ের অনুদান লাভের পূর্বশর্ত রেজিস্ট্রেশন লাভের পূর্বশর্ত হতে পারে না। সকল রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ কমিটি শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, অর্থসংগ্রহ, ছাত্রভর্তি ইত্যাদি সকল বিষয়ে তদারকি করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এ কমিটি কিছু কিছু নির্বাহী ক্ষমতাও ভোগ করে।

বিদ্যালয়টি রেজিস্ট্রেশন লাভ করলে শিক্ষকবৃন্দ সরকারি অনুদান পাওয়ার উপযুক্ত হন। বিদ্যালয়ের জন্য পাকা ভবন অধিকাংশ সময়ই সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করে দেয়। স্থাপন ও চালুর অনুমতি প্রদানের পরপরই এ বিদ্যালয়গুলোর তদারকির দায়িত্ব প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর বর্তায়। শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য অনাবর্তক ব্যয় মেটাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ক্ষেত্রেই সক্ষম নয়।

৭.১.৩ আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এ বিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণভাবে বেসরকারিভাবে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। এদের কার্যাবলি তদারকির জন্য নির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ নেই। সাধারণত রেজিস্ট্রেশনের প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এ ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করে এ বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করা হয়। সরকারের তরফ থেকে তদারকির কেউ না থাকায় এখানে পড়ালেখার বিষয়টি সার্বিকভাবেই অবহেলিত থেকে যায়। সার্বিক দিক দিয়ে অধিকাংশ বেসরকারি বিদ্যালয়ই যথাযথভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের অনুপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত।

৭.১.৪ উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়

উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের। প্রাথমিক শিক্ষাদানকারী এসকল বিদ্যালয়ের উপর শুধুমাত্র বিনামূল্যে বই বিতরণ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এর ফলে এ বিদ্যালয়গুলোর প্রাথমিক শিক্ষার একাডেমিক তত্ত্বাবধানের কোন কার্যকর ব্যবস্থাও নেই। শিক্ষকদের সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই, কেননা পিটিআইগুলোতে সরকারি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক ছাড়া অন্য কোন পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণেও এসকল শিক্ষককে সম্পৃক্ত করা যায় না। এ সব কারণে এ ধরনের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে ধারণা করা যায়।

৭.১.৫ স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা

এসব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে মাদ্রাসাবোর্ড ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক নির্দেশাবলি যথাযথভাবে এসব প্রতিষ্ঠানে পালিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত কোন ধরনের প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করার সুযোগ নেই। এ সকল কারণে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এসব প্রতিষ্ঠানে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে ধারণা করা যায়।

৭.১.৬ উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা

এসব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার মতো।

৭.১.৭ পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে এগুলো প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এসব বিদ্যালয়ের সার্বিক দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপরে ন্যস্ত। স্থানীয়ভাবে পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট এগুলো পরিচালনা করে থাকেন। এখানে আলাদা কোন পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা কমিটি নেই। এসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তবে এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতনস্কেল সাধারণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা ও বেতনস্কেল থেকে আলাদা (উচ্চতর)। এ কারণে পিটিআইতে কিছু প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্ট হচ্ছে।

৭.১.৮ কমিউনিটি বিদ্যালয়

কমিউনিটি বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে ৫টি শ্রেণী রয়েছে। এসব বিদ্যালয় স্থানীয় উদ্যোগে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে। সরকার এ শিক্ষকদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা দিয়ে থাকে।

৭.১.৯ স্যাটেলাইট বিদ্যালয়

স্যাটেলাইট বিদ্যালয় কোন পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের আবাসস্থলের নিকটবর্তী স্থানে বেসরকারিভাবে এ বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত। এসব বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ঘরভাড়া সরকার থেকে দেওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সরকার প্রকল্পের আওতায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পাকা ভবন নির্মাণ করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রেও স্থানীয়ভাবে দু'জন মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সরকার এ শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা দিয়ে থাকে।

৭.১.১০ কিন্ডারগার্টেন স্কুল

এ বিদ্যালয়গুলো ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণত শহরভিত্তিক। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ভবন নেই। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যালয় পরিচালনা ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় এসব বিদ্যালয়ের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এগুলো বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ন্যূনতম শর্ত অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করে না। কারণ এ ধরণের স্কুলের ছাত্রবেতন অতি উচ্চ। আর্থিক অবস্থা ভাল নয় এমন পরিবারের শিশুরা এসব বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। এসব বিদ্যালয় ক্ষমতার অতিরিক্ত পাঠ্যক্রমের বোঝা শিশুদের উপর চাপিয়ে দেয়। তুলনামূলক হিসেবে বিত্তবান অভিভাবকবৃন্দ শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একাধিক গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করে এ চাপ সামাল দেন। আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ায় বেশী বেতনে উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগে এ বিদ্যালয়গুলো সক্ষম। এ বিদ্যালয়গুলো ইংরেজির উপর খুব বেশি জোর দিয়ে থাকে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনে মোটেই আগ্রহী নয়, ফলে, সরকারের এসব বিদ্যালয়ের উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

৭.১.১১ এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়

এ বিদ্যালয়গুলো দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা কোন পরিচালনা কমিটি নেই। সরকারের নিয়ন্ত্রণ এক্ষেত্রে-ও খুবই শিথিল। এ বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই রেজিস্ট্রেশনে আগ্রহী হলেও রেজিস্ট্রেশনের প্রচলিত নিয়মনীতি এ পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এ নিয়মনীতি প্রয়োজনে কিছুটা শিথিল করে হলেও এ বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয় স্বার্থে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

১১ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য ছক:[১]

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শতকরা হার	শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা	শতকরা হার	ছাত্র - ছাত্রী
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৬৭১*	৪৮.২২%	১৬২০৯০	৫০.৫৪%	১০৮৩০৭৪২
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪২৮	২৪.৮৭%	৭৭২৩৩	২৪.০৮%	৪১৬৩৮৭৩
আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৭১	২.৫০%	৭৮৮৮	২.৪৬%	২৯৯৩৪৫
পি টি আই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৩	০.০৭%	২৫৫	.০৮%	১১৫১৩
স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা	৩৮৪৩	৪.৯২%	১৫৭৪৪	৪.৯১%	৪৩৮৯৫৭
কিন্ডারগার্টেন	২৪৭৭	৩.১৭%	১৫০৫২	৪.৬৯%	৩৬৪১৯৬
এনজিও বিদ্যালয়	১৭০	০.২২%	৬৭৬	০.২১%	২৮৮৬৪
কমিউনিটি বিদ্যালয়	৩২৬৮	৪.১৮%	৯১৬২	২.৮৬%	৪৯০৪৫৬
স্যাটেলাইট বিদ্যালয় (১ম ও ২য় শ্রেণী)	৪০৯৫	৫.২৪%	৭২২৪	২.২৫%	২৭৬৩৪৮
উচ্চ মাধ্যমিক সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা	৩৫৭৪	৪.৫৭%	১৪৮৫৫	৪.৬৩%	৪১৭৩৮৩
উচ্চ মাধ্যমিক সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৭৬	১০০%	৩২০৬৯৪	১০০%	১৭৬৫৯২০০

- নদী ভাঙন, একত্রীকরণ এবং অন্যান্য কারণে সংখ্যার তারতম্য ঘটতে পারে ।

সূত্র: Primary Edcuation Statistics in Bangladesh -2001, DPE, Dhaka, May 2002, P-1,3,5.

৭.২ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

স্থানীয় চাহিদার আলোকে নতুনভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবৎ স্থগিত রয়েছে। তবে বিকল্প হিসেবে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় কমিউনিটি বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ও রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতা বা বেতনের অংশবিশেষ প্রদান করে বেসরকারি খাতে বিদ্যালয় স্থাপন উৎসাহিত করা হচেছ।

৭.৩ বিদ্যালয় গৃহ ও অন্যান্য ভৌত সুবিধা

সরকারি উদ্যোগে ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের জন্য পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তবে ঐ ভবনগুলো খুব কম ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় আসবাবপত্রের পরিমাণ ও শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। ফলে বছর ঘুরতেই নতুন শ্রেণীকক্ষ ও অতিরিক্ত আসবাবপত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিদ্যালয়গৃহ ও অন্যান্য ভৌত সুবিধার ক্ষেত্রে বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের চিত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় আরও করুণ।

যে-সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ছাত্রের সংখ্যাধিক্যের কারণে নতুন শাখা খোলা অপরিহার্য হয়ে ওঠে সেসব বিদ্যালয়ে নতুন শ্রেণীকক্ষ সংযোজন করে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র সরবরাহ করা না হলে শিক্ষার মান নিচে নেমে যেতে বাধ্য। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অনেকগুলোর জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি স্থানীয় উদ্যোগে পাকা ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাকা ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রধানত সরকারি উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এরপরও বহু বিদ্যালয় ভবনের জীর্ণ দশা নিয়ে কার্যক্রম চালাতে বাধ্য হচ্ছে। এজন্য যত্রতত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রবণতাকে দায়ী করা যায়।

৭.৪ সমস্যা

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয়ের অভাব;
- বিদ্যালয়ভবন পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের বিষয়টির অনেক ক্ষেত্রে অবহেলা;
- অপর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ;
- অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কোন শৌচাগার নেই (বিশেষ করে মেয়েদের জন্য)। যেখানে আছে সেখানেও পানির সুব্যবস্থা না থাকায় সেগুলো দিনে দিনে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যায়;
- খেলার মাঠের অপ্রতুলতা/সংরক্ষণের অভাব;
- পানীয় জলের অভাব/আর্সেনিক দূষণ;
- প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব;

- ৫ বছরের শিশুদের বিদ্যালয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগহীনতা;
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের অভাব;
- সহায়ক পুস্তকের অভাব;
- খেলাধুলার সরঞ্জাম নেই অথবা অপর্যাপ্ত;
- দুর্গম এলাকা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী মানুষের অভাব;
- বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি শিক্ষাপ্রসারের সহায়ক নয়;
- কমিউনিটি ও স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতার অপ্রতুলতা;
- বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিরাপত্তা প্রাচীর ও নৈশপ্রহরীর অভাব;
- শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হারে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থার অনুপস্থিতি;
- এসএমসি আশানুরূপ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না ।

৭.৫ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি

সরকারি ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের জন্য সরকার কর্তৃক ম্যানেজিং কমিটির রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। মোট ১১ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে ২ জন বিদ্যোৎসাহী ও ৫ জন অভিভাবক প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যোৎসাহী সদস্যের একজন মহিলা অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থাও এখানে রাখা হয়েছে। উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং ওয়ার্ড মেম্বর । কমিটির মেয়াদ ২ বছর যা বাস্তবতার নিরিখে অপর্যাপ্ত মনে হয়।

বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের অংশীদারিত্বের কথা বিবেচনা করে অভিভাবক ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের এসব কমিটিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই বেশ ভাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে থাকে। তবে বাস্তব অবস্থা এ রকম যে সদস্য হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই অধিকাংশ সদস্য স্কুলের বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। মাসিক সভায় প্রায়শই কোরামের অভাব দেখা যায়। এর ফলে বিদ্যালয়ের কোন উন্নয়ন বা একাডেমিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুবই সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রধান শিক্ষক পদাধিকারবলে এ কমিটির সদস্যসচিব থাকেন। সভা নিয়মিত না হলে তাকে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। ফলে প্রতি মাসেই সভা হচ্ছে বলে কাগজে-কলমে দেখানো হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক বিদ্যালয়ে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয় না।

শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি বা পিটিএ বর্তমানে নামেই রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এ সমিতির দৃশ্যত কোন কর্মকাণ্ড নেই। শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের প্রতিনিধিসহ যাতে লেখাপড়ার অগ্রগতি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের মতো বিষয়াবলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এ সমিতি গঠনের উদ্যোগ সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে। এ সমিতির কর্মকাণ্ড নিয়মিত শুরু করার জন্য পরিদর্শকবৃন্দ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাগিদ এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

৭.৬ বিদ্যালয় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা রয়েছে। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও বিভাগীয় উপপরিচালক প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক (৪টি থেকে ১০টি পর্যন্ত) বিদ্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দও বিদ্যালয়সহ অন্যান্য অধীনস্থ অফিসসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন এবং নির্ধারিত ছকে রিপোর্ট প্রদান করে থাকেন।

মাসিক পরিদর্শনের নির্দিষ্ট কোটা পূরণ না হলে এসব কর্মকর্তার সকলেরই জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রয়েছে । এ ছাড়া প্রধানশিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর (নেপ) কর্মকর্তাবৃন্দ শিক্ষা তত্ত্বাবধান (একাডেমিক সুপারভিশন) করে থাকেন। অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিক্ষা তত্ত্বাবধান করার জন্য সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে দক্ষতা না থাকায় তাদের শুধু প্রশাসনিক দিক পরিদর্শন করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সকল স্তরের কর্মকর্তার একই ছকে পরিদর্শন করতে হয় বলে শিক্ষা তত্ত্বাবধান অবহেলিত হয়। তা ছাড়া সারা বছর একই ছক ব্যবহার পরিদর্শনের গুরুত্ব

কমিয়ে দিয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ছকের নির্ধারিত কলামগুলো বাদ দিয়ে প্রয়োজনে অন্যান্য অতিরিক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সারা বছরের জন্য আলাদা একটি ছক প্রণয়ন করা যায়। শিক্ষা পরিদর্শনকে পুলিশি পরিদর্শন থেকে আলাদাভাবে উপস্থাপনের উপযুক্ত ছকের এবং একই সাথে কর্মকর্তাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন অপরিহার্য। শিক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধানশিক্ষককে এ বিষয়ে সর্বশেষ তথ্যসহ প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে যাদের জ্ঞান নেই তেমন কর্মকর্তাদের শিক্ষা তত্ত্বাবধান থেকে দূরে রাখতে হবে। কারণ এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে উক্ত পদস্থ কর্মকর্তাদের শিক্ষা তত্ত্বাবধানে হিতে বিপরীত ফলসৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যাবে।

৭.৭ লোকবল

বর্তমানে প্রতিটি বিদ্যালয়ের ন্যূনতম ৪টি বা ৫ টি শিক্ষকপদ বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রধানশিক্ষক পদ। সহকারী প্রধানশিক্ষকের পদ নামে থাকলেও এটিকে কোন আলাদা বেতনস্কেল দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। অধিক ছাত্রসংখ্যার জন্য কোন কোন বিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত পদসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলেও সংশ্লিষ্ট উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সৃষ্ট শিক্ষকপদ সমন্বয় করেই তা করা হয়ে থাকে। এর ফলে অধিক ছাত্রসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকপদ বরাদ্দ দেওয়া প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

বর্তমানে হাতেগোনা কয়েকটি বিদ্যালয় বাদ দিলে শিক্ষকপদের অতিরিক্ত অন্য কোন ধরনের পদ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য সৃষ্টি করা হয় নি। ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর দপ্তরি, আয়া ইত্যাদি পদ বিলুপ্ত করে দেয়। বর্তমানে যে কটি পদ রয়েছে তাতে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ অবসর গ্রহণের সাথে সাথে তাদের পদগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অন্য কোন ধরনের কর্মচারী কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভবন পাহারা দেওয়া বা অন্যান্য কাজে সহায়তা করার মতো কোন কর্মচারীর অস্তিত্ব নেই। সরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্য অন্তত একজন নৈশপ্রহরী থাকা প্রয়োজন। ছাত্রশিক্ষক অনুপাত হিসেব করে শিক্ষকপদ সৃষ্টি করা অপরিহার্য। ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের উপর জোর দিতে হবে।

৭.৮ সুপারিশসমূহ

- ৫ বছর বয়:প্রাপ্ত সকল শিশুকে অবশ্যই বিদ্যালয়ে আনতে হবে এবং এজন্য সারা বছরব্যাপী ভর্তি কার্যক্রম চালু রাখতে হবে।
- সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাচক্র যাতে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতি ১৫০০ জনসংখ্যার জন্য অন্তত একটি প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে এবং এজন্য সরকারি উদ্যোগে প্রতি বছর অন্যূন ১০০টি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্কুল ম্যাপিং-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
- এক্ষেত্রে বিদ্যালয়বিহীন, দুর্গম ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস ও জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এমন সব এলাকাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আরও সহজ করে বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে এবং দেশের সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রেশন আওতায় আনতে হবে।
- বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণসহ সকল অনাবর্তক ব্যয় ও শিক্ষকদের বেতন সরকারি খাত থেকে প্রদান করতে হবে।
- হাইস্কুল সংলগ্ন ও মাদ্রাসা বোর্ড কতৃর্ক নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা তত্ত্বাবধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুসৃত পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে । এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।
- **'স্থাপন ও চালু'র** পর একটি বিদ্যালয়কে ৩ বছরের জন্য একবার অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন দিয়ে আরোপিত শর্ত পূরণ হলে ৩ বৎসর পরই স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিতে হবে ।
- ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়গুলোতে ন্যূনতম ৬টি নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করতে হবে এবং প্রয়োজনানুযায়ী আসবাবপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্রী ও শিক্ষিকার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক আলাদা শৌচাগার নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানযোগ্য পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রচলিত ৫ বৎসর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে "রিসোর্স শিক্ষক" হিসাবে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে কোন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে সাময়িকভাবে প্রধানশিক্ষক ক্লাশ নেয়ার জন্য তাদের নিয়োগ দেবেন।
- প্রতি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ১০ হাজার বর্গফুটের একটি খেলার মাঠ থাকা বাঞ্ছনীয়।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার জন্য ন্যূনতম পরিমাণ সরঞ্জাম সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুর জন্য বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্ল্যাকবোর্ড ও শিক্ষা- উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য সীমিত আকারের একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে সহায়ক ও সম্পূরক পুস্তকসহ বিভিন্ন শিশুতোষ পুস্তক সরবরাহ করতে হবে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়ার কাজে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৩ বৎসর করতে হবে।
- ৫ বছর বয়স হলেই শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিতে হবে।
- স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ডাক্তার ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্য থেকে ২জনসহ বর্তমান ১১ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এস.এম.সি কে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট করে পুনর্গঠন করতে হবে।
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন কোন চাঁদা/অর্থ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে পারবে না।
- এস,এম,সির সক্রিয় সহযোগিতায় ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে উপস্থিতি উৎসাহিত করার জন্য ১০০% উপস্থিত ছাত্র/ছাত্রীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে জনগণের দান গ্রহণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।
- কমিউনিটি ও স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতা সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।
- সরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ করে পৌর এলাকায় প্রতি বিদ্যালয়ে অন্তত একজন নৈশপ্রহরীর ব্যবস্থা করতে হবে।
- আগামী ৮ বৎসরের মধ্যে শিক্ষক/ ছাত্র অনুপাত ১:৩০ এবং পরবর্তী ১০ বৎসরে ১:২৫-এ উন্নীত করতে হবে।
- সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এ বিষয়ে সরকার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদের অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারে।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাদান করে এমন প্রতিষ্ঠানের সকল একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হোম ভিজিট প্রোগ্রাম জোরদার করা উচিত।
- কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলিকে সরকারি তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়
শিক্ষক নিয়োগ

৮.১ নিয়োগবিধি

শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগ একটি নিয়মিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ না করা গেলে শিক্ষার ন্যূনতম মান বজায় রাখা সম্ভব নয়।

যে-কোন নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়োগবিধি থাকা অপরিহার্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের জন্য আলাদা আলাদা নিয়োগবিধি (পরিশিষ্টে সংযোজিত) প্রণীত হয়েছে। এ দুটো ক্ষেত্রেই নিয়োগের জন্য ৬০% মহিলা কোটা নির্ধারিত রয়েছে। দেশে পর্যাপ্ত শিক্ষিত মহিলা প্রার্থী পাওয়া যাবে না এ ধারণায় মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হয়েছে। শিশুবিষয়ক যে কোন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের অনেক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এ জন্যে বরং ৬০% মহিলা কোটা ক্রমশ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে আপোস করে এ কোটা পূর্ণ করা যথার্থ হবে না। যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সে স্থলে অবশ্যই যোগ্য পুরুষ প্রার্থী নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এ সম্পর্কিত নিয়োগবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় সংশোধনী আনতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা (সহকারী শিক্ষক) বর্তমানে পুরুষদের ক্ষেত্রে যে-কোন শাখায় ডিগ্রি পাশ হলেও মহিলাদের যোগ্যতা রাখা হয়েছে দ্বিতীয় বিভাগে এস.এস.সি পাশ। অধিকাংশ এস.এস.সি পাশ শিক্ষক ৩-৫ শ্রেণীর গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞানের পাঠদানে সক্ষম নন। এ ছাড়া পদোন্নতির ক্ষেত্রে এসব নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকবৃন্দ বঞ্চিত হন; ফলে নানা প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৮.২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ একটি বিশাল কর্মকাণ্ড। প্রার্থীর সংখ্যাধিক্য এ কাজকে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার করে তুলেছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ কাজটি করে থাকে। একজন পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন) ও একজন সহকারী পরিচালক (নিয়োগ) প্রধানত এ কাজের দায়িত্বে থাকেন। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও ছাপার কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে করা হয়। ঢাকাস্থ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় থেকে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে সিলগালা করে তা জেলা পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়। উত্তরপত্র পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের কাজটি কেন্দ্রীয়ভাবেই করানো হয়।

সার্বিক কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য কেন্দ্রীয় পরীক্ষাকমিটি রয়েছে। এ কমিটিতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট পরিচালক ছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি; মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা; চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবং চেয়ারম্যান এনসিটিবি সদস্য হিসেবে রয়েছেন। জাতীয় এ-কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত।

১৯৮৯ সাল থেকে শুরু করে এ যাবৎকাল গৃহীত সকল পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের মধ্যেই উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে সদস্য সচিব করে পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি পরীক্ষা গ্রহণ করে উত্তরপত্র ঐ দিনই কেন্দ্রীয় কমিটি বরাবর প্রেরণ করে। উত্তরপত্র প্রাপ্তির পরপরই সেগুলোতে কোড নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এর পর দক্ষ পরীক্ষক নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় ভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। কোন পরীক্ষককে উত্তরপত্র বাড়ি নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। নিরীক্ষাশেষে নম্বরপত্র টেবুলেশন ও ফলাফল তৈরির জন্য কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এটমিক এনার্জি কমিশন এবং পরবর্তীসময়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কেন্দ্র এ দায়িত্ব পালন করেছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রও মাঝে মাঝে এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, লিখিত পরীক্ষা দুটো অংশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থীরা প্রথম অংশটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে 'ও এম.আর পদ্ধতিতে' এবং দ্বিতীয় অংশটি 'রচনামূলক লিখনের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করে থাকে'। দুটো মিলিয়ে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। ন্যূনতম পাশ নম্বর (৫০%) প্রাপ্ত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করে পত্রিকার মাধ্যমে জানানো হয়। একই সাথে ফলাফল জেলা পর্যায়ে প্রেরণ করে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মৌখিক

পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বলা হয়। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যুক্ত করে এবং নির্ধারিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করে উপজেলা/থানাওয়ারি শূন্য পদের ভিত্তিতে ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্ত ফলাফলের কম্পিউটার প্রিন্ট জেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দিয়ে তা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ফলাফল প্রাপ্তির পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়োগপত্র প্রস্তুত করে সকল প্রার্থীর ঠিকানায় প্রেরণ করেন। নিয়োগপত্র প্রাপ্তির পর প্রার্থীরা ডাক্তারি পরীক্ষার সনদপত্রসহ যোগদানের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে রিপোর্ট করেন।

বিশাল এ কর্মকাণ্ডে অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকে। একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ৩/৪ মাস সময় লেগে যায় (অনেক ক্ষেত্রে ৬/৭ মাস)। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ কাজে প্রচুর সময় ব্যয় করেন বলে অনেক সময় তাদের মূল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন বাধাগ্রস্ত হয়।

৮.৩ শিক্ষক নিয়োগ কমিটি

সারা বছর জুড়ে শিক্ষক নিয়োগ কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। একটির ফলাফল প্রকাশের পরপরই পুনরায় এ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রচার করা হয়। এর ফলে অধিদপ্তরের কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সারা বছরই এ কাজে সময় ব্যয় করতে হয়। এমনিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিশাল কর্মকাণ্ড সামাল দিতে এরা গলদঘর্ম হন; এর পর এ অতিরিক্ত বিরাট দায়িত্বের বোঝা তাদের কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা নষ্ট করে দেয়।

১৯৮৯ সালের পূর্বে শিক্ষক নিয়োগ বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় উপজেলা/থানা পর্যায়ের আওতায় ছিল। কিন্তু নানা জটিলতা ও দুর্নীতির কারণে বিষয়টি কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রে আনার ফলে অন্য ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। আর সেজন্য শিক্ষক নিয়োগে বিকল্প প্রক্রিয়ার সন্ধান করা যেতে পারে।

বর্তমানে কেন্দ্রে যে পরীক্ষা কমিটি রয়েছে তাতে বিভিন্ন সংস্থার প্রধান ছাড়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা রয়েছেন যাঁরা নিজ দপ্তরের কাজে সদা ব্যস্ত থাকেন । যার ফলে এ কমিটি সময় সময় দিকনির্দেশনা দেওয়া ছাড়া প্রকৃত কাজটি করতে সক্ষম হন না।

বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ৯০% সরকার প্রদান করে থাকে। এ সব বিদ্যালয়ে যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তাতে অনেক সময়ই স্বচ্ছতা থাকে না। প্রায়শই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির পছন্দনীয় প্রার্থীই নির্বাচিত হয়ে নিয়োগ লাভ করে থাকেন।

৮.৪ পদোন্নতি ও বেতনক্রম

শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ না থাকলে এরা কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেও বছরের পর বছর একই পদে চাকুরি করে যেতে হয় অধিকাংশ শিক্ষক ও কর্মচারীদের । কর্মকর্তা পদে কর্মরত ব্যক্তিরা অন্যান্য সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের ন্যায় নির্দিষ্ট সময় পর পর পদোন্নতি আশা করেন। নিয়োগবিধির জটিলতা, উচ্চতর পদ সংখ্যার অপ্রতুলতা ও কখনওবা কর্তাব্যক্তিদের আন্তরিকতার অভাবে পদোন্নতি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এর ফলে সৃষ্ট মানসিক চাপের কারণে শিক্ষক ও কর্মচারীদের কাজের মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

যথাসময়ে ও যথানিয়মে পদোন্নতি পেলে তা সঞ্জীবনী শক্তির ন্যায় কাজ কাজে করে। বর্তমানে সহকারী শিক্ষকদের প্রধানশিক্ষক পদে পদোন্নতি পেতে ১৫ থেকে ২০ বছর লেগে যায়। তা ছাড়া উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে যখন জুনিয়র শিক্ষক সিনিয়র হয়ে যান তখন ক্ষতিগ্রস্ত সিনিয়র শিক্ষক চাকুরিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। চাকুরি-বই হালফিল নেই এ অজুহাতে কোন কোন শিক্ষককে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন সহকারী শিক্ষকদের বেতনক্রম বর্তমানে জাতীয় স্কেলের ১৮ নং গ্রেডে ১৬২৫ টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে যা একজন গাড়িচালকের বেতনস্কেলের সমানও নয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন প্রধানশিক্ষক বর্তমানে জাতীয় স্কেলের ১৫ নং গ্রেডে ১৯৭৫/- টাকা বেতন পান। এ বেতনক্রম তার এক ধাপ উচ্চতর পদে কর্মরত কর্মকর্তা এইউইও (১০ম গ্রেড) এর চেয়ে পাঁচ ধাপ নিচে (অর্থাৎ ১৫নং গ্রেড)। এর ফলে প্রধানশিক্ষককে এইউইও পদে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হবে না। তা হলে প্রধানশিক্ষক

পদে যে-সব শিক্ষক উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে চাকুরিতে যোগ দিয়েছেন তারা কিসের আশায় এখানে অবস্থান করবেন ? অবশ্যই তাদের পদোন্নতির দ্বার খুলে দিতে হবে। বর্তমান নিয়োগবিধি মোতাবেক কোন এইউইও-এর পদই পদোন্নতিতে পূরণযোগ্য নয়।অবশ্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের জন্য একটি কোটা রয়েছে (২০%), যার ফলে তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কিন্তু অধিক অভিজ্ঞ এবং ক্ষেত্রবিশেষে অধিক দক্ষ শিক্ষকের চেয়ে জুনিয়র শিক্ষক এইউইও হয়ে তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হয়ে বসেন। এ সব বঞ্চিত শিক্ষকদের কাছ থেকে জাতি বিশেষ কিছু আশা করতে পারে না।

নিয়োগবিধি সংশোধন করে এবং বেতনস্কেল উন্নীত করে সহকারী ও প্রধানশিক্ষকদের এসব সমস্যা সমাধান করা যায়।

বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের পদোন্নতির পথ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে তারা নিজেদের বঞ্চিত মনে না করে। তবে উচ্চতর পর্যায়ে/পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে পদের মূল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্তের সাথে কোনরূপ আপোস না করে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তবেই পদোন্নতি দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়োগবিধিতে রাখতে হবে।

৮.৫ বিরাজমান সমস্যা ও চাহিদা

- শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস, ভুয়া পরীক্ষার্থী, পরীক্ষার হলে দুর্নীতি, মৌখিক পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। যেহেতু এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়া সেহেতু চরিত্রের দিক দিয়ে অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষা থেকে ভিন্নতর হওয়ারও কথা নয়। এ পরীক্ষায়ও অন্যান্য পরীক্ষার ন্যায় অপরাধ সংঘটিত হচেছ।
- অধিকাংশ শিক্ষক পদপ্রার্থীই শিক্ষকতার মানসিকতা পোষণ না করার ফলে উপযুক্ত শিক্ষক বাছাই করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।
- বর্তমানে মৌখিক পরীক্ষায় ৩০% নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে যা নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে অনেকটাই ম্লান করে দিচ্ছে। এর ফলে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হচেছ।
- লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর (ওএমআর ব্যতীত) ম্যানুয়েলি কম্পিউটারে এন্ট্রি দিতে হয়; ফলে এখানে দুর্নীতির সুযোগ থেকে যায়।
- ওএমআর পদ্ধতিতে গৃহীত উত্তরপত্রে প্রার্থীর পরীক্ষার রোল নম্বর উল্লেখ থাকে বিধায় এগুলোর সংরক্ষণে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন না করলে দুর্নীতির সুযোগ থাকবে। যেহেতু সারা দেশে একই প্রশ্নে পরীক্ষা হয় সেজন্য প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে সারা দেশের পরীক্ষাই বাতিল হয়ে যায়।
- পরীক্ষাশেষে উত্তরপত্রসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দেয়।
- প্রশ্নপত্র গ্রহণ ও উত্তরপত্র প্রেরণে সিকিউরিটি ব্যবস্থার জন্য যে খরচ হয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তা সংকুলান করতে প্রায়ই সমস্যায় পড়েন।
- পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিন্নতর হওয়ায় বাছাই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নে জটিলতা দেখা দেয়। পুরুষ প্রার্থীদের জন্য যে-মানের প্রশ্ন হওয়া উচিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাধারী মহিলা প্রার্থীদের জন্য তা কঠিন হয়ে যায়। তাই মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়নের ফলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।
- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ নেই।
- সারা বছর জুড়ে নিয়োগের কারণে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত প্রায় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সারা বছর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয় যা তাদের সাধারণ দক্ষতাকে হ্রাস করে।
- বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোন স্বচছ নীতিমালা নেই।
- মহিলা প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে যে সব প্রার্থী চাকুরীতে প্রবেশ করে তাদের পদোন্নতি নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।
- ইংরেজি, গণিত ও পরিবেশ বিজ্ঞানের জন্য আলাদা করে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না।

৮.৬ সুপারিশসমূহ

- সরকারি ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে অভিন্ন নিয়োগনীতি অনুসরণ করতে হবে।
- সকল পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীর জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে প্রশিক্ষণসহ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী বা বি গ্রেড।
- শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন করতে হবে। এ কমিশন প্রার্থী নির্বাচন করে উপজেলাভিত্তিক অপেক্ষমান তালিকা প্রণয়ন করবে এবং চাহিদা মোতাবেক সরকারি ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করবে।
- এ ধরনের কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত শিক্ষাবিদ/কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি শিক্ষক নির্বাচনী বোর্ড/কমিটি গঠন করা যেতে পারে;

  ক. অধ্যক্ষ, সরকারি কলেজ ....সভাপতি

  খ. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ....সদস্যসচিব

  গ. জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধি ....সদস্য

  ঘ. সুপার, পি.টি.আই ....সদস্য

  ঙ. একজন স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য

  ক্রমিক ক ও ঘ মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃক মনোনীত হবেন।
- নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত পর্যায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করে তা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে অন্তত পাঁচ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।
- কমিশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক নির্বাচনী পরীক্ষা হবে মোট ১০০ নম্বরের। এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক (ও,এম, আর পদ্ধতি) ও রচনামূলক অংশের জন্য যথাক্রমে ৫০ ও ৫০ নম্বর থাকবে এবং মৌখিক পরীক্ষায় কোন নম্বর থাকবে না।
- কমিশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করলে ভবিষ্যতের জন্য ঐ প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।
- নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি যে সমস্যার সৃষ্টি করে সেগুলোর সমাধানকল্পে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯১ এর উপানুচেছদ ৭(খ)-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রার্থীর শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য সাইকোলজিক্যাল টেস্ট-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ইংরেজি, গণিত ও পরিবেশ বিজ্ঞানের জন্য বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা ও প্যানেল প্রণয়ন করতে হবে।

নবম অধ্যায়
শিক্ষক প্রশিক্ষণ

পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ'কে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশেরও শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতি, দক্ষতা, শ্রেণীকক্ষের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন এবং শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণদানের জন্য দেশে ৫৩টি সরকারি পিটিআই আছে। পিটিআইগুলিতে এক বছর মেয়াদি সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষাক্রমও আছে। শিক্ষাক্রমের শর্ত পূরণ হলে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি সনদপত্র প্রদান করা হয়। দর্শন ও তত্ত্বগত দিক থেকে সি-ইন-এড একটি চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ। বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এই প্রশিক্ষণ বর্তমানে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অতীতে এই একটি মাত্র সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ নিয়েই সারাজীবন শিক্ষকতা জীবন সমাপ্ত করতে হতো। সমকালীন জ্ঞান এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্ট নবতর ভাবধারার সঙ্গে শিক্ষকগণকে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিচিত হবার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা বাংলাদেশে ছিল না। বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কতিপয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পশেষে এই প্রশিক্ষণগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব হয় নি। সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের স্বল্পমেয়াদি চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তাছাড়া সাবক্লাস্টার পর্যায়েও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রকল্পনির্ভর ও স্থানীয়ভাবে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ গত দুই দশক ধরে চালু আছে।

৯.১ সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ:

শিক্ষক হিসেবে চাকুরিতে নিয়োগ পাওয়ার পর ৩ বছরের মধ্যে একজন শিক্ষককে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। চাকুরি পাওয়ার পর সরকারি খরচে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণকালে শিক্ষকগণ, প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব না দিয়ে সি-ইন-এড সনদ অর্জনেই সচেষ্ট থাকেন। প্রশিক্ষণ নয়, সনদই তখন মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ একটি কঠিন (Rigorous) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হওয়ার কথা। শারীরিক ও মানসিক শৃঙ্খলার অনুশীলন ও চর্চা এই প্রশিক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের আসল উদ্দেশ্য যথার্থভাবে অর্জিত হচ্ছে না। প্রশিক্ষণ চাকুরিকালীন হওয়ার ফলে আর্থিকভাবেও সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ চাকুরিপূর্ব হলে সরকারকে প্রশিক্ষণকালে শিক্ষকদের বেতনভাতা বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ এভাবে ব্যয় করতে হতো না।

সি-ইন-এড প্রশিক্ষণকে চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ করা হলে এবং শিক্ষক নিয়োগকালে এই প্রশিক্ষণে প্রার্থীর কৃতির (Performance) উপর অগ্রাধিকার দিলে প্রশিক্ষণার্থীগণ গুরুত্ব সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণে মনোনিবেশ করত। উত্তম ফল অর্জনের জন্য সকলেই প্রশিক্ষণের প্রতিটি স্তর ও কার্যাবলিতে সক্রিয় ও তৎপর হতো।

৯.২ পিটিআই

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে ৫৩টি এবং বেসরকারি পযার্য়ে ১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পি.টি.আই) রয়েছে। ইত:পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো। বর্তমানে কয়েক বৎসর থেকে এ প্রশিক্ষণ শুধু চাকুরিরত শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পিটিআইগুলিতে পর্যাপ্ত ভবন সুবিধা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রশিক্ষণ কক্ষগুলিতে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র নেই। অতিসম্প্রতি প্রকল্পের আওতায় কিছু পিটিআই-এ আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্টগুলোতে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রয়োজন। প্রতিটি পিটিআই-এর ধারণ ক্ষমতা গড়ে ২০০। আসবাবপত্রের অভাবে ধারণক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে ব্যবহৃত হচেছ না।

গত এক দশকে পিটিআইগুলিতে প্রশিক্ষণ সহায়ক কিছু উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি, যেমন, কম্পিউটার, ওভারহেড প্রজেক্টর, টেলিভিশন, ভিসিআর, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ সব মেরামত ও সচল রাখার জন্য আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ মোটেও বৃদ্ধি করা হয় নি। ফলে অর্থের অভাবে অধিকাংশ উপকরণ ও যন্ত্রপাতি একবার নষ্ট হয়ে গেলে মেরামতের মাধ্যমে কার্যোপযোগী করা সম্ভব হয় না। এতে এ সব মূল্যবান যন্ত্রপাতি প্রশিক্ষণের মানবৃদ্ধির জন্য যেমন ব্যবহার করা যায় না তা তেমনি অর্থের দিক থেকে অপচয়ও বটে।

৯.৩ জনবল

প্রতিটি পিটিআই-এ সুপার ও সহকারী সুপারসহ ১৪ জন প্রশিক্ষক এবং ৬ জন সহায়ক কর্মচারী আছে। উল্লিখিত ১৪ জনের মধ্যে ১২টি ইন্সট্রাক্টর পদ। এই ১২টির মধ্যে ৪টি বিষয়সংশ্লিষ্ট (subject attached)। এই ৪টির ১টি বিজ্ঞান, ১টি কৃষি, ১টি শরীরচর্চা ও ১টি চারু ও কারুকলার। অবশিষ্ট ৮টি বিষয়সংশ্লিষ্ট নয়। বি.এডসহ স্নাতকোত্তর যে-কোন বিষয়ের লোকই এই ৮টি পদে ইন্সট্রাক্টর হিসেবে নিয়োগ পেতে পারে। বাংলা, ইংরেজি ও গণিত প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বিষয়। অথচ এই তিনটি বিষয়ে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণদানের জন্য বিষয়সংশ্লিষ্ট ইন্সট্রাক্টর নেই।

৯.৪ পিটিআই প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ

পিটিআই-এ প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ইন্সট্রাক্টরগণের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ বি.এড প্রশিক্ষণ। কিন্তু এই বি.এড প্রশিক্ষণ 'মাধ্যমিক শিক্ষাভিত্তিক'। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বি.এড প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। বর্তমানের ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১৯৪৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বি.এড প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অধ্যাপক শামসুল হক সাহেবের প্রচেষ্টায় 'প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ' স্থাপিত হয়েছিল। এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে স্বাধীন দেশে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টির জন্য কলেজটি স্থাপন করা হয়েছিল। পিটিআইসমূহের সকল প্রশিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকগণকে এই কলেজ থেকে বি.এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হতো। ১৯৭৮ সালে ময়মনসিংহের 'প্রাথমিক টিচার্স ট্রেনিং কলেজ'টিকে মাধ্যমিকভিত্তিক ট্রেনিং কলেজে রূপান্তর করা হয়। মাধ্যমিক বি.এড প্রশিক্ষণ কোর্স কিশোর ও বয়:সন্ধিকালীন বালক-বালিকাদের মন ও মানসের প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রণীত। অন্যদিকে প্রাথমিক বি.এড প্রশিক্ষণ কোর্স শিশু ও প্রাক-কৈশোর মন ও মানসের প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রণীত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় মাধ্যমিক বি.এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের দ্বারা পিটিআইসমূহের প্রশিক্ষকের কাজ চালানো নীতিবিরুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। ১৯৮০ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল সম্প্রসারণ ঘটেছে। পিটিআইসমূহের ইন্সট্রাক্টর ছাড়াও, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা, উপজেলা ও ক্লাস্টার পর্যায়ে অগণিত কর্মকর্তা রয়েছে যাদের অনেকেরই মৌলিক প্রশিক্ষণ নেই এবং থাকলেও তা মাধ্যমিক শিক্ষাভিত্তিক। প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বি.এড প্রশিক্ষণ চালু করা একান্ত প্রয়োজন। ইতোমধ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। ইউআরসি'র কর্মকর্তাদের জন্যও প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বি.এড প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার প্রয়োজন রয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন মহল থেকেও প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বি.এড কোর্স চালুর কথা বলা হচ্ছে। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ইনস্টিটিউট অফ প্রাইমারি এন্ড ননফরমাল এডুকেশন ১৯৯৭ সাল থেকে বি.এড কার্যক্রম শুরু করেছে।

৯.৫ বি এড প্রশিক্ষণ

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকগণের জন্য সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। যেহেতু সম্প্রতি বিপুল সংখ্যক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসম্পন্ন শিক্ষকও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন। আগামীতে এ ধরনের আরও শিক্ষক আসতে থাকবেন। উচ্চতর মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্যারিয়ার উন্নয়নের জন্য বি.এড প্রাইমারি প্রশিক্ষণ বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতায় তখন ধাপে ধাপে সাধারণ শিক্ষক থেকে সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারবেন । তার এ ক্যারিয়ার বিনির্মাণে বি.এড (প্রাথমিক) প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা সহায়ক ভূমিকা রাখবে ।

৯.৬ সি-ইন-এড শিক্ষাক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের একবছর মেয়াদি সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম রয়েছে। শিক্ষাক্রমটি বিষয় ও তত্ত্বে ভারাক্রান্ত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে প্রায়োগিক বিষয়ে বেশি গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন যাতে প্রশিক্ষণকালে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিশেষ বিশেষ কুশলতা শ্রেণীকক্ষে প্রতিটি বিষয় শিক্ষাদানকালে ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। সি-ইন-এড শিক্ষাক্রমের প্রধান লক্ষ্য হবে শ্রেণীকক্ষের জন্য দক্ষ শিক্ষক তৈরি করা। তবে মেধাবী ও উচ্চাভিলাষী শিক্ষকদের ক্যারিয়ার উন্নয়নের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও রাখতে হবে। বর্তমানে শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কোন প্রণোদনামূলক (Motivational) বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

সি-ইন-এড শিক্ষাক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর একটি অংশ হচ্ছে পাঠদান অনুশীলনী (Practice Teaching)। প্রতিটি পাঠের জন্য পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি এবং শ্রেণীকক্ষে পরিকল্পনা মোতাবেক পাঠদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। প্রতিটি অনুশীলনী পাঠ পিটিআই-এর প্রশিক্ষক কর্তৃক পরিদর্শিত হওয়ার কথা, যাতে তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীর শ্রেণীপাঠদানে উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে এই অংশটি চরম অবহেলায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে পিটিআই-এর প্রশিক্ষকগণকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দূরবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে অনুশীলনী পাঠদান পরিদর্শন করতে হয়। এজন্য তাঁরা কোন যাতায়াত ভাতা পান না। তাছাড়া এক বছরের প্রশিক্ষণে পাঠদান অনুশীলনী মাত্র ২/৩ মাস সময়ে সম্পাদন করা হয়। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষাক্রম গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে শিক্ষাক্রম শুধুমাত্র কাগুজে দলিলসর্বস্ব হিসেবেই থাকবে।

৯.৭ উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি)

শিক্ষা একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য বইসহ অন্যান্য শিখন সামগ্রীর পরিবর্তন স্বাভাবিক। মানব অভিজ্ঞতা, গবেষণা এবং অনুসন্ধানের ফলে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসহ শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নবতর ভাবধারার সৃষ্টি ও প্রয়োগ হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়মিতভাবে এই পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে পরিচিত করাসহ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক স্বল্পকালীন নিয়মিত প্রশিক্ষণ দানের জন্য ইউআরসি স্থাপন করা হচ্ছে। দুইটি প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৭৪টি ইউআরসি স্থাপন করা হয়েছে এবং এখানে নিয়মিত ভাবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ২০০৩ সনের ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১৪০টি ইউআরসি স্থাপন হওয়ার কথা। অবশিষ্টগুলি PEDP-II(২০০৩-০৯)র আওতায় স্থাপিত হবে।

প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যাবলি পরিচালনার জন্য ইউআরসিতে ১জন ইন্সট্রাক্টর ও ১জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার রয়েছে। ইউআরসি'র প্রশিক্ষণে অন্যান্য কার্যাবলি পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য স্থানীয় লোকজনের সমন্বয়ে প্রতিটি ইউআরসিতে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি **রিসোর্স পুল** গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত ডিপিইও, পিটিআই সুপার, ইন্সট্রাক্টর, স্থানীয় শিল্পী, গায়ক, লেখক ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ সাধারণত রিসোর্সপুলের সদস্য হিসেবে থাকবেন। ইউআরসি'র প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যাবলি আইডিয়াল ও নোরাড প্রজেক্ট থেকে পরিচালিত হচ্ছে। ইউআরসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতাও ঐ দুটি প্রজেক্ট থেকে প্রদান করা হয়। ইউআরসি খুব সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউআরসি বিরাট অবদান রাখতে পারে। কাজেই ইউআরসি'র কার্যক্রম ও সেখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সুস্থিতি আনার জন্য অবিলম্বে ইউআরসিগুলোকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর প্রয়োজন। ইউআরসি'র প্রধান দুই কর্মকর্তার মধ্যে প্রশিক্ষক বি.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কিন্তু সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার-এর কোন মৌলিক প্রশিক্ষণ নেই। ইউআরসি'র কার্যাবলি ও সাফল্য এই দুই কর্মকর্তার দূরদৃষ্টি ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। দেশে এবং বিদেশে এদের দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এদের সুদক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে যতশীঘ্র গড়ে তোলা যায় ততই মঙ্গল। ইউআরসি'র ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতার জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শক্তিশালী সংস্থাস্থাপন আবশ্যক।

ইউআরসি উপজেলা সদরে অবস্থিত। শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে ৮/১০ মাইল দূর থেকে ইউআরসিতে আসতে হয়। কোন কোন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেও ভাল নয়। কাজেই প্রতিটি ইউআরসি-তে ১০ জনের আবাসন ব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ৯২টি ইউআরসির জন্য ভবন-নির্মিত হয়েছে এবং আগামীতে নির্মিতব্য ইউআরসি ভবনে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ইউআরসি'র কর্মকর্তাগণের একটি প্রধান দায়িত্ব হল এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা তত্ত্বাবধান পরিচালনা করা। শিক্ষা তত্ত্বাবধান (একাডেমিক সুপারভিশন) একটি প্রফেশনাল কাজ। এই কাজটি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইউআরসি কমকর্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এখন থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। শিক্ষা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও সেভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সের রূপরেখা তৈরি করা সম্ভব হবে। ইউআরসি'র কর্মকর্তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা এলাকার বিদ্যালয়গুলি নিয়মিতভাবে তত্ত্বাবধান করবেন এবং বিদ্যালয়, শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশনা পরিদর্শন বইয়ে লিখে আসবেন। পরিদর্শনকালে প্রদত্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা পালন করে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করা আবশ্যক। নতুবা এই শিক্ষা তত্ত্বাবধান কোন ইতিবাচক ফল আনতে ব্যর্থ হবে। বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার রয়েছে এবং তাঁরাও এ কাজটি করছেন। ইউআরসি কর্মকর্তাগণ সম্প্রতি বিদ্যালয় পরিদর্শন শুরু করলে এই দুই ধরনের কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এ দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। ইউআরসিগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হলে এবং ইউআরসি'র ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসাদের জন্য পদ রাজস্ব খাতের পদের সমমান ঘোষণা করলে এ দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে।

৯.৮ সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় দু দশক ধরে প্রথমে ক্লাস্টার এবং পরে সাব-ক্লাস্টার পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। বহুল আলোচিত ও আলোড়িত এই প্রশিক্ষণ। এসএমসি সভাপতি/সদস্যসহ ৫/৬টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্দিষ্ট একটি বিদ্যালয়ে একত্র করে প্রতি দুই মাস পর একদিনের এই প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়। এই প্রশিক্ষণের সংগঠক এবং প্রধান প্রশিক্ষক সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার। প্রদর্শনী পাঠ, শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের সমস্যা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় উদ্ভূত স্থানীয় সমস্যা ও কো-কারিকুলার কার্যাবলি সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। যথাযথভাবে সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রহণ করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভূত স্থানীয় বহু সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন অনেকখানি এগিয়ে নেয়া সম্ভব হতো। কিন্তু বাস্তবে সাবক্লাষ্টার প্রশিক্ষণে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দুই মাস পর পর এই প্রশিক্ষণ অনেকটা "পিকনিক" আয়োজনের মত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিবিড় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের অভাবেই এর এমন দশা। তাছাড়া সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাবও সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণের বর্তমান দশার জন্য দায়ী। এখন যেভাবে সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ হচ্ছে তা বন্ধ করে ইউআরসি'র উপর এই দায়িত্ব দেওয়া যুক্তিযুক্ত। এতে এই প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে।

৯.৯ প্রকল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণ

PEDP-I এর আওতায় বেশ কয়েকটি প্রকল্প প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এদের মধ্যে IDEAL, ESTEEM, CPEP এবং PEDPQI অন্যতম। MWTL, Local Level Planning, Academic Supervision, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ, URC'র মাধ্যমে ELT ও গণিত বিষয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং অন্যান্যদের এই সব প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পমেয়াদ সমাপ্ত হলে এসব বিষয়ের প্রশিক্ষণও বন্ধ হয়ে যাবে। পরবর্তী সময়ে এই প্রশিক্ষণগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। NAPE, URC এবং PTI-তে প্রশিক্ষণগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাতে প্রয়োজনে এসব বিষয়ে প্রণীত প্রশিক্ষণ সামগ্রী যেমন ব্যবহার করা সম্ভব হবে, তেমনি, প্রশিক্ষণও আয়োজন করা যাবে।

সুপারিশসমূহ

- আগামী ২০০৮ সাল থেকে সি-ইন এড চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং পিটিআইগুলোতে কিছু সংখ্যক আসন বহিরাগত ছাত্র/ছাত্রীদের নিজ খরচে ভর্তির জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।
- সি-ইন-এড/বি, এড (প্রাথমিক) প্রশিক্ষণকে চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
- সকল পিটিআই-এ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে।
- পিটিআই লাইব্রেরিগুলিতে প্রশিক্ষণ, শিশুবিকাশ, এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বইপত্র সরবরাহ করতে হবে।
- বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক ৩টি অতিরিক্ত ইন্সট্রাক্টরের এর পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরের পিটিআইগুলিতে সি-ইন-এড এর পাশাপাশি বি.এড (প্রাথমিক শিক্ষা) প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে যাতে গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ ও প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।
- পিটিআইসমূহের ইন্সট্রাক্টরদের প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বি.এড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- সি-ইন-এড শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর অনাবশ্যক ভার হ্রাস করে বেশিমাত্রায় প্রায়োগিক করা এবং অনুশীলনী পাঠদানের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া কাম্য।
- শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যসূচিতে গুরুত্বের সাথে প্রণোদনামূলক (Motivational) বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- উপজেলা রিসোর্স সেন্টারগুলো পর্যায়ক্রমে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা বাঞ্ছনীয়।
- আগামী ২০০৮ সালের মধ্যে সকল উপজেলায় URC স্থাপন, URC-এর বিল্ডিং নির্মাণ, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।
- URC'র কর্মকর্তাদের প্রথম সুযোগেই প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বি.এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা দরকার।
- প্রতিটি URC-তে অন্তত ১০জন শিক্ষকের আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- URC কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতার জন্য কেন্দ্রীয় (DPE), বিভাগীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে একটি উপদেষ্টা বোর্ড/পরিষদ গঠন করতে হবে।
- সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণগুলো বিলুপ্ত করে ঐ প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য URC-এর উপর ন্যস্ত করা আবশ্যক।
- বর্তমানে প্রকল্পভিত্তিক প্রচলিত প্রশিক্ষণগুলো প্রকল্পের মেয়াদান্তে চালিয়ে যাওয়া দরকার বলে বিবেচিত হলে NAPE, PTI এবং URC'র উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে।
- স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তাদের কিছু সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাঠপর্যায়ের বিদ্যালয় পরিদর্শন ও শিক্ষকসহ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে NGO দের অভিজ্ঞতা ও সুযোগ সুবিধা সরকারি পর্যায়ে ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের চাকুরির পূর্ব শর্ত হিসেবে বি. এড (প্রাইমারি) বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।
- বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে বি. এড (প্রাইমারি) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষককে বি এড (প্রা:) কোর্সে ডেপুটেশন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে প্রণোদনামূলক (Motivational) বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের সমসাময়িক কালে যে সব উন্নয়ন ঘটেছে তার সাথে শিক্ষকদের পরিচিত করার লক্ষ্যে রেডিও / টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান চালু করা যেতে পারে।

দশম অধ্যায়
প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন

সরকার কর্তৃক গৃহীত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। দেশজুড়ে এ বিশাল কর্মকাণ্ড পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে আরও একটি সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কোষ। এখন এ প্রতিষ্ঠানটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর নামে পরিচিত। বর্তমানে এটি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনভাতার অংশ প্রদান করার কাজেই অধিক সময় দিচ্ছে। উল্লিখিত দুটি প্রতিষ্ঠানই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আরও একটি অধিদপ্তর রয়েছে। এটি গণশিক্ষা অধিদপ্তর নামে পরিচিত। এটি বিভিন্ন ধরনের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১৯৭৯ সালে শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ঐ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি নতুন অধিদপ্তর গঠনের সুপারিশ করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নামে একটি অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক এই অধিদপ্তরকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি বিভাগ কার্যক্রম শুরু করলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক সকল বিষয় এ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ২০০৩ সালে এ বিভাগটি একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা লাভ করেছে। মাঠ পর্যায়ে ৬৪টি জেলা অফিস ৪৮১টি উপজেলা/থানা অফিস, ৫৩টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৭৪টি উপজেলায় একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যে সমস্ত বিদ্যালয়কে ঘিরে এসব দপ্তর তাদের ক্রিয়াকর্ম চালাচেছ তাদের মধ্যে ৩৭,৬৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৩টি এক্সপেরিমেন্টাল বিদ্যালয়, ১৯,৪২৮টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩,২৬৮টি কমিউনিটি ও ৪,০৯৫টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় রয়েছে। উল্লিখিত ৫ ধরনের মোট ৬৪,৫১৫টি প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের মোট ২,৫৫,৯৬৪জন শিক্ষকের বেতনভাতা (সম্পূর্ণ বা আংশিক) সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। এ সব বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। বাকি ৬ ধরনের প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের উপর এখনও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

১০.১ বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়

১০.১.১ প্রধান কার্যালয়

প্রধান বা কেন্দ্রীয় দপ্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলা হয়। এর প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে আছেন একজন মহাপরিচালক। তাঁকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার জন্য আছেন ৪ জন পরিচালক: পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (পরিবীক্ষণ)। এ ছাড়া পরিচালক (পলিসি অপারেশন) পদে এস্টিম প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা অধিদপ্তরের মূলস্রোতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতি পরিচালকের সাথে উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, শিক্ষা অফিসার, গবেষণা অফিসার যুক্ত থেকে তার কাজে সাহায্য করছেন। এ ছাড়া এম, আই, এস কোষে একজন সিস্টেম এনালিষ্ট ও প্রোগ্রামার অধিদপ্তরের তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সরবরাহের দায়িত্ব পালন করছেন। বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি ডেস্কের দায়িত্ব পালন করে থাকেন একজন সহকারী পরিচালক। অন্যান্য সাপোর্ট সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এ কার্যালয়টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত 'পলিসি' বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

১০.১.২ বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়

বর্তমানে প্রশাসনিক প্রতিটি বিভাগে একটি করে মোট ছয়টি বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয় রয়েছে। এ কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী বিভাগীয় উপপরিচালক। এ ছাড়াও ১জন সহকারী পরিচালক ও ১জন শিক্ষা অফিসার রয়েছেন। এ কার্যালয়গুলো নবসৃষ্ট বলে এসব পদ ক্যাডারভুক্ত হয় নি। উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও শিক্ষা অফিসারকে অফিসের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও নিয়মিত নির্দিষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় ও অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন করতে হয়। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় এ কার্যালয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দপ্তরের উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও শিক্ষা অফিসারের পদ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পদের সমমানের এবং পরস্পর বদলিযোগ্য। বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন এ কার্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালুর জন্য এ কার্যালয় থেকে অনুমতিপত্র জারি করা হয়। অস্থায়ী ও স্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্ব এ কার্যালয়ের। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সাথে এ অফিস থেকেও আওতাধীন পিটিআইগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। বিভাগের মধ্যে শিক্ষক ও কর্মচারীদের আন্ত:জেলা বদলির দায়িত্ব এ কার্যালয়ের।

১০.১.৩ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

এ অফিসগুলো ৬৪টি জেলা সদরে নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত। মহাপরিচালকের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে জেলাস্থ প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সব কর্মকাণ্ডে এ দপ্তরটি জড়িত রয়েছে। এর প্রধান নির্বাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডি.পি.ই.ও)। তার অধীনে একজন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, একজন সহকারী মনিটরিং অফিসার, উচ্চমান সহকারী, ক্যাশিয়ার, অফিস সহকারী কাম টাইপিস্ট, একজন ড্রাইভার, নৈশ প্রহরী ও এম.এল.এস.এস রয়েছে।

জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও ডি.পি.ই.ও-কে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় ও অধীনস্থ উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করতে হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত বিভিন্ন বিভাগবহির্ভূত কমিটির সদস্য হিসেবে ডি.পি.ই.ওকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদ্যালয়সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন ও মনিটরিং করা ও নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবন বুঝে নেওয়ার দায়িত্বও এ কর্মকর্তাকে পালন করতে হয়।

১০.১.৪ উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস

এটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক দপ্তর। এ দপ্তরের দায়িত্বে থাকেন একজন উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ইউইও/টিইও)। সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানায় অবস্থিত সকল সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শন ও এর প্রশাসনিক বিষয়গুলো এ দপ্তর থেকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষকদের বেতনভাতা প্রদান, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড এ দপ্তরের আওতাধীন। এ ছাড়া কমিউনিটি, স্যাটেলাইট ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়মিত পরিদর্শন; শিক্ষক নিয়োগ, অনুদান, নির্মাণ, বৃত্তি পরীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হয়।

বর্তমানে উপজেলা/থানা ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় শিক্ষকদের আন্তঃবিদ্যালয় বদলির প্রস্তাব এ দপ্তর থেকেই হয়ে থাকে। দাপ্তরিক কাজ ছাড়া একজন উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারকে মাসে ৫(পাঁচ) টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হয়।

প্রতিটি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসে বেশ কয়েকজন সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (এইউইও/এটিইও) থাকেন। এ পদের সংখ্যা নির্ধারিত হয় বিদ্যালয়ের সংখ্যার উপর। সাধারণত ১৫-২০টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ক্লাস্টার গঠন করা হয়। প্রতিটি ক্লাস্টারের দায়িত্বে একজন করে এইউইও/এটিইও থাকেন। ক্লাস্টারের দায়িত্ব প্রাপ্ত এ সব কর্মকর্তা ক্লাস্টারে অবস্থিত প্রতিটি বিদ্যালয় মাসে অন্তত ১ বার দিনব্যাপী পরিদর্শন ও শিক্ষা তত্ত্বাবধান করে থাকেন। কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ছুটির প্রয়োজন হলে এ কর্মকর্তার মাধ্যমে উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসে পাঠাতে হয়।

১০.১.৫ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)

বাংলাদেশে বর্তমানে এ ধরণের ৫৩টি সরকারি এবং ১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া। বর্তমানে ১ বছরব্যাপী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি.ইন.এড) ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ও কর্মশিবিরের ব্যবস্থা করা এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের আওতাভুক্ত। বর্তমানে সি-ইন-এড চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করে শুধুমাত্র নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাম্পাসের মধ্যেই থাকার জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল আছে। সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারী সুপারিনটেনডেন্টের জন্য আবাসিক ভবন রয়েছে।

প্রতিটি পিটিআই-এ একজন সুপারিনটেনডেন্ট প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সাধারণত একজন সুপার, একজন এ্যাসিসটেন্ট সুপার ও ১২ জন ইন্সট্রাক্টর নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হয়। একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ শ্রেণী পাঠদান করা ছাড়াও কিছু কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষা তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ল্যাবরেটরি হিসেবে একটি করে পরীক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, পিটিআই-এর স্টাফ হিসেবে পরিগণিত (স্টাফ কাউন্সিলের সদস্য নয়)। এরা সাধারণত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেন। তবে এসব শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতনস্কেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের থেকে ভিন্ন।

১০.১.৬ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)

দ্বিবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) এর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী স্থাপন। এ ধরনের একটি একাডেমী জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে এ লক্ষ্যে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে এর যাত্রা শুরু হয়। এ একাডেমীর উপর অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে সি-ইন-এড-এর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা ইত্যাদি প্রধান। এটি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রাণাধীন মাঠ পর্যায়ের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। ১জন পরিচালক এর প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন। অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

১০.১.৭ উপজেলা রিসোর্স সেন্টার

প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) স্থাপনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত মোট ১৭৬টি ইউআরসি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটির জন্য একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অফিস যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ইতোমধ্যে স্থাপিত ইউআরসিগুলো কার্যক্রম শুরু করতে পারে নি। প্রতিটি ইউআরসিতে একজন ইন্সট্রাক্টর, একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, একজন কম্পিউটার অপারেটর থাকবে।

১০.২ প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল তখন প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কতিপয় পদকে ক্যাডারের পদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এগুলো সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের পদ হিসেবে চিহ্নিত। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাওয়ার সাথে সাথে এ পদগুলো শিক্ষা ক্যাডারে থাকার আর কোন যুক্তি থাকে না। যদিও এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন ক্যাডার সৃস্টি করা হয় নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এখন স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় বিধায় এর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও তা এখনও চূড়ান্ত রূপ লাভ করে নি। বর্তমানে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই-এর ইন্সট্রাক্টর পদে যারা যোগদান করছে তাদের ধরে রাখতে হলে এবং এ সার্ভিসের উন্নয়ন করতে চাইলে অবশ্যই এ দুটো পদকে ক্যাডার সার্ভিসের এন্ট্রি পদ হিসেবে চিহ্নিত করে ক্যাডার গঠন করতে হবে।

১০.৩ নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত প্রথম শ্রেণী পদে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন বিধায় তাদের এ প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম দুটো ব্যাচ সাভারস্থ পি-এ-টি-টি তে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে নায়েম-এ এসব কর্মকর্তার শিক্ষা ক্যাডারের অন্যান্যদের সাথে ৪ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

১০.৪ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মকর্তাদের জন্য দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণের কিছু সুযোগ রয়েছে। তবে বলা যায় এ সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ও অপ্রতুল। যখন কোন নতুন বিষয় বা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় তখন সে বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়।

১০.৫ বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন প্রধানত কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যেমন-নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, টাইমস্কেল, ছুটি ও প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা।

১০.৫.১ নিয়োগ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল কর্মকর্তার নিয়োগের লক্ষ্যে বাছাই বা নির্বাচন সরকারি কর্ম কমিশন করে থাকে। বাছাইকৃত তালিকা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগ দিয়ে থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর করে থাকে। ১৯৯০ সাল থেকে শিক্ষক নিয়োগের বাছাই পর্বের কাজটি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে নিয়োগ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকেই দেওয়া হয়।

১০.৫.২ পদোন্নতি ও টাইমস্কেল প্রদান

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও টাইমস্কেল প্রদানের দায়িত্ব মন্ত্রণালয় পর্যায়ে পালন করা হয়। কর্মচারীদের পদোন্নতি বিষয়টি অধিদপ্তর এবং টাইমস্কেল বিষয়টি বিভাগীয় দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছে। শিক্ষকদের পদোন্নতি, টাইমস্কেল ও অবসর গ্রহণের বিষয়ে থানা শিক্ষা কমিটি সুপারিশ করলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেন।

১০.৫.৩ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলামূলক বিষয়গুলো মন্ত্রণালয় পর্যায় থেকে নিষ্পত্তি হয়। কর্মচারীদের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় থেকে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষকদের বেলায় এ ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের।

১০.৫.৪ বদলি

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারী সুপারিনটেনডেন্টদের বদলির প্রস্তাব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে করা হয়, তবে বদলির আদেশ জারির দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, পিটিআই-এর ইন্সট্রাক্টদের বদলির দায়িত্ব প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলি মন্ত্রণালয় থেকে করা হয়। কর্মচারীদের বদলির দায়িত্ব মহাপরিচালকের দপ্তরের (প্রধান কার্যালয়)।

১০.৬ প্রশাসনে জবাবদিহিতা

প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনতে জবাদিহিতা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে এজন্য বর্তমানে কিছু প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। যেমন-অফিস পরিদর্শন, সমন্বয় সভা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, অডিট ইত্যাদি।

১০.৬.১ পরিদর্শন

উর্ধ্বতন অফিস প্রতিটি অধস্তন অফিস নিয়মিত পরিদর্শন করে কাজের অগ্রগতি ও যে কোন ধরণের ক্রটির বিষয়ে অবহিত হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রতিটি উপজেলা অফিসে বিদ্যালয়ওয়ারি পরিদর্শন নথি রয়েছে। একই ভাবে জেলা অফিসে উপজেলাওয়ারি পরিদর্শন নথি রয়েছে। মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এসকল অফিস পরিদর্শনের সময় উল্লিখিত নথি নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কোনরূপ ক্রটি হয়ে থাকলে তা তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। তখন উর্ধ্বতন অফিস উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১০.৬.২ সমন্বয় সভা

প্রতি তিন মাস অন্তর বিভাগীয় অফিসে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টদের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এ সময় কর্মকর্তারা তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন। একইভাবে বিভাগীয় উপপরিচালকদের নিয়ে মহাপরিচালক ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা করে থাকেন। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধিদপ্তরের সভায় অধিদপ্তরের কাজের অগ্রগতি ও ক্রটিবিচ্যুতির জন্য জবাবদিহিতা করতে হয়।

১০.৬.৩ গোপনীয় প্রতিবেদন

প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য বার্ষিক ও বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যও এ প্রক্রিয়া কার্যকর করা হয়েছে। তবে কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষকদের কাজের ধারা অনুযায়ী প্রতিবেদন ছক যথাযথ নয়। বিশেষ করে শিক্ষকদের প্রতিবেদন ছকে তার শ্রেণী পাঠদান, শিক্ষকসুলভ আচরণ, শিশুদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা, সহমর্মিতা, জনসাধারণের সাথে আচরণ ও যোগাযোগ, আন্তরিকতা ইত্যাদি বৈশিষ্টাবলির প্রতিফলন তেমন নেই।

১০.৬.৪ অডিট

প্রতিটি কার্যালয়ের আর্থিক বিষয়গুলো প্রতি বছর সরকারের তরফ থেকে অডিট করা হয়। এভাবে আর্থিক জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

১০.৭ প্রশাসনক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলি

- বিভিন্ন কার্যালয়ে পর্যাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব। এজন্য অধস্তন কার্যালয় থেকে কর্মচারী এনে কাজ করানোর প্রবণতা দেখা যায়।
- দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাবে কাজে দীর্ঘসূত্রিতা বা অনীহা একটি প্রকট সমস্যা।
- ঘুষ, দুর্নীতি, প্রভাবশালী মহলের অনাহূত হস্তক্ষেপ ও মাস্তানী সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনার অন্তরায়।
- জবাবদিহিতার যে-সমস্ত ব্যবস্থা বা হাতিয়ার রয়েছে তা যথাযথভাবে ও যথাসময়ে ব্যবহার করা হয় না। জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা বিষয়টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।
- শিক্ষক বদলির নীতিমালা অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলি নীতিমালা থেকে ভিন্নতর হওয়ায় কখনও কখনও মানবিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য ভিন্নতর প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় ফলে বেসরকারি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচিত হয় না।
- সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনস্কেল ও চাকুরি সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে দুটো ধারার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকায় বেসরকারি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত মানের শিক্ষক নিয়োগে সমস্যা দেখা দেয়।
- প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নে বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় নি। প্রাথমিক শিক্ষা একটি হস্তান্তরিত বিষয় বলা হলেও কতটুকু ক্ষমতা কেন্দ্রে এবং কতটুকু ক্ষমতা জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রদান করা হবে তা স্পষ্ট নয়।

- বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পৌন:পুনিক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই।
- শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে চাকুরির প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণোদনমূলক (Motivational) বিষয়বস্তুর অনুপস্থিতি।
- সারা বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য অভিন্ন ছকের ব্যবহার।
- শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখনের জন্য যে ছক প্রণীত হয়েছে তা যথাযথ নয়।
- পরিদর্শনের ফলোআপ কার্যাবলি অপ্রতুল।
- শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অন্যান্য নিয়মিত কাজের ক্ষতি হয়।

১০.৮ সুপারিশসমূহ

- প্রশাসনকে দেশের চাহিদা মোতাবেক যুগোপযোগী করার জন্য Organizational Analysis এর উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ/Job description এর নবায়নের বিষয়টি বিবেচিত হওয়া দরকার।
- বিভাগীয় কার্যালয়গুলোতে পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে অধিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে কী ধরনের ক্ষমতা দেওয়া যাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। বিষয়টি যেন দ্বৈত শাসনের পর্যায়ে না যায় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করলে প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দ পদোন্নতি পেয়ে যাতে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন পদে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদ্যমান শূন্যপদ যথাসময়ে পূরণ করতে হবে।
- শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন ও বেতনস্কেল নির্ধারিত হবে তার শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।
- গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় উদ্যোগে হলেও প্রতিটি বিদ্যালয়ে নৈশ প্রহরী ও দপ্তরি নিয়োগ করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা প্রশাসনিক ক্যাডার সৃষ্টি করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীকে প্রস্তুত করতে হবে।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মনীতি মেনে চলার মানসিকতা গড়ে তুলতে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথ, নিরপেক্ষ ও জোরদার করতে হবে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন লেখার উপর যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পদোন্নতি, টাইমস্কেল, ই.বি. উত্তরণ ইত্যাদি প্রেষণামূলক কার্যক্রম এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দিতে হবে।
- চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ জোরদার করার জন্য সকল উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার স্থাপন ও চালু করণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তার স্থলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা পদায়নের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- সব ধরনের বদলি নীতিমালা আরও স্পষ্ট ও মানবিক হওয়া কাম্য। প্রণীত নীতিমালা দৃঢ়ভাবে সবাইকে মেনে চলতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধানশিক্ষকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।
- শিক্ষকদের পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি পাওনা অবসর গ্রহণের ৩মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করে শিক্ষকের ব্যাংক একাউন্টে জমা হওয়া নিশ্চিত করতে হবে এবং অপারগতায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
- ননক্যাডার পদ থেকে ক্যাডার এন্ট্রিপদে যাওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।
- পি.টি.আই সংলগ্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা, বেতনস্কেল ও চাকুরিবিধি প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুরূপ করতে হবে ।

একাদশ অধ্যায়
পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং একাডেমিক সুপারভিশন

আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর এর জন্য পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। প্রাথমিক শিক্ষার কর্মকাণ্ড পরিদর্শন ও মূল্যায়ন শেষে বিভিন্ন স্তরে পরীবিক্ষণ কার্যক্রম গড়ে তোলা হয়েছে।

১১.১ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে মনিটরিং উইং নামে একটি উইং রয়েছে। এর সার্বিক দায়িত্বে আছেন একজন পরিচালক। এছাড়া উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী কেন্দ্রীয় পর্যায়ের পরিদর্শন ও মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বর্তমানে বিভিন্ন ছকের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এসব ছকের মধ্যে কিছু নিয়মিত তথ্য প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। এ ছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে তথ্যছক প্রণয়ন করে মাঠপর্যায়ে প্রেরণ করেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সমন্বয় সভা ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের যে কোন উদ্দেশ্যে অধিদপ্তরে ডেকে পাঠালে তাদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একটি প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত তথ্যাদি পাওয়ার পর জরুরি মনে হলে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্যাদি এম, আই, এস শাখায় প্রেরণ করে কম্পিউটারে এন্ট্রি, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন নিরিখে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মাঠপর্যায়ের তথ্যসংগ্রহে ইলেকট্রনিক সিস্টেম চালু না হওয়ায় ডাক যোগাযোগের উপর সর্বাধিক নির্ভর করতে হয়। ফলে তথ্য আদান প্রদানে বিলম্ব ঘটে। উপজেলা দপ্তর থেকে কোন তথ্য সংগ্রহে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় বলে সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যায়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে যখন কোন তথ্য চেয়ে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে তখন অধিদপ্তর থেকে তথ্যসংগ্রহের জন্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী মাঠপর্যায়ে পাঠানো হয়। বিদ্যালয় পর্যায়ের সঠিক তথ্য এসব ব্যবস্থা গ্রহণের পরও শতভাগ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মন্ত্রণালয়ের চাপ মাত্রাতিরিক্ত হলে মাঠপর্যায় থেকে পুরোনো তথ্য পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। তথ্যসংগ্রহে ন্যূনতম কত সময় লাগতে পারে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগ ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের জন্য অনেকটাই দায়ী। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, ভর্তি ও উপস্থিতির ক্ষেত্রে অনেক সময় ইচছাকৃতভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়। এ জন্য ক্রসচেকিং পদ্ধতিতে একাধিক উৎস থেকে তথ্য চাওয়া হয়। প্রাথমিক উৎস দক্ষ হলেও এ প্রক্রিয়ায় গৃহীত তথ্যের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায় যা একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। একই তথ্য বারবার চাওয়ার ফলে মাঠপর্যায়ে তথ্য প্রদানে শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়।

অধিদপ্তরের বিভিন্ন উইং থেকে তথ্য চেয়ে ভিন্ন ভিন্ন ছক প্রেরণ বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে। এর ফলে মাঠপর্যায়ের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে অধিদপ্তর থেকে রিমাইন্ডার ও টেলিফোন পাওয়ার পরও মাঠপর্যায়ের দপ্তরগুলো তথ্য প্রেরণে প্রয়োজনীয় তৎপরতা দেখাতে পারে না। কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বল্পতা এজন্য দায়ী।

অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিমাসেই নির্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় ও অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে তাঁদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আছে। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা প্রশাসনিক পরিদর্শনে মোটামুটি দক্ষ হলেও একাডেমিক সুপারভিশনে অনেকেই প্রশিক্ষিত না হওয়ায় তাঁরা কাঙ্ক্ষিত ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেন না। যে সব কর্মকর্তা এ বিষয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তারাও সময়ের স্বল্পতার কারণে যথাযথভাবে এ কাজ করছেন বলে ভাবা যায় না।

অধিদপ্তর থেকে প্রতি ৬ মাসে একটি মনিটরিং প্রতিবেদন বের করা হয়। বছরশেষে এ সব তথ্য সংযোজন করে অধিদপ্তরের বার্ষিক মনিটরিং প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

১১.২ বিভাগীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা

দেশের ৬টি বিভাগের প্রতিটিতেই একটি করে প্রাথমিক শিক্ষার উপপরিচালকের কার্যালয় চালু আছে। এসব কার্যালয়ে একজন উপপরিচালক, একজন সহকারী পরিচালক ও একজন শিক্ষা কর্মকর্তা রয়েছেন। কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। এদের প্রত্যেকের জন্য মাসিক পরিদর্শন লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা আছে। এ সব পরিদর্শন প্রতিবেদন মাসশেষে মন্তব্যসহ অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হয়। প্রতিবেদনে প্রাপ্ত এবং উপ-পরিচালকের ক্ষমতার আওতায় রয়েছে এমন ত্রুটিসমূহের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা এসব কার্যালয় থেকে নেওয়া হয়।

উর্ধ্বতন কার্যালয়ে নিয়মিত মনিটরিং প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ছকে এ কার্যালয় অধীনস্থ জেলা, থানা ও পিটিআই থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই সুপারবৃন্দ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ সময় তাঁরা সঙ্গে করে পূর্বনির্ধারিত ছকে তথ্য নিয়ে আসেন। বর্তমানে এ দপ্তরে কম্পিউটার থাকায় তথ্য সংরক্ষণ করারও সুবিধে এ কার্যালয়ের রয়েছে। এ পর্যায়ের অধিকাংশ কর্মকর্তাই একাডেমিক সুপারভিশনে দক্ষ নন। পরিদর্শন ছকের গতানুগতিক কিছু প্রশ্নের জবাব পূরণ করা ছাড়া বিশেষ কোন ভূমিকা তারা এ ক্ষেত্রে রাখতে পারেন না।

১১.৩ জেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। প্রায় সবকটা অফিসই বর্তমানে নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। অতি সম্প্রতি এ অফিসগুলোতে কম্পিউটার ও কম্পিউটার অপারেটর দেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদি এসব কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হচেছ। এ পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার উপজেলা/থানা অফিস ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। এদের ক্ষেত্রেও পরিদর্শনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে ব্যবহৃত ছকই এ কর্মকর্তাদ্বয় পরিদর্শন কাজে ব্যবহার করেন। বিদ্যালয় ও উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস পরিদর্শনের জন্য প্রণীত অভিন্ন ছক সকল স্তরের কর্মকর্তাই সংশ্লিষ্ট কার্যালয় পরিদর্শন কালে ব্যবহার করে থাকেন।

পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি উর্ধ্বতন সকল দপ্তরে প্রেরণের নিয়ম চালু রয়েছে। প্রতিটি জেলা অফিসে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলা/থানা ভিত্তিক নথি রয়েছে। এসব প্রতিবেদন নিরিখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের ক্ষমতার আওতায় সীমিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সকল পরিদর্শন প্রতিবেদন একত্র করে মন্তব্যসহ সমন্বিত প্রতিবেদন উর্ধ্বতন দপ্তরে প্রেরণ করতে হয়। এছাড়া প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা করা হয়। এ সভার মাধ্যমেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাডেমিক সুপারভিশন ছকপূরণের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ কর্মকর্তা এ কাজে যেমন সময় দেন না তেমনি তাদের পারদর্শিতাও যথেষ্ট নয়।

১১.৪ উপজেলা/থানা পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা

পরিদর্শনে প্রধান ভূমিকা এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের বিশেষ করে ক্লাস্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসারদের। সকল বিদ্যালয় মাসে অন্তত একবার পরিদর্শন করা সম্ভব হবে এমন ভাবে পুরো থানার বিদ্যালয়গুলোকে ক্লাস্টারে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতি ১০-১৫টি বিদ্যালয় নিয়ে এ ক্লাস্টার গঠিত হলেও পদশূন্য থাকার কারণে একজন সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারকে ২/৩টি ক্লাস্টারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বিদ্যালয় মাসে একবার পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না।

এ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও পরিদর্শনের মাসিক ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। মাসের প্রথমেই সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারগণ মাসিক পরিদর্শন পরিকল্পনা উপস্থাপন করে অনুমোদন করিয়ে নেন। থানা শিক্ষা অফিসারও তার মাসিক পরিকল্পনা জেলা কর্মকর্তার দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেন। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার পরিদর্শনে একই ছক ব্যবহার করার ফলে প্রতিবেদনে বড় ধরনের গুণগত পার্থক্য পাওয়া যায় না।

উপজেলা/থানা কার্যালয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা নথি খোলা হয়েছে। প্রত্যেক সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের জন্য আলাদা পরিদর্শন নথি রয়েছে। ধারাবাহিক ভাবে এতে পরিদর্শন প্রতিবেদন ও গৃহীত কার্যক্রমের রেকর্ড সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

এ পর্যায়ে একাডেমিক সুপারভিশনের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বিশেষ করে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে এ বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁদের বিদ্যালয় শুরুর পূর্ব থেকে শেষ ঘন্টা বাজা পর্যন্ত সারাদিনব্যাপী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে অবস্থান করে একাডেমিক সুপারভিশনের দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। তবে বর্তমানে সবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতকৃত পরিদর্শন ছক এ কাজের জন্য যথাযথ নয়। প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে উপজেলা সদরে অথবা উপজেলার কোন একটি বিদ্যালয়ে সকল প্রধানশিক্ষককে নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত ছকে যার যার বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিসহ প্রধানশিক্ষক এ সভায় উপস্থিত হন। সভায় আলোচনা কালেও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। বিদ্যালয় সংখ্যা অধিক হলে দু'ভাগ করে দুটি আলাদা দিনে এ সভা করা হয়।

উপজেলা/থানা পর্যায়ে কম্পিউটার না থাকায় তথ্যাদি নথিভুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়। এ পর্যায়েও পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সম্ভাব্য বিষয়গুলো নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সকল তথ্য একত্র করে জেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করা হয়। স্থানীয়ভাবে এ.ইউ.ই.ও/এ.টি.ওদের কাজ মনিটরিং করার তেমন কেউ না থাকায় বহু বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ অপরিদর্শিত থেকে যায়। এর ফলে শিক্ষকগণ নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার সুযোগ পায়, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কমে যায় ও ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়।

১১.৫ সুপারিশসমূহ

- বিভিন্ন বিদ্যালয় ও শিক্ষা অফিস নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে যে পরিকল্পনা করা হয় তা যথাযথভাবে যাতে বাস্তবায়িত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নিয়মিতভাবে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ করার জন্য পরিদর্শন ছক প্রণয়ন করতে হবে। কোন দপ্তর সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত ছক বৎসরে একবার ব্যবহৃত হবে।
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নকালে যাতে জ্ঞানের সকল স্তরই বিবেচিত হয় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- একাডেমিক সুপারভিশনের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটি ছক প্রণয়ন করতে হবে (যা শুধু বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত পরিদর্শকবৃন্দ ব্যবহার করবেন)।
- প্রধানশিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার একাডেমিক সুপারভিশন ছক ব্যবহার করবেন।
- পিটিআই বা নেপের কর্মকর্তাবৃন্দও বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় একাডেমিক সুপারভিশন ছকটি ব্যবহার করবেন।
- শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট যোগ্যতাটি জানেন কিনা তা একাডেমিক সুপারভিশন ছকে উল্লেখ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে যে পরিদর্শন হবে তা অবশ্যই পরিদর্শন ছকে করতে হবে।
- বৎসরের শুরুতে একই সাথে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য তথ্যছক পূরণ করতে হবে।
- বিশেষ দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ না থাকলে জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ের পরিদর্শকবৃন্দ একাডেমিক বিষয়ে টেকনিক্যাল সাজেশন লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবেন।
- পরিদর্শনে যাওয়ার পূর্বে উপজেলা সদরে উপস্থিত হয়ে এ.ইউ.ই.ওদের খাতায় উপস্থিতি স্বাক্ষর প্রদানের প্রচলিত ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ বিধায় তা পরিহার করা কাম্য।
- অনুমোদিত পরিদর্শন পরিকল্পনা মোতাবেক বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্ব যে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারবৃন্দ পালন করছেন তা উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে অবশ্যই যাচাই করতে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে ফ্যাক্স ও ইন্টারনেটের সুযোগ প্রসারিত করতে হবে।
- প্রধান কার্যালয়ের পরিবীক্ষণ উইং দ্রুততার সাথে প্রাপ্ত তথ্যাদি EMIS কোষে প্রেরণ করবে।

- EMIS কোষ কর্তৃক বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ উইং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে।
- উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিয়মিত সমন্বয় সভা করতে হবে।
- থানা/উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকদের নিয়ে প্রতি তিন মাসে ইউ.ই.ও এবং এইউইওদের নিয়ে জেলায় প্রতি বছর ১বার ৩দিন ব্যাপী ও ডি.পি.ই.ও এবং পিটিআই সুপারসহ বিভাগে প্রতি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এ সভা করতে হবে।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতি তিন মাসে উপপরিচালকদের নিয়ে এবং বছরে ২বার ডিপিইও এবং পিটিআইসুপারদের নিয়ে এ ধরনের পর্যালোচনা সভা করা যেতে পারে।
- কেন্দ্র থেকে প্রেরিত তথ্যছকে যাতে কোন পরস্পরবিরোধী বক্তব্য না থাকে সে বিষয়ে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- ক্রসচেকিং-এর নামে একই সময়ে বিভিন্ন দপ্তর থেকে তথ্য চাওয়া যতটা সম্ভব পরিহার করতে হবে।
- অধিদপ্তরের পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ উইংয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের অবশ্যই কম্পিউটার ব্যবহারের প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে।
- প্রাথমিক অবস্থায় অধিদপ্তরের প্রতিটি কম্পিউটারকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের (LAN) আওতায় আনতে হবে।
- যে Software ব্যবহার করে অধিদপ্তরের EMIS উইং তথ্য সংরক্ষণ ও প্রসেসিং করে থাকে তার ব্যবহার সম্পর্কে অধিদপ্তরের অন্তত ডেস্ক লেভেলের সমস্ত কর্মকর্তাকে প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা ও বিভাগীয় অফিসসহ সকল মাঠপর্যায়ের অফিস কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে।
- কম্পিউটর থেকে ডাটা সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে সক্ষম করে তোলার জন্য অফিস প্রধানদের অবশ্যই প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- প্রতি বৎসর জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করা নিশ্চিত করতে হবে।
- অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ করা হলে তা পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
- নিয়মিত একাডেমিক তত্ত্বাবধায়নের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে শ্রেণী পাঠদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিদর্শন ও একাডেমিক তত্ত্বাবধায়ন আরও কার্যকর করার জন্য বিষয়টির উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোতে ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারিত করতে হবে।
- সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ যখন কোন বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন সে সময়ে অবশ্যই এস.এম.সি-এর অন্তত একজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর/তাঁদের উপস্থিতিতে পরিদর্শন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখনশেখানো সামগ্রী

১২.১ শিক্ষাক্রম

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাক্রম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাধীনতাউত্তর কালে ১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে এ কমিটি যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে মাতৃভাষা বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান), ইংরেজি, ধর্ম, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও সঙ্গীতকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। পরিমার্জিত এ শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম নামে পরিচিত হয়। এর ভিত্তিতে আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণীত হয়।

১২.১.১ একটি শিশু পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করার পর কোন কোন বিষয়ে কী কী ধরনের যোগ্যতা অর্জন করবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে ৫৩টি এবং পরবর্তী সময়ে ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা হয় যে এ যোগ্যতাগুলো অর্জিত হলে একটি শিশুর জীবনধারণের জন্য ন্যূন্যতম প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হবে; এবং তার মধ্যে আচরণিক পরিবর্তন আসবে ও ইতিবাচক মূল্যবোধের স্ফূরণ ঘটবে। নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কোন কোন যোগ্যতা নির্দিষ্ট একটি বা দুটি শ্রেণীতে, আবার কোন কোন যোগ্যতা ১-৫ শ্রেণী পর্যন্ত সব শ্রেণীতে বিস্তৃত করা হয়েছে। শেষোক্ত যোগ্যতাগুলো ৫ বছরের শিক্ষাচক্র শেষ করলে অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুরু ও শেষ হওয়ার স্তর ভিন্নতর হতে পারে। তাই ৫বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সম্পন্ন না হলে অনেকগুলো প্রান্তিক যোগ্যতাই অর্জন সম্ভব হবে না অথবা এ অর্জন হবে অসম্পূর্ণ।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো জাতীয় ভিত্তিতে প্রণীত কারিকুলাম প্রায়ই অনুসরণ করে না। সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে এসব স্কুল তাদের ইচেছমত কারিকুলাম প্রণয়ন ও অনুসরণ করে থাকে।

১২.১.২ আবশ্যকীয় শিখনক্রম

প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জনের সুবিধার্থে বিভিন্ন শ্রেণীর ১১টি বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধভাবে বিভাজিত ও সুনির্দিষ্ট করে আবশ্যক শিখনক্রম প্রণীত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসই শিখনক্রম (প্রান্তিক যোগ্যতা পরিশিষ্টে সংযোজিত)। শিশুর সামর্থ্য, বয়সের চাহিদা ও শ্রেণীভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার এই বিন্যাসের ভিত্তিতে আবশ্যক শিখনক্রম প্রণীত হয়েছে। তবে শ্রেণী শিক্ষকবৃন্দ এ যোগ্যতাগুলো অর্জনে শিশুদের কতটা সহায়তা করছেন বা করতে পারছেন তা পরিমাপ করার ব্যবস্থা এখনও মজবুত হয় নি। একাডেমিক সুপারভিশন কতটা ফলপ্রসূ হচেছ তারও কোন মাপকাঠি প্রণীত হয় নি। এ ব্যাপারে অধিদপ্তর অধিক মনোযোগী হলে ক্রমান্বয়ে এ অবস্থার উন্নতি হবে।

১২.২ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া সারা বছর ধরে চলে। তবে বড় ধরনের পরিবর্তন না হলে ৫ বছরের পূর্বে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন না করা ভাল। এতে পাঠ্যপুস্তকের পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রক্রিয়ার একটি অবিচেছদ্য অংশ হচেছ মাঠপর্যায়ের চাহিদা জরিপ করা। এর ফলে সামাজিক চাহিদার নিরিখে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সম্ভব হয়। বর্তমানে এ ব্যবস্থার সাথে মাঠপর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করারও ব্যবস্থা রয়েছে। এ দুটো পদক্ষেপের বাস্তবায়ন না করে শিক্ষাক্রম চালু করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

১২.২.১ এন.সি.টি. বি-এর শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রক্রিয়া

বর্তমানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এন.সি.টি.বি) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা উইং রয়েছে। এ উইং এর দায়িত্বে রয়েছেন একজন সদস্য। এখনও এ উইংটি একটি প্রকল্পের অধীনে রয়েছে। প্রকল্পশেষে এর ভবিষ্যৎ কী হবে তা এখনও অনিশ্চিত। বর্তমান প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ১-৫ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। ২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ১-২ শ্রেণী পাঠ্যপুস্তক চালু করা হয়েছে এবং ৩-৫ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজও শেষ হয়েছে।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন বা পরিমার্জনের সময় সাধারণত নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের সাথে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় অর্থ্যৎ একটি শিশু যাতে পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সে ভাবেই শিক্ষাক্রমে সহায়তা দেওয়া হয়। একই সাথে ৫ম শ্রেণীর লেখাপড়া শেষ করে যারা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে তাদের জন্যও দক্ষতা অর্জনে সহায়ক প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক বিষয়াবলি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। বিষয়ভিত্তিক ও কর্মভিত্তিক উপকমিটির মাধ্যমে এ দায়িত্ব এনসিটিবি পালন করে থাকে। এ কমিটিগুলো নিয়মিত সভা করা ছাড়াও সেমিনার ও বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে তাদের সুপারিশমালাকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পায়। এসব সুপারিশ জাতীয় কমিটিতে অনুমোদিত হলে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

১২.২.২ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ব্যবস্থাপনা

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম (আবশ্যকীয় শিখনক্রম)-এর বিস্তরণের জন্য কর্মকর্তা ও শিক্ষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়। তবে ২০০২ হতে চালুকৃত পুন:পরিমার্জিত আবশ্যকীয় শিখনক্রমের বিস্তরণ কার্যক্রম এখনও শুরু হয় নি। এ কার্যক্রমে মাস্টার ট্রেইনারবৃন্দ কোর ট্রেইনার ও ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ দেন। এরপর এ সব ট্রেইনার মাঠপর্যায়ে শ্রেণী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন।

সিএনএড শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ একই সাথে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম তথা আবশ্যক শিখনক্রমের বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন।

১২.২.৩ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে ১১০ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। ১-২ শ্রেণীতে বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের পুস্তক রয়েছে, কিন্তু পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে কোন পাঠ্যপুস্তক নেই। শিক্ষক শিক্ষাক্রম ও নির্দেশিকা অনুসরণ করে এ বিষয়ে পাঠদান করবেন এরুপ ব্যবস্থা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেহেতু বর্তমানে বিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞান নিয়ে খুব কম শিক্ষকই এ পেশায় আসছে না সেহেতু শুধুমাত্র শিক্ষক নির্দেশিকার ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষে পাঠ উপস্থাপনের মত যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে তাঁরা সক্ষম হন না। এ বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। ৩-৫ শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। এ সব বিষয়ের প্রায় সবকটির জন্য শিক্ষক সহায়িকা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের। এ দায়িত্ব পালনের অন্যতম নিদর্শন প্রাথমিক স্তরের সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা। তবে বর্তমানে অরেজিষ্ট্রিকৃত ও এনজিও পরিচালিত স্কুলে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরকার সরবরাহ করছে না। এ ছাড়া সক্ষম শিশুর জন্য মূল্যের পাঠ্যপুস্তকও বাজারজাত করা হয়ে থাকে।

১২.৩ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং মুদ্রণের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পালন করে থাকে। মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক সময়মত মুদ্রণ ও শিশুদের হাতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এনসিটিবি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে যায়। প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্তরের ও ধারার কোটি কোটি পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবিকে মুদ্রণ করতে হয়, ফলে শিক্ষাক্রম উন্নয়নসহ অন্যান্য শাখার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাঠ্যপুস্তক উইং তার স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে এ বিশাল কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করতে প্রতি বৎসর হিমশিম খাচ্ছে।

১২.৪ শিক্ষণ সংস্করণ নির্দেশিকা, সহায়িকা, প্রশ্নপুস্তিকা, ক্লাস রুটিন ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

১২.৪.১ শিক্ষক সংস্করণ, নির্দেশিকা ও সহায়িকা ও প্রশ্নপুস্তিকা

বর্তমানে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) সহ কয়েকটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা, সহায়িকা অথবা শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত ও পরিমার্জিত হয়েছে। সহায়িকার সাথে অথবা আলাদাভাবে প্রশ্নপুস্তিকা প্রণয়ন ও বিতরণ করা হয়েছে।

১২.৪.২ ক্লাশরুটিন ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

প্রতি শ্রেণীর জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও নমুনা ক্লাশরুটিন প্রণয়ন করা হয়েছে। ইচেছ করলে যে কোন প্রধানশিক্ষক স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতি মোতাবেক এ রুটিন পুনর্বিন্যাস করতে পারেন। তবে বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচেছ যে, এন.সি.টি.বি কর্তৃক প্রণীত নমুনা রুটিন পরিবর্তনের চিন্তা কোন শিক্ষকই করছেন না। বার্ষিক পাঠপরিকল্পনার নমুনাও ম্যান্ডেটরি নয়। স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

১২.৫ শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ

১২.৫.১ বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত করার দিকে কিছুটা মনোযোগী হয়েছে। তবে এগুলো অধিকাংশই চার্ট বা পোস্টার জাতীয় উপকরণ। এ সব চার্ট কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুরা বা শিক্ষকগণ নিজেরা আঁকেন অথবা কাউকে দিয়ে আঁকিয়ে নেন। মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মডেল প্রস্তুত করতেও দেখা যায়। বাঁশ, কাঠ বা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করেও এ ধরনের শিক্ষা-উপকরণের অভাব পূরণ করা হয়। শিক্ষক উদ্যোগী হলে অধিকাংশ শিক্ষা-উপকরণই সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে প্রস্তুত করা যায়।

শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত করার উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সি.ইন.এড ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

কিছু কিছু উপকরণ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমেও বিতরণ করা হয়ে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণ উপযুক্ত শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করতে বিশেষ আগ্রহ দেখান না। এগুলোর প্রস্তুতি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে চলছে কিনা তা নিয়মিত পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হচেছ না।

১২.৬ সুপারিশসমূহ

- শ্রেণীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো প্রতিটি শ্রেণীতে অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
- সি.ইন.এড প্রশিক্ষণে যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদানের উপর বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষাক্রম প্রচার (dissemination) কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
- শিক্ষাক্রম রিপোর্ট প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌছানো এবং প্রতিটি শিক্ষক কর্তৃক অনুসরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তক লেখকদের নির্বাচিত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পুস্তক প্রস্তুত করার পর অবশ্যই তা সীমিত পরিসরে মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপযোগিতা যাচাই করে তবেই সারাদেশে চালু করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ, কাগজ ও সেলাইয়ের মান এমন হবে যাতে এগুলোর পুনর্ব্যবহার উপযোগী হয়।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়-বিন্যাস ও উপস্থাপনা, চিত্র এবং প্রচছদ অবশ্যই শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় হতে হবে।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা বা সহায়িকা প্রণয়ন করতে হবে।
- শিক্ষা-উপকরণ কীভাবে স্বল্প ব্যয়ে সহজলভ্য দ্রব্য ব্যবহার করে প্রস্তুত করা যায় তা শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লেখ থাকবে।
- আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রেণীতে পাঠদান করা হয় কিনা তা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য প্রধান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে এবং তাঁর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

- ১ম শ্রেণীতে বাংলা ইংরেজি ও গণিত; ২য় শ্রেণীতে বাংলা, গণিত, ইংরেজি ও ধর্মশিক্ষা নিয়ে কারিকুলাম গঠিত হবে।
- ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ইংরেজি ও ধর্মশিক্ষার জন্য কোন পাঠ্যবই বা আনুষ্ঠানিক কোন লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না।
- ৩য় শ্রেণীতে বাংলা, গণিত, ধর্মীয় শিক্ষা, বাংলাদেশ পরিচিতি ও পরিবেশ বিজ্ঞান থাকবে।
- ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ পরিচিতি, পরিবেশ বিজ্ঞান, শরীরচর্চা, সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি বিষয় থাকবে।
- উপজাতি শিশুরা সকল শ্রেণীতে রাষ্ট্রভাষা বাংলাসহ অন্যান্য নির্ধারিত বিষয় এবং তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা পড়বে।
- ৩য় ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা শুধুমাত্র বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বাংলাদেশ পরিচিতি বিষয়ের উপর নিতে হবে। পরিবেশ বিজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষার উপর মৌখিক পরীক্ষা নিতে হবে। অন্যান্য বিষয়গুলো শুধুমাত্র অনুশীলন করতে উৎসাহিত করতে হবে, তবে কোন পরীক্ষা নিতে হবে না।
- যে যে বিষয়ে পাঠ্যবই প্রণীত হবে না সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরের জন্য নোট বই বা গাইড বই নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতি বছর বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা-উপকরণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমানে বিলুপ্ত অডিও ভিসুয়্যাল সেন্টারের ন্যায় একটি সংস্থা স্বল্পপরিসরে গঠন করে নিয়মিত শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত ও সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের মধ্যে এন,জি,ও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- আবশ্যিক বা কোর (Core) কারিকুলাম হিসেবে সকল বাংলা মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বাংলাদেশ পরিচিতি বাধ্যতামূলকভাবে পড়াতে হবে।
- সকল ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পঠিত অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বাংলা ও বাংলাদেশ পরিচিতি বিষয় দুটো পড়ানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- দেশের প্রাথমিক পর্যায়ে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ঐ কোর কারিকুলাম অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- শিক্ষক নির্দেশিকা, সহায়িকা, শিক্ষণ সংস্করণ ও প্রশ্নপুস্তিকা শিক্ষকবৃন্দ যাতে নিয়মিত ব্যবহার করেন তা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র -শিক্ষকদের জন্য একটি সাপ্তাহিক/মাসিক পত্রিকা সরকারি ব্যয়ে প্রকাশ করতে হবে এবং বিদ্যালয়গুলিতে বিতরণ করতে হবে।
- পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য চিত্র দ্বারা বিষয় উপস্থাপন করে Pictorial book প্রণয়ন করতে হবে যাতে নদীনালা, পাহাড়পবর্ত, গাছপালা, ফুল ও ফল, জীবজন্তু, বিভিন্ন দেশের মানুষ ইত্যাদির পরিচিতি শুধু চিত্রের মাধ্যমে দেওয়া যায়।
- শিক্ষক মাঝে মাঝে ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুলের বাইরে নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত করাবেন ও গাছপালা,ফুল-ফল ইত্যাদির দেশীয় নাম শিক্ষা দিবেন।
- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু শিক্ষকদের নিকট সহজবোধ্য হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বিন্যাস ও উপস্থাপনা, চিত্র ও প্রচ্ছদ অবশ্যই শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় হতে হবে।
- স্থানীয়ভাবে শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুতকরণ উৎসাহিত করতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

দেশের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুসৃত হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থীর ৫ বছরের শিক্ষা শেষে নির্ধারিত আবশ্যিক ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করার কথা। এই যোগ্যতাগুলি বিষয় ও শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী অনুযোগ্যতায় বিভাজিত ও বিন্যস্ত করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে প্রতিটি শ্রেণীর জন্য নির্বাচিত অর্জন উপযোগী অনুযোগ্যতাগুলি বছরশেষে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীগণ ৫ বছরের শিক্ষাশেষে ৫০টি যোগ্যতার অধিকারী হবে। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পরীক্ষা ও মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হবে শ্রেণীভিত্তিক অনুযোগ্যতাগুলি কতখানি অর্জিত হয়েছে তা পরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করা। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আসল উদ্দেশ্য পুরোপুরি শিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতাগুলি ১০০% অর্জন। তা না হলে প্রয়োজনে অতিরিক্ত শিখন-শেখানো ব্যবস্থার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। কাজেই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর প্রতি পাঠশেষে, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক শিখন মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে হওয়া প্রয়োজন। তবেই শিক্ষার্থীর অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলি অর্জনের অবস্থা নিরূপণ এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়। শ্রেণীশিক্ষার সঙ্গে মূল্যায়নের কোন সম্পর্ক নাই। অধিকাংশ বিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বাজার থেকে ক্রয় করা প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে যা চিন্তা-ভাবনাপ্রসূত নয়। এমনকি শ্রেণীপাঠের সঙ্গে অনেক সময় এসব প্রশ্নপত্রের সঙ্গতিও থাকে না। অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এ সব পরীক্ষার খাতা ঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে আন্দাজমত বেশি নম্বর দিয়ে রেজাল্ট বইয়ে তুলে রাখেন। এর উদ্দেশ্য তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল যে ভাল, তা দেখানো। উদ্দেশ্যহীন এই পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি কিছু কিছু উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার অবশ্য ক্লাস্টারভিত্তিক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় শিক্ষকগণই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে থাকেন এবং সাময়িক পরীক্ষার জন্য পাঠের বিষয়বস্তু বছরের প্রথম দিকে বিভাজন করা হয়। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারেন। এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত নমুনা প্রশ্নসম্বলিত প্রশ্নপুস্তিকা পরিমার্জন করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। এর আলোকে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসাররের তত্ত্বাবধায়নে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকগণ স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারেন।

ক্লাস্টারভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সংহত ও বিকশিত করা প্রয়োজন। সাময়িক পরীক্ষার জন্য বিষয়বস্তু বিভাজনের পাশাপাশি শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী অনুযোগ্যতাগুলিকেও বিভাজন করতে হবে। পরীক্ষার মাধ্যমে এই যোগ্যতাগুলি অর্জনের মাত্রা নিরূপণে মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে জাতীয়ভাবে কোন বহিঃপরীক্ষার প্রয়োজন নেই। তবে, স্থানীয়ভাবে উপজেলা বা ক্লাস্টারভিত্তিক একটি পরীক্ষা ৫ বছরের শিক্ষাশেষে গ্রহণ করতে পারলে ভাল হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উপজেলার বিদ্যালয়সমূহকে র‍্যাংকিং করে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ভিত্তিক কমিটিতে আলোচনার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে নিম্ন র‍্যাংকের বিদ্যালয়গুলির উপর সামাজিক ও নৈতিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং সেইসঙ্গে উচ্চ র‍্যাংকের বিদ্যালয়গুলি সামাজিকভাবে প্রশংসিত হয়। পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ না করে যাতে পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষকের শ্রেণীপাঠদান প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের জন্য Achievement Motivation হিসেবে কাজ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৩.১ সুপারিশ

- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্তমানে প্রচলিত ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থার পাশাপাশি সাময়িক পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করতে হবে। তবে ইংরেজি ও ধর্মশিক্ষা বিষয়ে শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষা হবে।
- তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে শুধু বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বাংলাদেশ পরিচিতির উপর লিখিত/আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হবে। পরিবেশ বিজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মৌখিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে। শরীরচর্চা, সঙ্গীত ও চারুকলা বিষয়ে কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না।
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খাতা ক্রয়সহ পরীক্ষার অন্যান্য টুকিটাকি ব্যয় মেটানোর জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরকার থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

- এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপুস্তিকার প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করতে হবে এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রশ্নপুস্তিকায় এমন পরিবর্তন ও পরিমার্জন আনতে হবে যাতে শ্রেণীভিত্তিক যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।
- পরীক্ষার প্রশ্ন বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়।
- সামাজিক জবাবদিহিতার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর শিক্ষক, অভিভাবক, ও এস,এম,সি-এর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনার জন্য প্রধানশিক্ষক কর্তৃক সভার আয়োজন করতে হবে।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনাকালে বিদ্যালয় প্রধানশিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসির সদস্যবৃন্দ এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট সাবক্লাস্টারের এ.ইউ.ই.ও এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার উপস্থিত থাকবেন।
- ৩য় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় যেসকল ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হতে পারবেনা তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধানশিক্ষক সহকর্মীদের সহায়তায় নিরাময়মূলক পাঠদানের ব্যবস্থা করবেন।
- ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর শিশুদের লেখাপড়ার বিষয়ে শিক্ষকগণ বিশেষ যত্ন নেবেন যাতে ৫ম শ্রেণীর শেষে প্রতিটি শিশুর নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জিত হয়।
- মূল্যায়নকালে যাতে জ্ঞানের সকল স্তরই বিবেচিত হয় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সঙ্গীত, শরীরচর্চা ও চারুকলা বিষয়ে কোন পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তবে এ সব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অংশগ্রহণ ও অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে।
- বৃত্তি পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম শতকরা ৬০% নম্বর পেলে তবেই তাকে মেধাবৃত্তি দেওয়ার জন্য বিবেচনা করা যাবে।

চতুর্দশ অধ্যায়
প্রাথমিক শিক্ষায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রকাশনার মধ্য দিয়ে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে যথোচিত ভূমিকা পালন করার জন্য ১৯৭৮ সালে ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ) প্রতিষ্ঠিত হয়। দূরদৃষ্টির অভাবে এবং ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগবিধির কারণে মেধাসম্পন্ন, দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল স্থায়ীভাবে এখানে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। প্রথম দিকে সরকারি কলেজ, টি, টি কলেজ ও পিটিআই থেকে প্রেষণে কিছু লোকজন এনে নেপ-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। এদের অনেককে বিদেশ থেকে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু উচ্চ ও মধ্য মর্যাদার পদের অভাবে অভিজ্ঞ লোকজনকে এখানে ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। এখানে পরিচালক ছাড়া সহকারী অধ্যাপকের উর্ধ্ব পদমর্যাদার কোন পদ নাই। ফলে নেপে সব সময়ই অভিজ্ঞ ও উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন জনবলের অভাব থাকে। তাই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও বিকাশে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না।

নেপ ঢাকা থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান। এটি আর্থিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের জন্য মহাপরিচালকের উপর নির্ভরশীল। ফলে প্রায় প্রতিটি কাজে সম্মতি ও ব্যয় বাজেট অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের শরণাপন্ন হতে হয়। এতে সময়ের অপচয় ও কাজ বিলম্বিত হয়। প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্বায়ত্তশাসন না থাকলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন তাদের ম্যান্ডেটেড কার্যাবলি সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারে না তেমনি প্রতিষ্ঠানগুলোও বিকশিত হয় না। বাংলাদেশে এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের কোন প্রতিষ্ঠানই স্বায়ত্তশাসিত নয়। ভারত, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়ায় এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি স্বায়ত্তশাসিত।

সুপারিশ

- জাতীয় পর্যায়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে নেপকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতাসহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মর্যাদা দিয়ে পুনর্গঠন করতে হবে।
- নেপের জন্য একটি পৃথক নিয়োগবিধি প্রণয়ন করে, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধাসম্পন্ন জনবল দ্বারা এর পদগুলো (Entry Post) পূরণ করতে হবে এবং নিজস্ব জনবল গড়ে তুলতে হবে।
- নেপ-এ প্রেষণে জনবল নিয়োগ পরিহার করতে হবে।
- অন্যান্য দেশের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে অভিজ্ঞতার বিনিময় ও জ্ঞানের সংকরায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নেপ-এর গ্রন্থাগারকে যথেষ্ট সংখ্যক বইপত্র, সাময়িকী ও দেশবিদেশের জার্নাল দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হবে।
- গবেষণার জন্য নেপ-কে বিশেষ মঞ্জুরি দানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পিটিআই সমূহের প্রশিক্ষকদের নেপের গবেষণা কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার একটি গবেষণার ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে।
- চিন্তার আধার হিসেবে নেপ যাতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্ভূত সমস্যা ও ইস্যুর উপর সরকারকে প্রয়োজনমত পরামর্শ প্রদান করতে পারে সেভাবে এটিকে গড়ে তুলতে হবে।
- নেপ থেকে ষান্মাসিকভাবে প্রকাশিত 'প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা' আর্ন্তজাতিক মানের মাসিক জার্নালে রূপান্তরিত করে ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিনামূল্যে তা সকল বিদ্যালয়ে বিতরণ করতে হবে।
- নেপ-এর প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
- পিটিআইগুলির প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য নেপকে সেখানকার একাডেমিক সুপারভিশনের দায়িত্ব পালন করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নেপ যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করতে পারে।
- নেপকে প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি ও অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ও উন্নত মানের প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়
প্রাথমিক স্তরের অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি চালুকরণ

প্রাথমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি চালুকরণ

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে তিন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। যথা- সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা। সাধারণভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাকে ইংরেজি শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ দুটোর মধ্যে আঙ্গিক পার্থক্য ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য লক্ষণীয়। সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির অবস্থান এ দুয়ের মাঝে। এ পদ্ধতিতে যেমন ইংরেজি পড়ানো হয় তেমনি ধর্মীয় বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১৫.১ সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি

বর্তমানে দেশে যে ১১ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাদান করছে তার মধ্যে ৮ ধরনের প্রতিষ্ঠানই সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সব প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে থাকে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। অর্থাৎ মোট ৮ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক কোন-না-কোনভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ জন্য এসব বিদ্যালয়ের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

১৫.২ মাদ্রাসা ধারার শিক্ষাপদ্ধতি

প্রাথমিকস্তরের সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বর্তমানে দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যথা-স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা ও উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা। এ প্রতিষ্ঠানগুলো মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে আরবি, ইংরেজি, বাংলা ও গণিতসহ মোট ৯টি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। কুরআন মজিদ ও তাজদিদ, ফিকহ ও আরবি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ভাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে বর্তমানে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে এনসিটিবি কর্তক প্রণীত শিক্ষাক্রম অনুসৃত হচ্ছে। এ স্তরের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকও এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের অনুরূপ। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম কতটা কার্যকর ভাবে চলছে তা বলা কঠিন। ধর্মীয় বিষয়গুলোর উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের পাঠদান অবহেলিত কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়গুলো পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৫.৩ কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি

সাধারণত ইংরেজি মিডিয়াম বিদ্যালয়ে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়; তবে দেশে কিছু বাংলা মাধ্যম কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ও রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে না। সাধারণত বিদ্যালয়ভিত্তিতে শিখন বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়; এছাড়া কখনও গোষ্ঠীগতভাবে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। আবার কখনওবা বিদেশী কোন স্কুলের আদলে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যক্রম রচিত হয়। সত্যিকার অর্থে এসব বিদ্যালয়ের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম নেই। কোনপ্রকার সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতারও কোন ব্যবস্থা এ যাবৎ গড়ে ওঠে নি। শিক্ষাক্রমের বিকল্প হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি বিদ্যালয় নিজেদের পছন্দমতো পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার মানের অসমতা লক্ষ্য করা যায় এধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে।

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে এমন সকল বিদ্যালয়ই বেসরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উচ্চ ছাত্র বেতন ও ইংরেজি ভাষার ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া এসব প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।

পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশই দেশের বাইরে প্রণীত ও মুদ্রিত। ফলে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন এসব পুস্তকে থাকে না। দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভূগোল সাধারণত এসব বিদ্যালয়ে কম গুরুত্ব পায়। ক্ষেত্রবিশেষে এসব বিষয়ের পুরোটাই ভিন্ন দেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের হওয়ায় শিশুমনে দেশপ্রেম যথাযথভাবে জাগরুক হয় না। বিদেশী ভূগোলপাঠের কারণে দেশের মানচিত্র, পতাকা ইত্যাদি সম্পর্কেও ভুল ধারণা জন্মাতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা দেশের জন্য অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না।

নিম্নবর্ণিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যায় :

- দেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মের বিষয়ে অত্যধিক স্পর্শকাতর।
- রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিধায় ইসলাম ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।
- মাদ্রাসায় পঠিত কতিপয় বিষয় যেমন বাদ দেওয়া সম্ভব নয় তেমনি এগুলো সাধারণ শিক্ষা বা কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতেও অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়।
- একালের অভিভাবক ও পড়ুয়ারা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠায় ইংরেজি বিদ্যালয়ের গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ায় যেসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে প্রতীয়মান সেগুলো নিম্নে দেওয়া হল :

- বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শিশুরা চিন্তাচেতনায় ভিন্নতর হচ্ছে।
- কিছু শিশুর মনে হীনমন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিতে পারে।
- কোন কোন শিশুর মনে দাম্ভিকতা ও অহংবোধ সৃষ্টি হতে পারে।
- বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের ফলে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধের অভাব সৃষ্টি হতে পারে।
- বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের অন্তরায়।

উল্লিখিত সমস্যাবলি নিরসনে কতিপয় সুপারিশ :

- দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক বিষয়ে কোন-না-কোনভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং এ ধরনের সকল প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বাংলাদেশ পরিচিতি বিষয়ে আবশ্যিক (CORE) কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরের সকল বিদ্যালয়ে আবশ্যিক কারিকুলাম বাধ্যতামূলকভাবে চালু করতে হবে।
- সকল ধরনের বিদ্যালয় নিয়মিত পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে।
- বেসরকারি বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ছাত্রবেতনের সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তকের ভার লাঘবকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আবশ্যিক (CORE) কারিকুলাম হিসেবে সকল বাংলা মাধ্যম প্রাথমিক ও এবতেদায়ি স্তরে বাংলা, গণিত, ইংরেজি ও বাংলাদেশ পরিচিতি থাকবে।
- ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়ের সাথে বাংলা ও বাংলাদেশ পরিচিতি আবশ্যিক (CORE) কারিকুলাম হিসাবে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রাথমিক ও এবতেদায়ি পর্যায়ের ১ম শ্রেণীতে বাংলা ও গণিত পড়তে হবে এবং ইংরেজি মৌখিকভাবে শেখানো হবে।
- ২য় শ্রেণীতে বাংলা ও গণিত পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ইংরেজি ও ধর্মশিক্ষা মৌখিকভাবে শিখতে হবে।
- ৩য় শ্রেণীতে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ পরিচিতি (ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজ) ও পরিবেশ বিজ্ঞান শিখতে হবে।
- ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ পরিচিতি, পরিবেশ বিজ্ঞান, শরীরচর্চা, সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা বিষয় থাকবে ।
- উপজাতীয় এলাকার বিদ্যালয়ে সব শ্রেণীতে অন্যান্য নির্ধারিত বিষয় ও বাংলাভাষাসহ তাদের মাতৃভাষাও কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত হবে।
- ৫ম শ্রেণীতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কম্পিউটারের সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবে।

ষোড়শ অধ্যায়
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১৬.১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশ (ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত)

বাংলাদেশ একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী এক বিশাল জনসম্পদ নিয়েও আমরা উন্নয়নের ঈপ্সিত স্তরে যেতে পারছি না। এর অনেক কারণ রয়েছে, যার মধ্যে নিরক্ষরতা অন্যতম। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যেসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার মধ্যে সাক্ষরতার হারবৃদ্ধি প্রশংসার দাবি রাখে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থার নানামুখী সাক্ষরতা উদ্যোগের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে।

প্রাক-বাংলাদেশ

এ অঞ্চলে সাক্ষরতা উদ্যোগের ইতিহাস বেশ পুরানো। বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯১৭-১৯১৮ সালে স্থানীয়ভাবে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রথম বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯২৬ সালে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১২টি থানায় ১৫০টির মত নৈশবিদ্যালয় চালু করা হয়। আস্তে আস্তে এই কার্যক্রম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই কার্যক্রমের গতিময়তা বিনষ্ট হয়। ১৯৫৪ সালের দিকে মার্কিন সহায়তায় V-AID (Village Agricultural and Industrial Development) কর্মসূচির অংশ হিসাবে পুনরায় বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীকালে মূল কর্মসূচির বিলুপ্তির সঙ্গে বয়স্কশিক্ষা কর্মসূচিরও বিলুপ্তি ঘটে। ১৯৫৬ সালে বিভার নামক একজন বিদেশী ঢাকায় বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র চালু করেন। নব্য সাক্ষরদের জন্য তিনি ২৪টির মত বইও লেখেন। ৪ বছরের মধ্যে তিনি প্রায় দশ হাজার লোককে সাক্ষর করে তোলেন। ১৯৬৩ সালে 'বার্ড' কুমিল্লার আশেপাশে বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এই কর্মসূচিও সফল হয় নি।

বাংলাদেশ

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর স্বাধীন জাতির মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের পদক্ষেপ হিসাবে শিক্ষাবিস্তারকে সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। শিক্ষাসংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য ডক্টর কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করে নবগঠিত জাতির শিশু-কিশোরদের শিক্ষালাভের অধিকার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়ন আজকের পরিকল্পনা নয়। এ পরিকল্পনা দীর্ঘদিন আগের। ১৯৮০-৮২ সালে সরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী গণশিক্ষা কর্মসূচি চালু করার লক্ষ্যে উপ-রাষ্ট্রপতিকে সভাপতি করে জাতীয় সাক্ষরতা কাউন্সিল গঠন করা হয়। সেই উদ্যোগের ফলে ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে একজন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার কার্যক্রম গৃহীত হয়।

১৯৮০ সালে তৎকালীন সরকারপ্রধান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এক বৎসরে এক কোটি নিরক্ষর এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে চার কোটি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতাসেবা প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে Mass Education Programme (MEP) কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বৎসর থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সরকারিভাবে কোন কর্মসূচি গ্রহণ না করা হলেও এনজিও এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করে। ১৯৮৮ সালে সরকার এনজিওদের সম্পৃক্ত করে Mass Education Through Small Local Organization (METSLO) নামে একটি সাক্ষরতা কর্মসূচি শুরু করলেও পরবরতীকালে এই কর্মসূচিটি পূর্বে বাস্তবায়িত Mass Education Programme (MEP) কর্মসূচি নামে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

'৯০-এর দশকের শুরু থেকে বয়স্কশিক্ষা ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে সচেতন কর্মপ্রয়াসের উন্মেষ ঘটে। এর সাথে যুক্ত হয় আন্তজার্তিক উদ্যম ও উৎসাহ। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক পর্যায়ে এক ধরনের সাড়া জাগে। ১৯৯০ সালের মার্চে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন, ১৯৯৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নয়টি ঘনবসতিপূর্ণ দেশের 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগদান করে এবং সম্মেলনের ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এসবের

অনুপ্রেরণা ও অঙ্গীকার থেকে দেশে 'সবার জন্য শিক্ষা' আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ২০০০ সাল নাগাদ অর্জনের জন্য ৪টি জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ :

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীতকরণ;

(খ) ছাত্রীভর্তির হার শতকরা ৯৪ ভাগে উন্নীতকরণ;

(গ) প্রাথমিক শিক্ষাপর্যায়ে ঝরে পড়ার হার শতকরা ৩০ ভাগে হ্রাসকরণ;

(ঘ) বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীতকরণ;

দেশের একটি বৃহৎ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ) শুরু করা হয়। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। নবসৃষ্ট এ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ইনফেপ কার্যক্রম চলতে থাকে। এ কার্যক্রমের ব্যয় সফল প্রমাণিত হয়। এ কর্মসূচির সাফল্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠিত হয়।

১৬.২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য :

দেশের বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতাসেবা প্রদানের পাশাপাশি সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য :

১. বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতাসেবা প্রদান করা;
২. শিক্ষা সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টি করা;
৩. সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত নব্য সাক্ষরদেরকে কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক আয়ের দ্বারা তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ও তাদেরকে উৎপাদনশীল ও প্রদীপ্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা;
৪. নব্যসাক্ষরদেরকে শিক্ষার সাথে জীবনব্যাপী সংশ্লিষ্ট করা।

১৬.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মেয়াদ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বর্তমানে মূলত দুই ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সেগুলো হচ্ছে (ক) সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং (খ) সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি।

(ক) সাক্ষরতা কর্মসূচি :

দেশের ৮-৪৫ বছর বয়স্ক ৩৪.৬ মিলিয়ন নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ৪টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করে। তিনটি কৌশলের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। কৌশল তিনটি হচ্ছে ঃ (১) সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম), (২) সেন্টার বেইসড এপ্রোচ (সিবিএ), এবং (৩) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিকট বই বিতরণ।

(১) সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) : জেলা প্রশাসকের সার্বিক নেতৃত্বে গঠিত জেলা সাক্ষরতা সমিতির মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। জেলার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জন প্রতিনিধি, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের জনগণ সর্বতোভাবে নিয়োজিত হন বিধায় এ কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্য সমাজের সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) হিসাবে গণ্য করা হয়। এ কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

টিএলএম কর্মসূচিতে মৌলিক সাক্ষরতা কোর্স ০৬ মাস এবং সাক্ষরতা-উত্তর কোর্স ০৩ মাস। মৌলিক সাক্ষরতা কোর্সে শিক্ষার্থীগণ লেখা, পড়া ও গণনা শিখে থাকেন এবং সাক্ষরতা উত্তর কোর্সে শিক্ষার্থীগণ সাক্ষরতা কোর্সে অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতার অনুশীলন করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা লাভ করে থাকেন। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় টিএলএম কর্মসূচির মাধ্যমে ১১-৪৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষরতা সেবা প্রদান করা হয়। টিএলএম কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৮.০ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে সাক্ষর করা হয়েছে।

টিএলএম কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭টি জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করা হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, মাগুরা, জয়পুরহাট ও সিরাজগঞ্জ। ২টি জেলা নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার অপেক্ষায় আছে। জেলাগুলো হচ্ছে ঃ নড়াইল ও গাইবান্ধা। ৬টি জেলায় টিএলএম কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং চূড়ান্ত মূল্যায়নের অপেক্ষায় আছে। জেলাগুলো হচ্ছেঃ পাবনা, বরগুনা, যশোর, গোপালগঞ্জ, নেত্রকোণা এবং রাজবাড়ী ১১টি জেলায় সাক্ষরতা কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে এবং সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি চলমান রয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে : লক্ষীপুর, নোয়াখালী, মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, খুলনা, হবিগঞ্জ, শরিয়তপুর ও মানিকগঞ্জ। ৭টি জেলাতে সাক্ষরতা কর্মসূচি চলমান রয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে : ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, পটুয়াখালী, বগুড়া, কুমিল্লা, মেহেরপুর ও ফেনী। তাছাড়া ১৯টি জেলা কর্মসূচি শুরু করার জন্য প্রস্তুত আছে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা গেলে অচিরেই কর্মসূচি শুরু করা যাবে। অবশিষ্ট ১২টি জেলায় কর্মসূচি শুরু করার জন্য প্রাথমিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) সেন্টার বেইসড্ এপ্রোচ (সিবিএ) : এই কর্মসূচিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১ ও ২ পরিচালিত হয়েছে এবং প্রকল্প-৩ চলমান রয়েছে। প্রকল্প-১ ও ২-এর মৌলিক সাক্ষরতা কোর্স ছিল ০৬ মাসের এবং সাক্ষরতা-উত্তর কোর্স ছিল ০৪ মাসের। প্রকল্প-৩-এর পুরো কোর্সের মেয়াদ ২৪ মাস। প্রকল্প-১-এর লক্ষ্যদলের বয়সসীমা ছিল ১৫-২৪ বৎসর, প্রকল্প-২-এর ১১-৪৫ বৎসর। প্রকল্প-৩ এর লক্ষ্যদলের বয়সসীমা ৮-১৪ বৎসর। নির্বাচিত এনজিওদের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

(৩) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিকট বই বিতরণ : বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিকট বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১ ও ২-এ বই বিতরণ কর্মসূচির সংস্থান ছিল। প্রকল্প দু'টি সমাপ্ত হওয়ার কারণে এ কর্মসূচিও সমাপ্ত হয়েছে।

(খ) সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি :

সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সাক্ষরতার যথাযথ চর্চা না থাকার কারণে শিক্ষার্থীগণ তাদের অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখতে পারে না এবং পুনরায় নিরক্ষরে পরিণত হয়। তাই নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা ধরে রাখার জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত 'মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প' মোট তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প তিনটি হচ্ছে :

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ : এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে -

(১) ১৬.৫৬ লক্ষ নব্য সাক্ষরকে সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ইত:পূর্বে অর্জিত সাক্ষরতার দক্ষতা সুসংহত করা, ধরে রাখা ও মান উন্নত করা;

(২) সমসংখ্যক সাক্ষরতা-উত্তর কোর্স সম্পন্নকারীকে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক আয়ের দ্বারা তাঁদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ও তাদেরকে প্রদীপ্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা;

(৩) প্রকল্পের লক্ষ্যদলকে শিক্ষার সাথে জীবনব্যাপী সংশ্লিষ্ট করা;

(৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় কাঠামো দৃঢ়করণ এবং সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার বাস্তব সংজ্ঞা ও রূপরেখা নির্ধারণ;

(৫) সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচিকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির মেয়াদ হচ্ছে ৯ (নয়) মাস যার মধ্যে সাক্ষরতা-উত্তর কোর্স হবে ৩ মাস এবং অব্যাহত শিক্ষাকোর্স হবে ৬ মাস। সাক্ষরতা-উত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থী কর্তৃক ইত:পূর্বে অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা (Literacy Skill) দৃঢ়করণ, ব্যক্তিজীবনে সাক্ষরতা দক্ষতার ব্যবহার বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হবে। পরবর্তী ৬ মাস মেয়াদে নব্য-সাক্ষরদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক আয়ের দ্বারা তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার সাথে জীবনব্যাপী সংশ্লিষ্টতা সৃষ্টি করার জন্য তাঁদেরকে নিজ নিজ পছন্দ, স্থানীয় বাজারে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা এবং কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বিবেচনা করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের ইপ্সিত বিষয়ে নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগের পদ্ধতির উপরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঋণপ্রদায়ী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হবে এবং ব্যক্তি উদ্যোগের জন্য পরামর্শ দেওয়া হবে।

মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ : এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে -

(১) ১৭.০৪ লক্ষ নব্য স্বাক্ষরকে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ইত:পূর্বে অর্জিত সাক্ষরতার দক্ষতা সুসংহত করা, ধরে রাখা, মান উন্নত করা এবং কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক আয়ের দ্বারা তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকরণ ও তাদেরকে প্রদীপ্ত ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা;

(২) প্রকল্পের লক্ষ্যদলকে শিক্ষার সাথে জীবনব্যাপী সংশ্লিষ্ট করা;

(৩) মানবসম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৪) নব্য সাক্ষরদের আয়বৃদ্ধির দ্বারা তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ও তাদেরকে প্রদীপ্ত ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা;

এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৫টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই কেন্দ্রগুলি নব্য-সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতার দক্ষতা সুসংহত করা, ধরে রাখা ও পরিশীলিত করার জন্য ৩ মাস মেয়াদি সাক্ষরতা- উত্তর শিক্ষা দেবে। পরবর্তী ৬ মাস মেয়াদে নব্য-সাক্ষরদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক আয়ের দ্বারা তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার সাথে জীবনব্যাপী সংশ্লিষ্টতা সৃষ্টি করার জন্য তাঁদেরকে নিজ নিজ পছন্দ, স্থানীয় বাজারে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা এবং কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বিবেচনা করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের ইপ্সিত বিষয়ে নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগের পদ্ধতির উপরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঋণপ্রদায়ী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হবে এবং ব্যক্তি উদ্যোগের জন্য পরামর্শ দেওয়া হবে।

অধিদপ্তরের বর্তমানে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচিতে তিনটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১-এর কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত সাধারণ ০৮টি ও আয়বর্ধক ১২টি ইস্যুর মোট ১২৫টি অনুসারক উপকরণ কেন্দ্রে সরবরাহ করার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/এনজিও-র বিভিন্ন ইস্যুর অনুসারক উপকরণসমূহ অধিদপ্তর কর্তৃক বাছাই করে বইয়ের নামের তালিকা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিওদের দেওয়া হয়। তালিকা মোতাবেক বই ক্রয় করে তারা কেন্দ্রে সরবরাহ করে থাকে। সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ ও ৩-এর এখনও মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয় নি।

১৬.৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র

৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। প্রতি কেন্দ্রের জন্য একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা বা সহায়ক/সহায়িকা এবং ১৫টি কেন্দ্রের জন্য একজন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি)। কেন্দ্র পর্যায়ে সিএমসি কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাছাড়া উপজেলা ও জেলাপর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকমিটি রয়েছে। কর্মসূচির শুরুতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বা সহায়ক/সহায়িকা ও সুপারভাইজারগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া শিক্ষা কর্মসূচি চলাকালে তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে সতেজিকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৬.৫ শিক্ষক নিয়োগ

সাক্ষরতা কর্মসূচির ক্ষেত্রে শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ। আর সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির ক্ষেত্রে সহায়ক/সহায়িকা ও সুপারভাইজারদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে যথাক্রমে এইচএসসি ও ডিগ্রি পাশ। তবে মহিলাপ্রার্থী এবং শিক্ষক/সুপারভাইজারদের দুষ্প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। এনজিওদের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক ও সুপারভাইজার নিয়োগ করে থাকেন। টিএলএম কর্মসূচির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন এ দায়িত্ব পালন করেন।

১৬.৬ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক/সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণের জন্য এখনও কোন স্থায়ী কাঠামো গড়ে ওঠে নি। কেন্দ্রপর্যায়ে নিয়োগকৃত কোর ট্রেইনারগণ উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। টিএলএম কর্মসূচির ক্ষেত্রে মাস্টার ট্রেইনারগণ সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং সুপারভাইজারগণ শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। অপরদিকে এনজিওদের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাস্টার ট্রেইনারগণ একই সাথে শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। এ সকল প্রশিক্ষণ সাধারণত NGO-দের ভেন্যু অথবা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রকল্পভিত্তিক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ছাড়াও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

১৬.৭ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষাকেন্দ্র পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও একাডেমিক সুপারভিশন

প্রতি ১৫টি কেন্দ্রের জন্য নিয়োগকৃত সুপারভাইজার নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন করে থাকে। মনিটরিং কাজে সহায়তা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত মনিটরিং এসোসিয়েটগণ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি নিয়মিত মনিটরিং করে থাকেন। এছাড়াও জেলা কো-অর্ডিনেটর এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে অবহিত করা হয় এবং কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অধিদপ্তরের মনিটরিং শাখার মাধ্যমে পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

১৬.৮ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় অধিদপ্তরের সকল শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন করা হয়। উপকরণ উন্নয়নকালে লক্ষ্যদলে চাহিদা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। উপকরণ উন্নয়নকালে এবং পরবর্তীতে উন্নীত উপকরণের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা যাচাই-এর জন্য উপকরণসমূহের মাঠ পরীক্ষা করা হয়। মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্ত এবং উপকরণ ব্যবহারকারীদের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে উপকরণসমূহের পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্প ১, ২, ৪-এর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য মৌলিক সাক্ষরতা শিক্ষা প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম (কারিকুলাম) অনুসারে অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত ও মুদ্রিত তিনটি প্রাইমার চেতনা-১, চেতনা-২ ও চেতনা-৩ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এই প্রাইমারসমূহ শিক্ষার্থীদেরকে পড়ানোর জন্য সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, শিক্ষক গাইড, ফ্লিপচার্ট, ক্লাস কার্ড ইত্যাদি অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত ও মুদ্রিত। এগুলো সুপারভাইজার ও শিক্ষকদের মধ্যে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। চেতনা ১, ২, ৩-এর রিভিশন কার্যক্রম অতি সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। এতে তিনটি প্রাইমারকে ২টিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এই প্রাইমার মুদ্রণ ও ব্যবহার করা হবে। বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রমে মৌলিক সাক্ষরতা পর্যায় অতিক্রম করার পর সাক্ষরতা-উত্তর পর্যায়ের জন্য কেন্দ্রসমূহে অধিদপ্তরের অথবা বিভিন্ন এনজিও-র সম্পূরক উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩ এর লক্ষ্যদলে বয়স ভিন্নতার কারণে পাঠ্যক্রমেরও ভিন্নতা রয়েছে। এ প্রকল্পে শিক্ষাকোর্সের মেয়াদ হচ্ছে ২ বছর যা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রতি পর্যায়ের মেয়াদ ৮ মাস। এ সময়ে ২টি করে প্রাইমার অর্থাৎ সম্পূর্ণ শিক্ষাকোর্সে মোট ৬টি প্রাইমার পড়ানো হয়ে থাকে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩-এ যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে :

প্রথম পর্যায়	:	কাজের ফাঁকে পড়ি-	১ম খণ্ড
		কাজের ফাঁকে পড়ি-	২য় খণ্ড
দ্বিতীয় পর্যায়	:	কাজের ফাঁকে পড়ি-	বাংলা (২য় পর্যায়)
		কাজের ফাঁকে পড়ি-	গণিত (২য় পর্যায়)
তৃতীয় পর্যায়	:	কাজের ফাঁকে পড়ি-	বাংলা (৩য় পর্যায়)
		কাজের ফাঁকে পড়ি-	গণিত (৩য় পর্যায়)।

উল্লিখিত প্রাইমারসমূহ, শিক্ষক সহায়িকা, তত্ত্বাবধায়ক ম্যানুয়াল, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত ও মুদ্রিত। এগুলো শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও অধিদপ্তরের এবং বিভিন্ন এনটিও-র সহজ ভাষায় সম্পূরক উপকরণ শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১৬.৯ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

অধিদপ্তরের সাক্ষরতা কর্মসূচিতে দু'ধরনের মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃমূল্যায়ন। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে চলমান ও সমাপনী মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষক/শিক্ষিকা হচ্ছেন কর্মসূচির মূল মূল্যায়ক। তিনি পাঠদানের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করছেন। এছাড়াও বয়স্কশিক্ষার শিক্ষার্থীদের প্রাইমারে প্রতি ৮টি পাঠের পর গুচ্ছ মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। এর পাশাপাশি কর্মসূচির শেষ পর্যায়ে সহযোগী বেসরকারি সংস্থার শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্ব স্ব কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের সমাপনী মূল্যায়ন করেন। অপরদিকে টিএলএম কর্মসূচিতে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা সাক্ষরতা সমিতি মূল সাক্ষরতা কার্যক্রম শেষে সমাপনী মূল্যায়ন করে থাকেন। মূল্যায়নকালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেন কোনরূপ পরীক্ষাভীতি কাজ না করে তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। এছাড়া অধিদপ্তরের প্রতিটি প্রকল্পের প্রকল্প-মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং মেয়াদশেষে চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত Terms of Reference (TOR)-এর ভিত্তিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়।

১৬.১০ গবেষণা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবিষয়ে গবেষণা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই। তবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন দেশে বাস্তবায়িত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সরেজমিনে পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিদেশে ভ্রমণ করে থাকেন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

১৬.১১ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যাদি

বিভিন্ন সমস্যার কারণে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

(ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা না থাকা;
(খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকা;
(গ) সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারা;
(ঘ) কর্মসূচি চলমান থাকার সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি;
(ঙ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব।

সুপারিশসমূহ :

দেশের বৃহৎ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করার পাশাপাশি তাদের অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগধর্মী করার লক্ষ্যে বর্ণিত সমস্যাদি নিরসন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিকে জোরালো করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

(ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা।
(খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপ-খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা।
(গ) সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
(ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলা।
(ঙ) কর্মসূচি পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা।
(চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিস্ট এনজিওদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং এজন্য একটি Regulatory Framework ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা।

মূল রচনা :
আজিজ আহমদ চৌধুরী ; এস. এম. হায়দার; ড: আনোয়ারুল আজিজ; প্রফেসর আনোয়ার আলী।

সূচিপত্র

মাধ্যমিক শিক্ষা : প্রথম অংশ

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
মাধ্যমিক শিক্ষা : সাধারণ চিত্র	৬৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন	৭০
তৃতীয় অধ্যায়	
পরিবেশ ও অবকাঠামোগত সমস্যা	৭৬
চতুর্থ অধ্যায়	
শিক্ষাক্রম	৭৮
পঞ্চম অধ্যায়	
শিক্ষক ও তাঁর সামাজিক অবস্থান	৯০
ষষ্ঠ অধ্যায়	
মাধ্যমিক শিক্ষা : শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৯৩

মাধ্যমিক শিক্ষা : দ্বিতীয় অংশ

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	৯৬

প্রথম অধ্যায়
মাধ্যমিক শিক্ষা : সাধারণ চিত্র

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশ যে ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, শিক্ষার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। দূর অতীতের সে শিক্ষাব্যবস্থা একান্তভাবেই স্থানীয় সমাজপ্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এ দেশে ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ়মূল হওয়ার পূর্বে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, উইলিয়াম এ্যাডাম প্রচলিত শিক্ষার উপর জরিপ চালিয়ে দেশীয় শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এ্যাডামের রিপোর্ট (১৮৩৫-৩৮) তথ্যনির্ভর হলেও এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশীয় সে শিক্ষাপ্রচেষ্টা সুব্যবস্থিত ও সুসংহত ছিল না। অধিকন্তু তা প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষাক্রম, শিখনসামগ্রী এবং অবকাঠামোগত দিক থেকে তা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাধীন ছিল না। ফলে বিভিন্ন বয়সী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে শিক্ষার স্তর পরম্পরায় যে শিক্ষাকাঠামো গড়ে ওঠে, দেশীয় শিক্ষার আয়োজনে তা অনুপস্থিত ছিল।

আজকের দিনে মাধ্যমিক শিক্ষা হিসেবে যে স্তরটিকে চিহ্নিত করা হয় তার সূচনা ঘটে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিদানের উদ্দেশ্যে একটি অভিজাত বশংবদ শ্রেণী গড়ে তোলার প্রয়োজনেই তা পরিকল্পিত হয়েছিল। সরকারি কাজে ইংরেজি জানা কর্মচারী তৈরিই ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাসম্পর্কিত বিভিন্নমুখী বিবেচনায় এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনায় উপরিবর্ণিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজন।

২. মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাসমূহ

মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা এখন দেশে প্রচলিত আছে। এগুলির মধ্যে এখানে কেবল সাধারণ শিক্ষার ধারা আলোচিত হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং ধর্মীয় শিক্ষার ধারা সম্পর্কে আলাদাভাবে প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। স্বভাবতই এগুলো এখানে আলোচনায় আসছে না। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ধারাটি-ও এখানে আলোচনা করা হচ্ছে না।

২.১ সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা

বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো নিম্নরূপ :

(ক) নিম্ন মাধ্যমিক ৩ বছর–ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী

(খ) মাধ্যমিক ২ বছর—নবম ও দশম শ্রেণী

(গ) উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর–একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী

উল্লেখ্য যে মাধ্যমিক পর্যায়ের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কেও অপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এজন্য এ সম্পর্কে এখানে কোন বিশদ আলোচনা করা হবে না।

নিম্নের সারণি থেকে বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, এ সব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি : মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের ধরন	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠান		শিক্ষক		ভর্তি	
		মোট	মহিলা	পুরুষ ও মহিলা	মহিলা	ছেলে ও মেয়ে	মেয়ে
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পাবলিক	-	-	-	-	-	-
	প্রাইভেট	৩২৪৫	৮৫৬	২১৩১১	৩৪৩০	৭৩২২৯৮	৪৩৯৪৩৭
	মোট	৩২৪৫	৮৫৬	২১৩১১	৩৪৩০	৭৩২২৯৮	৪৩৯৪৩৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পাবলিক	৩১৭	১৪৭	৬৯১৩	২৪১০	২২১২১৫	১০১৪৪৭
	প্রাইভেট	১২৬০৪	২০১৮	১৫৫০৫৩	২৪৫৩৬	৬৯৩৩৪৯৭	৬৩৫২২১৩
	মোট	১২৯২৬	২১৬৫	১৬১৯৬৬	২৬৭৬৬	৭১৫৪৭১২	৩৭৫৬৬৬০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপমোট	পাবলিক	৩১৭	১৪৭	৬৯১৩	২৪১০	২২১২১৫	১০১৪৪৭
	প্রাইভেট	১৫৮৪৯	২৮৭৪	১৭৬৩৬৪	২৭৭৮৬	৭৬৬৫৭৯৫	৪০৯৪৬৫০
	মোট	১৬১৬৬	৩০২১	১৮৩২৭৭	৩০১৯৬	৭৮৮৭০১০	৪১৯৬০৯৭
ইন্টারমিডিয়েট স্কুল ও কলেজ	পাবলিক	১১	৭	১৯১	৭২	৩৩২৬	২২৪১
	প্রাইভেট	১৪৭৪	৩০৯	২৭৬৫৪	৫৪৮৩	৩২৭৩৬০	১৬৫২৯৩
	মোট	১৪৮৫	৩১৬	২৭৬৫৪	৫৫৫৫	৩৩০৬৮৬	১৬৭৫৩৪

সূত্র: ব্যানবেইস, নভেম্বর, ২০০২

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রয়েছে। এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে চালু রয়েছে ভোকেশনাল কোর্স। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ২ বছর মেয়াদি এস.এস.সি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থাকে মানবদেহের সাথে তুলনা করলে প্রাথমিক শিক্ষাকে পদযুগল, মাধ্যমিক শিক্ষাকে মেরুদণ্ড এবং উচ্চ শিক্ষাকে মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। আর সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও উচ্চারিত বাগধারাটি হচ্ছে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। প্রকৃতপক্ষে মেরুদণ্ডটি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। অর্থনীতির গবেষকরা বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপক বিস্তার না হলে উন্নয়নের যাত্রাই শুরু হয় না অর্থাৎ তা প্রাথমিক ধাপেই প্রবেশ করে না। আর উন্নয়ন টেকসই বা স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজন মাধ্যমিক শিক্ষার। অর্থাৎ একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের জন্য মধ্যম শ্রেণীর জনশক্তিকে গড়ে তোলার কাজ করে মাধ্যমিক শিক্ষা।

৩. শিক্ষা প্রশাসন

বস্তুত শিক্ষার উন্নয়ন নির্ভর করে সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাঠামোর উপর। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত ভৌত অবকাঠামো, ভাল শিক্ষক এবং উন্নত শিক্ষা উপকরণ থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাঠামো যদি মজবুত ও দক্ষ না হয়, তাহলে সে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন আশা করা যায় না।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত শিক্ষাব্যবস্থার অধীন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা প্রশাসনের মূল কেন্দ্র হল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় তার অধীন দপ্তরগুলোর মাধ্যমে এ দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রণীত নীতিমালা এবং জারিকৃত সরকারি আদেশসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের। শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পদে আসীন। তাঁকে সহায়তার জন্য রয়েছেন সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মীবাহিনী।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ, মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিদপ্তর, ব্যানবেইস, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যাবলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

৪. শিক্ষার গুণগত মান

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বিচারের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য কমিশনের হাতে নেই। তবে বিভিন্ন বছরের পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করলে মান যে ক্রমাগত নিম্নগামী হচ্ছে তা অনুমান করা যায়। নিম্নে পাঁচ বছরের মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষার (এস.এস.সি) ফলাফলের তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো।

বৎসর	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		উত্তীর্ণ সংখ্যা		% পাশের হার	
	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা
১৯৯৯	৮৩৭২২০	৩৬২৮৭৫	৪৫৭২৫২	১৯৪৪৮৫	৫৪.৬২%	৫৩.৬০%
২০০২	১০০৫৯৩৭	৪৪১০২৪	৪০৮৯৬৯	১৬৬৩৩৯	৪০.৬৬%	৩৭.৭২%
২০০১	৭৮৬২২০	৩৩৪২৫৫	২৭৬৯০৩	১১২৮৬৮	৩৫.২২%	৩৩.৭৭%
২০০২	১০০৫৯৩৭	৪৪১০২৪	৪০৮৯৬৯	১৬৬৩৩৯	৪০.৬৬%	৩৭.৭২%
২০০৩	৯২১০২৪	৪০৯৬২৩	৩৩০৭৭৬	১৩৭৬৪০	৩৫.৯১%	৩৩.৬০%

স্পষ্টতই মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বিগত পাঁচ বছরের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে কয়েকটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সার্বিকভাবে ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক।

মাধ্যমিক শিক্ষার মানের এরূপ ক্রমাবনতি বুঝতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার :

১. শিক্ষা প্রশাসন;

২. ভৌত অবকাঠামো এবং পরিবেশ;

৩. শিক্ষাক্রম;

৪. শিক্ষক ও তাঁর সামাজিক অবস্থান;

৫. শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এ সব বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন

১. ভূমিকা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি প্রচলিত ধারা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, (১) সাধারণ শিক্ষা (২) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (৩) মাদ্রাসা শিক্ষা। উল্লিখিত তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তিনটি স্বতন্ত্র ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে মাধ্যমিক স্কুল, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুলের প্রায় শতকরা ৯৮টি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৬১৬৬টি এবং ছাত্রসংখ্যা ৭৮৮৭০১০। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই দশম শ্রেণী পর্যন্ত। বেশ কিছু সংখ্যক স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।

২. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ধাপে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা এবং সরকারি আদেশসমূহ বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে নিয়োজিত অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলো হলো :

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
(গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (৭টি)
(ঘ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

উল্লিখিত সংগঠনগুলো ছাড়াও রয়েছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডাইরেক্টরেট অব অডিট এন্ড ইন্সপেকশন এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী এর নির্বাহী প্রধান, তবে অর্থসংক্রান্ত বিষয়সমূহের নির্বাহী প্রধান মন্ত্রণালয়ের সচিব। একজন অতিরিক্ত সচিব, তিনজন যুগ্ম-সচিব, কয়েকজন উপসচিব ও কয়েকজন উর্ধ্বতন সহকারী সচিব, সহকারী সচিব এবং অন্যান্য সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবকে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন। সমস্ত নীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ যা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকর্তৃক নির্ধারিত রূপরেখায় বাস্তবায়িত হবে তাও শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে।

(খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধঃস্তন সংগঠনসমূহের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হলো বৃহত্তম নির্বাহী সংগঠন। মহাপরিচালক হলেন এই অধিদপ্তরের প্রধান। চারজন পরিচালক, কয়েকজন উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও অন্যান্য সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁর কার্যালয়ের কাজে সহায়তা করেন। এই অধিদপ্তরের কাজ হলো সরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পরিচালনা করা। এছাড়াও এ অধিদপ্তর বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহকে বিবিধ প্রকার মঞ্জুরিসহ তাদের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-অনুদানও প্রদান করে থাকে। অধিদপ্তরটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতি ও প্রদত্ত রূপরেখা অনুসারে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে। মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পও এই অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে। সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোকে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়।

(গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

দেশে ৭টি মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করছে। শিক্ষার্থী নিবন্ধীকরণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলপ্রকাশের কাজ বোর্ডগুলো করছে। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরের কোর্স খোলার অনুমতিও বোর্ডসমূহ দিয়ে থাকে। একাডেমিক তত্ত্বাবধান, শিক্ষকদের বিরোধ এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের কাজও বোর্ড করে থাকে।

(ঘ) **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড (এন.সি.টি.বি)**

এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হলো প্রথম শ্রেনী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যাবতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা। এই সংস্থা প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে নির্বাচিত এজেন্সীর মাধ্যমে তা দেশের সর্বত্র পৌছানোর ব্যবস্থা করে। চেয়ারম্যান হলেন এনসিটিবির প্রধান। তিনজন সদস্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড নির্বাহ করেন।

(ঙ) **বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)**

এই সংস্থার প্রধান কাজ হলো শিক্ষাসম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্য এজেন্সীকে সরবরাহ করা। শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় এ সকল তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সরকারি বেতন-অনুদান বিতরণের দায়িত্বও আগে এই প্রতিষ্ঠানের ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ দায়িত্ব শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে অর্পণ করা হয়েছে।

(চ) **স্কুল ম্যানেজিং কমিটি**

দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলো স্থানীয় পর্যায়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত। ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট এই ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা।

(ছ) **জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)**

বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ, মাদ্রাসা, সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসক/ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা অর্জনে সহায়তাদান এই একাডেমীর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এছাড়া এই একাডেমীতে বি.সি.এস (শিক্ষা) কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা এই একাডেমীর অন্যতম আর একটি দায়িত্ব। মহাপরিচালক এই একাডেমীর প্রধান। তাঁকে সহায়তা করেন পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

(জ) **উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এইচ.এস.টি.টি আই)**

এ প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে পাঁচটি এইচ.এস.টি.টি.আই সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালিত হচ্ছে। এর আগে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের জন্য নায়েমে এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে নায়েমের তত্ত্বাবধানে উক্ত এইচ.এস.টি.টি.আইগুলোতে বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসন এবং শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

(ঝ) **শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর**

এটি একটি প্রকৌশল সংস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রকার পূর্তকার্য সম্পাদন এবং বিভিন্ন ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ এর প্রধান কাজ। একজন প্রধান প্রকৌশলীর অধীনে কয়েকটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা অধিদপ্তরভুক্ত সকল কার্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনও এই অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত হয়।

(ঞ) **অডিট ও ইন্সপেকশন অধিদপ্তর**

বেসরকারি মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি বিশেষ করে আর্থিক লেনদেনের হিসাব নিরীক্ষা করা এই অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। এই অধিদপ্তরের সদস্যবৃন্দ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-অনুদান যথাযথভাবে বণ্টিত হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করে থাকেন। পরিচালক এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান।

(ট) **আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিস**

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা পর্যায়ের অফিসে নিয়োজিত জেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারগণই প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে জেলায় অবস্থিত সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়াও আঞ্চলিক উপপরিচালক অফিসের উপপরিচালক, স্কুল পরিদর্শক, স্কুল পরিদর্শিকা, সহকারী স্কুল পরিদর্শক ও সহকারী স্কুল পরিদর্শিকাগণও

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক, উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক পদে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণও বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

৩. **প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম পর্যালোচনা**

ক. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম যেমন– শিক্ষক বদলি, নিয়োগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এম.পি.ও ভুক্তি প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এ সব প্রশাসনিক কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে তাঁরা পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করার সময় প্রায় পান না বললেই চলে। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সংখ্যা মাত্র ২০৮। এত অল্পসংখ্যক কর্মকর্তার পক্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৬১৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্‌রাসা ও কলেজ পর্যায়ের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এত অধিকসংখ্যক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ঘাটতি থেকে যায়। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনের জন্য প্রতিটি অঞ্চলে একটি পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শকের পদ রয়েছে তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা নগণ্য।

খ. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহ পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা ও স্বীকৃতি প্রদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে। বোর্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক রয়েছে। কিন্তু তারা শুধু স্বীকৃতিসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন, প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না। এছাড়াও বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মচারীর বোর্ডের কার্যক্রমে অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে প্রশাসনিক কাজে জটিলতা সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, পরিদর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থাকার ফলে বোর্ডের মূল দায়িত্ব অর্থাৎ পরীক্ষাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না।

গ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ অভিযোগের তদন্ত করে থাকে। কিন্তু তাদের পরিদর্শন অর্থসংক্রান্ত কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়া উক্ত পরিদপ্তর কর্তৃক আর্থিক নিরীক্ষণের বিষয়টির স্বচ্ছতা সম্পর্কে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন। পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত কোন কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়।

ঘ. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ডসমূহ, পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ পরিদপ্তর, ব্যানবেইস প্রভৃতি সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঙ. দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলো স্থানীয়ভাবে ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নিরপেক্ষতার অভাবে যোগ্য প্রার্থী শিক্ষকতায় নিয়োগ পান না। এছাড়াও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, আর্থিক অনিয়ম, রাজনৈতিক দলীয়করণ প্রভৃতি বিষয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষক নিয়োগ, একাডেমিক কর্মকাণ্ড, ছাত্রভর্তি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে স্কুলের প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। অপরদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন বিষয়ে এস.এম.সি-এর অধিকাংশ সদস্য উদাসীন থাকেন এমন কথা প্রায়শ শোনা যায়।

চ. জাতীয় শিক্ষাক্রম বোর্ডের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন কলেজ থেকে বদলি হয়ে আসেন। এদের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য যথার্থ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না। জাতীয় শিক্ষাক্রম বোর্ড থেকে প্রতি বছর প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয় না। ফলে বিপুলসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক পাইরেসির মাধ্যমে বাজারজাত করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ছ. আঞ্চলিক কার্যালয় ও জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের মধ্যেও যোগাযোগের অভাব ও সমন্বয়হীনতা রয়েছে।

জ. বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনার জন্য থানা পর্যায়ে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য থানা প্রজেক্ট অফিসার রয়েছে। এজন্য থানা পর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে।

ঝ. সরকারি-বেসরকারি এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষাক্রম, শিক্ষকদের বেতনকাঠামো প্রভৃতিতেও বৈষম্য রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যালোচনায় যে সব বিষয় বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ :

১. প্রশাসন অযৌক্তিকভাবে মাথাভারী।

২. এ সব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। স্বভাবতই এর ফলে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা প্রকাশ পাচ্ছে।

৩. জবাবদিহিতার অভাব থাকায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে, যা শিক্ষার গুণগত মানের উপর প্রভাব ফেলছে।

৪. কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন প্রশাসন প্রভাবশালী মহলের কাছে নতি স্বীকার করছে, তেমনি আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

মাথাভারী ও সমন্বয়হীন প্রশাসন মাঠ পর্যায়ে কী ধরনের অযৌক্তিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে তার দুই একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঢাকা শহরেই একটি স্কুলে অংকনের চারজন শিক্ষক আছেন, অথচ অপর একটি স্কুলে রয়েছেন মাত্র একজন। সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক একটিতে রয়েছেন চারজন, অন্য এক স্কুলে একজনও নেই। এও দেখা যাচ্ছে যে একটি স্কুলের তিনজন ইংরেজি শিক্ষকের মধ্যে কারও মূল ডিগ্রি ইংরেজিতে নয়—স্নাতক পর্যায়েও তাদের ইংরেজি ছিল না। এরা অবশ্য নিয়োগ লাভের পর ইংরেজিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এ উদাহরণগুলি সবই সরকারি স্কুলের এবং এগুলি ঢাকা শহরে অবস্থিত। আমাদের সীমিত মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়ই পরিচয় বহন করে না এ সব।

সামগ্রিক বিবেচনায় কমিশনের মত হচ্ছে এই যে প্রশাসনের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) যেমন বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বের পুনর্বন্টন। এ উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করছে।

৪. সুপারিশ

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দায়িত্ব ব্যতিরেকে অন্যান্য দায়িত্ব অধঃস্তন সংগঠনগুলির কাছে হস্তান্তর করবে :

ক. নীতি নির্ধারণ;

খ. অধঃস্তন সংগঠনগুলির বাজেট অনুমোদন ও অর্থবন্টন;

গ. কোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংগঠন (authority) কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা ক্ষুব্ধ হলে সে বিষয়ে আপিল গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত দান।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করা কাম্য। উচ্চ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াদি অন্য অধিদপ্তর গঠন করে সেখানে ন্যস্ত করা যেতে পারে।

(৩) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব বোর্ড রয়েছে সেগুলোকে পরিদর্শন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতিদান, নবায়ন প্রভৃতি যাবতীয় কার্যাবলি থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। পরীক্ষাসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা বোর্ডের একমাত্র দায়িত্ব থাকবে।

(৪) জাতীয় শিক্ষাক্রম বোর্ড (এন.সি.টি.বি) কেবলমাত্র শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং শিক্ষাক্রম অনুযায়ী উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যাতে প্রতিটি বিষয়ের একাধিক পুস্তক প্রণীত হতে পারে তা দেখাশোনা করার দায়িত্ব পালন করবে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ এবং সে সব বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে বেসরকারি প্রকাশকদের দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ এবং বাজারজাতকরণে অস্বচ্ছতার যে সব অভিযোগ পাওয়া যায় তা দূরীভূত হবে।

পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক রচনা স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নতকরণে অত্যন্ত পুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এ সব কাজে যাতে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিয়োজিত হন সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনকে বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে ৯টি অঞ্চলে ৯টি উপপরিচালকের কার্যালয় রয়েছে। কিন্তু উপপরিচালকের কর্মপরিধি, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সীমিত। ৯টি আঞ্চলিক অফিসের আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করে জনবল কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। সেজন্য ৯টি অঞ্চলে পরিচালকের (মাধ্যমিক) পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। আঞ্চলিক পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতিদান, স্বীকৃতি নবায়ন, ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন ছাড়াও নিজ নিজ এলাকায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি, পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া আপিল ও আরবিট্রেশন কমিটি গঠন করে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিরোধ ও অপরাধ নিরসনের দায়িত্ব পালন করতে পারে আঞ্চলিক কার্যালয়।

(৬) উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটি এস.এম.সি-র কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার এম.পি-কে প্রধান করে কমিটি গঠন করে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে চলছে কিনা তা দেখাশোনা (oversee) করার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

(৭) একাডেমিক পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণকে শক্তিশালী করার জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ তাদের পরিদর্শন, প্রতিবেদন ও পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য অন্ততপক্ষে তিন মাসে একবার আঞ্চলিক পরিচালকের সাথে আলোচনায় বসবেন।

(৮) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(৯) জেলা শিক্ষা অফিসারকে উপপরিচালকের মর্যাদা দেওয়া সমীচীন হবে।

(১০) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক, আর্থিক ও একাডেমিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ২৫-৩০ সদস্যের সমন্বয়ে একটি শিক্ষাকমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পার্লামেন্টে পেশ করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এ কমিটির প্রধান হবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। এর সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন বেসরকারি শিক্ষাবিদকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(১১) পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ পরিদপ্তরের জনবল কাঠামো পরিবর্তন করে পদ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কর্মবিভাজন নীতি থাকা দরকার।

(১২) বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে জেলা শিক্ষাকমিটি গঠন করা যেতে পারে।

(১৩) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্য পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(১৪) কম্পিউটারাইজড নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিচালকের দপ্তরকে জেলা শিক্ষা অফিস ও অধিদপ্তরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। আঞ্চলিক কার্যালয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কার্যালয়ের তথ্যলাভের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এতে থানা, জেলা ও বিভাগের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পরীক্ষার ফলাফল, প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উক্ত নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৫) প্রত্যেক উপজেলায় সরকারি উদ্যোগে আগামী ১০ বছরের মধ্যে কমপক্ষে একটি আদর্শ স্কুল (Model School) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(১৬) স্কুলম্যাপিং-এর মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রয়োজন যাচাইপূর্বক এলাকা চিহ্নিত করে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে কমপক্ষে ২৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

(১৭) শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম রোধের লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন করা অত্যাবশ্যক।

(১৮) বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

(১৯) শিক্ষকদের ক্যারিয়ার উন্নয়নের পথ খোলা রাখতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মসম্পাদন দক্ষতার মাধমে তাঁরা যেন উচ্চতর পদে উন্নীত এবং নিয়োগ পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দ যাতে পর্যায়ক্রমে সিনিয়র শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে এবং পরিচালক পদেও নিয়োগের সুযোগ পেতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(২০) প্রধান শিক্ষক জেলা শিক্ষা অফিসারের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের কর্মসম্পাদনে দক্ষতাবিষয়ক মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করতে পারেন। বছরে একবার এ আলোচনা সভার আয়োজন করা কাম্য।

(২১) শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো থাকতে হবে।

(২২) মাধ্যমিক স্কুলে ৭৫% প্রধান শিক্ষক সরাসরি নিয়োগ দিতে হবে। বাকী ২৫% প্রমোশনের মাধ্যমে নিয়োজিত হতে পারেন।

(২৩) সব সমাজে শিক্ষকরা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। নিজেদের এই ভাবমূর্তি উজ্জল রাখার জন্য পেশাগত নীতি (Professional ethics) মেনে চলা প্রয়োজন। এ জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের আত্মমূল্যায়ন এবং আত্মসমীক্ষার জন্য নিজেদের সচেষ্ট হতে হবে।

(২৪) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের সম্মুখে অধিক সংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১:৪০-এ নামিয়ে আনতে হবে।

(২৫) কোচিং সেন্টার ও নোট বই নিষিদ্ধ করতে হবে।

(২৬) প্রধান শিক্ষকের অনুমতিক্রমে কোন শিক্ষক সপ্তাহে সর্বোচ্চ ছয় ঘন্টা পর্যন্ত প্রাইভেট টিউশন দিতে পারেন। এমন টিউশন কেবলমাত্র স্কুলপ্রাঙ্গনেই দেওয়া যাবে, অন্য কোথাও নয়।

(২৭) জাতীয় শিক্ষাক্রম বোর্ডে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের শিক্ষাক্রম বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকৃত পদগুলো বদলিযোগ্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সংযোজন সংখ্যা
2170

তৃতীয় অধ্যায়
পরিবেশ ও অবকাঠামোগত সমস্যা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় সবক্ষেত্রেই অবকাঠামোগত দুর্বলতা, সঠিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, সম্পদের অপচয় ইত্যাদি যেন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এ সবের ফলে শিক্ষার মান দিন দিন অবনতির দিকে। এ বিষয়ে কমিশনের পর্যালোচনা ও সুপারিশ নিম্নে বিধৃত করা হলো।

ক. অবকাঠামোগত সমস্যা

১. বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের জন্য কক্ষ ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে উপজেলা এবং প্রত্যন্ত এলাকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ নেই।

২. গ্রামাঞ্চলের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি এবং ল্যাবরেটরির অভাব রয়েছে। সারাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৬১৬৬। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ৮৮৫০ টিতে ল্যাবরেটরি রয়েছে, গ্রন্থাগার রয়েছে ৭৮০৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (ব্যানবেইজ জরিপ ২০০১)। কোন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার জন্য কোন পদ সৃষ্টি করা হয় নি।

৩. অনেক মাধ্যমিক স্কুলে সুপরিসর খেলার মাঠ নেই। অপ্রতুল শ্রেণীকক্ষগুলির অপরিসর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ শিক্ষার্থীদের যথার্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপযোগী নয়।

খ. যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষকের অভাব

১. স্কুলের প্রধান শিক্ষককে একাধারে প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, নেতা প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়। মাধ্যমিক স্কুলগুলোর সুষ্ঠু উন্নয়ন ও প্রশাসন যোগ্য প্রধান শিক্ষকের উপর নির্ভর করছে। কিন্তু স্কুলে অনেক ক্ষেত্রে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দক্ষ ও যোগ্য প্রধান শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

২. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব রয়েছে প্রায় প্রত্যেকটি সরকারি-বেসরকারি স্কুলে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বর্তমানে ইংরেজি, অংক ও বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোতেও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। ফলে বিষয়ভিত্তিক যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় শিক্ষার্থীরা যথার্থ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মূলত এ কারণে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে।

৩. দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। অনেক বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের জন্য শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠু পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

গ. সম্পদের অপচয়

একদিকে সম্পদের অপ্রতুলতা আর অন্যদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের সর্বত্র সম্পদের অপচয় আজ চরম মাত্রায় বিরাজমান। শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা এবং সচেতন জনগোষ্ঠী মাত্রই অভিযোগ করেন যে শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অডিট এবং ইন্সপেকশন অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড সহ প্রত্যেকটি শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সংগঠনে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনৈতিক আচরণের কারণে বিপুল অংকের সরকারি অর্থের অপচয় ঘটছে। সরকারি অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার ও অবৈধ আত্মসাতের ফলে উচ্চ শিক্ষার মেরুদণ্ড হিসেবে স্বীকৃত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরটিতে অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে। আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়, জেলা শিক্ষা কার্যালয়, এমনকি স্কুল পর্যায়েও আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে বলে প্রায়শ বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ওঠে।

ঘ. সুপারিশ

গ্রন্থাগার

১. প্রত্যেক মাধ্যমিক স্কুলে গ্রন্থাগার থাকতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক রেফারেন্স বই এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই, ম্যাগাজিন এবং পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২. মাধ্যমিক স্কুলে গ্রন্থাগারের আয়তন এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠকক্ষে অনুকূল পরিবেশে পাঠাভ্যাসের সুযোগ পায়।

৩. প্রত্যেক গ্রন্থাগারের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারে পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের বিষয়টি শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গবেষণাগার

১. গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের অভাবে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম যতদ্রুত সম্ভব সরবরাহ করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন বিজ্ঞান শিক্ষাকে অর্থবহ করে তুলবে। এ বিষয়ে শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞদের কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

২. গ্রাম ও শহরের প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার থাকতে হবে। সরকারকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১. শিক্ষকতা পেশায় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য চাকুরি পূর্বকালীন এবং চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের মাধ্যমে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক গড়ে তুলতে হবে।

৪. প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোতে প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এগুলিকে ডাবল শিফটে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

৬. দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রত্যেকটিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ খুলতে হবে এবং এগুলির সাথে শিক্ষা সম্পর্কীয় যাবতীয় গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রত্যেকটিতে শিক্ষকদের জন্য গ্রীষ্মকালীন সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি সংগঠনের কর্মকর্তাদের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি বিপুল অর্থের অপচয় রোধকল্পে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা উপজেলা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে (যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে) পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে পারলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রতিটি সংগঠনের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষাক্রম

১. ভূমিকা

শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও ডিগ্রি শিক্ষা পূর্ববর্তী স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। যে কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তরের পূর্ব প্রান্তে বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা, এবং উত্তর প্রান্তে উচ্চ শিক্ষা। এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড বলা হয়।

মাধ্যমিক স্তরে সাধারণত ১০/১১ থেকে ১৬/১৭ বছর বয়:ক্রমের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে। মনোবিজ্ঞানে এই বয়:ক্রমকে বয়:সন্ধিকাল বা কৈশোর বলে। এই সময়েই কিশোরদের দ্রুত শারীরিক ও মানসিক বর্ধন ও বিকাশ ঘটে। এ কারণে এই স্তরকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিক্ষা সংস্কার করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত তৈরি করতে পারে, তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়, তারা সমাজ ও দেশের জন্য সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। এ সংস্কারের মূল ও অপরিহার্য উপাদান একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম।

২. মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইউনেস্কো মৌলিক শিক্ষার চারটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। লক্ষ্য চারটি হল :

- শিখতে শেখা (Learning to learn)
- করতে শেখা (Learning to do)
- সামাজিক পরিবেশে বাস করতে শেখা (Learning to live together) এবং
- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করা (Learning to be)

উপর্যুক্ত লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে দেশের সাংস্কৃতিক ও সামগ্রিক পরিবেশ এবং আধুনিক যুগের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে, আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি নিম্নলিখিত ভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে :

১. প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করে শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২. শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

৩. সুষম সামাজিক ও নাগরিক বিকাশের জন্য ভাষা. গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা।

৪. শিক্ষার্থীকে নিজ মেধা, প্রবণতা ও সৃজনশীলতা অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা এবং সৃজনশীলতাকে সচেতনভাবে লালনের ব্যবস্থা করা।

৫. শিক্ষাকে জীবন ও কর্মমুখী করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।

৬. শিক্ষায় মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তা ও জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো।

৭. দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মানের সৎ, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।

৮. মানবিক জীবনের আনন্দ উপভোগ করার জন্য সাংস্কৃতিক, মানবিক, শারীরিক ও সৌন্দর্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করা।

৯. আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আধুনিক যুগের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দেশ-বিদেশের ও মানব সভ্যতার ইতিহাস, দেশ-বিদেশের ভূগোল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি সম্পর্কে কার্যকর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন।

৩. শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাক্রমের উপাদান

শিক্ষার্থীদের আচার-ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে যথাযথ শিখন অভিজ্ঞতা দেবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপরিকল্পিত, সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত কর্মকাণ্ডের পর্যায়ক্রমকে শিক্ষাক্রম বলে। এক কথায় শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত শিক্ষা কার্যক্রমই শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা লাভের জন্য আমরা নিচের সংজ্ঞা এবং বর্ণনা দেখতে পারি।

জনশক্তি একটি দেশের বা রাষ্ট্রের অন্যতম মূল্যবান উপাদান। মানুষকে শক্তিতে বা সম্পদে রূপান্তর করার পদ্ধতিই হল শিক্ষা আদান-প্রদান প্রক্রিয়া। একজন ব্যক্তির বা পরিবারের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বা ভালবাসার উপাদান হল তার সন্তান বা সন্তানেরা। মানুষের সন্তানেরা কিন্তু সম্পদ হয়ে জন্মায় না, মানুষের সন্তানকে সম্পদশালী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া হল তাকে শিক্ষাদান করা। রাষ্ট্রের এ মূল্যবান উপাদানকে, অথবা ব্যক্তি বা পরিবারের সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রকে সম্পদে রূপান্তর করার যে পরিকল্পনা তাকেই বলা হয় শিক্ষাক্রম। অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা হল শিক্ষাক্রম। কাজেই শিক্ষাক্রমের পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকরী সংজ্ঞা এবং বর্ণনায় অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হতে হবে :

একটি জাতির স্বপ্ন;

তার আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য;

একটি কর্ম-পরিকল্পনা;

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি;

সৃজনশীলতা ও উৎপাদন ফল;

জীবনভিত্তিক বাস্তবতা; এবং

একটি জাতির আদর্শ এবং শিক্ষার মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি।

একটি স্তরে শিক্ষাক্রম হল একটি জাতি কী মূল্যবান মনে করে, কী চায়, তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কী হস্তান্তর করতে চায়, কী নবায়ন করতে চায় তার বর্ণনা। শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে নানাভাবে জাতি তার বাছাই-যাচাই করে। সংসদে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে, আইন প্রণয়ন দ্বারা, শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে অথবা মূল্য যাচাই পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে।

অন্য স্তরে শিক্ষাক্রম ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবতা। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, স্বপ্ন, আদর্শ রূপায়নের জন্য শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরিমণ্ডল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে। এ সব হচ্ছে স্কুল, শ্রেণীকক্ষ, গৃহ ও সামাজিক পরিপার্শ্ব। এ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর, শিক্ষার্থীর ও শিক্ষার্থীর, শিক্ষা উপকরণের ও শিক্ষার্থীর, শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর, সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর অনবরত ক্রিয়া, প্রক্রিয়া, আদানপ্রদান, গ্রহণ ও বর্জন। শিক্ষার্থী শুনে শিখছে, পড়ে শিখছে, লিখে শিখছে, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে শিখছে, বিশ্লেষণ করে শিখছে, মূল্যায়ন করে শিখছে। শিক্ষার্থী তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সমাগ্রিকভাবে নিজের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে কাম্য সম্পদে ও যোগ্যতায় রূপান্তর করছে।

শিক্ষাক্রমের উপাদান শিক্ষার্থী ও শিক্ষকভেদে পরিবর্তন হয়। যেমন একজন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাক্রমের উপাদান পাঠ্যপুস্তক, বাড়ির কাজ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, অঙ্কন, মডেল তৈরি, ল্যাবরেটরির কাজ ইত্যাদি। এ সব বিষয় শিক্ষাদান ও শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাসহ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন সহ শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। যেমন, খেলাধুলা, নাটক মঞ্চস্থ করা, বির্তক সভা অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান, গণিত ও কুইজ ক্লাব প্রভৃতি। এ সবই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের উপাদান হিসাবে বিবেচিত। নিচের চিত্র থেকে শিক্ষাক্রমের মুখ্য চারটি উপাদান, যথা উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়নের ধারণা পাওয়া যাবে।

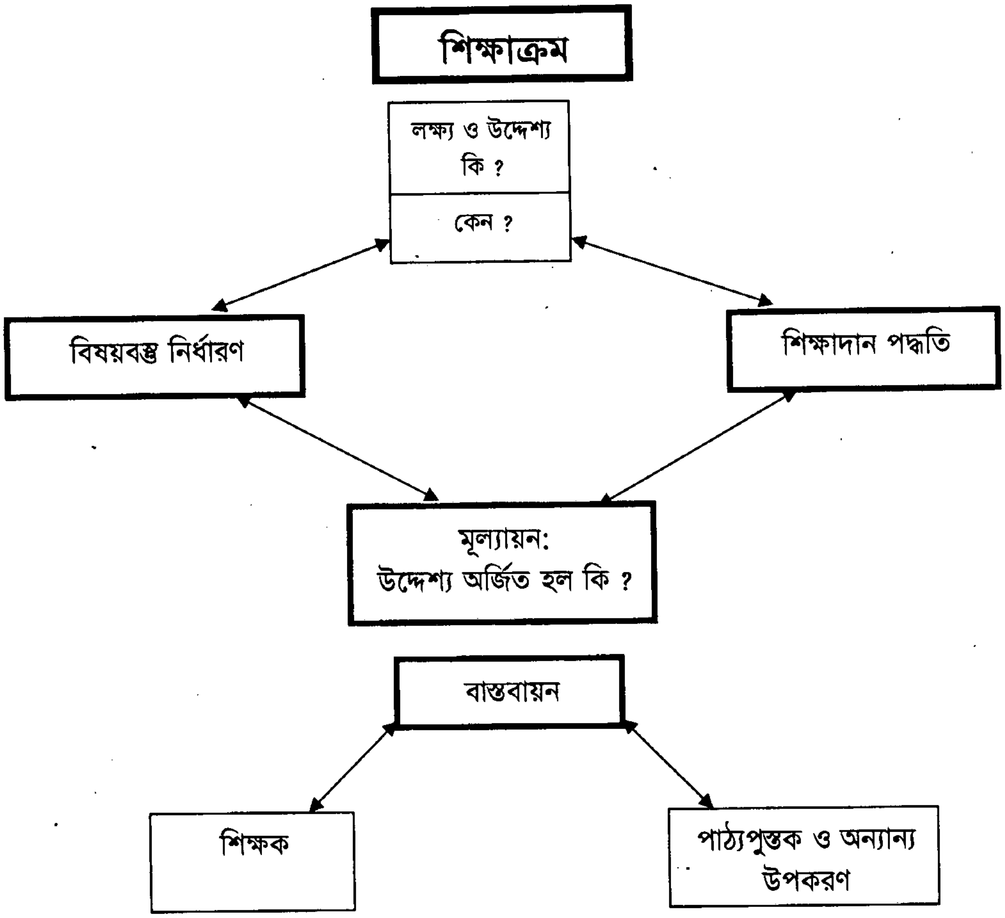

৪. মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো

বর্তমানে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো ৩+২+২ বছরে বিন্যস্ত। প্রথম তিন বছর অর্থাৎ ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণী নিম্ন-মাধ্যমিক, নবম-দশম শ্রেণী মাধ্যমিক এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চ মাধ্যমিক। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনায় এ স্তর বয়ঃসন্ধিকালের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ সময়ে তারা শিক্ষকের নিয়মিত নির্দেশনা ও সহায়তা কামনা করে। এতদ্ব্যতীত প্রশাসনিক এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিও এ স্তরের জন্য প্রাথমিক বা উচ্চ শিক্ষা থেকে পৃথক। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পদ্ধতিতে কিছুটা বেশি হারে দলগত কাজ, শ্রেণীর কাজ, বাড়ির কাজ, অর্পিত কাজ, শ্রেণী অভীক্ষা ব্যবহার করতে হয়, যা উচ্চ শিক্ষায় প্রয়োগ বা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষা পরামর্শকদের অধিকতর সাহায্য-সহযোগিতা এবং তদারকি প্রয়োজন। এসব বিষয় বিবেচনা করেই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরকে মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে সমন্বিত করে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় বিবেচনা করে মাধ্যমিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি।

তাছাড়া আমাদের দেশের শিক্ষার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে, দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো রাতারাতি পরিবর্তনের কথা বিবেচনা না করে শিক্ষাক্রমকে একমুখী করার কথা বিবেচনা করা বাস্তবসম্মত বলে আমরা মনে করি।

দেশে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যে সকল বিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলো দশম শ্রেণী পর্যন্তই থাকতে পারে, তবে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা এবং আর্থসামাজিক পরিবেশ এবং সামর্থ্য অনুসারে সে সকল বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উন্নীত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। অবশ্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাক্রম একমুখী হবে। এছাড়া প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শরীরচর্চার জন্য জিমন্যাসিয়াম এবং খেলার মাঠ থাকবে এবং জীবনভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের জন্য একটি ওয়ার্কশপ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছবি আঁকা এবং সঙ্গীত শেখার ব্যবস্থাও থাকবে।

৫. মাধ্যমিক শিক্ষার ধারা

এ কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি শিক্ষা উপব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এগুলি হচ্ছে :

সাধারণ শিক্ষা,

ভোকেশনাল শিক্ষা এবং

মাদ্রাসা শিক্ষা।

আবার সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থায় রয়েছে তিনটি শাখা : মানবিক, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা।

বাংলাদেশে বহুমুখী কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয় পকিস্তান আমলে। এদেশে বহুমুখী কার্যক্রম চালু হওয়ার প্রধান কারণ ছিল মাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা। কিন্তু বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দিয়েছে। যেমন :

(ক) বহুমুখী শিক্ষাক্রম কার্যকরি করার জন্য যে ধরনের বিশেষজ্ঞশিক্ষক স্কুল স্তরে সরবরাহ করা প্রয়োজন, দেশে সে ধরনের শিক্ষক প্রস্তুত ও যোগান দেওয়া হয় নি। দেশের বর্তমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো এযাবৎকাল বিভিন্ন কারণে এ বিষয়ে সফল ভূমিকা পালন করতে পারে নি।

(খ) বহুমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন গ্রামীণ স্কুলগুলোতে এখনো সম্ভব হয় নি এবং অনেক স্কুলে কেবল মানবিক এবং বাণিজ্যিক শাখা রয়েছে, অথচ বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, যা অত্যাবশক।

(গ) কার্যত গ্রামীণ স্কুলগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি করছে এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে আর্থসামাজিক অসমতা ও ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ঘ) এদেশের শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

(ঙ) বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুসারে একদিকে শিক্ষার্থীদের যেমন মাতৃভাষা, ইংরেজি ও বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে না, তেমনি আধুনিক মানুষ হিসাবে সাধারণ জীবন-যাপনের জন্য ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

(চ) মাধ্যমিক শিক্ষার মান হ্রাস পাওয়ার ফলে, উচ্চ শিক্ষার মানও নিম্নগামী হয়েছে। ফলে দেশে উচ্চ মেধা ও দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তির সরবরাহ হতাশাজনক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। মেধার ক্ষেত্রে দেশ পরনির্ভরশীল হয়ে উঠছে এবং সর্বক্ষেত্রে বিদেশি পরামর্শকদের অতিশয় উচ্চ বেতনে নিয়োগদান করতে হচ্ছে।

(ছ) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীগণের দৃষ্টিভঙ্গি অতিমাত্রায় সঙ্কীর্ণ এবং তা আধুনিক, আন্তর্জাতিক ও ব্যাপকভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী হয়ে গড়ে উঠছে, ফলে দেশে বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের ভূমিকা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

এ সব কারণে কমিশনের বিবেচনায় সাধারণ শিক্ষাক্রমে একমুখী ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এরূপ শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি এবং গণিত ও বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে উন্নত দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানিতে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় একটি বিষয় উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের কেবল দ্রুত শারীরিক বিকাশই ঘটে না, তাদের মানসিক বিকাশও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের মানসিক বিকাশ উচ্চতম শিখরে অর্থাৎ বিমূর্ত চিন্তার স্তরে (Formal operational stage) পৌঁছে। সম্ভবত এই সব দিক চিন্তা করে প্লেটোর শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল : Grammatic for the mind, gymnastic for the body and music for the soul. প্লেটোর মতে এই তিন ধরনের শিক্ষার অর্থাৎ মননশীল বিকাশের জন্য যৌক্তিকতা, শারীরিক বিকাশের জন্য শরীরচর্চা ও খেলাধুলা এবং আবেগিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সঙ্গীতচর্চার যথাযথ ভারসাম্য রক্ষিত হলে শিক্ষার্থীর জীবনও সঙ্গীতের মত মধুময় এবং আনন্দময় হয়ে উঠবে।

৬. সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরভেদে পাঠ্যবিষয়

নিম্নমাধ্যমিক স্তর

শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক পরিনমন ও চাহিদা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ট-৮ম) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নিম্নরূপ সুপারিশ করা হচ্ছে :

ক্রমিক নং	বিষয়সমূহ	পূর্ণ নম্বর
১	বাংলা	২০০
২	ইংরেজি	২০০
৩	গণিত	১০০
৪	সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
৫	কম্পিউটার শিক্ষা	৫০
৬	ধর্মশিক্ষা	১০০
৭	সামাজিক বিজ্ঞান (ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ)	২০০
৮	শারীরিক শিক্ষা	৫০
৯	চারু ও কারুকলা	
১০	সঙ্গীত	

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এখন প্রবলভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। বিদ্যুৎ, ক্যালকুলেটর, মোবাইল টেলিফোন এখন গ্রামের আনাচে-কানাচে পৌঁছে গেছে। অতএব বিদ্যুৎ, ক্যালকুলেটর, মোবাইল টেলিফোন ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য যে সব ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন হয় তা এই স্তরের শিক্ষার্থীদের শেখানো আবশ্যক।

শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত, সামাজিক জীবন যাপনের দক্ষতা, ব্যবহারিক কর্মদক্ষতা (ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস) ইত্যাদি শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ে সময় ও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক স্কুলে সপ্তাহে ৫দিন নিয়মিত ক্লাশ হবে। বাকি দুই দিন বিশেষ কাজ ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। যেমন খেলাধুলা, ওয়াজ মহফিল, মিলাদ, জন্মদিন-উদযাপন, ল্যাবরেটরি ওয়ার্কশপে বিশেষ ক্লাশ, গল্প বলা ও গল্প পাঠ ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে আঞ্চলিক এবং শহর ও গ্রামের চাহিদা অনুসারে কিছু কিছু সাধারণ দক্ষতা শেখানোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ গ্রামে কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যচাষ সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং শহর অঞ্চলে ব্যবসা ও বাণিজ্য বিষয়ে এবং গৃহসজ্জা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অঞ্চলভেদে বাঁশের কাজ, কাঠের কাজ, বেতের কাজও শেখান যেতে পারে।

যে সব বিষয়ে পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগদান সম্ভব নয়, সে সকল বিষয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক স্তর : (নবম -দশম শ্রেণী)

মাধ্যমিক স্তর (নবম-দশম শ্রেণী)-এর পাঠ্যবিষয় নিম্নবর্ণিতভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	বিষয়সমূহ	পূর্ণ নম্বর
১	বাংলা	২০০
২	ইংরেজি	২০০
৩	গণিত	১০০
৪	বিজ্ঞান	
	জড় বিজ্ঞান-১০০ জীব বিজ্ঞান-১০০	২০০
৫	কম্পিউটার বিজ্ঞান	১০০
৬	ভূগোল	৫০
৭	ইতিহাস	৫০
৮	ধর্ম	১০০

বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান মূল বিষয় (core s ubject) হিসাবে বিবেচিত হবে। এ সব বিষয় সমমানের মাদ্‌রাসা এবং কারিগরি শিক্ষাধারায়ও চালু করতে হবে।

ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ

বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধার সাথে সঙ্গতি রেখে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে যে কোন একটি (পূর্ণমান ১০০) ছাত্র-ছাত্রীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে পারে।

১. দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস

২. উচ্চতর গণিত

৩. অর্থনীতি ও পৌরনীতি

৪. ব্যবসায়পদ্ধতি ও বাণিজ্যনীতি

৫. নীতিবিদ্যা

৬. কৃষিবিজ্ঞান

৭. পশুপালন ও মৎসচাষ

৮. স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টি

৯. আরবি/সংস্কৃত/পালি

১০. ইংরেজি ব্যতীত অপর একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা।

এছাড়া খেলাধুলা, গানবাজনা, অঙ্কন প্রভৃতি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন আবশ্যক, তবে কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হবে না। কমিশন আশা করে যে আগামী তিন বছরের মধ্যে সকল বিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান চালুর ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি বিদ্যালয় তো বটেই, এ বিষয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ের চাহিদা মেটাতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষা কমিশন লক্ষ্য করছে যে শিক্ষকের অভাবে অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্ম শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত মানের হচ্ছে না। অন্যদিকে যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকলে অনেক বিদ্যালয়ে ঐ সব ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় এ সব ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরা ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি বিষয় পড়তে পারবে। অবকাঠামোগত সমস্যার জন্য যে সব স্কুল কম্পিউটার বিজ্ঞানে পাঠদান করতে সক্ষম হবে না সে সব স্কুলের শিক্ষার্থীরা একটি ঐচ্ছিক বিষয় পড়তে পারবে। তবে এ সুযোগ কেবলমাত্র তিন বছর পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

৭. শিক্ষাদান পদ্ধতি

কমিশনের বিবেচনায় শিক্ষার গুণগত মান ও ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জন নির্ভর করবে যেমন সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের উপরে তেমনি তা নির্ভর করবে শিক্ষাদানকারীদের গুণগত মানের উপরও। আর শিক্ষকের মান নির্ভর করবে মূলত: তাঁর বিষয়জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের উপর। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ইংরেজি ভাষা, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকদের অনেকেই বিষয়জ্ঞানে যথোপযুক্ত সমৃদ্ধ নন। এ অবস্থার সাথে যখন যুক্ত হয় প্রশিক্ষণের অভাব তখন তা হয় আরও ভয়াবহ। আজকের অবস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইরূপ।

এদিকে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নতুনভাবে শিক্ষাদানের প্রবণতা দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে বর্তমানে ইংরেজি ভাষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতে যে নতুনত্ব উদ্ভাবন করা হয়েছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। নতুন বিষয় বা নতুন পদ্ধতি দোষের কিছু নয়। কিন্তু তা প্রচলনের আগে যে ব্যাপক শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এর ফল হচ্ছে এই যে শিক্ষকদের বিরাট এক অংশ কিভাবে নতুন শিক্ষাসূচি সম্পর্কে পাঠদান করবে সে সম্পর্কে অবহিত নন। দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ইংরেজি শিক্ষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বলে কমিশন মনে করে। এগুলো হচ্ছে :

১. মাধ্যমিক পর্যায়ের কমিউনিকেটিভ ইংলিশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা স্পষ্ট নয়।

২. বর্তমানে প্রচলিত এ শিক্ষাক্রমটি কতখানি ফলপ্রসূ হচ্ছে যে সম্পর্কে অনেক শিক্ষকই সন্দিহান।

৩. সমস্যাটি বেশি প্রকট গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের মতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. শিক্ষাক্রমে অন্ততপক্ষে ২৫ নম্বর ইংরেজি ব্যাকরণের জন্য নির্ধারিত থাকতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে।

২. দেশের সকল বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষকদের জন্য অবিলম্বে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চিরাচরিত প্রথায় যেহেতু তা অনেক সময়সাপেক্ষ সেহেতু টেলিভিশনের মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে এ দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

৩. শহরের স্কুলগুলির বেশ কিছু শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তাদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

একই পদ্ধতি বাংলা ভাষা, গণিত এবং বিজ্ঞানের শিক্ষকের প্রশিক্ষণের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

এতকাল আমাদের দেশে প্রধানত বক্তৃতা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, শিক্ষক এক সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতে পারেন এবং অল্প সময়ে অনেক বেশি বিষয়বস্তু আলোচনা করতে পারেন। প্রধানত এই দুটি সুবিধার জন্য যুগযুগ ধরে এই পদ্ধতি আমাদের দেশে এবং অন্যান্য অনেক দেশে অনুসৃত হয়ে আসছে।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতির পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আমাদের দেশে এখনও আমরা পুরনো পদ্ধতিকে ধরে আছি। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার ফলে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিপর্যয় শুরু হয়েছে। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে এস.এস.সি পরীক্ষায় পাশের শতকরা হার ৩০ থেকে ৪০। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগের শতকরা ৬০ ভাগের অপচয় ঘটছে। এবং বিশেষজ্ঞ ও চাকুরিদাতাদের মতে শিক্ষার মান দিনদিন নিম্নগামী হচ্ছে।

এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তনের কথা কমিশন সুপারিশ করছে। বক্তৃতা পদ্ধতি সীমিত করে শ্রেণীতে দলগত কাজের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে আমাদের পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণ দলগতভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে শেখা ও প্রকাশ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সামাজিক বোধ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষক দলগতকাজে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন বা নম্বর প্রদান করতে পারেন।

গণিত, বিজ্ঞান এবং ভূগোলের মত সমস্যাপ্রধান বিষয়ে শিক্ষক অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট গ্রহণ করে শিক্ষাদান করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বৃক্ষের শ্রেণীবিন্যাস থেকে শুরু করে পশু, পাখি, পরিবেশের উপর নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যায়।

প্রকল্প বা অনুসন্ধানমুলক কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং রিপোর্টিং-এর উপর শিক্ষক নম্বর প্রদানও করতে পারবেন।

এতদ্ব্যতীত বাড়ির কাজ, শ্রেণীর কাজ, নির্ধারিত কাজ দিয়ে শিক্ষাদান কর্মসূচিকে সফল করা যায়। শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল কথা হল শিক্ষার্থীরা দেখে, শুনে এবং হাতেকলমে শিখবার প্রয়াস পাবে।

আমাদের দেশে এ ধরনের পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হলে প্রথমেই শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন বিষয়শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

যৌক্তিকভাবে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ থেকে ১:৪০-এর মধ্যে কমিয়ে আনতে হবে।

শ্রেণীকক্ষের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের আকার বৃদ্ধি করতে হবে এবং আসবাবপত্রেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে পারে।

শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে বেতন কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৮. শিক্ষা পরিমাপ ও মূল্যায়ন

বর্তমানে শিক্ষাবোর্ডসমূহ পরিচালিত এস.এস.সি পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থী দুই বছর লেখাপড়া করে গ্রহণ করতে পারে। এই পরীক্ষাগুলোর ফল আমাদের দেশে যা দেখা যাচ্ছে তা নিম্নরূপ :

- প্রতি বছর প্রায় ৬০% শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। ২০০৩ সালে ৬৪% অকৃতকার্য করেছে।
- ব্যাপকহারে পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।
- অনেক সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সঙ্গে আইন প্রয়োগকারীদের সংঘর্ষ ঘটে এবং শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত হয়।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অতি সামান্য অংশ আয়ত্ত করেই কৃতকার্য হতে সমর্থ হয়। (পাশ নম্বর ৩৩%)।
- শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের নিম্নতর স্তরগুলো আয়ত্ত করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চতর স্তরসমূহ আয়ত্ত করে না। যেমন জ্ঞানের প্রয়োগ-বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ মূল্যায়ন স্তরে পৌঁছতে তারা সক্ষম হয় না।
- কাগজ-পেন্সিল পরীক্ষায় আবেগিক এবং মনোপেশিজ ক্ষেত্রের মূল্যায়ন সম্ভব হয় না, ফলে শিক্ষাক্রমের এই ক্ষেত্রগুলোর মূল্যায়ন হয় না।
- একটি মাত্র পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীর মেধা যাচাই করা হয় ফলে তার ব্যক্তিত্বের মানবিক ও সামাজিক আচরণগুলো মূল্যায়ন করা হয় না।
- এস.এস.সি পরীক্ষায় শ্রেণীশিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে মূল্যায়নের কোন প্রভাব থাকে না, এর ফলে শিক্ষকের মান ও মর্যাদা সমাজে অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক বিঘ্নিত হয় এবং শিক্ষালাভ যথার্থ গভীরতা লাভ করে না। শিক্ষকগণেরও কোন জবাবদিহিতা থাকে না।
- ২-বছর পর একসাথে দশটি বিষয়ে পরীক্ষা হয় বলে শিক্ষার্থীরা অধিক শারীরিক ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়।

তাই প্রশ্ন উঠেছে, যে শিক্ষার জন্য জাতীয় বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়, যে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা দেশের মহত্তম নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে চাই, যে শিক্ষা দিয়ে আমরা দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করতে চাই, সে শিক্ষার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষার অবস্থা যদি এরূপ হয়, তবে জাতির সামনে সে শিক্ষা আমাদের কী আদর্শ, কী স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উম্মুক্ত করতে পারে?

শিক্ষা থেকে এই অসাধুতা, এই দুর্নীতি ও কলঙ্কিত অধ্যায় দূর করার জন্য সমাপ্তিসূচক কেবলমাত্র একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থার পাশাপাশি স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। পরের অংশে এ বিষয়ে একটি বিকল্প মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন কী ও কেন ?

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন (School Based Assessment) হল শিক্ষাক্রমের বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া শিক্ষা বছরে শিক্ষাদান কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক গঠনমূলক ও চূড়ান্ত মূল্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা। বছরে কেবল একবার বা দুবার লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষক এখন সমগ্র বছরব্যাপী শিক্ষার্থীর মননশীল, আবেগিক ও মনোপেশিজ বা দক্ষতার সার্বিক মূল্যায়ন করতে প্রয়াস পাবেন।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের একটি সুবিধে হবে এই যে বৎসরান্তে স্কুলে গৃহীত একটি পরীক্ষা বা দশম শ্রেণীর শেষে বোর্ড কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত পরীক্ষার অনেক আগেই যেমন শিক্ষক তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন তেমনি শিক্ষার্থীরাও তাদের ঘাটতিগুলো সম্পর্কে সচেতন হবে। স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন সার্থক করতে হলে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা একসাথে এ সব বিষয় আলোচনা করবেন ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সকলে সচেষ্ট হবেন। এ বিষয়ে অবশ্য শিক্ষককে ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা করার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলি দূর করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনবোধে প্রতিষেধমূলক

(remedial) ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষাকে বিবেচনা করতে হবে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করার মাধ্যম হিসাবে, তাকে অকৃতকার্য ঘোষণা করে শিক্ষাঙ্গন থেকে বাদ দেয়ার জন্য নয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের আরও মনে রাখতে হবে যে কিশোর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভাবাবেগ প্রবণতা খুবই স্বাভাবিক। আর তাই তাদের ভুল-ভ্রান্তি, দুর্বলতা বা অকৃতকার্যতা সবসময়ে তাদের মেধার ঘাটতির পরিচয় বহন করে না। আর সে কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোরদের পরামর্শদানের জন্য কিশোর মনস্তত্ত্বে পারদর্শী পরামর্শক বা কাউন্সেলর নিয়োগদান প্রয়োজন।

মূল্যায়নের উপাদানসমূহ :

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য যে সব উপাদান শিক্ষার্থীর আগ্রহ, দক্ষতা ও আচরণের ভিত্তি হতে পারে, সেগুলো হলো :

(ক) ক্লাসে উপস্থিতি ও শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ;

(খ) মূল্যায়ন (শ্রেণীভিত্তিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা);

(গ) এসাইনমেন্ট (একক/দলভিত্তিক);

(ঘ) মূল্যবোধ ও সততা;

(ঙ) বক্তব্য উপস্থাপন/একক ও দলভিত্তিক আলোচনা;

(চ) নেতৃত্বের গুণাবলি;

(ছ) নিয়মানুবর্তিতা;

(জ) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ;

(ঝ) খেলাধুলায় কৃতিত্ব;

(ঞ) বিজ্ঞানবিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস;

(ট) আচরণ।

এতদ্ব্যতীত প্রধান শিক্ষক নিজ স্কুলের আদর্শ ও সংস্কৃতি অনুসারে অতিরিক্ত দক্ষতাও এর সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন।

উদাহরণস্বরূপ :

বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষের যত্ন

সমবায়ের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি।

শিক্ষাবিদগণ মনে করেন যে সমগ্র দেশে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন প্রবর্তিত হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনগুলো ঘটবে।

১. শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হবে;

২. শিক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন হ্রাস পাবে;

৩. ফল বিপর্যয় রোধ হবে;

৪. শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে;

৫. শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষকের অধিক কথা বলার প্রবণতা কমে যাবে;

৬. শিক্ষক তার যথাযথ মর্যাদা নিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন;

৭. শিক্ষার্থী আত্মনির্ভরশীল এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে বেড়ে উঠবে;

৮. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে;

৯. শিক্ষার মান উন্নত হবে;

১০. শিক্ষার্থীগণ সামাজিক, সহানুভূতিশীল ও মানবিক গুণসম্পন্ন সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে।

স্কুলভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের মুখ্য সুফল নিম্নরূপ

- শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে পুনরালোচনা, পুনঃঅনুধাবন, পুনঃঅধ্যয়ন এবং পুনঃচিন্তা করার সুযোগ দেয়;
- শিক্ষককে অধিকতর কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষোপকরণ ও কর্মতৎপরতা উদ্ভাবন করতে সহায়তা করে এবং প্রেরণা যোগায়;
- শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য ও শিক্ষা অর্জনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে মনোযোগী করে।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষার্থীরা–

- কী করতে পারে এবং কী করতে অন্যের সহায়তা প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে পারে;
- তাদের প্রচেষ্টা এবং অগ্রগতি উপলব্ধি করতে পারে;
- নিজেদের লক্ষ্য স্থির করতে এবং তা অর্জন করতে সক্রিয় থাকে;
- স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ সংগ্রহ করতে এবং শিক্ষালাভ করতে শেখে;
- নিজের জ্ঞান অর্জনের মূল্য যাচাই করতে শেখে এবং সহপাঠীদেরও মূল্যায়ন করতে পারে;
- যুগপৎ বিভিন্ন ভূমিকায় অবদান রাখতে সমর্থ হয়: যেমন, শিক্ষার্থী, সেবক, সহায়তাকারী, মূল্যযাচাইকারী এবং পুনরালোচনাকারী;
- একে অন্যের প্রতিভা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়;
- বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং সমস্যা সমাধানের মত জ্ঞানের উচ্চতর সোপানগুলোতে আরোহণ করার আনন্দ ও অনুভূতি উপভোগ করতে সমর্থ হয়;
- কোন শিক্ষণীয় বিষয় নিজেরা সৃষ্টি করতে, প্রস্তুত করতে, উপস্থাপন করতে এবং নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে সুযোগ লাভ করে।

৯. একাডেমিক সুপারভিশন বা শিক্ষাগত পরিদর্শন

গুণগত মান উন্নয়নের জন্য একাডেমিক সুপারভিশনের কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী বা পরিদর্শক কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সরেজমিনে তদারকির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত ও পরিমানগত অবস্থা অবলোকনপূর্বক উন্নয়নের জন্য বাস্তব দিক নির্দেশনাকেই একাডেমিক সুপারভিশন বলা হয়।

একাডেমিক সুপারভিশনের প্রধান উদ্দেশ্যে হল শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষার এবং শ্রেণী শিক্ষকের মান উন্নয়নে বাস্তব পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান এবং শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।

আমাদের দেশে শিক্ষা বিভাগের এবং শিক্ষা বোর্ডের কিছুসংখ্যক স্কুল পরিদর্শক এ দায়িত্ব পালনের প্রয়াস পান, যদিও এক্ষেত্রে তাঁদের অনেকের শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতা যথাযথ কিনা সে বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়।

আমরা মনে করি শিক্ষা পরিদর্শনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য যাঁরা এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তাঁদের সেবা কাজে লাগান উচিত। আমরা মনে করি প্রত্যেক উপজেলায় একজন অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ বিষয়শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি একাডেমিক সুপারভিশন দল গঠিত হতে পারে। জেলা শিক্ষা অফিসারের অফিসিয়াল প্রোগ্রাম অনুসারে এই টিম নিজ অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শনে বিভাগীয় শিক্ষা অফিসারকে সহায়তা করবে। এ ধরনের পরিদর্শনের জন্য অবশ্যই সরকারি সুপারভিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতিবছর প্রতি জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমিক মান নির্ধারণ ও প্রকাশ করা প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট Critera বা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের মান নির্ধারণ করা হলে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং তার ফলে শিক্ষার গুণগত মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

১০. সুপারিশ

(১) সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত বিষয়ে (core subject) অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হবে।

(২) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পালন করবে। প্রকাশনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারিকরণ করা যেতে পারে।

(৩) বর্তমান উচ্চমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চমাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম-দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থা সকল সরকারি বিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য।

(৪) (ক) সকল বিষয়ের শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শূন্য পদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) এই স্তরের শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত এবং কার্যকর করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ পদের নির্বাচন ও বাছাইয়ের সুপারিশ করবে।

(৫) সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৮) শিক্ষার্থীদের উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য বিদ্যালয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে।

(৯) বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান জোরদার করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী-সংখ্যা ১০০০ (এক হাজার)-এর বেশি হলে একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য দুজন অথবা আরও বেশিসংখ্যক উপাধ্যক্ষ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী সংখ্যার ভিত্তিতে ততোধিক উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা যেতে পারে।

(১০) শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

(১১) (ক) দশম শ্রেণীর পর একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে এস.এস.সি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে আন্তঃপরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে।

(খ) বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকারি আদেশ জারি করেছে। এই ব্যবস্থায় বহি:পরীক্ষার শতকরা ৩০ ভাগ নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে। কমিশনের বিবেচনায় প্রথম কয়েকবছর পরীক্ষামূলকভাবে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শতকরা ২৫ নম্বর বরাদ্দ রাখা শ্রেয়। তবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য তা বর্ধিত করা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ এবং স্কুলসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। স্কুলসমূহে অবিলম্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও শিক্ষাগতযোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের সরবরাহও নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) কোন শিক্ষার্থী এস.এস.সি পরীক্ষায় একবারে উত্তীর্ণ হতে না পারলেও যে সব বিষয়ে সে পাশ করবে, সেসব বিষয়ের নম্বর তিন বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে; ঐ সময়ে সে কেবল যে সব বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে ঐ সব বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করবার সুযোগ লাভ করবে। স্কুলপ্রধান কোন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলেও তার পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, যে সব বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হয় না অথচ ছাত্র-ছাত্রীরা অনুশীলন করে সে সব বিষয়ের অর্জন এবং স্কুলের আচরণ সম্বলিত সার্টিফিকেট দিবেন যাতে সে তার উপযোগী পেশায় কাজ করবার সুযোগ লাভ করতে পারে।

(১২) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ অনুপাত হবে ১:৪০।

(১৩) শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে সকল শিক্ষার্থীকে বাংলা এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও ভূগোল বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।

(১৪) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।

(১৫) দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৬) (ক) সরকারের নির্ধারিত স্তরের চেয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে অথবা মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সরকারের শিক্ষাখাত থেকে অর্থ বরাদ্দ পাবে না।

(খ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, শিক্ষকের বেতন, ছাত্র বেতন একটি নির্দিষ্ট নীতিকাঠামোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

(১৭) বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে যে, অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ভোগ করছেন। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসব চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৮) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে মাধ্যমিক স্তরের মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশ্নপ্রণয়নের জন্য একটি শাখা থাকবে। এই শাখা প্রশ্নপ্রণয়ন ছাড়াও প্রশপ্রণেতাদের এবং প্রশ্ন মডারেটরগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে শিক্ষাবোর্ডগুলিকে একাডেমিক সহায়তা প্রদান করবে।

(১৯) শিক্ষার সুযোগ বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্দেশ্যে প্রতি উপজেলায় একটি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) স্থাপন করতে হবে। গ্রামের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধাকে লালন করার উদ্দেশ্যে এ সকল বিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি এবং আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে।

(২০) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের Constituent কলেজরূপে তাদের পূর্ব অবস্থানে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
শিক্ষক ও তাঁর সামাজিক অবস্থান

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম যতই উন্নতমানের হোক, বিদ্যালয়ের ঘর-দুয়ার-দালান যতই চাকচিক্যময় হোক, অবকাঠামোগত সুবিধাদি যতই প্রয়োজন মাফিক হোক না কেন শেষ বিচারে শিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করবে শিক্ষকদের বিষয় জ্ঞানের পরিধি, তাঁদের প্রশিক্ষণ, তাঁদের কাজের আগ্রহ, দক্ষতা প্রভৃতির উপর। প্রকৃতপক্ষে, ভাল শিক্ষক না হলে কখনই ভাল ফল পাওয়া যাবে না। অপরপক্ষে শিক্ষকের মর্যাদা নির্ভর করবে তাঁর নিয়োগ পদ্ধতি, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি, তাঁর জ্ঞান ও শিক্ষার মান, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি প্রভৃতির উপর।

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্বাচন পদ্ধতি, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ, বেতনকাঠামো ইত্যাদি নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। এসব বিষয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক, স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ মহলের সাথে কমিশন আলাপ-আলোচনা করেছে। এ সব বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুপারিশ নিম্নরূপ :

ক. শিক্ষক নির্বাচন পদ্ধতি

শিক্ষাঙ্গনের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে সব বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া তার মধ্যে অন্যতম। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে এসব প্রশ্নের সাথে স্কুল পরিচালনা পর্ষদের নামও প্রায়শ জড়িয়ে পড়ছে। অভিযোগ উঠেছে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সত্যিকারভাবে যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচিত হচ্ছেন না। এমন অভিযোগ যদি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নাও হয়, তবুও ব্যাপকভাবে আলোচিত এ বিষয় শিক্ষাঙ্গনের সুনাম মলিন করে তুলছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সামগ্রিক অবস্থার বিবেচনায় কমিশনের সুচিন্তিত মত হচ্ছে এই যে সরকারি এবং বেসরকারি সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ সরকারি কর্ম-কমিশনের মত একটি নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে করা হোক। কমিশন বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের দীর্ঘ প্যানেল তৈরি করতে পারে, যার মধ্য থেকে জেলাওয়ারিভাবে সরকারি স্কুলের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ দেবেন। আর বেসরকারি স্কুল হলে জেলা শিক্ষা অফিসারের পরামর্শক্রমে বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগ দিতে পারবে। প্রস্তুককৃত প্যানেলের কার্যকারিতা তিনবছর পর্যন্ত বজায় থাকবে।

যেহেতু প্রচলিত প্রথার বদলে সুপারিশকৃত পদ্ধতিতে নিয়োগদানের জন্য আইন-কানুন পরিবর্তন করে নতুন আইন-কানুন প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে এবং কমিশন গঠন প্রক্রিয়াও কিছু সময় লাগবে সেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক নির্বাচন করা যেতে পারে।

কমিটির গঠন :

(১)	আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক মনোনীত কোন একটি কলেজের অধ্যক্ষ	-	সভাপতি
(২)	জেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য সচিব
(৩-৪)	জেলা প্রশাসক মনোনীত দুজন শিক্ষাবিদ	-	সদস্য
(৫-৬)	এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুজন (জেলা শিক্ষা অফিসার মনোনীত)	-	সদস্য
(৭-৮)	জেলা প্রশাসক মনোনীত জেলার বিশিষ্ট দুজন ব্যক্তিত্ব	-	সদস্য
(৯)	বিষয় বিশেষজ্ঞ (মাউশি মনোনীত)	-	সদস্য

কমিশন অথবা উপর্যুক্ত কমিটি শিক্ষক নির্বাচনের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও প্রার্থীর শিক্ষাদান কার্যে আগ্রহ এবং তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ে সংবেদনশীল মনমানসিকতার অধিকারী কিনা তাও বিবেচনা করবে।

খ. প্রধান শিক্ষক নির্বাচন

প্রধান শিক্ষকের নির্বাচন প্রক্রিয়াও উপরের পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে পারে। তবে শর্ত থাকে যে প্রধান শিক্ষক পদের প্রার্থীদের যোগ্যতা নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত করা আবশ্যক।

(১) স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী;
(২) বি.এড/এম.এড;
(৩) একাধিক বিষয়ের জ্ঞান;
(৪) বিদ্যালয় পরিচালনাসংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী;

(৫) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন;
(৬) নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন;
(৭) কিশোর-বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংবেদনশীল মন ও মানসিকতা।

গ. শিক্ষকদের বেতনভাতাদি

শিক্ষকদের কাছে সমাজের চাহিদা অনেক, তবে তাঁদের বেতনভাতাদি অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত সমযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের তুলনায় কম। এ বিষয়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া সমীচীন হবে।

(১) ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। সমযোগ্যতাসম্পন্ন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের মর্যাদা কিন্তু বেশ নিচে;
(২) স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু সে মর্যাদা দেওয়া হয় না;
(৩) ১৯৭৭-এর আগে টি-ই-ও পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সহকারী শিক্ষকদের এক গ্রেড নিচে বেতন পেতেন। পি-টি-আই ইনস্ট্রাকটরা সহকারী শিক্ষকদের সমান বেতন পেতেন। ১৯৯৩ সালে এদের সকলকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের তা দেওয়া হয় নি।
(৪) সহকারী শিক্ষকেরা ৮, ১২, ও ১৫ বছর পর টাইমস্কেল পান, কিন্তু তাঁদের কোন পদোন্নতি হয় না। মূলত এ কারণে অনেক সুযোগ্য তরুণ শিক্ষকতার চেয়ে বি.সি.এস-এর দিকে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে ভাল মানের শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

উপরের তথ্যগুলি অদ্ভুত, অযৌক্তিক এবং সুশিক্ষার অনুকূল নয় বিধায় তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

খুব সম্ভবত এ সব কারণে নিতান্ত সচ্ছল জীবন-যাপনের তাগিদেই অনেক শিক্ষক এখন নিজেদের দায়িত্বের প্রতি কম মনোযোগী হয়ে প্রাইভেট টিউশন এবং কোচিং এর-দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ অবস্থা বড় রকমের কুফলের জম্ম দিচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এমনও মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে অনেক অভিভাবক নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের ভাল ফললাভের উদ্দেশ্যে একাধিক গৃহশিক্ষক নিয়োজিত করছেন। এর ফল হচ্ছে এই যে শিক্ষা এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়তো কোন কোন শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ না করে শ্রেণীকক্ষে সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য। কিন্তু এখন এর ব্যত্যয় ঘটছে বলে শিক্ষক সম্প্রদায়ের নীতি-নৈতিকতাও আজ প্রশ্নবিদ্ধ। এর পেছনের কারণ হয়তো প্রাইভেট টিউশন।

এছাড়া রয়েছে সর্বস্তরের শিক্ষক মহলে তাঁদের জন্য আলাদা বেতনস্কেল প্রণয়নের দীর্ঘদিনের দাবি। এ দাবির প্রধান যৌক্তিকতা এই যে সরকারি কোষাগার থেকে যারা বেতন গ্রহণ করেন শিক্ষকদের কাজের ধরন তাদের সকলের থেকে আলাদা। তাছাড়া শিক্ষকসমাজ মনমানসিকতার দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আর তাই তাঁরা অন্যদের সঙ্গে তুলনীয় হতে চান না। এ বিষয়ে কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত হলো এই, শিক্ষকদের আলাদা বেতনকাঠামোকে শ্রদ্ধা জানানো কাম্য। আবার পেনশন পরবর্তী সময়ের আর্থিক নিরাপত্তার দাবি-দাওয়া সম্পর্কে একটি সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তও শিক্ষকসমাজ আশা করে।

ঘ. শিক্ষকের মর্যাদা

শেষ বিচারে শিক্ষকের মর্যাদা নির্ভর করবে তাঁর শিক্ষার মান ও জ্ঞান এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির উপর। যদি শিক্ষক নির্বাচন পদ্ধতি স্বচ্ছ হয় তাহলে তার দ্বারা-ই শিক্ষকের মানের পরিমাপ হবে।

শিক্ষকের কাছে সমাজ এ-ও আশা করে যে তাঁরা তাদের সকল কার্যে ও আচরণে পেশাগত নীতিবোধের (Professional ethics)পরিচয় দিবেন। এ ছাড়া তাঁরা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে আদর্শ মানুষ হিসাবে যাতে প্রতিভাত হন সে রকম আদর্শেও তাঁরা নিষ্ঠ থাকবেন। প্রকৃতপক্ষে তরুণেরা সব সময়ে তাদের শিক্ষকের মাঝে একজন অনুকরণীয় চরিত্রের আদর্শ মানুষ (role model) খোঁজে। শিক্ষকেরা যখন এমন হন তখন তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রভূত শ্রদ্ধা পান। সমাজের কাছে এমন শিক্ষকের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। ছাত্র-শিক্ষকের স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক তরুণ সমাজের চরিত্র গঠনে অনেকখানি প্রভাব ফেলে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এবং সমাজের কাছে মর্যাদা পাওয়ার এমন পন্থা যেহেতু খুবই সহজ শিক্ষকরা তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

ঙ. শিক্ষকদের কার্যাবলির অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে প্রতি তিন মাস পর পর সকল শিক্ষকের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভায় প্রধান শিক্ষক শিক্ষকদের কাজের সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন এবং এ সভায় খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদানকার্যে যে সব ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে তা পরবর্তী পর্যায়ে আর যাতে না ঘটে সে সম্পর্কে সবাই সচেতন হবেন। প্রধান শিক্ষক এ সব সভার দিন, তারিখ ও সময়সূচি স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও অপরাপর সদস্য এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করবেন। এরা যদি কেউ আগ্রহী হন তাহলে তাঁরা এসব সভায় যোগদান করতে পারেন।

এছাড়া বছরে অন্তত একবার পরীক্ষার ফল বেরুবার পরে জেলা শিক্ষা অফিসার, স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এবং সকল সদস্য, প্রধান শিক্ষক এবং সকল শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা যৌথভাবে একটি সভায় মিলিত হবেন। এরূপ সভায় মূলত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং অভিভাবকবৃন্দ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে এর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মত বিনিময় করবেন। সব রকম সভার কার্যবিবরণী প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

চ. সুপারিশ

(১) প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক একটি নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

(২) চাকুরির প্রারম্ভে একজন শিক্ষক সহকারী শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হবেন। সহকারী শিক্ষক পাঁচ বছর পর সিনিয়র সহকারী শিক্ষক হিসেবে উচ্চতর বেতনস্কেলে উন্নীত হবেন এবং দশ বছর পর মাউসি গঠিত একটি কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে অপর একটি উচ্চতর স্কেলে উন্নীত হবেন। এই স্কেলটি হবে সহকারী প্রধান শিক্ষকের।

(৩) শিক্ষকদের একটি ক্যারিয়ার পাথ থাকবে, যাতে অপেক্ষাকৃত মেধাবী শিক্ষকেরা উচ্চ মাধ্যমিক বা কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকতায় নিয়োজিত হতে পারেন। শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চতর প্রশাসক পদেও তাঁরা যাতে নিয়োগ পেতে পারেন এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(৪) শিক্ষকদের বেতনভাতাদি এমনভাবে একটি আলাদা বেতনস্কেলের আওতায় নির্ধারিত হবে যেন তারা সমাজে মর্যাদার সাথে জীবন-যাপন করতে পারেন। নতুন স্কেল তৈরির সময় অতীতের ভুল সিদ্ধান্ত থাকলে তা যৌক্তিক করতে হবে।

(৫) সমযোগ্যতার অধিকারী বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান বেতনস্কেল দিতে হবে।

(৬) সরকার প্রদত্ত বেতনভাতাদির অংশের অতিরিক্ত অংশ ভর্তুকি দিয়ে শিক্ষকদের বেতনভাতাদি সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমপর্যায়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব বেসরকারি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

(৭) সরকারি বা বেসরকারি সকল শিক্ষকের জন্য পেনশন ও গ্রাচ্যুইটির ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে।

(৮) প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। অবশ্য কেউ যদি দায়িত্বে অবহেলা করেন অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি স্নিগ্ধ সংবেদনশীল আচরণ করতে ব্যর্থ হন অথবা নৈতিকতা বিবর্জিত কোনরূপ কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট হন সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এমন ব্যবস্থা জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক গঠিত একটি কমিটির সুপারিশক্রমে নিতে হবে। কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আপিলের মাধ্যমে প্রতিকার চাইতে পারেন।

(৯) শিক্ষকেরা যাতে তাঁদের দায়িত্ব পালনে পেশাগত নীতিবোধের পরিচয় দেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ও সমাজের কাছে নিজে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিভাত হন সে চেষ্টা করবেন।

(১০) নিজেদের কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকেরা প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে প্রতি তিনমাস পর পর অভ্যন্তরীণ আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের মূল্যায়ন করবেন এবং সে মোতাবেক স্ব স্ব কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মাধ্যমিক শিক্ষা : শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা

সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম, যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের উপর শিক্ষার গুণগত মান নির্ভরশীল। এই নিয়ন্ত্রকগুলোর মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য শিক্ষক হওয়ার জন্য আবশ্যক (১) নিজের বিষয়বস্তু ভালভাবে জানা; (২) শিক্ষাবিজ্ঞানে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন; এবং (৩) শিক্ষাদানের মন মানসিকতা নিজের মধ্যে গড়ে তোলা। এই আবশ্যক উপাদানগুলি পূরণ করতে পারলেই শিক্ষক নিজের বিষয়বস্তু পাঠদানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টিতে, জ্ঞানলাভে ও দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে এবং আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। এই গুণাবলি অর্জনের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় বিগত শতকের গোড়ার দিকে ১৯০৯ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ধারাবাহিকতায় দেশে এ পর্যন্ত মোট ১১টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সরকারিভাবে স্থাপিত হয়েছে। আরও ৩টি নির্মাণাধীন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৬০ সাল থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ বি.এড কোর্স পরিচালনা করেছে। ১৯৯৩ সালে দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত হয়ে যাওয়ার পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বি.এড ও এম.এড কোর্স পরিচালনা করছে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে মোট কতজন কোন আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নি সে সম্পর্কে কোন তথ্য ব্যানবেইসে নেই। সরকারি ও বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১,৮৭,০০০ জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। এই শিক্ষকদের মধ্যে আনুমানিক মাত্র ৪৩% জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং বাকি ৫৭% জনের কোন প্রশিক্ষণ নেই। অর্থাৎ প্রায় ১০০,০০০ শিক্ষকের কোন প্রশিক্ষণ নেই। ১১টি সরকারি ও ৫৪টি বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে বছরে প্রায় ৭৫০০ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছেন। এই হারে চলতে থাকলে প্রশিক্ষকবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে ১২ বছর লাগবে। ততদিনে নতুন শিক্ষক নিয়োজিত হবেন, তাছাড়া পুরোনো শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। নতুন শিক্ষক হিসেবে যারা বিদ্যালয়ে যোগদান করছেন তাদের অধিকাংশেরই প্রশিক্ষণ নেই। এই নতুন শিক্ষকের বৃদ্ধির হার ১০% জন। অপরপক্ষে বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলি প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অতএব সামগ্রিক বিবেচনায় ভবিষ্যতের চিত্র খুব একটা আশা ব্যঞ্জক নয়।

এক দশক পূর্ব পর্যন্ত দেশের সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত। ১৯৯৪ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোকে একাডেমিক ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্যন্ত ৫৪টি বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছে। পূর্বের এগারটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মধ্যে ৫টি কলেজে বি.এড ও এম এড কোর্স চালু আছে। বাকি ছয়টিতে শুধু বি.এড কোর্স চালু রয়েছে।

আশির দশকের মাঝামাঝি ৯টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসংলগ্ন ক্যাম্পাসে ৯টি বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই কেন্দ্রগুলো স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান। এ কেন্দ্রগুলো ৮-১০ বছরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার বিষয়শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পরবর্তীসময়ে সরকার এ কেন্দ্রগুলোকে সংশ্লিষ্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধীনে ন্যস্ত করে। বর্তমানে বিষয়শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের আর কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নেই। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক লোকবল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বদলি হয়ে গিয়েছে। কিছুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজ নিজ স্থানে নিয়োজিত আছেন।

এগারটি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ৩২০টি আবর্তক বাজেটের অধীন এবং ১০০টি প্রজেক্টভিত্তিক পদ রয়েছে। ৩২০টি পদের মধ্যে ১৯৯টি পদে বিভিন্ন ক্যাটেগরির শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। আর ১০০টি প্রজেক্ট পদের মধ্যে ৯০টি পদে প্রভাষক নিয়োজিত রয়েছেন।

৫৪টি বেসরকারি কলেজে মোট ৬৯৮ জন শিক্ষক শিক্ষাদানে রত আছেন। সরকারি কলেজগুলোতে ২০০৩ সালে ৫৭১৫ জন এবং বেসরকারি কলেজগুলোতে ৭৩১৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। বিগত ২০০০, ২০০১ এবং ২০০২ সালে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বি.এড পরীক্ষায় পাশের হার নিম্নরূপ ছিলঃ

ব্যবস্থাপনা	২০০০, ২০০১ এবং ২০০২ সালে পাশের হার					
	২০০০		২০০১		২০০২	
	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা
সরকারি	৭৪%	৭৪%	৭৪%	৭৩%	৭৩%	৭৪%
বেসরকারি	৫৩%	৫৫%	৫৬%	৫৭%	৫৭%	৬১%

সূত্র : ব্যানবেইস-ড্রাফ্‌ট ফাইনাল রিপোর্ট, ২০০৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিউটে বি.এড, এম.এড, এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ৪৮ জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। ২০০৩ সালে সকল কোর্স মিলে ৫৩৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এড, বি.এড.এগ, এম.এড এবং ইংলিস ল্যাংগুয়েজ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। এদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বি.এড বাৎসরিক কোর্সে ভর্তির সংখ্যা ৫০০০-৬০০০ জন, পাশের হার ৫৩%। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে ১৭ জন প্রশিক্ষক নিয়োজিত আছেন। এ প্রতিষ্ঠান ২০০৩ সালে ৯৫৯ জন মাদরাসা প্রশাসক ও শিক্ষককে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধানদের এবং বি.সি.এস শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকদের স্বল্পকালীন ও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ২০০৩ সালে এ প্রতিষ্ঠান ৩০৯৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

২. গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য কার্যকরী শিক্ষক প্রশিক্ষণের সমস্যাদি

২.১ অবকাঠামোগত সমস্যা

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ভাল। এগুলোতে শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরি রয়েছে। তবে গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় আধুনিক পুস্তকের অভাব আছে। গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আশানুরূপ নয়। ল্যাবরেটরি থাকলেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোর অধিকাংশের (৭০-৮০%) নিজস্ব বাড়িঘর নেই। ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠান চলছে। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি নেই। যেখানে আছে সেখানে এ সব পরিচালনার লোকবল নেই।

২.২ শিক্ষক

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে শিক্ষকের শতকরা ৪০টি পদ শূন্য। সরকারি কলেজগুলোর মধ্যে ২/৪টি বাদে প্রায় সবগুলোতেই শিক্ষকের খুব অভাব। এ কলেজগুলোতে গড়ে ১৮ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। বেসরকারি কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা আরও অনেক কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খণ্ডকালীন শিক্ষকেরা কাজ চালান। গড়ে প্রতি কলেজে ১৩ জন শিক্ষক রয়েছেন।

২.৩ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

ট্রেনিং কলেজগুলোর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। কদাচিৎ কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশে গিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও একাডেমিক উৎকর্ষের জন্য নিয়মিত কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

২.৪ গ্রন্থের অভাব

কোন প্রতিষ্ঠানেই সময়োপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক পুস্তক নেই। ইচ্ছুক ও আগ্রহী শিক্ষকেরাও প্রয়োজনে নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারছেন না।

২.৫ বিজ্ঞানবিষয়ক বিষয়গুলোর চর্চার সুযোগের অভাব

আধুনিক বিজ্ঞানাগার এবং দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে বিজ্ঞান প্রায় তত্ত্বীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

২.৬ প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকার দরুন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে।

২.৭ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেশনাল কর্মকর্তার অনুপস্থিতি

দেশের সকল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের একাডেমিক দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা নেই। ধারকরা প্রফেশনালরা তাদের কাজ করে থাকেন। কিন্তু এ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।

২.৮ টিচার্স ট্রেনিং আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা নেই

শিক্ষক প্রশিক্ষণ আধুনিকীকরণের জন্য উন্নত দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ নেই। দেশেও সে ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেই।

২.৯ টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের সরকারি প্রচেষ্টার অভাব

সরকারি-বেসরকারি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সরকার কর্তৃক পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই। সরকারি প্রশাসনে কাজ করার লোকবলও নেই।

বেসরকারি কলেজগুলোর উপর সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই।

বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো সরকার থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করে না বিধায় তাদের সরকারের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। কলেজগুলোর অধিকাংশই অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য থেকে সৃষ্ট। তাই লেখাপড়া কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অবকাঠামোগত ও শিক্ষকদের পর্যাপ্ততা থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা অনেক কম।

বর্তমানে অনুসৃত নীতিতে কোথাও পর্যাপ্ত অনুশীলনী পাঠদানের ব্যবস্থা নেই।

সরকারি টিচার্স ট্রেণিং কলেজের শিক্ষকদের সাধারণ কলেজে যাবার প্রবণতা বেশি। আর উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতির সুবিধা না থাকায় অনেকে বাধ্য হয়ে সাধারণ কলেজে চলে যান।

৩. সুপারিশসমূহ

১. শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রত্যেক টিচার্স ট্রেণিং কলেজের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় অনুমোদন বাতিল করতে হবে।
২. প্রত্যেক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকতে হবে।
৩. প্রত্যেক কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (সরকারি/বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো অনুসারে) শিক্ষক থাকতে হবে।
৪. টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং পেডাগজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।
৫. প্রশিক্ষকদের প্রতি ৫ বছরে একবার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. উন্নত দেশের সাথে যোগাযোগ, শিক্ষা-বিনিময় বা অন্য কোন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৭. শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়নে প্রশিক্ষক ও শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
৮. প্রতিটি কলেজে অনুশীলনী পাঠদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. গ্রন্থাগারে আধুনিক পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা সরকারিভাবে করতে হবে।
১০. বিজ্ঞানাগারে যথাযথ ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত অর্থ সংস্থান করতে হবে।
১১. সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের ট্রেনিং কলেজে ধরে রাখার জন্য বর্তমান জনবল কাঠামো বিন্যাস করে উর্ধ্বতন পদ সৃষ্টি করতে হবে।
১২. প্রত্যেকটি কলেজে যথাযথ পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১৩. বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে যেভাবে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটছে তদ্রূপ নীতিতে বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করতে হবে।
১৪. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড প্রোগ্রামের কার্যকরী অনুশীলনী পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৫. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোকে নায়েমের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
১৬. বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য আর কোন কলেজকে নতুনভাবে অধিভুক্তি দেয়া নিষিদ্ধ করতে হবে।
১৭. শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দূরশিক্ষণের (দূরশিক্ষণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ব্যবহার করতে হবে।

মূল রচনা :

প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমদ; প্রফেসর আনোয়ার আলী; জনাব সবদার আলী; বেগম জাকিয়া আখতার; প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

১. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা : প্রাথমিক তথ্যাবলি

১.১ বাংলাদেশে শিক্ষার বর্তমান অবকাঠামো

বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঁচটি স্তর প্রচলিত। এগুলো হচ্ছে :

(ক) ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী)
(খ) ৩ বছর মেয়াদি নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী)
(গ) ২ বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষা (৯ম থেকে ১০ম শ্রেণী)
(ঘ) ২ বছর মেয়াদি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী)
(ঙ) ৩ থেকে ৫ বছর মেয়াদি উচ্চশিক্ষা (১ম বর্ষ স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর)।

১.২ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর

বাংলাদেশের শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী (১১-১২শ) পর্যন্ত অংশটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় এ স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তরটিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সংযোগ সেতু বলা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি পর্ব এবং ছাড়পত্র হিসেবেও বিবেচিত হয়। এপর্বের শিক্ষাশেষে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করবে। এ কারণে যে, এ স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত তৈরি করবে। এখানকার অর্জিত দক্ষতার মাধ্যমে তাদের জীবন হয়ে উঠবে সাফল্যমণ্ডিত; ফলে তারা সমাজ ও দেশের জন্য অমূল্য সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে।

১.৩ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রাপ্ত শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সংগঠিত করা;
- সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাপনের জন্য সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
- দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা;
- মেধা ও পারগতা অনুযায়ী মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীকে দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল, গণতন্ত্রমনা, সুশীল, পরমতসহিষ্ণু ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- বুদ্ধিভিত্তিক নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা;
- বর্তমান বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের এবং দেশের স্থান করে নেওয়ার মতো উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের জন্য যোগ্য করে তোলা;
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীকে ভবিষৎ কর্মক্ষেত্র (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) তথা বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা;
- চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য বৈপ্লবিক বিকাশে অংশগ্রহণের মতো মেধা ও দক্ষতা অর্জনের উপযোগী শিক্ষার ভিত তৈরি করে দেওয়া;

১.৪ শিক্ষাক্রম

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ৪০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি এই দুটি আবশ্যিক বিষয় পড়তে হয়। এছাড়া ২০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় রয়েছে। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় মোট ৬০০ নম্বরের ৩টি নৈর্বাচনিক বিষয় পড়ানো হয়। এই স্তরের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি শিক্ষা বিদ্যমান।

২. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

২.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা

দেশে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটি বর্তমানে কয়েকটি পৃথক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। মাধ্যমিক স্কুলের সাথে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী, সরকারি ও বেসরকারি পৃথক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ডিগ্রি কলেজ, এবং কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে (অনার্স-মাস্টার্স) উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে।

এক দশক পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হিসেবে গণ্য হতো। এর আগে রাজধানীর কয়েকটি অনার্স-মাস্টার্স ক্লাস আছে এমন কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। পরবর্তী পর্যায়ে এডিবি'র (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক) সাহায্যপুষ্ট হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (HSEP)-এর আওতায় দেশের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের বেশ কিছু মাধ্যমিক স্কুলের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী খোলা হয়। উক্ত স্কুলসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, জনবল নিয়োগ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়।

সারণি-১ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং ছাত্রসংখ্যা'২০০১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		সর্বমোট ছাত্র	ছাত্রী	সর্বমোট শিক্ষক	মহিলা	অনুপাত
	সরকারি	বেসরকারি					
স্কুল ও কলেজ	০	৩৭২	১২৯৩২৩	৭০৮৮১	১০৮০৬	২৭১৬	১১:১
ইন্টারমেডিয়েট কলেজ	১০	১১৩৫	৫৩০৫৭৮	২৫১৪৪৬	৪২৮১৭	৮০৭৪	১২:১
ডিগ্রি কলেজ	১৪৩	৭২৫	১৬৮৯৩১৯	৬০১৪৪৩	৫৫৭২০	৯৩৪৩	৩০:১
ডিগ্রি অনার্স কলেজ	৪৩	২১	১৭০৬৪০	৫৯৫৪০	৫১৬৩	৯৭২	৩৩:১
মাস্টার্স কলেজ	৫৫	২০	৪৩৮৯১৮	১৫৪১৮২	১০৪৭৭	৩১৬৮	৪২:১
সর্বমোট	২৫১	২২৭২	২৯৫৮৭৭৮	১১৩৭৪৯২	১২৫০৭৪	২৪২৯৭	২৩:১

সূত্র : ব্যানবেইস (BANBEIS)

সারনি-১ এর তথ্যচিত্রে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি কোন স্কুলে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী নেই। ৩৭২টি বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী রয়েছে। কেবল ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রয়েছে সরকারি ১০টি এবং বেসরকারি ১১৩৬টি। এছাড়া একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীসম্বলিত সরকারি ও বেসরকারি মোট ৮৬৮টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। দেশে সরকারি ও বেসরকারি সর্বমোট কলেজের সংখ্যা ২৫২৩টি। একমাত্র চট্টগ্রাম কলেজ ছাড়া বিভাগ বা বৃহত্তর জেলা পর্যায়ের স্নাতকোত্তর সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী নেই। এর মধ্যে অনেক কলেজেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী যুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশের জেলা শহরের সরকারি মহিলা কলেজ এবং অন্যান্য যে-সব কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোতেও চরম অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে। এমন অনেক কলেজ রয়েছে যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষক নেই। সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে উপাধ্যক্ষের পদ নেই। আবার অনেক কলেজে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিষয় শিক্ষকের পদও অনেক কলেজে শূন্য রয়েছে। এতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ক্লাস এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে দেশের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সার্বিক মানের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২.২ পরীক্ষার ফলাফল

সারণি-২ : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিগত পাঁচ বছরের ফলাফল

বৎসর	পরীক্ষার্থী		পাশ		% হার	
	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী
১৯৯৯	৫১৮৬৪৮	১৯৮৩১৪	২৯০৬৮৭	১১৫৪৪৮	৫৬.০৫	৫৮.২১
২০০০	৪৭০৫৪১	১৮০২৩১	১৮১৭৬৮	৭৩৭২৮	৩৮.৩৩	৪০.৯১
২০০১	৫২৫৭৫৫	২০৯১৩৭	১৪৯৩৫৮	৬২১৫৩	২৮.৪১	২৯.৭২
২০০২	৫৩৮২৯৬	২১৬২৭৬	১৪৫৮৬৭	৬০০৬৭	২৬.২৬	২৬.৪৮
২০০৩	৫০১৫০৭	২০৮৯৮৩	১৯২৭১৩	৭৯৭১২	৩৫.৮৮	৩৫.৩২

সূত্র ঃ ব্যানবেইস (BANBEIS)

বিগত পাঁচ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায় যে পাশের হার ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ২০০৩ শিক্ষাবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে জানা যায় যে, ৯৫টি কলেজ থেকে কোন শিক্ষার্থী পাশ করে নি এবং দুহাজারের বেশী প্রতিষ্ঠান থেকে ৫%-এর কম শিক্ষার্থী পাশ করেছে।

২.৩ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বর্তমান প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা এবং সরকারি আদেশসমূহ বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে নিয়োজিত অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলো হলো :

(i) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর;
(ii) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর;
(iii) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড;
(iv) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড;
(v) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

এছাড়াও রয়েছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডাইরেক্টরেট অব অডিট এন্ড ইন্সপেকশন এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

কলেজ শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

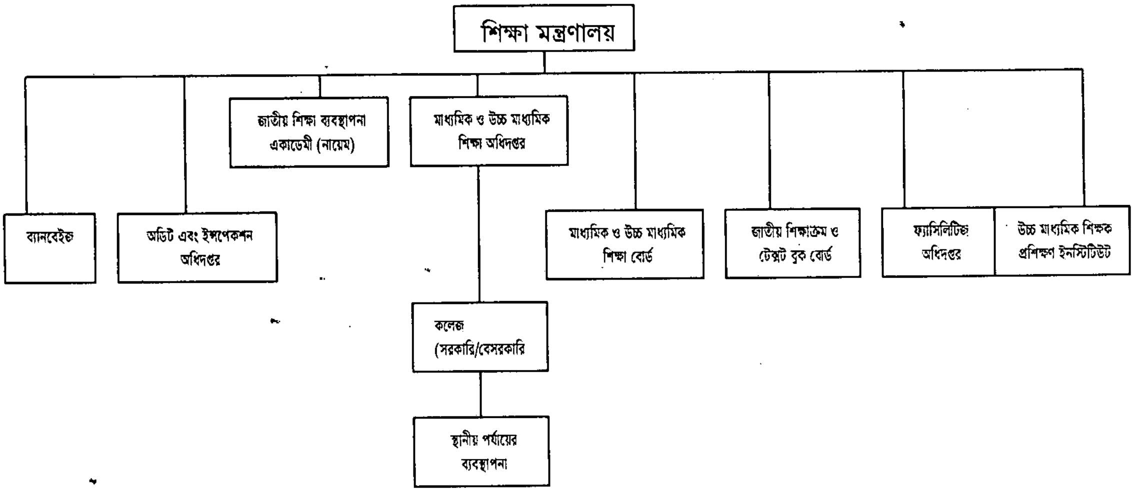

২.৪ স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ের পরিচালনা পরিষদ। শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও তদারকির জন্য গভর্নিং বডি গঠনের বিধান রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি গঠনের বিধান থাকলেও তা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেলায় এখন পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডি কলেজের উন্নতি, অগ্রগতি, অর্থযোগান, শিক্ষক নিয়োগসহ যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে থাকে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাবোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবিধান ছাড়াও সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধিনির্দেশ মেনে চলতে হয়।

বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের গভর্নিং বডি সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে সদস্য সচিব নির্বাচিত হন। সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সংসদ সদস্য (পদাধিকার বলে) গভর্নিং বডির সভাপতি থাকেন। জেলা সদরের দুইটি কলেজে সংসদ সদস্য, অবশিষ্ট কলেজে জেলা প্রশাসক বা তাঁর প্রতিনিধি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়া গভর্নিং বডিতে দু'জন শিক্ষক প্রতিনিধি, দু'জন অভিভাবক প্রতিনিধি, একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, একজন দাতা সদস্য, দু'জন বিদ্যোৎসাহী সদস্য (একজন বোর্ড চেয়ারম্যান, অন্যজন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত) থাকেন। ডিগ্রি কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস

চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি। ডিগ্রি কলেজের গভর্নিং বডিতে ৩-জন শিক্ষক প্রতিনিধি, ৩-জন অভিভাবক প্রতিনিধি, ২-জন বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি, একজন প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি, দাতা প্রতিনিধি, একজন হিতৈষী প্রতিনিধি ও একজন রেজিস্ট্রিভুক্ত চিকিৎসক অন্তর্ভুক্ত থাকে।

গভর্নিং বডি কলেজসমূহ পরিচালনা, তদারকি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, শৃঙ্খলা রক্ষণ এবং বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি অনুযায়ী প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগসহ সকল দায়িত্ব পালন করে।

২.৫ বর্তমান সমস্যাসমূহ :

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

(i) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ডসহ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য প্রচলিত পরিদর্শন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। বোর্ডসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য পরিদর্শন করে থাকে। এছাড়া পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ পরিদর্শন করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার পরিপন্থী।

(ii) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভাগভিত্তিক শিক্ষাবোর্ড রয়েছে। বোর্ডগুলো কর্মচারীদের দ্বারা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত বলে প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। যেমন- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, ফল প্রকাশে বিলম্ব প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

(iii) বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মতো সুনির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান নেই। একটি চাকুরিবিধি ও নীতিমালার আলোকে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান কমিটির মাধ্যমে তাদের পছন্দমতো প্রয়োজনীয় শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করে। নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়। এছাড়া শিক্ষকদের পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা নেই।

(iv) বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত আধা স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মালিকানাধীন বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে–যেমন ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এগুলোর উপর সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। এতে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

(v) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বছরে একবার পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের বিধি থাকলেও কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বছরের মধ্যেও পরিদর্শন করা হয় না। ফলে প্রশাসনিক ও একাডেমিক উভয় দিকেই অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়।

অবকাঠামোগত :

(i) অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, শিক্ষার্থীদের মিলনায়তন, ক্যান্টিন ইত্যাদির অভাব রয়েছে। বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষের অভাব রয়েছে।

(ii) অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার নেই, নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণাগার। সারাদেশে কলেজ পর্যায়ের ২৫২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ২১৯৮টি লাইব্রেরি এবং ২০৩৮টি গবেষণাগার রয়েছে। এগুলো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রন্থাগারিকের পদ নেই। এজন্য গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হচ্ছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব (Lack of Accountability)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান পরীক্ষা বা ফলাফলের বিষয়টি যাচাই না করেই সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। বছরের পর বছর পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোন পরিশোধনমূলক (corrective or reformative) ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদ অর্থাৎ গভর্নিং বডিকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহিতার কোন বিধান নেই।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

বর্তমান শিক্ষার্থী-মূল্যায়নরীতিও মানসম্মত নয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দু'ছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তিতে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষার ফলাফলে দু'ছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকালের কোন কর্মসম্পাদন দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয় না। সুসমন্বিতভাবে পাঠ্যসূচি বা সিলেবাস অনুসরণ করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় না। অনেক সময় বোর্ড থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এছাড়া পরীক্ষায় ছাত্রদের নকল প্রবণতা, শিক্ষক কর্তৃক নকল সরবরাহ, অর্থের বিনিময়ে নম্বর প্রদান ইত্যাদি বিষয়েও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পর্যায়ের প্রচার মাধ্যমে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রভাব

শিক্ষার সব পর্যায়েই রাজনীতির প্রভাব একটি জটিল সমস্যা। এমনকি ছাত্র, শিক্ষক এবং প্রশাসনের সর্বত্র রাজনীতির প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রভর্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি/নবায়ন প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান থাকায় শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

মানসম্মত শিক্ষা উপাদানের অভাব (Poor quality of teaching aids)

মানসম্মত গুণগত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন যগোপযোগী শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, দক্ষ শিক্ষক এবং কার্যকর সুষ্ঠু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। শিক্ষাক্রম, মেধাবী ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনও সমস্যা বিরাজ করছে।

দুর্নীতি (Corruption)

দু:খজনক হলে-ও সত্য যে, শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে দুর্নীতি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রভর্তি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, এম.পি.ও এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রকল্প, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যয়ের স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রায় সকলের অভিমত এই যে, শিক্ষাক্ষেত্রের এইসব অপচয়ের জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অর্থব্যয় প্রত্যাশিত সাফল্য আনতে সক্ষম হচ্ছে না।

মেধাসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষকের অভাব

উচ্চ মাধ্যমিক সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে যেসব মাধ্যমিক স্কুলের সাথে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খোলা রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দেওয়ার মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব হয়েছে। অনেক মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকদের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ক্লাস নেওয়ার মতো যথেষ্ট বিষয়জ্ঞান নেই। বেসরকারি কলেজগুলোতেও উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

২.৬ সুপারিশ

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যায়।

প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামো

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা হবে দুই বছরের (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী)

(খ) মাধ্যমিক পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী একই শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মৌলিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ধারা তিনটি–সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা। প্রত্যেক ধারা আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। যেমন সাধারণ ধারায় মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসা, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি। একাদশ শ্রেণী অধ্যয়নের প্রাক্কালে প্রত্যেক শিক্ষার্থী মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী বহুমুখী শিক্ষাক্রমের যে-কোনটিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ললিতকলা বিভাগ, ধর্মশিক্ষা বিভাগ যে কোনটিতে অধ্যয়ন সুযোগ নিতে পারবে। তবে বাংলা, ইংরেজি ও কম্পিউটর প্রত্যেক শাখায় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যানবেইস ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা প্রশাসন

(i) বিভিন্ন ধরনের কলেজের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী সম্পৃক্ত না রেখে নবম ও দশম শ্রেণী সম্বলিত সকল সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী খোলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

(ii) শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শনের নিমিত্তে আঞ্চলিক অফিস খোলা যেতে পারে।

(iii) দেশের সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে নতুন কলেজ খোলার অনুমতি দিতে হবে। বোর্ডকর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্তির শর্তাবলি পূরণ ব্যতীত উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ প্রতিষ্ঠা যাতে না করা যায় সে বিষয়ে সতর্ক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। বিদ্যমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে।

(iv) শিক্ষাব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল স্তরের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

(v) সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাঠামোগত পরিবর্তন এনে এর জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মহাপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সবাই কাজের চাপে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকেন যার ফলে কলেজের শিক্ষকদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে অর্থ, শ্রম ও সময় ব্যয় করে দিনের পর দিন ঢাকায় অবস্থান করতে হয়। তেমনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সমস্যার সৃষ্টি হয়। পৃথক অধিদপ্তর হলে জনবল-কাঠামো পরিবর্তিত হবে এবং এতে শিক্ষকদের দুর্ভোগের অবসান হবে বলে আশা করা যায়।

(vi) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় শুধু শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

(vii) গভর্নিং বডি তৈরি ও গভর্নিং বডির সদস্যদের ক্ষমতার ব্যবহার সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান গভর্নিং বডি বাস্তব অর্থে অকার্যকর এবং চরম রাজনীতিকেন্দ্রিক। গভর্নিং বডির সদস্যদের নির্বাচনপদ্ধতিও যথার্থ নয়। এর সদস্যদের অধিকাংশই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য চিন্তা করেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের তুচ্ছ বিষয়েও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত স্বার্থেও ব্যবহার করেন। সেজন্য গভর্নিং বডি তথা কলেজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংস্কারের প্রয়োজন। গভর্নিং বডির দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়া উচিত যাতে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম বিঘ্নিত করতে না পারেন।

(viii) প্রাইভেট টিউশনি এবং কোচিং সেন্টার বন্ধ করার জন্য দৃঢ় ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

(ix) কলেজের শিক্ষকদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা (performance) তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারি অনুদান দেওয়া যেতে পারে।

অবকাঠামো

(i) নতুন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সময় দক্ষ প্রকৌশলী ও স্থপতির সাহায্য নেওয়া দরকার যাতে শ্রেণীকক্ষের পরিসর শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত এবং উপযোগী করা যায়।

(ii) গ্রাম এলাকার কলেজগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পর্যাপ্তসংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও পাঠাগারের সুযোগ-সুবিধা গ্রামের শিক্ষার্থীরাও পেতে পারে।

(iii) প্রত্যেকটি কলেজে খেলার মাঠ থাকতে হবে।

(iv) প্রত্যেকটি কলেজে গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষাক্রম

(i) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্রম সমন্বিত হতে হবে। গ্রাম, শহর, সরকারি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যম সব প্রতিষ্ঠানেই একই রকম শিক্ষা সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জাতীয় সংহতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

(ii) শিক্ষাক্রম সমাজের প্রয়োজনের নিরিখে হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে মেধা, প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(iii) যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করার ধাপ হিসেবে বিবেচিত, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়সমূহ শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

(iv) শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণীত হবে যাতে শিক্ষাক্রমে থাকবে শিক্ষার্থীর মধ্যে নৈতিক ও আদর্শগত মূল্যবোধ, মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টির বিষয়সমূহ। শিক্ষাক্রম এমন হবে যাতে জীবিকা ও চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। নৈতিকতা, জাতীয় মর্যাদাবোধ, দেশপ্রেম এবং আত্মমর্যাদার সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করার মতো মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। শিক্ষাকে যেন শুধু অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে না শেখে।

(v) শিক্ষা প্রায়োগিক এবং ব্যবহারিক হতে হবে। এ বিষয়েও বিবেচনা করা প্রয়োজন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাকেও দারিদ্র্য দূরীকরণের যন্ত্র এবং ব্যক্তির আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(vi) ছাত্র শিক্ষক অনুপাত যথাযথ হতে হবে। কোন কোন কলেজে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১:৬০ কোন কলেজে আবার ১:১২ । ছাত্র শিক্ষক অনুপাত নির্দিষ্ট করে দেয়ার ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪০ এর উর্ধ্বে না হয়।

(vii) বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে ছাত্রবেতনেরও ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বার্থে এ অবস্থার নিরসন প্রয়োজন।

শিক্ষাপদ্ধতি

(i) প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে। শ্রেণীকক্ষে বিষয় উপলব্ধির জন্য অনেক শিক্ষার্থীর স্বল্প সময়, আবার অনেকের বেশী সময় লাগে। ব্যক্তিগত সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এমন সুযোগ থাকতে হবে। সেজন্য শিক্ষাপদ্ধতিকে নমনীয় হতে হবে।

(ii) শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের ব্যবহার ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং যোগ্যতা সৃষ্টি করবে। এমন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে হবে যাতে তা শিক্ষার্থীকে বিশ্লেষণ দক্ষতা, জ্ঞানপ্রয়োগের ক্ষমতা এবং পুরনো ভাবধারার সাথে নুতন ভাবধারার সংযোগ ঘটাতে সক্ষম করে তোলে।

(iii) শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আধুনিক হতে হবে। বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে হবে। দলীয় ভিত্তিতে কাজের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহনশীলতা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি গুণাবলি বিকশিত হবে।

(iv) সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠু পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(v) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়ে শিক্ষকদের সচেতন হতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট সমান আচরণ প্রত্যাশা করে।

(vi) শিক্ষাদান শুধু জ্ঞান বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে যেন কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় এমন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে হবে।

শিক্ষক নিয়োগ

(i) শহর এবং গ্রামের উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের মেধা, যোগ্যতা, এবং দক্ষতা একই রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

(ii) মেয়েদের শিক্ষার জন্য বর্তমান সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। এতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকতা পেশায় নারীদের সংখ্যাবৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে মহিলা কলেজগুলোতে শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা সমমানের রেখে মহিলা শিক্ষক নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

(iii) যোগ্য এবং দক্ষ শিক্ষকদের চাকুরির বয়সসীমা বর্ধিত করা যেতে পারে।

(iv) সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মতো বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগের জন্য কর্ম কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

(v) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় আঞ্চলিক পরিদপ্তর গঠন করা যেতে পারে। আঞ্চলিক পরিদপ্তরে পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ) পদ সৃষ্টি করে তাদের অধীনে উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, পরিদর্শকসহ অন্যান্য সহায়ক পদ সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কার্যক্রম জেলা এবং থানা পর্যায়েও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। এতে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের কাজটি নিয়মিত এবং নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

(i) প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(ii) শিক্ষকদের জন্য সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে।

(iii) বর্তমানে ৫টি এইচ,এস,টি,টি,আই-তে বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা দরকার। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা দরকার।

(iv) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণোত্তর সমীক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

(v) আধুনিক প্রশিক্ষণ রীতিনীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(vi) সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (Training Institute) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(vii) সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। শূন্য পদ পূরণের সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত হতে হবে।

গ্রন্থাগার

(i) প্রত্যেক উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার থাকতে হবে। যথেষ্ট সংখ্যক রেফারেন্স বই এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই, ম্যাগাজিন এবং পত্র-পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(ii) শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়ে শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্য বিষয় এবং অন্যান্য বই পড়ার বিষয়ে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষকদের গ্রন্থাগারে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। ছাত্ররা নিয়মিত লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন করছে কিনা তা অব্যাহত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে তাদের পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার অব্যাহত শ্রেণী মুল্যায়নের একটি উপাদান হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

(iii) গ্রন্থাগারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত গ্রন্থাগারিককে নিয়োগ দিতে হবে।

আবাসন

(i) প্রত্যেকটি কলেজে ছাত্রাবাস থাকতে হবে।

(ii) শিক্ষকদের জন্য কলেজ সংলগ্ন অথবা স্বল্প দূরত্বে আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং কলেজে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

(iii) মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ফি ছাড়া হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(iv) হোস্টেল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন।

(v) হোস্টেল নির্মাণের সময় ছাত্রসংখ্যার বিষয় বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় কক্ষ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

৩. শিক্ষকদের মর্যাদা অধিকার ও দায়িত্ব

শিক্ষকদের দায়িত্ব

শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়নে এবং শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষকদের মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষকই হচ্ছেন যে-কোন শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র এবং শিক্ষার মান চূড়ান্তভাবে শিক্ষকের মান ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা একটি প্রত্যক্ষ জাতিগঠনমূলক কার্যক্রম। শিক্ষার সকল স্তরে নরনারী নির্বিশেষে উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যাচাই করে নিতে হবে এবং জাতীয় জীবনে শিক্ষকরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের দাবিদার তাদের সে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। তা নইলে কোন শিক্ষাসংস্কারই সফল হবে না।

(i) আমাদের শিক্ষকদের নিজ পেশা ও জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ, গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সদিচ্ছা, শিক্ষার আধুনিক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন থাকা আবশ্যক। বিদেশী যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশীয় সহজলভ্য উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প ও আগ্রহ থাকা দরকার।

(ii) শিক্ষার্থীর মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, তাদের ভিতরে শ্রমশীলতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন করা এবং অনুসন্ধান ও সমালোচনার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলা শিক্ষকের মূল দায়িত্ব। শিক্ষকরা যোগ্যতা ও কৃতিত্ব সহকারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং কলেজের শিক্ষকতার কাজে নিদিষ্ট সময় ব্যয় করবেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষার্থীদের পরিচালনা, পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কার্যক্রম ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষার ও শ্রেণীর কাজ, টিউটোরিয়াল কাজ ইত্যাদি এবং কলেজে থাকাকালীন সময়ে তাদের আচরণবিষয়ক মূল্যায়নের তথ্য ক্রমপুঞ্জিত আকারে লিপিবদ্ধ করবেন।

(iii) শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। শিক্ষকদের অধ্যাপনা/শিক্ষকতা যাতে নৈর্ব্যক্তিক ও গতানুগতিকতায় পর্যবসিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

(iv) শিক্ষকরা যাতে তাদের সময় ও যোগ্যতা সম্পূর্ণ নিয়োগ করতে পারেন সেজন্য শিক্ষাবছরের একটা কার্যতালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

(v) শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিগত, ভাবাবেগজাত ও সামাজিক প্রয়োজন উপলব্ধি করার মানসিকতা থাকতে হবে। এবং সহানুভূতি ও হৃদ্যতার মাধ্যমে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর আস্থা অর্জন করতে হবে।

(vi) শিক্ষাসংশ্লিষ্ট যে-কোন সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার মতো প্রবণতা থাকতে হবে।

(vii) শিক্ষকদের আচরণ যাতে নিজেদের দেওয়া উপদেশসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। উপদেশ ও আচরণের অসঙ্গতি তরুণ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ক্রমশ শিথিল করে দেয়। শিক্ষকদের নিজেদেরকেই আদর্শ এবং মূল্যবোধের বাস্তব উদাহরণ হতে হবে।

৩.১ শিক্ষকদের মর্যাদা ও অধিকার

একজন সার্থক শিক্ষক বহুগুণের অধিকারী। যে বিষয়ে তিনি শিক্ষাদান করেন সে বিষয়ে তাঁর উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। তাঁর তত্ত্বাবধানে পাঠরত ছেলেমেয়েদের মনোভাব উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে। শিক্ষককে স্বীয় বৃত্তিগত মর্যাদা সম্পর্কে গভীর প্রত্যয়সম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু সে সঙ্গে সরকারকেও তাদের নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার কথা বিবেচনা করতে হবে।

(i) শিক্ষকদের কাজে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শ্রম, নিষ্ঠা ও অবদানের বিনিময়ে যাতে তারা যোগ্য মর্যাদা পান সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে।

(ii) যোগ্যতাভিত্তিক বেতননির্ধারণ নীতির ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

(iii) বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ রাখতে হবে।

(iv) শিক্ষকদের মেধাবী সন্তানদের বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(v) শিক্ষাকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে দেশের চাকুরির বেতন কাঠামোতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই কাঠামো তৈরি করতে পারলে আমাদের দেশের প্রতিভাবান মেধাবী ও যুবসম্প্রদায় শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হবে। শিক্ষকতা পেশাকে যদি রাষ্ট্রীয় চাকুরি কাঠামোর সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে মেধাবী ও বিষয়বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ভবিষ্যৎ উন্নতির সুযোগ সুবিধা চিন্তা করে অন্য পেশা গ্রহণ না করে শিক্ষকতা পেশাকেই বেছে নেবেন। বর্তমানে শিক্ষকতা পেশার সর্বোচ্চ পদটি বেতন কাঠামোর দিক থেকে প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বোচ্চ পদটির নিম্ন মর্যাদায় রয়েছে।

(vi) শিক্ষকদের স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের সুযোগ ও পরিবেশ দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকাংশ শিক্ষককেই আর্থিক অনটন ও অনেক সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হয়। শ্রেণীকক্ষের অভাব, ছাত্রসংখ্যার আধিক্য, সমাজে শিক্ষকদের নিম্ন মর্যাদা এসব সমস্যা নিরসনের জন্য সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন।

(vii) শিক্ষকেরা যাতে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে বেতনক্রম নির্ধারণ করতে হবে। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বেতন দেওয়া যেতে পারে। গ্রামের মহিলা শিক্ষকদের জন্য প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন সমাজ ও সুশিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকসমাজকে সকল প্রকার সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যথার্থ সম্মানজনক অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যে-কোনও স্তরের শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। শিক্ষাসম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের বেলায় শিক্ষকদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন।

(viii) সমযোগ্যতাসম্পন্ন সব স্তরের শিক্ষকদের বেতনহারে কোন তারতম্য থাকা উচিত নয়। শিক্ষকদের উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণা কাজের জন্য ছুটি দিতে হবে।

(ix) শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অভাব অনটন ও অসুবিধার মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষককে কাজ করতে হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষকই সরকারি অনুদান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। বাড়িভাড়া, উৎসবভাতা পান না। কলেজ থেকে সামান্য ও অনিয়মিত বেতনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিও স্বীয় পেশার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। শিক্ষকদের এমন পরিবেশে কাজ করতে হয় যা দু:সাহসী ব্যক্তিকেও নিরুৎসাহিত করে ফেলতে পারে। অনেকেই আর্থিক প্রয়োজনে টিউশনি করতে বাধ্য হন। এর ফলে শিক্ষকদের কাছে উন্নতমানের শিক্ষাদান প্রত্যাশা করা যায় না। ফলে শিক্ষার মান অবনমিত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ বের করতে হলে শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ এবং পদমর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে।

মূল রচনা :

বেগম জাকিয়া আখতার; জনাব সবদার আলী।

সূচিপত্র

উচ্চ শিক্ষা

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
উচ্চ শিক্ষা: সাধারণ চিত্র	১০৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান	১১২
তৃতীয় অধ্যায়	
বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ও বিধিবিধান	১১৮
চতুর্থ অধ্যায়	
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জ্যাম	১২১
পঞ্চম অধ্যায়	
বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবর্তন	১২৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিবিধান	১৩০
সপ্তম অধ্যায়	
একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা : পূর্বাভাস	১৩৩
অষ্টম অধ্যায়	
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা (ভৌত বিজ্ঞান)	১৩৭
নবম অধ্যায়	
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা (জীববিজ্ঞান)	১৫০
দশম অধ্যায়	
কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা	১৬২
একাদশ	
কলেজ পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা : মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান	১৬৭
দ্বাদশ অধ্যায়	
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা	১৭২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
কলেজ শিক্ষা : একটি সমীক্ষা রিপোর্ট	১৮৮

প্রথম অধ্যায়
উচ্চ শিক্ষা: সাধারণ চিত্র

১. প্রতিষ্ঠানসমূহ

১.১ বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চ শিক্ষা বলতে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ের সকল শিক্ষাকে বোঝানো হচ্ছে। এদেশে মূলত দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে: (ক) বিশ্ববিদ্যালয় এবং (খ) কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কিছুসংখ্যক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সর্বমোট সংখ্যা বর্তমানে ২১টি। এই ২১টি উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টি রয়েছে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলোতে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা দান ও গবেষণা করা হয়। এছাড়া রয়েছে কিছুসংখ্যক পেশাগত শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান। নিম্নের সারণি থেকে প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাদানের বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি-১: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ধরন	সংখ্যা
১.	সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়	৭টি
২.	প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	(১+৪) = ৫টি
৩.	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩টি
৪.	চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	১টি
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩টি
৬.	অধিভুক্তিদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়	১টি
৭.	উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	১টি
মোট		২১টি

(বি:দ্র: প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার মধ্যে সম্প্রতি যে ৪টি বিআইটি (BIT)-কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত)।

উল্লিখিত সরকারি ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বর্তমানে দেশে বেসরকারি উদ্যোগে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে এগুলির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও উল্লেখ্য যে এগুলির প্রায় সবকটি ঢাকা নগরে অবস্থিত।

১.২ কলেজ

এক সময়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রি (পাস) পর্যায়ের শিক্ষা দান করা হতো সে সব প্রতিষ্ঠান কলেজ নামে অভিহিত। এখন সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাদান এখন আর কলেজগুলির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। অপর পক্ষে, ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলেজগুলিকে ডিগ্রি (পাস), ডিগ্রি (অনার্স) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাদানের জন্য অধিভুক্তি দেওয়া হয়। পরবর্তী কয়েক বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলির সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আয়োজিত উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত একটি সেমিনারের কার্যবিবরণী (Proceedings) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা যেখানে ছিল ৮৪৪, ২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২৯৭। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৩ সালের ৩রা জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদানকারী কলেজের সর্বমোট সংখ্যা ১৪৮২।

নিচের সারণিতে সরকারি এবং বেসরকারি কলেজসমূহের সংখ্যা দেওয়া হল : এ পরিসংখ্যান ২০০২ সালের।

ক্রমিক নং	কলেজের ধরন	সংখ্যা
(ক)	অনার্স কলেজ	১৫০টি
(খ)	মাস্টার্স ১ম পর্ব	৭৬টি
(গ)	মাস্টার্স শেষ পর্ব	৮৯টি
(ঘ)	আইন কলেজ	৬৭টি
(ঙ)	শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ	৬৮টি
(চ)	কম্পিউটার সায়েন্স ও বিভিন্ন কলেজ	৬৪টি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আরও বিভিন্ন ধরনের কলেজ রয়েছে যা সংযোজনীতে (সংযোজনী-১) দেওয়া হল।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলি ছাড়াও দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বা অঙ্গীভূত কিছু কলেজ রয়েছে। অঙ্গীভূত কলেজসমূহ মূলত বিশেষায়িত কলেজ। নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের সংখ্যা দেখানো হল :

সারণি-২

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নাম	সংখ্যা
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫টি
২.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৫টি (কেবল)
৩.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১টি(কেবল)
৪.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৩টি(কেবল)

২. শিক্ষাক্রমের পর্যায়সমূহ

নীতিগতভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাদানসহ এম.ফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণা পরিচালিত হয়। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাচীনত্ব অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের ব্যাপকতা নির্ধারিত হয়েছে, এটিই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৯২১ সনে স্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিষয়ভিত্তিক বিভাগ ৪৮টি এবং ইনস্টিটিউট ৯টি। অপরপক্ষে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ সংখ্যা ১৫টি এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ইনস্টিটিউট নেই (বি ম ক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০১)। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বি.বি. শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাদান ও গবেষণা পরিচালিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০ সালে সর্বপ্রথম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি আরম্ভ হয়।

কলেজগুলির মধ্যে যেগুলি সাধারণ শিক্ষাদানকারী কলেজ সেগুলিতেই স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাদান করা হয়। এগুলি বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল কলেজে স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান) ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। সাধারণ শিক্ষার স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কলেজগুলির বেশীর ভাগই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (সংযোজনী-১)।

৩. ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে বাকি ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রী-২০০১ সনের হিসেবে (বি ম ক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০১) ৯২৫৬২ জন। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৫১৪৭ জন অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ছিল ১:১৮। অবশ্য কেবল কর্তব্যরত শিক্ষকদের সংখ্যা বিবেচনা করলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:২২। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বি বি শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বি বি শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০১ সনে ছাত্র ভর্তি করেছে বলে স্বভাবতই এই সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত যথাক্রমে ১:৩ এবং ১:৫। এ দুটিকে বাদ দিলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত রাজশাহী এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:২৯, যা সর্বোচ্চ। অপরপক্ষে, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপাত সর্বনিম্ন ১:১১।

দেশে বেসরকারি উদ্যোগে ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসেব মতে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো এখনও সুচারুভাবে গড়ে উঠতে পারে নি, কিন্তু রাজনীতিজনিত অনির্ধারিত বন্ধ নেই বলে এবং শিক্ষা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটর করা হয় বলে এ সব প্রতিষ্ঠানে কোন সেশন জ্যাম নেই। শিক্ষার সুযোগের চাহিদা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে এ কথা তো আছেই। এ সব কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১৯৯৮ সালে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৭১৮ জন, ২০০১ সালে এসে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৫,৯৬৮ জন।

ইত:পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ২০০১ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১২৯৭। এসব কলেজে ঐ সালে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৩২২৭৮ এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৮১৭০০০। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২৫। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৯৭ সাল থেকে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ঐ সালে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দেশের সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৭৮ ভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে অধ্যয়নরত ছিল এবং বাকি শতকরা ২২ ভাগ ছিল দেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০১ সালে এসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা হিসেবে ৯১ আর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শতকরা ৯ ভাগ।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত বিচারে কলেজগুলির অবস্থান গড়পড়তা হিসেবে আদৌ খারাপ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার অনেক ভাল। কিন্তু কলেজগুলির পরীক্ষার ফলাফল বিচারে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। কলেজগুলির পরীক্ষার বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. ব্যবস্থাপনা

খুব স্বাভাবিক কারণে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা চরিত্রগতভাবে আলাদা। আবার সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যেমন তফাৎ রয়েছে তেমনি রয়েছে সরকারি কলেজ ও বেসরকারি কলেজের মধ্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংসদে প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মূল আইনের সাথে সংঘাত পরিহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের প্রয়োজনে স্ট্যাটিউট ও বিধিবিধান প্রণয়ন করতে পারে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে দেশের সরকারি এবং বেসরকারি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটকর্তৃক প্রণীত তিনজনের একটি প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োজিত হন, যদিও সাময়িকভাবে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা চ্যান্সেলরের আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োজিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকার থেকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অনুদান পায়। সবগুলি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ করার দায়িত্ব মঞ্জুরী কমিশনের। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বায়ত্তশাসিত।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ১৯৯২ সালে প্রণীত (১৯৯৭-এ সংশোধিত) আইনদ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এসব প্রতিষ্ঠানে উপাচার্যসহ সবরকম কর্মকর্তা ও সংস্থা (body) থাকার কথা। তবে এ সম্পর্কিত আইনটি এখনও পূর্ণাঙ্গরূপ নেয় নি বলে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকর্তা বা সংস্থা নেই। উপাচার্য উদ্যোক্তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত হন।

সরকারি এবং বেসরকারি উভয় প্রকার কলেজের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নিয়মে একটি করে পরিচালনা পর্যৎ বা গভর্নিং বডি গঠিত হওয়ার কথা। গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োজিত হন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত নিয়ম মাফিক সরকারি কলেজের কোন গভর্নিং বডি নেই। এ সব কলেজের সকল বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকারি কলেজের জনবল কাঠামোও সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়। সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকবৃন্দসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকার কর্তৃক সরাসরি নিয়োজিত হন। অপরপক্ষে শিক্ষক নির্বাচন কর্ম কমিশনের মাধ্যমে করা হয়। কলেজ পরিচালনার

জন্য অর্থও কলেজ সরকার থেকে সরাসরি গ্রহণ করে। অবশ্য সরকারি, বেসরকারি সকল কলেজে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াদি (ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা, পাঠ্যবিষয়, পরীক্ষা প্রভৃতি) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অপরদিকে, বেসরকারি কলেজের পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতা অনেক বেশি, যা শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

কলেজগুলির ব্যবস্থাপনা স্ব স্ব কলেজের গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হয়। গভর্নিং বডির গঠন এবং এর সদস্যদের মনোনয়ন/নির্বাচন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা সুনির্দিষ্ট। বিয়াম ১৯৯৮ সালের মে ও জুন মাসে কলেজ গভর্নিং বডির ৩৫২ জন সদস্যকে সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সদস্যগণ কী কী সমস্যার সম্মুখীন হন সে বিষয়ে একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। গভর্নিং বডির বিভিন্ন সদস্য অত্যন্ত সুচারুরূপে কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন তা জানিয়েছেন। তাদের মতামত পরিশিষ্টাকারে (সংযোজনী-২) দেওয়া হল।

এগুলি থেকে যে সমস্ত মূল বক্তব্য বেরিয়ে আসে তা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে :

প্রশাসনিক

১. কলেজ ব্যবস্থাপনায় অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই।

২. কলেজ পরিচালনা কমিটি আমলাতন্ত্রের ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে কলেজ উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়।

৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দুর্নীতি ও অসদাচরণের কারণে কলেজ উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হয়।

৪. কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে অধ্যক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা থাকে।

৫. প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারের ভূমিকায় থাকেন।

৬. অধ্যক্ষ শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি করেন এবং দলসৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন।

৭. কলেজে নিয়োগবিধির অস্পষ্টতার দরুণ অনেক ক্ষেত্রে donation ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

আর্থিক

৮. সরকারি অনুদান অপ্রতুল এবং অসম।

৯. কলেজের হিসাব-নিকাশের অনিয়ম।

১০. বিনা রশিদে টাকা আদায় করে আত্মসাতের প্রবণতা।

১১. ভর্তি ফরম বিক্রি করে অর্থ ভাগাভাগি করা।

১২. অবকাঠামোগত সমস্যা।

১৩. প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ ও ল্যাবরেটরির অভাব।

একাডেমিক সমস্যা

১৪. অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রশিক্ষণের অভাব।

১৫. যোগ্য ইংরেজি শিক্ষকের অভাব।

১৬. বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব।

১৭. কম্পিউটার শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের অভাব।

১৮. গ্রন্থাগারে ম্যাগাজিন/বইপত্র/পত্রপত্রিকার অভাব।

১৯. শিক্ষকগণের অনেকেই সময়মতো কলেজে আসার প্রয়োজন মনে করেন না।

২০. অধিকাংশ শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা নেই।

২১. শিক্ষকগণের অনেকেই কলেজের চাকুরিটা লেবেল হিসেবে ব্যবহার করেন।

২২. শিক্ষকেরা টিউশানির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে নিয়োজিত।

২৩. কলেজে নিয়মিত ক্লাশ না-হওয়ায় শিক্ষকেরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

পরীক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা

২৪. পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সকল স্তরের লোকের অবক্ষয়।

২৫. দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চলতে থাকায় সময় ও অর্থের অপচয়।

২৬. ব্যবহারিক পরীক্ষায় অযোগ্য পরীক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রদান।

২৭. অনেক সময় ব্যবহারিক পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করা।

২৮. অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর দেবার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করা হয়।

সামাজিক সমস্যা

এই অংশে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষক এবং ছাত্রদের উপর রাজনৈতিক দলগুলির অশুভ প্রভাব, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অবৈধভাবে কলেজের প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ, বিধিবহির্ভূতভাবে স্বল্প দূরত্বে কলেজ গড়ে ওঠা, শিক্ষকদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও আস্থার অভাব, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার কারণে সন্ত্রাসী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কলেজ প্রশাসনের অক্ষমতা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

গভর্নিং বডির সদস্যগণ বিভিন্ন শিরোনামে যে সব সমস্যার উল্লেখ করেছেন সেগুলির সম্ভাব্য সমাধানের নির্দেশ তারা করেছেন যা পরিশিষ্টে (সংযোজনী-২) জুড়ে দেওয়া হল।

মূল রচনা :
প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

দ্বিতীয় অধ্যায়
উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান

শিক্ষার গুণগত মান বলতে আমরা কী বুঝব ? কোন এক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে না পারে তখন বলা হয় শিক্ষার গুণগত মান কমে গিয়েছে। যেহেতু গুণগতমানের বিষয়টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলির সাথে জড়িত সেহেতু উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কে প্রথমে স্পষ্ট ধারণা নেওয়া দরকার।

শিক্ষার, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। এক সময় শিক্ষাগ্রহণ ছিল বিলাসিতা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া শিখতেন মূলত সমাজে অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা শ্রেণী হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য। শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটে, কেননা তখন প্রয়োজন হয় শিল্প ব্যবসাসহ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির। শিল্পোৎপাদনের সাথে সাথে আসে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষসাধনের প্রতিযোগিতা। শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন এ চাহিদা মেটাবার জন্য ডাক পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর। এভাবেই উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে হয়েছে গবেষণার সূত্রপাত, যার মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানবৃদ্ধি সম্ভব হয়। একজন শিক্ষিত শ্রমিক যে অশিক্ষিত শ্রমিকের তুলনায় বেশি উৎপাদনশীল তা আজ প্রমাণিত সত্য। একটি হিসেবে দেখা গেছে যে, কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকের অবদান জনপ্রতি ২২৬ ডলার যেখানে পাকিস্তানে ৪০৪, ভারতে ৪৬৬, মালয়েশিয়ায় ৪০৫২, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫০৩২, জাপানে ১৬৭১২ এবং অস্ট্রেলিয়ায় ২২,২৫৬ ডলার। এ হিসেবে বাংলাদেশের সর্বনিম্নে অবস্থানের কারণ মূলত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, যার সাথে যুক্ত হয়েছে শিক্ষার গুণগত মানের ঘাটতি। একই কথা খাটে শিল্প শ্রমিকের বেলায়। শিক্ষার গুণগত মানের প্রশ্নটি আরও আসছে এ কারণে যে, এখন শিক্ষালাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে অনেক, যার ফলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বলা যায় এক ধরনের চাপের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের মতো একটি দেশে সম্পদ খুবই সীমিত সেহেতু শিক্ষার জন্য ব্যয়িত সম্পদ যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ শিক্ষিত জনগণ যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগে তার ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। এরূপ সম্ভব শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের মাধ্যমে, অন্য কোনভাবে নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর চাপ বেড়েছে আরও দু'কারণে। প্রথমটি হচ্ছে জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মাণে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও পেশার ব্যক্তিদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার চাহিদা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সব দেশ পিছিয়ে রয়েছে তাদের অনুন্নয়নের মূল কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই ফাঁক পূরণ করা যেতে পারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে। অর্থাৎ গবেষণা ও নব উদ্ভাবিত ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির মধ্যে তফাৎ কমাবার মাধ্যম হচ্ছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। এ আলোচনা থেকে শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ :

উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা;

২. গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে জ্ঞানের নব নব দিগন্ত উন্মোচন করা;

৩. সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্মুক্ত করা যাতে যে কোন বয়সের মানুষ অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে জ্ঞানের রাজ্যে হালনাগাদ রাখতে সক্ষম হয়;

৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধি।

এবারে আমরা উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানের কথায় আসতে পারি।

"পেছনের দিন ভাল ছিল" একথা বলা মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাস। কিন্তু কেউ যখন বলে যে, সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার গুণগত মান আগের তুলনায় কম তখন তা বহুলাংশে সঠিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার গুণগত মান বিষয়টি ছাত্র-শিক্ষক, চাকুরিদাতা এবং সরকার বিভিন্ন জনের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ছাত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে তার পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষার মানের সূচক। কিন্তু চাকুরিদাতা একজন ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম না দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছে তার থেকে বেশি মূল্য দেন কর্মক্ষেত্রে তার দক্ষতার উপর। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এর থেকেও আলাদা হতে পারে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি কী ভাবে কথা বলেন, অন্যের সাথে কীরূপ আচরণ করেন, তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কত নির্মল ও পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করেন এ সবই সমাজের বিবেচ্য। সে যাই হোক, একটি কথা ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষক-প্রশাসক, চাকুরিদাতা, সরকার এবং সমাজের বেশির ভাগ মানুষের কাছেই শোনা যায় যে, সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার মান কমে গেছে। সত্যি করে বলতে কি, এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত ধারণা। পরিসংখ্যানের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার্জনের গুণগত মান সম্পর্কে সংখ্যাতাত্ত্বিক বা অপর কোনভাবে ধারণা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে বিভিন্ন সময়ে সরকারি কর্ম কমিশনের রিপোর্টে প্রতিযোগী চাকুরিপ্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। এ ছাড়া কলেজগুলির শিক্ষার মান কী পর্যায়ে গিয়েছে তা বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল বিচার করলেই বোঝা যায়।

গত কয়েক বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজসমূহ থেকে স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করলে অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি চিত্র পাওয়া যায়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১ সালে স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় সর্বমোট ২৭০৪২০ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় শতকরা ৩৪.২৯ জন। ঐ বছর ৩৪টি কলেজ থেকে কোন ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য হয় নি, ১৫৯টি কলেজের শতকরা ১০ ভাগের কম ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রি প্রাপ্ত হয় এবং ৩৫৪টি কলেজে পাসের শতকরা হার ছিল ২০ ভাগেরও কম। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০০২ সালে স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা হার আরও করুণ। এ বছর প্রকৃতপক্ষে শতকরা ১৯.৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ইংরেজিতে সকলকে ৭ নম্বর গ্রেস দিয়ে পাশের শতকরা হার ২৪.৭৭-এ উন্নীত করা হয়।

ঐ বছর ৪৩টি কলেজ থেকে ১ জন ছাত্র-ছাত্রীও পাশ করে নি। শতকরা শূন্যের বেশি অথচ পাঁচের কম পাশ করেছে এমন কলেজের সংখ্যা ৭৪টি। ১৭৬টি কলেজের পাশের হার ছিল শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ।

স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ১৩২। স্নাতক পর্যায়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় তাদের শিক্ষাগত মান তুলনামূলকভাবে উন্নততর। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত ২০০১ সালের স্নাতক সম্মান শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করলে মেধা, সময় ও অর্থের অপচয় এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অর্জিত ফলাফল যে কত নিম্নস্তরে নেমে গেছে তা বোঝা যায়। ফলাফলের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একটি কলেজের পরীক্ষায় অবতীর্ণ ১২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই অকৃতকার্য হয়েছে। অপর আরেকটি কলেজে ৫৮ জন ছাত্রীর মধ্যে সকলেই কৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু এটি একটি ব্যতিক্রম। কেননা দেখা যাচ্ছে যে, ১৩২টি কলেজের মধ্যে মাত্র ৩৪টি কলেজে পাসের হার শতকরা ৫০ এর উর্ধ্বে। অপরপক্ষে, যেসব কলেজ থেকে শতকরা ৩০-এর নিচে ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তীর্ণ হয়েছে তার সংখ্যা ৪০ এবং এইসব কলেজের মধ্যে অনেক সরকারি কলেজও অন্তর্ভুক্ত।

স্নাতক সম্মান শেষ বর্ষ পরীক্ষার ২০০০ ও ২০০১ সালের অর্থাৎ পর পর দু'বছরের ফল পর্যালোচনা করলে আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষায় ব্যাপকহারে অসাধুতা অবলম্বন করা হচ্ছে। এর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছাত্র, শিক্ষক ও স্থানীয় প্রশাসন অনেকেই জড়িত এমন তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০০১ সালে স্নাতক সম্মান পরীক্ষার সকল কেন্দ্র স্ব স্ব কলেজ থেকে সরিয়ে অন্য কলেজে স্থানান্তর করে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১ সালে ব্যতিক্রমধর্মী দুচারটি কলেজ বাদে প্রায় সবগুলো কলেজেই আগের বছরের তুলনায় ফল বিপর্যয় ঘটেছে। আমাদের বক্তব্যটি সুস্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি কলেজের ফলাফল নিম্নসারণিতে দেওয়া হলঃ এগুলোর মধ্যে ঢাকায় অবস্থিত অনেক নামকরা কলেজও রয়েছে।

কলেজ	বিষয়	২০০০-ফল	২০০১-ফল
ঢাকার একটি কলেজ	বাংলা	৭৮%	৪০%
,,	দর্শন	৬৮%	২৬%
,,	অংক	৭৪%	৩৯%
,,	ভূগোল	৯০%	৬১%
ঢাকার আরেকটি কলেজ (সরকারি)	বাংলা	৭৩%	৩৩%
ঢাকার একটি সরকারি কলেজ	ইতিহাস	৭৩%	২০%
,,	অংক	৬৪%	৪২%
,,	ভূগোল	৯৩%	৭৩%
ঢাকার বাইরের ১টি সরকারি কলেজ	দর্শন	৬৩%	৩৪%
,,	অংক	৫২%	৩৯%
রংপুরের ১টি সরকারি কলেজ	বাংলা	৭৫%	৩৪%
,,	দর্শন	৪৭%	৩৯%
দক্ষিণাঞ্চলের ১টি কলেজ	বাংলা	৭০%	৪৭%
,,	দর্শন	৭৫%	২৭%
,,	অংক	৬৭%	১৯%
রাজশাহীর একটি কলেজ	বাংলা	৬৮%	৩৮%
,,	দর্শন	৭৭%	৩২%
,,	অংক	২৯%	২৬%

উল্লিখিত কলেজেগুলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ফলাফল থেকে random sampling-এর ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। তবে পুনর্বার আমরা উল্লেখ করছি যে, খুবই অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে এই চিত্রই ফুটে ওঠে সর্বত্র। এর থেকে যা বোঝা যায় তা হলো ব্যাপারটি আদৌ রহস্যময় নয়।

কিন্তু শিক্ষার মানের অবনতির এ ধরনের অবস্থায় কেন আমরা এলাম ? কী তার কারণ ? এ অবস্থার জন্য দায়ী মূল কারণগুলি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে :-

১। ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা

শুনতে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হলেও একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার পরে তিন দশক চলে গেলেও আমাদের জাতীয় ভাষানীতি কী হবে, তা নির্ধারণের জন্য সরকার কোনদিন কোন কমিশন গঠন করে নি, যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকেও ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশাবলি উচ্চারিত হয়েছে। এর ফলে দেশে কোন একক ভাষানীতি নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। বিজ্ঞজনেরও অভাব নেই এখানে। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে সকলেই যে এক ভাষা ব্যবহার করছেন তা মোটেও নয়। এ তফাৎ বিভিন্ন অনুষদে তো বটেই একই অনুষদের বিভিন্ন বিভাগেও। এমন কি কোন কোন বিভাগের শিক্ষকগণের মধ্যে সকলেই যে একই ভাষায় শিক্ষাদান করছেন তাও নয়।

ভাষা বিভ্রাটের আরেকটি দিক বাংলা-ইংরেজির দ্বন্দ্ব। স্বাধীনতার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের বাংলায় বক্তৃতা দেবার নির্দেশ জারি করে। প্রথম দিকে কিছুটা অসুবিধা হলেও শিক্ষকরা যদিওবা, নিজেদের প্রস্তুত করেছেন কিন্তু ব্যাঘাত দেখা গেছে বই-পুস্তকের অভাবের ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৌশল বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান আজও ইংরেজি ভাষানির্ভর। কেননা এসব বিষয়ে কোন বাংলা পুস্তক লেখা হয় নি। একই অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলির মধ্যে। এরপরও কিছু কিছু উৎসাহী শিক্ষক বাংলায় বক্তৃতা দেন। কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ছাত্ররা সমস্যায় পড়ে, কেননা বাংলা বই পুস্তক যদিওবা আছে তা-ও কিন্তু ভুলে ভরা। কিছু কিছু বই-পুস্তক পশ্চিম বাংলা থেকে আসে, কিন্তু এগুলিও অনেক ক্ষেত্রে এদেশের পাঠ্যসূচি উপযোগী নয়।

কারণ আরও রয়েছে। বাংলা বা ইংরেজি কোন ভাষাতেই আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নেই। ভাষার এই ডামাডোলের কারণে উচ্চ শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আজ বিপর্যস্ত।

২। বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিপর্যয়

ভাষাজনিত কারণের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের বিদ্যালয়ের (প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক) বিপর্যস্ত অবস্থা। এই প্রতিবেদনের অপর দুই অংশে বলা হয়েছে, স্কুলগুলিতে বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যা তা আদৌ ভাষাশিক্ষা লাভের উপযোগী নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যান্য সমস্যাসহ পাঁচ বছর লেখাপড়া করার পরেও ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জন দুর্বল। অন্যদিকে মাধ্যমিকের কথাই যদি ধরা যায়, সেখানেও মুল বিষয় অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকসংখ্যা অত্যন্ত কম। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এসে পৌঁছে তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষাগত প্রস্তুতি প্রায় ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কমার আরেকটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

৩। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ও মানসিক প্রস্তুতি

একজন ছাত্র-ছাত্রী যখন উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে (বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে) শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসে তখন শিক্ষকেরা তাকে তার অধীত বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য তো বটেই সাথে সাথে বিষয়টির দার্শনিক দিক এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াস পান। কিন্তু এ-সবই শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রীক ভাষার মতই দুর্বোধ্য। অতএব শিক্ষার্থীরা অল্প দিনে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিষয়ে কঠোর নিয়ম অনুসরণ করে শেষপর্যন্ত যে বিষয়ে ভর্তি করা হয় তার সাথে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর পছন্দ বা আগ্রহ থাকে না। স্বভাবত যে বিভাগে তাকে ভর্তি করা হয় সে বিষয়ে শীঘ্রই তার অনীহা দেখা যায়। তার সাথে যখন যুক্ত হয় পঠিত বিষয়ের দার্শনিক ও আন্তর্জাতিক দিক তখন তা বোঝার উপর শাকের আঁটির মত শিক্ষার্থীর ঘাড়ে চেপে বসে, যে ভার বইতে সে আদৌ সক্ষম হয় না। অতএব যদিও তার একটি ডিগ্রি নেওয়ার ইচ্ছা থাকে কিন্তু শেখবার আগ্রহের অভাবের জন্য সে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকে জ্ঞানার্জন করতে পারে খুব সামান্যই।

৪। শিক্ষাজীবন শেষে চাকুরি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা

শিক্ষিত যুব সমাজের বেকারত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া মুশকিল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে যতই গালভরা বুলি শোনা যাক না কেন প্রকৃত তথ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা খুব একটা উজ্জ্বল নয়। এও ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় অনাগ্রহের একটা উল্লেখযোগ্য কারণ।

৫। শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক পরিবেশ

শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক পরিবেশও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুকূল বলে দাবি করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধার (যা মফস্বলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবশ্যক) অপ্রতুলতা তো আছেই তার সাথে যুক্ত হয় তাদের খাবারের নিম্নমান। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য যে অব্যাহত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় উক্ত সব কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা অনুপস্থিত।

৬। রাজনীতি

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে জনগণের সমস্যা অনেক। এ সব সমস্যা তরুণ মনকে সবসময় আন্দোলিত করে, বিশেষ করে সে আরও ক্ষুব্ধ হয় যখন দেখে যে এ সব সমস্যার অনেকগুলি মনুষ্যসৃষ্ট। স্বভাবতই তার মনে বিদ্রোহের ভাব জেগে ওঠে। এ মনোভাবকে আরও উসকিয়ে দেয় দলীয় এবং গোষ্ঠীগত রাজনীতি। আর, একবার রাজনীতির উত্তপ্ত অঙ্গনে প্রবেশ করলে (বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রাজনীতিতে টেনে আনে) সেখান থেকে সে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। একটি অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসে। মানসিক এই অস্থিরতা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কখনই অনুকূল নয়।

৭। শিক্ষকদের ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ শিক্ষার্জনের জন্য অনুকূল রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁরা সে ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছেন কি না সে সম্পর্কে নানা মহলে প্রশ্ন উথাপিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার বিষয়টি বেশি করে শোনা যায়। গত দুই দশকে শিক্ষকদের উচ্চতর পদে নিয়োগ আগের তুলনায় সহজতর হয়েছে। তবে যে বিষয়টি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের মনোভাব। ছাত্র-শিক্ষক মিলেই বিশ্ববিদ্যালয়। স্কুলজীবনে একদিকে অভিভাবকের কর্তৃত্ব অন্যদিকে বিদ্যালয়ের নিয়মকানুনের শৃঙ্খল ইত্যাদি থেকে বেরিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তখন তরুণদের প্রয়োজন হয় একজন বন্ধুর, একজন সহায়কের ও একজন অভিভাবকের। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের বন্ধুর ভূমিকা চিরাচরিত ভাবে পালন করে এসেছেন শিক্ষকমণ্ডলী। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। পারিপার্শ্বিক কারণে শিক্ষকেরা আজ সে ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। এখন টিউটোরিয়াল পদ্ধতি পরীক্ষা গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে একদিকে ভীতিকর হয়ে উঠেছে অন্যদিকে তার দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য আদৌ সহায়ক হচ্ছে না। ছাত্রাবাসগুলির প্রভোষ্ট ও হাউস টিউটরদের দায়িত্ব এখন প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। কোন ক্ষেত্রেই ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের দূরত্ব কমে আসছে না। এ অবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার অগ্রগতির অনুকূল বলে কেউই দাবি করবে না।

প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে। এখন যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই নবীন শিক্ষকেরা বিভাগীয় প্রধান হন সেহেতু নিজেদের শিক্ষক পর্যায়ের প্রবীণ শিক্ষকদের উপরে তাদের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছে এ অভিযোগ প্রায়শ শোনা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের মর্মবাণী সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ সব কারণে বিভাগে নিয়মিত ক্লাশ হচ্ছে কি না এবং সময়মত পাঠ্যসূচি সুষ্ঠুভাবে শেষ হচ্ছে কিনা এসব বিষয়ে খেয়াল করা হচ্ছে কম। অবশ্য দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছুক শিক্ষকের সংখ্যা খুব অল্পই। তবে অন্তত দুটো ক্ষেত্রে শিক্ষকবৃন্দ যে অনাগ্রহী হয়ে পড়েছেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বীকার করেন। এর একটি ক্ষেত্র হচ্ছে টিউটোরিয়াল। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ে যে টিউটোরিয়াল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তার উপকারিতা ছিল অনেক। এক, এর মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে নৈকট্য স্থাপিত হতো এবং তার ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হতো সৌহার্দ্যপূর্ণ। দুই, ছাত্ররা সরাসরি শিক্ষকদের এবং তাদের মাধ্যমে জ্ঞানের বৃহত্তর রাজ্যে প্রবেশ করতে অনুপ্রাণিত হতো। লেখাপড়াই হতো তাদের কাম্য। তিন, টিউটোরিয়াল ক্লাশে ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার প্রয়াস পেতেন শিক্ষকবৃন্দ। তা ছাড়া বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও বেশ খানিকটা হয়ে যেতো। এর ফলে পরীক্ষা পেছানোর দাবি উঠতো কম, যার থেকে উদ্ভূত বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকের অনেক সমস্যা। দুর্ভাগ্যজনক যে আজ এই পদ্ধতি মাঝে মাঝে কয়েকটি পরীক্ষা নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যার সাথে টিউটোরিয়াল পদ্ধতির উদ্দেশ্যের কোন মিল নেই। উল্টো বরং মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিলে পরীক্ষার দু'চারদিন আগে ক্লাশে অনুপস্থিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে, যা পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে পর্যবসিত হয়।

আরেকটি ক্ষেত্রেও বিভাগীয় পর্যায়ে একাডেমিক কার্যক্রমের ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তা হচ্ছে পাঠ্যসূচি আধুনিকীকরণ। প্রতিটি বিভাগে কমিটি অব কোর্সেস রয়েছে, যার একটি দায়িত্ব হচ্ছে বছরে অন্তত একবার বিভাগে প্রচলিত পাঠ্যসূচির মূল্যায়ন ও প্রয়োজনে তার কিছুটা রদবদল। তার উদ্দেশ্যে হচ্ছে, বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে কলেবর বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে পাঠ্যসূচিকে সময়োপযোগী করা। কমিটি অব কোর্সেসের বার্ষিক সভায় যে এ দায়িত্ব পালন করা হয় না তা নয়, তবে খুব সম্ভবত তা যৎকিঞ্চিৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি এবং পদসৃষ্টির প্রবণতা যতটা দেখা গেছে প্রচলিত পাঠ্যসূচির আধুনিকায়ন সম্পর্কে আগ্রহ ততটা দেখা যায় নি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান সংরক্ষণ এবং এর অব্যাহত বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সুপারিশ হবে নিম্নরূপ :

১. ভাষা শেখার সময় মূলত: প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এসব পর্যায়ে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. যেহেতু ভাষা শিক্ষা এবং ভাষার ব্যবহার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবে ভাষাজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে সেহেতু কমিশন সুপারিশ করছে যে জাতীয় ভাষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক।

৩. প্রকৃতপক্ষে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষার মান যদি সুসংহত না করা যায় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তা সম্ভব নয়; সেজন্যই বিদ্যালয়গুলির দিকে নজর দিতে হবে আরও বেশি।

৪. বিদ্যালয়গুলি থেকে উন্নতমানের ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে না-আসা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর প্রথম ছয় মাস ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য তাদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষাজ্ঞান (বাংলা ও ইংরেজি উভয়) বৃদ্ধি।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এর বৃহত্তর ক্ষেত্রে হারিয়ে না-যায় ও পরিবেশের সাথে শীঘ্র নিজেদেরকে একাত্ম করতে পারে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রশাসকদের (বিশেষ করে উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, ডীন, বিভাগীয় প্রধান) সকলকে প্রথম থেকেই চেষ্টা করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে :

(ক) বিভিন্ন পর্যায়ে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নবীন-বরণ অনুষ্ঠান করা অত্যাবশ্যক। নবীন-বরণ অনুষ্ঠান যদি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হয় তাহলে উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য সকল অনুষদের ডীন এবং প্রয়োজনবোধে কোন কোন প্রবীণ শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল অতীত, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। অনুরূপভাবে অনুষদ পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়েও এ ধরনের নবীন-বরণ উৎসব হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুষদ পর্যায়ে এ ধরনের অনুষ্ঠানে ডীন মহোদয় সভাপতিত্ব করতে পারেন যেমন বিভাগীয় ক্ষেত্রে সে দায়িত্ব পালন করবেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নবীন-বরণের দিন সকল ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতিমূলক একটি পুস্তিকা দেওয়া যেতে পারে। বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠানের দিন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিভাগীয় শিক্ষকদের তালিকা, তাদের পাঠ্যসূচি এবং পরীক্ষার নিয়ম-কানুন সম্বলিত কাগজপত্র দেওয়া অত্যাবশ্যক। চেয়ারম্যান মহোদয় ঐদিন শিক্ষকদের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলকে অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। সভার প্রারম্ভে পুরোনো ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে নুতন ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হবে। এ সব করার উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভাগীয় প্রশাসন ও পুরোনো ও নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে যাতে সম্পর্কের কোন দেয়াল না থাকে। আবাসিক হল পর্যায়েও নবীন-বরণ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে হল-প্রশাসনের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে কোন দূরত্ব না থাকে তার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস নিতে হবে। প্রশাসন এবং শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এ সব কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশের সাথে একাত্মবোধ করবে যা শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক পরিবেশ শিক্ষার অনুকুল রাখতে খুবই সহায়ক হবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নির্দেশনা ও পরামর্শ বিভাগ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক দিকের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় ঘটাবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের আরও প্রসার ঘটাতে হবে।

উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলি সবই সম্পাদিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু যা প্রয়োজন তা এই যে, এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ এবং এগুলি যাতে প্রাণবন্ত হয় তা দেখা, যাতে তা কেবল আনুষ্ঠানিক রীতিতে রূপ না নেয়।

৬. বিভাগীয় শিক্ষা কার্যক্রম আরও সুসংহত হওয়া কাম্য। এর জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করবে ও ব্যাপকভাবে তা ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের মাঝে প্রচার করবে।

(খ) উপর্যুক্ত ক্যালেন্ডার সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে প্রতিটি বিভাগে একাডেমিক কমিটি মাসে অন্তত একবার তা মনিটর করবে। অনুরূপভাবে, অন্তত প্রতি তিন মাসে একবার অনুষদ পর্যায়ে তা আলোচনা হওয়া দরকার। অনুষদের ডীন প্রতি তিন মাসে একবার এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপাচার্যের কাছে প্রেরণ করবেন এবং উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্য প্রতি তিন মাসে ডীন, চেয়ারম্যান এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের সাথে বসে আলোচনা করে নির্ধারণ করবেন কোথাও একাডেমিক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নে ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে কিনা এবং হলে তা নিরসনের চেষ্টা করতে হবে।

৭. প্রতিবছর কমিটি অব কোর্সেসের সভায় বিভাগীয় পাঠ্যসূচিতে কিছু কিছু পরিবর্তনের রীতি প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে অন্তত প্রতি তিন বছরে একবার কমিটি অব কোর্সেসের সভায় বিভাগীয় সিলেবাসের বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হলে নতুন নতুন কোর্স প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসগুলি বিশ্বমানের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

৮. পরীক্ষার বহিরাগত পরীক্ষকগণ যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার মান সম্পর্কে উপাচার্যের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন সে সম্পর্কে বিধিবিধান প্রণীত হওয়া দরকার।

৯. লেখাপড়া শেষে যদি ছাত্র-ছাত্রীরা বেকার থাকতে বাধ্য হয় তাহলে লেখাপড়ায় তারা খুব কমই মনোনিবেশ করতে পারবে। কর্মসংস্থান মূলত সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে এটিই কাম্য।

১০. ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে বহু আলোচনা, বহু তর্কবিতর্ক এদেশে হয়েছে। সংগঠন করার অধিকার যেহেতু সংবিধানস্বীকৃত তাই এ অধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তদুপরি প্রতিটি ছাত্র-সংগঠন আইনিভাবেই কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন। কিন্তু এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশকে ক্ষুণ্ন না করে তা দেখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলের, সরকার, রাজনৈতিক দল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ছাত্র-সংগঠন এবং বৃহত্তর সমাজের। এ বিষয়ে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতি অথবা সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক দল এবং সমাজের অপরাপর অংশের সাথে আলোচনা ক্রমে তার রূপরেখা যদি প্রণয়ন করেন তা দেশের জন্য কল্যাণকর হবে।

মূল রচনা :

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

তৃতীয় অধ্যায়
বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ও বিধিবিধান

বৃটিশরা আমাদের দেশে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে রাজত্ব করে। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, শিক্ষাক্ষেত্রে Academic Freedom এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ধারণা আমরা মূলত ওদের দেশ থেকেই পেয়েছি। ঐ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ একাডেমিক ফ্রিডমকে তাঁদের অধিকার হিসেবেই বিবেচনা করেন। সহজ কথাই বলতে গেলে জ্ঞান-আহরণ এবং জ্ঞান-বিতরণের স্বাধীনতাই একাডেমিক ফ্রিডম বলে বিবেচিত হয়। গ্রীকদের আমলে Lyceum অথবা মধ্যযুগীয় ইউরোপে Studium generale অথবা আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সব সময় কিছু ব্যক্তি ছিলেন বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে যারা সমাজের অন্যান্য অংশের ব্যক্তিদের তুলনায় অত্যন্ত উঁচু মানের বলে বিবেচিত হন। সমাজ সেজন্যই তাঁদের সব সময় সম্মান দিয়ে এসেছে। তাছাড়া উচ্চমানের পণ্ডিতদের সমাবেশ শিক্ষাঙ্গনে প্রগতিশীল ধারণা এবং বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কায়েমি স্বার্থের (পুরোহিততন্ত্র বা সরকার) বিরোধ বেধেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতকুলের সাথে কায়েমি স্বার্থের দ্বন্দ্ব গত ৮০০ বছর ধরে চলে আসছে। এই দ্বন্দ্ব থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার ধারণার জন্ম। কেননা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা না-থাকলে একাডেমিক ফ্রিডমও থাকে না। এক কথায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, স্বাধীনভাবে জ্ঞান আহরণ এবং জ্ঞান বিতরণের স্বাধীনতার জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

প্রশ্ন হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা সরকার কীভাবে ক্ষুণ্ন করে। মূলত সরকারের হাতে দুটি মাধ্যম থাকে : এক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নয় সেহেতু তাদের অর্থের প্রয়োজনে সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। অর্থাৎ বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হতে পারে এমন কোন একাডেমিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এককভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। বাড়তি অর্থের প্রয়োজনে সরকারের সাথে তাদের সমঝোতা করতে হয়, তাদের একাডেমিক ফ্রিডম বাধাগ্রস্ত হয়।

দুই, নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনের উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রচেষ্টা করে। এ ধরনের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আন্দোলন আরম্ভ করেন। এরই ফল হিসেবে ১৯৭৩-এ রাষ্ট্রপতির আদেশ ১১ নং দ্বারা পুরোনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। অপর একটি আইন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আইন দুটির মূল উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা। প্রথমটির দ্বারা উপাচার্যের নিয়োগ পুরোপুরি সরকারের হাতে না-রেখে আংশিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সিনেটের হাতে অর্পিত হয়। সিনেট কর্তৃক তিনজনের একটি প্যানেল থেকে নিয়োগ দেবার বিধি প্রচলিত হয়। অপর আইনটি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি দপ্তরে না গিয়ে কমিশনের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তির বিষয় বিধিবদ্ধ হয়। এসব ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে নিশ্চিত করার বিধিবিধান প্রণীত হয়। বিষয়টি নিম্নে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

১৯৭৩-এর রাষ্ট্রপতির আদেশের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষকদের একাডেমিক ফ্রিডম সুনিশ্চিত করা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিষ্ঠা এবং সিনেটের প্যানেল থেকে উপাচার্য নিয়োগের পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই সাথে একজন ব্যক্তি-শিক্ষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ পরিবর্তনগুলি যেসব মূল নীতির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে :

(১) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং (২) শিক্ষকদের মধ্যে সহকর্মীসুলভ সমতা প্রতিষ্ঠা। প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর যাতে কোন ব্যক্তির হাতে এককভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয় তার জন্য যেমন প্রয়োজন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তেমনি প্রয়োজন শিক্ষকদের মধ্যে সমান অধিকার প্রয়োগের বিধান। এ সব নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে কীভাবে নতুন বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে তার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন এখানে নেই, তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে উল্লিখিত নীতিগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষকদের মধ্যে অনেকগুলি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিনেট অর্থাৎ যে সংস্থাটি উপাচার্যের প্যানেল নির্বাচন করে তার ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩৫ জন শিক্ষকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থা সিন্ডিকেটের ১৭জন সদস্যের মধ্যে ৬ জনই শিক্ষকদের নির্বাচিত । অনুষদের ডীনও অনুষদের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত হন। বিভাগীয় পর্যায়েও শিক্ষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন বিধিবিধান, যার সবগুলিরই উদ্দেশ্য শিক্ষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে যে আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তা ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুসারে প্রণীত হয়েছিল। কিছুদিন পর রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুরূপ আইন জাতীয় সংসদে প্রণীত হয়। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মূলত একই রকম, যদিও খুব স্বাভাবিক কারণে কিছু কিছু জায়গায় পার্থক্য রয়েছে। সে যাই হোক, গত ৩০ বছর যাবৎ উক্ত চারটি বিশ্ববিদ্যালয় এই আইনগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রায় প্রথম থেকেই এই আইনের মূল বিষয়গুলির কোন কোন দিক সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের সমাজে দ্বিমত ছিল। যারা প্রশ্ন তুলেছেন তারা প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী। লক্ষণীয় যে, গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর থেকেও আইনের কোন কোন দিকের সুষ্ঠুতা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে আজকাল। এসবের মধ্যে মূল প্রশ্নগুলি কি?

প্রধান বিষয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তা বাস্তবে কতটুকু সার্থক হয়েছে। একথাটি আসছে এ কারণে যে, ক্ষমতাসীন সরকারের পছন্দের বাইরে কারও পক্ষে উপাচার্যের পদ লাভ করা বাস্তবে সম্ভব হচ্ছে না। অর্থৎ যিনি উপাচার্য পদে নিয়োগ পাচ্ছেন সরকারের প্রতি তার অনুগত্য থাকছেই। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন কেবল আংশিকভাবেই অর্জিত হয়েছে। অপরদিকে, যে সিনেট প্রণীত তিনজনের প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেবেন সেই সিনেটে ২৫ জন নির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি থাকা নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকারের আনুকূল্য না-পেলে ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সময় সরকার সরাসরি উপাচার্য নিয়োগ করত তখনও সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরা সরকারি সহায়তায় নির্বাচিত হতেন। আজকে যেহেতু সিনেটের ক্ষমতা অনেক বেশি তাই সরকার, শিক্ষকদের বিরাট এক অংশ এবং উপাচার্য পদপ্রার্থী ব্যক্তি সকলেই এ নির্বাচনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন সারা দেশব্যাপী (বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য) এক মহাযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। এর জন্যে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শ্রম এবং শক্তির অপচয় হচ্ছে। অন্যদিকে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটির ফলাফল নির্ভর করছে আর্থিক সামর্থ্যের উপরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে এ যে এক অশুভ প্রভাব ফেলছে, তা বলাই বাহুল্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে এর বিকল্প খোঁজার।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এখানে আলোচিত হওয়া দরকার, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে-সব নীতির ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ-১৯৭৩ প্রণীত হয়েছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছিল তার মধ্যে অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্যের ক্ষমতা এই নীতির ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা বিভাজন করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন আইন প্রণীত হয় সে সব ক্ষেত্রে সবসময় তা মেনে চলা হয় নি। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-উপাচার্য নিয়োজিত রয়েছেন কিন্তু তিনি উপাচার্য বা সিণ্ডিকেটের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্যের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, যার নিরসন হওয়া দরকার।

তৃতীয় প্রশ্ন এসেছে বিভাগীয় পর্যায়ে আবর্তনের নিয়মে চেয়ারম্যান নিয়োগ পদ্ধতির ফলাফল সম্পর্কে। একথা ঠিক যে এ নিয়মের (আইনের মধ্যে আরও অনেক নিয়মসহ) ফলে শিক্ষকদের মধ্যে পদভেদে যে সহকর্মীসুলভ সমতার নীতি প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা ছিল তা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এর বিপক্ষে যা বলা হচ্ছে তার সারমর্ম এই যে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক নবীন শিক্ষক চেয়ারম্যান পদ অলঙ্কৃত করছেন যারা বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম সমন্বয়ের ব্যাপারে তাদের শিক্ষক পর্যায়ের প্রবীণ শিক্ষকদের উপর প্রয়োজনীয় ন্যূনতম তদারকি বিস্তার করতে পারছেন না। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে নানান বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সরাসরি বলতে গেলে সব সময়ে ঠিকমত ক্লাশও অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্যের একটি প্রতীক যে অত্যাবশ্যক টিউটোরিয়াল, তা এখন কতগুলো সাময়িক পরীক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরীক্ষার ফল সময়মত প্রকাশিত হচ্ছে না। এসবের সামগ্রিক কুফল হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জ্যাম।

১৯৭৩ এর বিধিবিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও কিছু ক্ষেত্রে অশুভ প্রভাব পড়ছে, বিশেষ করে শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ১৯৭৩ এর আদেশ পালন করতে গিয়ে শিক্ষকদের অনেকগুলি নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর ফলে শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় বিভক্তি আগের তুলনায় তীব্রতর হয়েছে। এমন অভিযোগ প্রায় উত্থাপিত হচ্ছে যে, দলীয় অবস্থান দৃঢ় করার জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দল বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য প্রাধান্য পাচ্ছে এবং মেধার বিচার গৌণ হয়ে পড়ছে। এ অভিযোগ হয়তোবা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়, কিন্তু এ ধরনের

ঘটনা যে ঘটছে সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই আজকাল বলে থাকেন। এসব বিষয় মাথায় রেখেই হয়তো সিন্ডিকেট প্রতিনিধি নির্বাচন এবং শিক্ষক নিয়োগ আইনের কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ অবস্থান দৃঢ় করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। এ সব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন কলুষিত হয়ে পড়ছে এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ১৯৭৩ এর আদেশ-এর পক্ষে বেশ কিছু জোরালো যুক্তি খাড়া করা যেতে পারে, তবে এটাও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের সমাজ আইনের কোন কোন দিক নিয়ে সব সময় সমালোচনায় সোচ্চার। কমিশনের মতে গত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে এ আইনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপ :

১. একাডেমিক কাউন্সিলে সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারারদের নির্বাচনের বিধান তুলে দেওয়া যেতে পারে।

২. ডীন নির্বাচিত না হয়ে উপাচার্য কর্তৃক সিনিয়রিটির ভিত্তিতে এবং সুনির্দিষ্ট আবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ থেকে মনোনীত হওয়ার বিধি প্রবর্তিত হতে পারে।

৩. সিন্ডিকেটে শিক্ষকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মেয়াদ ২ বছরের জায়গায় ৩ বছর করা যেতে পারে।

৪. উপাচার্য পদের জন্য নির্বাচন/মনোনয়ন/সুপারিশ নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সার্চ কমিটির মাধ্যমে করা যেতে পারে।

৫. শিক্ষক নিয়োগের নির্বাচন কমিটিতে সিন্ডিকেট যে ২ জন সদস্য মনোনয়ন দান করে তারা সিন্ডিকেটের বাইরের এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও বাইরে থেকে হওয়া উচিত।

৬. সিন্ডিকেটে যে তিনজন সদস্য চ্যান্সেলর মনোনয়ন দান করেন তাদেরও বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত ব্যক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭. বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পদ ৩ বছরের মেয়াদে আবর্তিত হলেও তা অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে।

৮. যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-উপাচার্য নিয়োজিত রয়েছেন সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ক্ষমতা আইনদ্বারা নির্ধারিত করা প্রয়োজন যেন স্বায়ত্তশাসনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ একক ক্ষমতার অধিকারী না হন।

৯. সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন মহলের সাথে আলাপ-আলোচনাক্রমে বিকল্প পদ্ধতি চিন্তা করা যেতে পারে।

উপরের এক নম্বর সুপারিশটি করা হচ্ছে এ কারণে যে একাডেমিক কাউন্সিল এখন এত বিরাট যে এ বিধিটি অপ্রয়োজনীয়। দুই নম্বর সুপারিশের উদ্দেশ্য শিক্ষকদের সিনিয়রিটি ও অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন বিভাগের পর্যায়ক্রমিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, যার ফলে কেউ যাতে নিজেদের বঞ্চিত না মনে করে। তিন নম্বর সুপারিশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি নির্বাচনের মধ্যে সময় প্রলম্বিত করা। এর ফলে শিক্ষকদের মধ্যে নির্বাচনের জন্য যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততা হয় তা কমে আসবে। বর্তমানে প্রচলিত আইনটি প্রণীত হওয়ার পর শিক্ষকদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বেশ কিছু ক্ষেত্রে উপাচার্য পদে নির্বাচনকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তো বটেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও এ নিয়ে সমালোচনা প্রচুর। তবে এ কথাও ঠিক যে এর বিকল্প হিসেবে খুব কম শিক্ষকই উপাচার্য পদে নিয়োগের ব্যাপারে পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতে চাইবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনী কমিটির (সার্চ কমিটি) মাধ্যমে উপাচার্য পদে মনোনয়ন দানের সুপারিশ করছে। সার্চ কমিটির একটি রূপরেখা সংযোজনীতে (সংযোজনী-৪) দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকের নির্বাচন পর্ষদে সিন্ডিকেটের যে দুইজন মনোনীত সদস্য থাকার কথা তা বাইরের ব্যক্তিকে মনোনীত করলে নির্বাচনী পর্ষদের নিরপেক্ষতা অনেকখানি রক্ষিত হবে। অনুরূপভাবে, সিন্ডিকেটে চ্যান্সেলর যে তিনজন সদস্য মনোনয়ন দান করেন তারাও যদি শিক্ষক না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ব্যক্তি হন তাহলে সিন্ডিকেটের সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থা হিসেবে নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে। এ চিন্তাধারা থেকেই পাঁচ ও ছয় সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মুলত বিভাগভিত্তিক, সে কারণে বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ লোকদেরই থাকা উচিত। সেজন্যই সাত নম্বর সুপারিশ করা হয়েছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্যের মধ্যে মন কষাকষি নিরসনের জন্য ৮নং সুপারিশের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অবশ্য এ সব বিষয়ে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হওয়া দরকার। এ দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বি-ম-ক) নিতে পারে।

মূল রচনা :

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

চতুর্থ অধ্যায়
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জ্যাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জ্যাম সম্পর্কে এখন সংশ্লিষ্ট সকলেই অবহিত। চিত্রটি মোটামুটি এরকম। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান ৩ বছর মেয়াদি (সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান কোর্স চালু হয়েছে) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায় ১ বৎসর মেয়াদি। এ হিসেবে একজন শিক্ষার্থীর যেদিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে তার চার বছরের মধ্যে এম.এ/এম.কম/এম.এস.সি ডিগ্রি পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। নমুনা হিসেবে একটি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ থেকে একজন ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাজীবনে যে সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হয় তার প্রত্যেকটি পর্যায়ের আরম্ভ ও শেষ হওয়ার তারিখ নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৫ সালের ২১শে অক্টোবর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বছর উত্তীর্ণ যে সব ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল তাদের কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রির ফল বিভাগভেদে ১৪/২/২০০০ থেকে ১৪/৮/২০০০ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ তিন বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি পেতে তাদের লেগেছিল মোটামুটি সাড়ে চার বছরের মতো। ঐ ব্যাচেরই ছাত্র-ছাত্রী যারা মাস্টার্স শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল তাদের বিভাগভেদে ২৫/০৯/২০০১ থেকে ১৪/০৮/২০০২ সালে ফল প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক ফল প্রকাশের তারিখ থেকে বিভাগভেদে ৪ বছরের লেখাপড়া শেষ করতে ৬ বছর থেকে ৬ বছর ১০ মাস পর্যন্ত সময় লেগেছে। এ চিত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের।

বিজ্ঞান অনুষদের অবস্থাটা কি? একই বছর অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের ২১শে অক্টোবর যেসব ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি হয়েছিল তাদের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল বিভাগভেদে প্রকাশিত হয়েছিল ২৬/০১/২০০০ থেকে ১৪/১১/২০০০ এর মধ্যে। অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছর পর (সর্বোচ্চ) ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রী বি.এসসি (অনার্স) ডিগ্রি পায়। একই ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের এম.এসসি ডিগ্রি পেতে প্রয়োজন হয়েছিল কোন কোন ক্ষেত্রে আরও দুই বছর।

বিভিন্ন অনুষদের এবং বিভাগের একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের সকল তারিখ বিশ্লেষণ করে দেখলে কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে আসে। যেমন :

(ক) ভর্তি প্রক্রিয়া, শিক্ষাদান কাল, পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলপ্রকাশ এই পাঁচটির প্রতিটি পর্যায়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় হচ্ছে।

(খ) পরীক্ষা গ্রহণ থেকে ফলপ্রকাশের সময় প্রায় সম্পূর্ণই শিক্ষকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু সেখানেও দীর্ঘ সময় ব্যয় হচ্ছে। কোন কোন বিভাগে গুটি কয়েক ছাত্রের (অর্ধ ডজনেরও কম) জন্য যে সময় ব্যয় হচ্ছে তার যথাযোগ্য কোন কারণ নেই। উদাহরণ হিসেবে এখানে দু'একটি তথ্য উল্লেখ করা হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে একটি বিভাগে মাত্র ৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। তাদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের সর্বশেষ তারিখ ছিল ১৬/০৯/৯৭। কিন্তু ঐ বিভাগের ফল প্রকাশিত হয়েছিল তারও সাড়ে তিন মাস পর। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, হয় পরীক্ষকরা যথাসময়ে তাদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন নি অথবা মূল্যায়নের পরে ট্যাবুলেশনে অহেতুক দেরি হয়েছে।

(গ) একই সময়ে বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগে (ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৩৬) উত্তরপত্র মূল্যায়নের সর্বশেষ তারিখের প্রায় ৬ মাস পরে ফল প্রকাশিত হয়। ঐ অনুষদের অপর একটি বিভাগে (পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩৪) ফল প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৮ মাস পর।

১৯৯৮ সালের তৃতীয় বর্ষ (সম্মান) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সর্বনিম্ন ১ মাস ৪ দিন এবং সর্বোচ্চ ৬ মাস ২১ দিন সময় লেগেছে।

(ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের ফল প্রকাশের জন্য অস্বাভাবিক সময় ব্যয়িত হচ্ছে। স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষের পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য যে সময় ব্যয়িত হচ্ছে তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল :

বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগ, ছাত্র-ছাত্রী ৫৬ জন, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় ৫ মাস।

বিজ্ঞান অনুষদের আরেকটি বিভাগ, ছাত্র-ছাত্রী ৪৩ জন, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় ৫ মাস ৩ দিন।

প্রথম বিভাগটিতে ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে সেজন্য সময় কিছুটা বেশি লাগতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগটিতে তা নেই। প্রশ্ন জাগে এ ধরনের সময় ব্যয় কতটা যৌক্তিক।

(ঙ) স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষের ফল প্রকাশ বিভিন্ন অনুষদে বিভিন্ন সময়ে হচ্ছে। ব্যবহারিক থাকার জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম-বেশি হওয়ার জন্য অনুষদভেদে এ সময়ের বিভিন্নতা হতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা যে প্রযোজ্য নয় তার উদাহরণ প্রচুর।

সেশন-জ্যামের কারণ

(বি:দ্র: নিম্নের অংশটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করে ১৯৯২ সালে তৎকালীন উপাচার্য কর্তৃক রচিত একটি নিবন্ধের অংশ বিশেষ। এটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে পঠিত হয়েছিল ও পরে সুন্দরম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এক দশক আগে এটি রচিত হয়েছিল তবুও এ অবস্থা এখনও প্রায় অনুরূপ। উল্লেখ্য যে এখানে বিধৃত অবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়কে কেন্দ্র করে, কিন্তু তা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও সাধারণভাবে প্রযোজ্য।)

সেশন জামের প্রথম এবং প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনির্ধারিত বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বইয়ে বছরের একটি সংজ্ঞা আছে। কিন্তু এ সংজ্ঞা বহুদিন আগেই তার তাৎপর্য হারিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভর্তি, ক্লাশ আরম্ভের তারিখ, পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ বা ফলপ্রকাশের তারিখ সম্বলিত কোন বর্ষপঞ্জি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। তার কারণ অনির্ধারিত বন্ধের জন্য আমরা ১লা জুলাই বর্ষ আরম্ভ করতেও পারছি না এবং নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশ সম্পাদনও করতে পারছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আজকে এই যে, প্রায় সারা বছরই কোন-না-কোন নতুন ক্লাশ আরম্ভ হচ্ছে। আর গত ২০ বছরের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার ফল হিসাবে এখন সেশনগুলি অন্তত বছর তিনেক পিছিয়ে গেছে। কেবল যে পিছিয়ে আছে তাই নয় কোন কোন ক্লাশ একাধিকও রয়েছে। নিম্নের বিবরণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত ও অনির্ধারিত বন্ধের একটা চিত্র পাওয়া যাবে। গত চার-পাঁচ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশসমূহ বন্ধের বিবরণী নিম্নরূপ :

১৯৮৭-৮৮ সালে নির্ধারিত ১১৮ দিনসহ অনির্ধারিত ১০৪ দিন মোট ২২২ দিন; ১৯৮৮-৮৯ সালে নির্ধারিত ১১৮ দিনসহ অনির্ধারিত ৩৩ দিনসহ মোট ১৫১ দিন; ১৯৮৯-৯০ সালে নির্ধারিত ১২৮ দিনসহ অনির্ধারিত ৫৮ দিন মোট ১৮৬ দিন; ১৯৯০-৯১ সলে নির্ধারিত ১১৪ দিনসহ অনির্ধারিত ৫১ দিন মোট ১৬৫ দিন; ১৯৯১-৯২ সালে নির্ধারিত ৫০ দিনসহ অনির্ধারিত ৯০ দিন মোট ১৪০ দিন। (৩১-১২-১৯৯১ পর্যন্ত)।

অনির্ধারিত বন্ধের কারণ আবার অনেক। সন্ত্রাস, সন্ত্রাসের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্ধ ঘোষণা, সরকার কর্তৃক বন্ধ ঘোষণা, শিক্ষকদের ধর্মঘট, ছাত্রদের ধর্মঘট, রাজনৈতিক দলসমূহের ধর্মঘট ইত্যাদি। সেশনজট প্রধানত এসব কারণেই হয়েছে।

সেশনজটের দ্বিতীয় কারণ ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিলম্ব। সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি করা হচ্ছে। আর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি যেহেতু সমন্বিতভাবে হচ্ছে না তাই ভর্তিকার্য সমাধা করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় হচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি প্রক্রিয়ায় ৬/৭ মাস লেগে যাচ্ছে।

বিষয়টি আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাক। বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদে এবারে ভর্তির জন্য পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ২৭শে জানুয়ারি। এরপরে ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ, সেগুলি নিরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ, সবকিছু সম্পন্ন করে ৬-১২-৯১ তারিখে, অর্থাৎ প্রায় এক বছর পরে ভর্তিপ্রক্রিয়া বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখন যারা প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে তারা ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রী, অর্থাৎ তাদের ক্লাশ আরম্ভ হওয়ার কথা ১লা জুলাই, ১৯৯০ সালে। অর্থাৎ আমরা প্রথমেই দেড় বছর পিছিয়ে গেলাম। লক্ষণীয় যে, এ দুই অনুষদে ছাত্রছাত্রীদের অন্তত চার দফায় সাক্ষাৎকারের জন্য আহবান করার পরেও এখনো বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অনুষদে শতাধিক আসন খালি রয়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার পরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও কোনো কোনো টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। যার ফলে এখান থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী পরবর্তী সময়ে ঐসব শিক্ষায়তনে চলে গেছে।

সেশনজটের তৃতীয় কারণ সময়মত পাঠ্যসূচি শেষ না হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিতভাবে বন্ধ হওয়ার জন্যই যে সময়মত ক্লাশ শেষ হচ্ছে না তাই নয়। দু:খজনক হলেও সত্যি যে, প্রায় প্রতিটি বিভাগে ২/১ জন শিক্ষক থাকেন যাদের ক্লাশ পেনিলোপের সূতার মতো, যার শেষ নেই। এর ফলে পাঠ্যক্রম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। স্বভাবতই পরীক্ষার তারিখও আগে থেকে ঠিকমত নির্ধারণ করা যায় না। আর পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করলেও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পরীক্ষা পিছানোর দাবি ওঠে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম প্রধানত বিভাগভিত্তিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে

যে, বিভাগীয় চেয়ারম্যান পর্যায়ে হয় কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে গেছে, না হয় কোন কোন ক্ষেত্রে বিভাগীয় চেয়ারম্যান মহোদয়গণ তাঁদের উপর শিক্ষা কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের যে দায়িত্ব রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন না বলেই এ রকম ঘটছে।

ছাত্রদের পরীক্ষা পিছানোর দাবি সেশনজটের আরেকটি কারণ। গত দুই দশকে এমন কোন ঘটনাই মনে পড়ছে না যেখানে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করার পরে ঐ তারিখ ঠিক রাখতে পেরেছি। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা হওয়ার পরে ছাত্রদের পক্ষ থেকে পরীক্ষা পিছানোর দাবি উঠবেই এবং চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত তা মানতেও হয়। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যাহত হয়।

সেশনজটের আরেকটি কারণ পরীক্ষা গ্রহণে দীর্ঘ সময় ব্যয়। আজকাল একটি রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে যে, দু'টি পরীক্ষার মাঝে ৪/৫ দিন করে বিরতি দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য নিজস্ব কারণেই এ বিরতি দিতে হয়। কেননা, আমাদের এমন পরীক্ষা কক্ষ নেই যেখানে একই দিনে সকল ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব, অর্থাৎ ৩/৪টি ব্যাচ করতেই হয়। আর তার ফলে কমপক্ষে কয়েকদিন বিরতি থাকেই। এছাড়া রয়েছে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, অন্যান্য ছুটির দিন ইত্যাদি। এসব নিয়ে দু'টি পরীক্ষার মাঝে যেহেতু ব্যবধান বেড়ে যায় তাই পরীক্ষা নিতেও দুই থেকে তিন মাস সময় লেগে যায়।

এরপরে ফলপ্রকাশের কথা। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রতিটি খাতা দুইজন পরীক্ষক দেখেন। আবার দুই পরীক্ষকের নম্বরের মধ্যে ২০% ভাগের বেশি ব্যবধান হলে তৃতীয় আরেক জন পরীক্ষক নিয়োগ করতে হয়। দুই-জন পরীক্ষকের মধ্যে যেহেতু একজন বহিরাগত তাই খাতাপত্র আনানেওয়া ইত্যাদিতে কিছু সময় ব্যয় হয়। এছাড়া রয়েছে কোন কোন পরীক্ষকের সময়মত পরীক্ষার খাতা না দেখার বাতিক। পরীক্ষার ফলপ্রকাশের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ সময় (কোন কোন ক্ষেত্রে এক বছরও) চলে যায় তা সেশন জটের একটি কারণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছাত্রছাত্রীরা যখন পরীক্ষা পেছানোর দাবি নিয়ে আসে তখন দুটো প্রধান যুক্তি দেখায়– এক, পাঠ্যসূচি শেষ না-হওয়া এবং দুই, পরীক্ষার ফলপ্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব।

নিয়মকানুনের জটিলতাও কিন্তু সেশনজটের বৃদ্ধিতে কোন কোন ক্ষেত্রে কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে একটি মোটা উদাহরণ দিচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার এবং বার্ষিক দুই পদ্ধতিই চালু আছে, আবার একই অনুষদে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা এবং প্রমোশন পদ্ধতিও আলাদা আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের এসব নিয়মকানুন সম্পর্কে প্রায় সময়েই স্পষ্ট ধারণা থাকে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের আবেদন-নিবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনেক সময় চলে যায়। আর তাই সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর আসে পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন, অর্থাৎ জটটা আরও বাড়ে।

প্রতিকারের উপায়

এবারে সেশনজটের কবল থেকে কীভাবে উত্তরণ সম্ভব তা আলোচনা করা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভর্তি প্রক্রিয়া, শিক্ষাদান কার্যক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ সব পর্যায়েই অস্বাভাবিক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। সেশনজট সত্যি সত্যি কমাতে হলে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপ্তিকাল কমিয়ে আনতে হবে এবং যেহেতু সমস্যাটি ব্যতিক্রমধর্মী তাই কিছু ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতিও গ্রহণ করতে হতে পারে। এখন আমাদের সেশন আরম্ভ করতেই দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবং তা ক্ষেত্রবিশেষে এক থেকে দেড় বছর। এর কারণ হিসাবে ভর্তি পরীক্ষার জটিলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আর একটি কারণ উল্লেখ করা হয় নি, তা হচ্ছে এই যে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল এখন বের হচ্ছে নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে যা আগে পূর্ববর্তী জুন মাসের মধ্যে বের হতো। অর্থাৎ বোর্ডের ফল প্রকাশে বিলম্ব ও পরবর্তী পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া, এ দুইয়ে মিলে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে এক/দেড় বছর পর। অতএব সেশন-জট নিরসন করতে হলে প্রথমত বোর্ডগুলিকে আগের মতো জুন মাসের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

এরপর আসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-প্রক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং বি.আই.টি. গুলোর ভর্তিপরীক্ষা একই সাথে গ্রহণ করে সমন্বিত মেধাতালিকা প্রণয়ন করে ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছেমতো কে কোন প্রতিষ্ঠানে যেতে চায় তা নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে। এ ব্যবস্থা অবশ্য বলছি কেবল বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অনুষদদ্বয়ের জন্য। আমরা দেখেছি এবং ইত:পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আগে পরীক্ষা নিয়ে ও ভর্তি করে ছাত্রছাত্রীদের আমরা রাখতে পারছি না। কারণ পরবর্তী সময়ে অনেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ অথবা বি.আই.টি-তে চলে যায়। এজন্য এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়টি সমন্বয়সাধন করা প্রয়োজন। প্রশ্ন আসবে এই সমন্বয়সাধন কে

করবে? এটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন করতে পারে অথবা প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একসাথেও করতে পারে কিংবা কেন্দ্রীয় কোন সংস্থার মাধ্যমেও তা হতে পারে। এই সমন্বয়সাধন করতে পারলে দুমাসের মধ্যে ভর্তি-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারব, অর্থাৎ যে শিক্ষা বছরের ছাত্রছাত্রী সেই বছরে সেপ্টেম্বরে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাশ আরম্ভ করতে পারব–এভাবে প্রথমেই এক বছর সময় বেঁচে যাবে।

এবার আসি পাঠদানের সময়সীমার কথায়। সাধারণভাবে কোন কোর্সই সম্পন্ন করতে ৫০টির বেশি বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ যদি ২০ সপ্তাহের ক্লাশ হয় এবং প্রতি সপ্তাহে একটি কোর্সের জন্য তিনটি করে ক্লাশ নেয়া হয় তাহলে যে কোনো কোর্স শেষ করা সম্ভব। গত এক বছর ধরে এ কথাটি বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এ ধারণাটি গ্রহণ করাতে পারছি না। জানি না কেন ? কারণ আমিও তো দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করেছি এবং ২০ সপ্তাহে নিয়মিত ক্লাশ নিলে একটি কোর্স কেন সমাপ্ত হবে না কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, মনে হয় কারণটি অন্যখানে। অবশ্য বোর্ড যদি ক্লাশ না নেন তাহলে ২০ সপ্তাহ কেন, কোনোদিনই তা শেষ করা সম্ভব হবে না। যাক সে কথা যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, বছরের ধারণাটি বদলাতে হবে। এ কথা বোঝা উচিত যে, ১২ মাসে যে বছর হয় সে বছর পঞ্জিকার বছর। কিন্তু ১২ মাসের বছর কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও আছে? ১২ মাসের মধ্যে ৩ মাস গ্রীষ্মাবকাশ এবং আরও এক মাস বিভিন্ন ছুটি থাকে। অর্থাৎ আসলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কার্যকাল হচ্ছে ৮ মাস। এই ৮ মাসের মধ্যে ছাত্র ভর্তি করতে হবে, পড়াশোনা সম্পন্ন করতে হবে, পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় দিতে হবে, পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে পাঠদানের সময় ২০ সপ্তাহের বেশি পাওয়া কি যাবে কখনও ? এটাই প্রশ্ন।

এর পরে আসে পরীক্ষা পদ্ধতির কথা। এখানে আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন আপনাদের সামনে শুধুই বিবেচনার জন্য পেশ করব। এখন যে সেশন জটের চোরাবালিতে আমরা আটকা পড়ে গেছি তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রথম এবং দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে কোর্স সমাপনী পরীক্ষা উঠিয়ে দিলে আমরা ৪/৫ মাস সময় বাঁচাতে পারি। জানি এ কথা বলার সাথে সাথে একটি রৈ রৈ আওয়াজ উঠবে এবং বলা হবে যে, এবার সব গেল। কোর্স সমাপনী পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে অবশ্য এর বদলে যা সুপারিশ করতে চাই তা হচ্ছে এই যে, ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্স চলার সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একটি সার্বক্ষণিক মূল্যায়ন হতে পারে, যে মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের পরীক্ষার ফল নির্ধারিত হতে পারে। এ মূল্যায়নের অনেকগুলো উপাদান থাকতে পারে। যেমন ধরা যাক বলতে পারি যে, ক্লাশে ৭৫% ভাগ হাজিরা, প্রতিটি কোর্সের জন্য অন্তত দুইটি পাঠ্য বই পড়ে তা পর্যালোচনা করা, দুইটি টিউটোরিয়াল করা এবং কোর্স শেষে আধ ঘন্টাব্যাপী মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা। এসবগুলির সমন্বয়ে যদি পরীক্ষার ফল নির্ণীত হয় তাহলে কি আমরা সঠিক মূল্যায়ন করতে পারব না ? অবশ্য কোর্স সমাপনী লিখিত পরীক্ষা যদি বাদ দিতে হয় তাহলে যে ব্যবস্থার কথা বললাম সেই উপাদানগুলি ছাড়া অন্যান্য কী কী উপাদান এবং কোনটির মূল্য কতভাগ হতে পারে তা সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণ করতে হবে। আমি এ ব্যবস্থা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর জন্য বলছি। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই কোর্স সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় এবং স্বভাবতই তৃতীয় পরীক্ষক পদ্ধতি বাদ দেয়া যেতে পারে। স্নাতকোত্তর (শেষ পর্ব) পরীক্ষায় চিরাচরিত প্রথাটি আমরা রেখে দিতে পারি।

এ কথাটা বলছি এ জন্য যে, বহুদিন ধরে যে পদ্ধতি চলে আসছে তা হঠাৎ করে পরিবর্তন করলে পরীক্ষার গুণাগুণ সম্পর্কে বাইরের জগতের মানুষের আস্থা কমে যেতে পারে। যা হোক, যদি কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে কোর্স চলাকালীন মূল্যায়নে যাই তাহলে এক বছরে দুবছরের পড়াশোনা শেষ করা যাবে। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা চালু করে দেখতে পারি তা সফল হচ্ছে কিনা? যদি সফল হয় তাহলে তা বরাবরের জন্য চালু হতে পারে। আর আমাদের মনে যদি সন্দেহ হয় এ পরীক্ষা- ব্যবস্থার মাধ্যমে যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না তাহলে অন্তত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য অর্থাৎ সেশন-জট দূর করা পর্যন্ত সময়ের জন্য এটি রেখে আমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারি।

পাঠ্যসূচি এবং ক্লাশ লোডগুলি একবার পর্যালোচনা করা দরকার। বিজ্ঞান অনুষদের ডীন হিসাবে লক্ষ করেছি যে, এক ইউনিট প্র্যাকটিক্যাল কোর্সের জন্য বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন সময় ব্যয় করছে। কোন কোন বিভাগ অন্য বিভাগের তুলনায় অন্তত চারগুণ সময় ব্যয় করছে। রসায়ন বিভাগেই প্র্যাকটিক্যাল কোর্স সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়েছে। এ বিষয়গুলি একটু পর্যালোচনা করা দরকার। আসলে আমরা যখন পাঠদান করছি তখন এগুলোও চিন্তায় রাখতে হবে যে, ছাত্রদের লেখাপড়া করার সময় কতটুকু থাকছে?

পরীক্ষা ও প্রমোশনের নিয়মাবলি সম্পর্কে কিছু সুপারিশ আছে। সম্মান ও সাবসিডিয়ারি মিলে যে সব কোর্স আছে তা একজন ছাত্র যখন যেটার পরীক্ষা দিতে পারবে তা যদি দেয় তাহলে কী কোন ক্ষতি হবে? একটি অসুবিধা এই হতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে বেশিদিন অবস্থান করার কারও কারও প্রবণতা বাড়তে পারে। কিন্তু এরূপ যাতে না হয় সেজন্য তিন বছর অবস্থানের পর একজন ছাত্রের হলের আসন বাতিল করা যেতে পারে এবং তার মাইনে ও পরীক্ষার ফিস বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা একটি পরিবর্তন আনতে পারি একই পরীক্ষা বছরে দুবার গ্রহণের ব্যবস্থা করে, তাতে পরীক্ষা পেছানোর প্রবণতা কমবে।

সাংবাৎসরিক কার্যক্রমের বর্ষপঞ্জি তৈরি করে সকল ছাত্রছাত্রীকে তা বছরের প্রারম্ভেই জানিয়ে দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। যাতে তারা আগে থেকেই জানতে পারে তাদের পরীক্ষার তারিখসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে এবং সেভাবে যাতে তাঁরা পূর্বাহ্নেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। এ বর্ষপঞ্জির ভিত্তি হতে পারে ২০ সপ্তাহ কালব্যাপী ক্লাশ, ৪/৬ সপ্তাহ পরীক্ষার (যেখানে প্রযোজ্য) প্রস্তুতির সময়, ৪/৬ সপ্তাহব্যাপী পরীক্ষা গ্রহণ, ৬/৮ সপ্তাহের মধ্যে ফলপ্রকাশ।

সেশন-জ্যাম থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে উপরে যা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো পুনরায় এখানে সংক্ষেপে সুপারিশ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডগুলি আগের মত জুন মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করবে।

২. বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তিপরীক্ষা সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকর ২০ সপ্তাহের মধ্যে বছরের পাঠদান কার্য সমাধা করতে হবে।

৪. তিন বছরের তিনটি কোর্স সমাপনী পরীক্ষার পরিবর্তে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সুচিন্তিত উপাদান সম্বলিত ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা যেতে পারে। বাৎসরিক কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা কেবল তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সেক্ষেত্রেও ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও কোর্স সমাপনী পরীক্ষার সমন্বয়ে ফল নির্ণীত হতে পারে এবং তৃতীয় পরীক্ষক পদ্ধতি উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে এ ব্যবস্থা অন্তত কয়েক বছর চালু রেখে তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের পাঠসূচির সাথে সমন্বয় রেখে কত ঘন্টা পাঠদান এবং ব্যবহারিক ক্লাশ অনুষ্ঠিত হবে তা অনুষদ পর্যায়ে পূর্বাহ্নে নির্ণয় করা আবশ্যক।

৬. সম্মান ও অনুষঙ্গী কোর্সগুলির পরীক্ষায় যে ছাত্র যখন অবতীর্ণ হতে চায় তখন তাকে সে সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

৭. বছরে দুবার পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮. বছরের প্রথমেই সাংবাৎসরিক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি পঞ্জি তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে দিতে হবে যাতে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে।

উপসংহারে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে যদি আমাদের আন্তরিকতা না-থাকে, যদি ছাত্রছাত্রীদের মটিভেশন না থাকে, আর যদি অনির্ধারিত বন্ধে পড়াশোনার ছেদ না পড়ে। অনির্ধারিত বন্ধই সেশনজটের প্রথম ও প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রতিকারের বিষয়ে বলতে গিয়ে একথা আর আনি নি ইচ্ছাকৃতভাবেই। কারণ মনে করি তা প্রধানত যে জন্য হয় তা হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস। সন্ত্রাস যেহেতু বহিরারোপিত তাই তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত। সন্ত্রাস যারা করে বা করায় তারা যদি এবিষয়ে এগিয়ে না-আসে তাহলে সম্প্রতি একজন প্রবন্ধকার যেমন লিখেছেন আমাদের সমবেতভাবে একটি 'প্রার্থনা সভা' করা ছাড়া আর কী-ইবা করার আছে।

মূল রচনা :

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

পঞ্চম অধ্যায়
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবর্তন

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। যাত্রারম্ভে এর কোন কোন দিক এ প্রতিষ্ঠানকে উপমহাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। প্রথমত; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এটি অধিভুক্তিদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। দ্বিতীয়ত; এটি আবাসিক ছিল বিধায় এর ছাত্র-ছাত্রী বাস করত ছাত্রাবাসে, যেগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছিল হল, যার প্রশাসনিক প্রধান প্রভোস্ট। প্রত্যেকটি হলে কিছু সংখ্যক হাউস টিউটর ছিলেন। এ ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এখানকার নিয়মিত টিউটোরিয়াল পদ্ধতি। অপর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এখানকার তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি। এ সবের ধারণা পাওয়া গিয়েছিল অক্সফোর্ড থেকে। আর তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হতো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। জন্মলগ্ন থেকে সিকি শতাব্দী যাবৎ এ সবের কোন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু ১৯৪৭-এর পর পারিপার্শ্বিক কারণে এর প্রথম কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। তখন এটি আর তার আবাসিক একক প্রতিষ্ঠানগত (unitary) বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারল না। হলো অধিভুক্তিদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের কলেজগুলিরও শিক্ষাসম্পর্কীয় কোন কোন বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব নিতে হল। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সব মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল আরও এক সিকি শতাব্দী চলে যায় সে-সবের কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর। নিম্নে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত পরিবর্তন আনা হয়েছে সেগুলো কী এবং সেগুলি কতটুকু যৌক্তিক ছিল এ আলোচনাই এখানকার উপজীব্য।

(ক) সেমিস্টার পদ্ধতি

১৯৭৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়। এর সূচনা হয় বিজ্ঞান অনুষদে। পরে অন্যান্য অনুষদে-ও তা গৃহীত হয়। তিন বছরের পাঠ্যসূচিতে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল মোটামুটিভাবে সেগুলিকেই ছয় মাসের কোর্সে বিভক্ত করে এ পদ্ধতি চালু করা হয় এবং আমেরিকান পদ্ধতি অনুসরণে কোর্স চলাকালে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার নিয়ম চালু হয়। উদ্দেশ্য ছিল মূলত দুটি: এক, শিক্ষার্থীদের মন থেকে পরীক্ষাভীতি দূর করে পরীক্ষা পেছানোর দাবি থেকে তাদের দূরে রাখা। দুই, আরেকটি কারণ বোধ হয় এই ছিল যে সার্বক্ষণিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা চালু থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় মনোযোগ থাকবে বেশি এবং তাদের জ্ঞানার্জনের পরিমাণও কলেবরে বৃদ্ধি পাবে। উদ্দেশ্য মহৎ থাকলেও এ পদ্ধতি বেশি দিন চালানো যায় নি, বলা চলে আঁতুড় ঘরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এর কারণ কী ?

এর কারণ ছিল বিভিন্ন। প্রথমত, শিক্ষকদের বৃহদাংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বৃটিশ পদ্ধতির সাথে পরিচিত ছিলেন। হঠাৎ করেই আমেরিকান পদ্ধতির সাথে তাদের খাপ খাইয়ে নেয়া সহজ হয় নি। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধার অভাব, খাবারের নিম্নমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ সার্বক্ষণিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য খুব একটা অনুকূল ছিল না। তৃতীয়ত, আরও একটি বিষয় ছিল, যাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। নতুন পদ্ধতি চালু করার আগে যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন ছিল তা হয় নি। ফলে ষান্মাষিক কোর্স বিভাজনে এবং ছাত্রদের বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের নিয়ম-কানুনগুলিও খুব সুষ্ঠু ও প্রশ্নাতীত ছিল না। তাই এ পদ্ধতি বেশীদিন চলতে পারে নি এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা বাৎসরিক পদ্ধতিতে পরিণত হয়। বলা চলে সেমিস্টার পদ্ধতির অপমৃত্যু ঘটে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল বাণিজ্য অনুষদে এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যেও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু আছে। বাণিজ্য অনুষদ বাদ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সকল অনুষদে বাৎসরিক কোর্সপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

(খ) সাবসিডিয়ারির পরিবর্তে সমন্বিত পদ্ধতির প্রচলন

তিনবছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিদান পদ্ধতিতে সম্মান বিষয়টির সাথে অন্য দুটি বিষয় অনুষঙ্গী (সাবসিডিয়ারি) বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করতে হতো। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, একপর্যায়ে এ পদ্ধতিরও পচন ধরে। সাবসিডিয়ারি বিষয়গুলিতে কেবল পাস মার্ক (শতকরা ৩৩) পেলেই চলত, কেন না অনার্স ডিগ্রির ক্লাশ বা শ্রেণী নির্ধারণে সাবসিডিয়ারি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করা হতো না। এর ফলে অনুষঙ্গী বিষয়গুলিকে ছাত্র-ছাত্রীরা আদৌ গুরুত্ব দিত না। ছাত্র-ছাত্রীদের

এমন অনাগ্রহের কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও এসব বিষয় পড়ানোর ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অনাগ্রহের আরেকটি কারণ অবশ্য ছিল এই যে, অনেক বিভাগে (সব ক্ষেত্রে তা প্রয়োজ্য নয়) বিষয়গুলি পড়ানোর দায়িত্ব থাকত অপেক্ষাকৃত তরুণ শিক্ষকদের উপর। যাই হোক, এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুষঙ্গী বিষয়গুলির প্রাপ্ত নম্বর সম্মান বিষয়ের শ্রেণী নির্ধারণে যোগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যার নাম দেওয়া হয় Integrated বা সমন্বিত পদ্ধতি। ধারণার দিক দিয়ে নীতিগতভাবে হয়তো অনুষঙ্গী বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে সম্মান বিষয়ের শ্রেণী নির্ধারণের পদ্ধতির ব্যাপারে আপত্তি করার খুব একটা কারণ নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিকে অযৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। বিষয়টা আরেকটু বিশদভাবে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

আগের পদ্ধতি কাঠামোগতভাবে ঠিক রেখে যদি কেবল অনুষঙ্গী বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে সম্মান বিষয়ের শ্রেণী নির্ধারিত হতো, তাহলে তা নিয়ে বেশি প্রশ্ন উঠত না। কিন্ত এখন যা করা হয়েছে তা এই যে, প্রতিটি বিভাগ তার ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষঙ্গী বিষয়ের সিলেবাসও প্রণয়ন করে দেবে। এর ফল হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগণ যদি কোন একটি বিষয় অনুষঙ্গী বিষয় হিসেবে নেয় তাহলে তাদের সিলেবাস হবে বিভিন্ন। স্বভাবতই কোন বিভাগই এত বিভিন্নধর্মী সিলেবাস পড়াতে পারবে না বা পড়াতে রাজি হবে না। এর ফল হবে এই যে, (হচ্ছেও তাই) প্রতিটি বিভাগ তার ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষঙ্গী বিষয়গুলির পাঠদানের জন্য হয় ঐ সব বিষয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে অথবা কয়েকজন খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগদান করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অন্য বিষয়ের অন্তত তিনজন খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। আরও কোন কোন বিভাগে নিশ্চয় অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সবসময়ে যে ধরনের আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে তার ফলে এ বাড়তি আর্থিক বোঝা নেওয়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কি সম্ভব ? তাছাড়া খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যদি অন্য কোনখানে পূর্ণকালীন হিসাবে নিয়োজিত না-থাকেন তাহলে তা থেকে অনেক প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হবে। শিক্ষাগত যুক্তিতেও এ পদ্ধতি খুব সুষ্ঠু বলে মনে করার কোন কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে, ছাত্র-ছাত্রীরা কম অভিজ্ঞ খণ্ডকালীন শিক্ষকের কাছে যে জ্ঞান লাভ করবে নিশ্চয় তারা অন্য বিভাগে গিয়ে অনুষঙ্গী বিষয়ে পাঠগ্রহণ করলে গুণগত মানের দিক দিয়ে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নততর হবে। তাছাড়া বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে একসঙ্গে মিলেমিশে ক্লাশ করলে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা বাড়বে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তারা জ্ঞানের বিস্তৃত রাজ্যের সাথেও পরিচিত হবে। এ সবই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সামগ্রিক বিচারে কয়েক বছর আগে প্রচলিত সমন্বিত কোর্সপদ্ধতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি ভাল মন্দ যা-ই হোক অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও তা অনুসরণ করে।

(গ) চারবছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান কোর্স

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ উদ্ভাবন পূর্বের তিন বছর অনার্স ডিগ্রির পরিবর্তে চার বছর মেয়াদি ডিগ্রির প্রচলন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন এ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু কী কারণে এ পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল তা খুব স্পষ্ট নয়। এমন হতে পারে যে, বেশ কিছুদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে যে-সব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে আসছে তাদের গুণগত মান, যে কোন কারণেই হোক, আগের তুলনায় নিম্নস্তরের। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এ নিম্নগতি আরম্ভ হয়েছে স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে। সাধারণ মানের থেকেও আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, এ সব শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান (বাংলা, ইংরেজি উভয়ই) উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য আদৌ উপযোগী নয়। এমন যদি হতো যে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার পর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষাসহ সাধারণ কোন কোন বিষয়ের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ব্যয় করছে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ এ কারণে বাড়ানো হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেত। কিন্তু এমন ব্যবস্থা কোন কোন বিভাগ নিয়ে থাকলেও সবখানে নেওয়া হয় নি।

তিন বছরকে বাড়িয়ে চারবছর মেয়াদি ডিগ্রি করার পিছনে আজ দেশে ক্রমবর্ধমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে প্রতিযোগিতার কথাও বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তা করেছে হয়তোবা। এমন ভীতি থাকলেও তাও কিন্তু অমূলক। কেননা পুরোনো, পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমান প্রতিষ্ঠা পেতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সময় লাগবে। তা ছাড়া এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সীমিত সংখ্যক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। সে যাই হোক তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রিকে চার বছর মেয়াদি করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদেরকে আরেকটি বিতর্কে জড়িয়ে ফেলেছে। বিষয়টি আরও আলোচনার অবকাশ রাখে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিভিন্ন মেয়াদি ডিগ্রি প্রচলিত। প্রথমত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত কলেজগুলিতে তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি রয়েছে, যা আগে ছিল দুই বছর মেয়াদি। এছাড়া রয়েছে সরকারি সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি কোর্স। অপরদিকে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেহেতু আমেরিকান পদ্ধতি অনুসরণ করে সেহেতু যে সব প্রতিষ্ঠানের কোর্সগুলি চার বছর মেয়াদি হলেও তারা তাদের কোর্সকে কেবল স্নাতক বলে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এগুলিকে স্নাতক (সম্মান) বলে অভিহিত করছে অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের পরের পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদি প্রথম ডিগ্রি বা স্নাতক ডিগ্রি দিচ্ছে–তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি, চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি (পাস এবং সম্মান উল্লেখ ব্যতিরেকে)।

মেয়াদ তিন বছর হোক বা চার বছর হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি সবসময়ে প্রথম ডিগ্রি হিসেবেই বিবেচিত হবে। প্রথম ডিগ্রির বিশিষ্টতা এই যে, একটি মূল বিষয়ে অনেক বেশি জ্ঞানার্জন যখন ছাত্র-ছাত্রীরা করবে তখন তার সাথে মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কোন কোন বিষয়ে (আমেরিকান পদ্ধতিতে বিষয় নির্ধারণে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনতা অনেক বেশি) জ্ঞানার্জন করবে, যাতে মূল বিষয়টি জানতে এবং বুঝতে সহায়ক হয়। পরবর্তী পর্যায়ে স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ডিগ্রির দর্শন হচ্ছে মূল বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান আরও গভীর ও পরিপক্ব করা। এ পর্যায়ে একটি বিষয়েরই পাঠগ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা গবেষণা পদ্ধতির সাথেও পরিচিত হয়। বেশির ভাগ দেশেই মাস্টার্স ডিগ্রির প্রয়োজন হয় যাঁরা ভবিষ্যত জীবনে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চান বা গবেষণায় নিজেদের নিয়োজিত করতে চান তাঁদের জন্য। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি (স্নাতক) এবং দ্বিতীয় ডিগ্রি (স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স) দুটির নীতি ও দর্শন আলাদা। কিন্তু বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি না করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা এখন প্রথম ডিগ্রি চার বছর মেয়াদি হওয়ার জন্য তাকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমান বলে ঘোষণা দিতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। বাড়তি এক বছরের ব্যয়বহন করার অক্ষমতা এবং মাস্টার্স ডিগ্রির সামাজিক মর্যাদাও এক্ষেত্রে কাজ করছে বলে মনে হয়। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদেরকে একটি অনভিপ্রেত বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে, যার আশু অবসান কাম্য।

(ঘ) **শিক্ষক-নিয়োগ পদ্ধতি**

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আশির দশকের প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন পদ সৃষ্টি না-করে নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের পদোন্নতির পদ্ধতি চালু করে। তাত্ত্বিক বিচারে এর তেমন কোন ত্রুটি ছিল একথা বলা যাবে না। একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শূন্য পদের ঘাটতি দেখিয়ে নিম্নপদে ধরে রাখা খুব গ্রহণযোগ্য ছিল তা মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তা প্রচলিত হয়েছে। তবে দেখা যাচ্ছে যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার ক্ষেত্রে তফাৎ রয়েছে বিরাট। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বশাসিত এবং স্ব-স্ব নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু একই দেশের মধ্যে দুই ডজনেরও কম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পার্থক্য স্বভাবতই বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে, যার নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশ

১. বর্তমানে প্রচলিত বাৎসরিক কোর্সপদ্ধতি চালু রাখা যেতে পারে। তবে সম্মান শ্রেণীর ছাত্র যাতে বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি কোর্স অনুষঙ্গী (বা minor যে নামেই ডাকা হোক) বিষয় নিতে পারে সেজন্য প্রতিটি বিভাগ ছয় মাস মেয়াদি সাবসিডিয়ারি কোর্স চালু করবে।

২. বিভাগে বিভাগে অন্য বিষয়ের পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি তুলে দেওয়া যেতে পারে। তবে সম্মান বিষয়ের শ্রেণী নির্ধারণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত সমন্বিত পদ্ধতির আওতায় যে ভাবে নম্বর যোগ হয় তা প্রচলিত থাকতে পারে।

৩. আজ আর পেছন ফিরে গিয়ে চার বছর মেয়াদি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা যাবে না বিধায় তাই বজায় রাখতে হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকতা এবং গবেষণার ক্ষেত্র বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল চাকুরির জন্য চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সটি যথোপযুক্ত বলে ঘোষণা দিতে হবে।

৪. চার বছর মেয়াদি কোর্সের প্রথম ছয় মাস ইংরেজি ভাষা এবং অন্যান্য কোন কোন নির্ধারিত বিষয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যাতে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রির মেয়াদ কী হবে সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আলাপ-আলোচনা করে নির্ধারণ করতে পারে।

৬. মাস্টার্স পর্যায়ে পূর্ণ নম্বরের অর্ধেক হবে লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে এবং বাকি অর্ধেক নির্ভর করবে ছয় থেকে আট হাজার শব্দের একটি গবেষণামূলক রচনার উপর।

৭. শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করতে পারে।

৮. স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন পাশ ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাঙ্গনে একবছর বাড়তি সময় ব্যয় করে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

মূল রচনা :
প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

ষষ্ঠ অধ্যায়
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিবিধান

ইত:পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয় সংসদপ্রণীত আইন দ্বারা। সরকারি অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বায়ত্তশাসনের নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মূলত এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্থাপিত হয়েছে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য সরকারের কাছে ধর্ণা দিতে না হয়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সৃষ্টি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সংরক্ষণের পন্থা হিসাবে। কমিশন একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় অর্থ বণ্টন করে থাকে, অপরদিকে তেমনি শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে এ সব প্রতিষ্ঠানের উপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। কমিশনের ক্ষমতার পরিধি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সম্বলিত আইনটি ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১০ হিসেবে জারি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮৩ সালের ২৪শে জুলাই এর একটি সংশোধনী প্রণীত হয়। এ আইনে কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-সব ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয় তার মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

১. দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রয়োজন নির্ধারণ করা;
২. বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য বাৎসরিক আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ করা;
৩. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;
৪. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে অথবা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কলেবর বৃদ্ধির (Expansion) ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া;
৫. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন নিরূপণে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার অধিকারও কমিশনের রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মোটামুটিভাবে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সকল বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও যে সব আইন দ্বারা এগুলি পরিচালিত হয়, তা সবক্ষেত্রে এক নয়। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইন প্রায় একই রকম। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ সিনেট কর্তৃক প্রস্তাবিত তিন সদস্যের প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োজিত হন। কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট প্রভৃতি) সিনেট বলে কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এছাড়া যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট আছে সেগুলি অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের প্রয়োজনে বিধিবিধান প্রণয়ন করে। সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ কমিশনের মাধ্যমে সরকারি অনুদান হিসেবে পেয়ে থাকে। সে কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন ক্ষমতা এবং আয়ব্যয় পরীক্ষানিরীক্ষা করার এখতিয়ার কমিশনকে দেওয়া হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপরে কতটা কর্তৃত্ব মঞ্জুরী কমিশন করতে পারে এ নিয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ কমিশন এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিবাদ বেধেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ৯০ দশকের শেষের দিকে বিবাদ বেধেছিল (যা কয়েক বছর ধরে চলেছে) কমিশনের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি নতুন বিভাগ খোলা নিয়ে এ বিতর্ক দীর্ঘদিন চলেছে। অনুরূপ মতভেদ দেখা গেছে সমসাময়িক সময়ে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রায় একশত নতুন পদ সৃষ্টি নিয়ে। এসব বিতর্ক থেকে যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে তা নিম্নরূপ :

১. শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতার পরিধি কতটুকু, এবং
২. নতুন বিভাগ খোলার এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে কিনা ?

এ কথা ঠিক যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টির ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে বি.ম.ক-র ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ এবং ১৯৮৩ সালের সংশোধনী থেকে এটি স্পষ্ট যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় নতুন অনুষদ বা শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার বিষয়ে কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে ক্ষমতা রাখে না। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বি.ম.ক-এর আইনের মধ্যে একটা সংঘাত রয়েছে। তবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেহেতু সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার কমিশনের, সেহেতু নতুন বিভাগ খোলার আগে কমিশনের অনুমোদন নেওয়া কাম্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। আইনের চুলচেরা বিচার না করেও বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে পুরোনো

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সমাজে এমন ধারণা জন্মেছে যে, স্বায়ত্তশাসনের নামে ইচ্ছেমতো শিক্ষকের পদ সৃষ্টি, শিক্ষক নিয়োগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের অপচয় ঘটছে।

এবারে আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথায় আসতে পারি। এসব প্রতিষ্ঠান যে-আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তা ১৯৯২ সালে প্রণীত হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে এ আইনের একটি সংশোধনী আনয়ন করা হয়। এ আইন দুটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে কতগুলো বিষয় বেরিয়ে আসে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তাঁর উপস্থিত থাকার কথা। দ্বিতীয়ত, উপাচার্যসহ প্রায় সবগুলি উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদে নিয়োগদানের বিষয়ে চ্যান্সেলর কোন-না-কোনভাবে সংশ্লিষ্ট। তৃতীয়ত, এ সব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে সব স্ট্যাটিউট বা প্রবিধি প্রণীত হবে সে সবও চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। স্পষ্টতই এই আইন বাস্তবসম্মত নয়, এগুলির বাস্তবায়ন দীর্ঘমেয়াদ সাপেক্ষ এবং প্রায়-অসম্ভব বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে মাননীয় চ্যান্সেলরের সচিবালয়ের বর্তমান অবস্থায় এতগুলি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সব বিভিন্নধর্মী দায়িত্বপালন সম্ভব বলে মনে করার কোন কারণ নাই।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১৯৯২ সালে প্রণীত আইন এবং ১৯৯৭ সালের সংশোধনী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এর মূল কারণ এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে-সমস্ত কর্তৃপক্ষ (Authority) থাকার কথা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে এগুলি গঠন করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যেও টানাপোড়েনের সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে উপাচার্যকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করা হয় নি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃপক্ষের (অর্থাৎ বোর্ড অব ট্রাস্টি বা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বা অন্য যে-কোন নামেই ডাকা হোক না কেন) সাথে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে টানাপোড়েনের অবস্থা বিরাজমান যা দুএক ক্ষেত্রে আইনি লড়ায়ের পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

সে যাই হোক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে প্রায় ৪০০০০ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত না হলে এ সব শিক্ষার্থী হয় বিদেশে লেখাপড়া করতে যেত অথবা ছাত্রজীবন শেষ করতে বাধ্য হতো। দেশের বর্তমান অবস্থায় এর কোনটিই কাম্য নয়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নতুন। খুব সম্ভবত এ কারণে এ সব প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান, অবকাঠামোগত অবস্থা, এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জনমনে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারের যথাযথ ভূমিকা নেওয়া দরকার বলে কমিশন মনে করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত, দেশের কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তার থেকে ৮ গুণ বেশি। স্বভাবতই উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলেজগুলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত ১৯৯৮-এর সংশোধিত সংবিধি মোতাবেক গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হয়। এ আইনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মনোনয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটেগরি থেকে কয়েকজন নির্বাচিত অথবা মনোনীত সদস্য দ্বারা গভর্নিং বডি গঠিত হয়। সরকারি কলেজগুলির ক্ষেত্রে প্রকৃত চিত্র কিন্তু অন্যরূপ। সরকারি কলেজগুলির শিক্ষক নির্বাচন পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর মাধ্যমে করা হয়। প্রশাসনিক অন্যান্য মূল সিদ্ধান্ত সবই নেওয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। দেশের সরকারি কলেজগুলিতে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে যে চিত্র পাওয়া গিয়েছে তা অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। যেমন :

১. দেশের ৪০টি শীর্ষস্থানীয় সরকারি কলেজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ থাকার কথা ৫১৬০ জন। কিন্তু এ সব কলেজে সৃষ্ট পদের সংখ্যা ৪৩৫৩ জন। গত ১৫ বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। কিন্তু এতদিন পরে মন্ত্রণালয় মাত্র ১৬৯টি পদের অনুমোদন দিয়েছে।

২. স্নাতক সম্মান এবং মাস্টার্স পর্যায়ে ৯৫টি কলেজের মধ্যে কেবল জগন্নাথ কলেজে একজন গ্রন্থাগারিক নিয়োজিত রয়েছেন। যেসব কলেজে নেই তার মধ্যে ঢাকা কলেজসহ দেশের শীর্ষ কলেজগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

বিধি মোতাবেক বেসরকারি কলেজগুলিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দিয়ে থাকে। কয়েক বছর আগে স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (অলিখিত সরকারি ইচ্ছা অনুযায়ী) সকল কলেজে মনোনয়ন দান করা হয়েছিল। এভাবে কলেজগুলিতে দলীয় রাজনীতির প্রবেশ ঘটে, বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে। অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য যে, তথাকথিত donation পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ফলে শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতির চরম বহি:প্রকাশ ঘটে। কলেজগুলিতে সংসদ সদস্যদের মনোনয়ন দান এখনও চালু আছে। যদিও বর্তমানে সংসদ

সদস্যদের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দান ২/৩টি কলেজে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে কলেজে (সরকারি এবং বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রে) আরও অনেক সমস্যা রয়েছে যেমন :-

১. সম্মান এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কোর্স খোলা;

২. ভৌত অবকাঠামোর ঘাটতি;

৩. স্থাপিত কলেজের সন্নিকটে যত্রতত্র অন্যান্য কলেজ স্থাপন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সংস্কারের সুপারিশ করা হচ্ছে--

১. সরকারি অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি এবং নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তদারকি মেনে নেয়াই শ্রেয়, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন কোন ব্যক্তির ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত না হয়।

২. মঞ্জুরী কমিশন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের মধ্যে যে সব ক্ষেত্রে সংঘাত রয়েছে তা দূর করা প্রয়োজন।

৩. মঞ্জুরী কমিশন প্রতি তিন বছর পর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে কোথাও কোন সম্পদের অপচয় হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে পারে। কেননা কমিশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থের সিংহভাগই বেতন-ভাতাদির খাতে যে কেবল ব্যয় হচ্ছে তাই নয় বরং ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দান করা হচ্ছে। এমন অভিযোগও পাওয়া গিয়েছে যে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষকদের সকলের নির্ধারিত সংখ্যক ক্লাশ নেই।

৪. (ক) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধিত হওয়া দরকার, যেন তা বাস্তবসম্মত হয়। একই সাথে আইনটি কার্যকরী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্ট্যাটিউট প্রণীত হওয়া দরকার, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সংস্থা/কর্তৃপক্ষ (Authority) গঠন করা সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাও নির্ধারিত হওয়া দরকার যাতে এ নিয়ে কোন অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি না হয়।

(খ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার গুণগত মান নির্ধারণের জন্য ইউ-জি-সি-কে তদারকি ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে অথবা একটি এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (Accreditation Council) গঠন করা যেতে পারে।

৫. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সংবিধি অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার কলেজে গভর্নিং বডি গঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

৬. সরকার স্থাপিত কলেজগুলির ভৌত কাঠামো, শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য সুবিধা নিরূপণ করে প্রতিবেদন প্রণয়নের একটি বেসরকারি কমিশন গঠন করতে পারে।

৭. সরকারি কলেজের জন্য সৃষ্ট পদগুলি অনতিবিলম্বে পূরণ করা প্রয়োজন।

৮. সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার কলেজে শিক্ষক নির্বাচন একটি আলাদা কর্ম-কমিশনের মাধ্যমে করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ভাবমূর্তি সংরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে-

(ক) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই, প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ব্যতিরেকে এবং স্পষ্টভাবে ছাপানো রশিদ ছাড়া কারও কাছ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করবে না।

(খ) প্রতিটি কলেজ বছরে একবার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সম্মেলনের আয়োজন করবে। ঐ সব সম্মেলনে যে-কোন বিষয় উত্থাপন করার অধিকার অভিভাবকদের থাকবে। এ ধরনের যৌথ সভার পূর্ণাঙ্গ কার্য-বিবরণী মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে হবে। যে সব কলেজে ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক সেখানে অভিভাবকদের ৫০ থেকে ১০০ জনকে আহবান করা যেতে পারে।

মূল রচনা :

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

সপ্তম অধ্যায়
একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা : পূর্বাভাস

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ শতাব্দীতে আমরা জ্ঞানের রাজ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চায় পশ্চিমা জগৎ যে উন্নতি করেছে তা অভাবনীয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে উইলিয়াম হার্ভে, ব্লেইজ পাসকাল, আইজাক নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানী ইউরোপে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটান। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সূচিত হয় শিল্প বিপ্লবের। বলা যেতে পারে ১৭৭৬ সালে জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন বাজারজাত হওয়ার পর থেকে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইউরোপে উত্তরোত্তর উন্নতি শুরু হয়, একই সাথে অগ্রগতি হতে থাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। গত শতাব্দীর শেষার্ধে বিজ্ঞান গবেষণার প্রসার ঘটে প্রভূতভাবে। বর্তমান অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতি দশকে এখন জ্ঞানের পরিমাণ, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে এ এক জ্ঞানের বিস্ফোরণ। গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিশেষ করে তিনটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা যা আবিষ্কার করেছেন তা কল্পনাতীত। যেমন, সিলিকন চিপস-এর আবিষ্কারের ফলে এসেছে তথ্য প্রযুক্তি, ডি-এন-এ অণুর রূপান্তর, যার ফলে এসেছে অসীম সম্ভাবনাময় জৈব প্রযুক্তি এবং তৃতীয় হচ্ছে উন্নত মানের শিল্পদ্রব্যের সৃষ্টি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ফোরণ আজ এমন এক পর্যায়ে গিয়েছে যে এখন মানব সমাজ শিল্প বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে পৌঁছেছে। শিল্প বিপ্লব, যার মূল লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং তা প্রক্রিয়াজাত করে বেশি উৎপাদন, সে অবস্থায় শিল্পোন্নত দেশগুলি আর নেই, তারা নব নব দ্রব্যেরও আবিষ্কার করছে আজ।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি দেশ কীভাবে জ্ঞাননির্ভর উন্নত দেশের সাথে সমতালে চলবে ? ১৯৯০ সালে বেইজিং-এ একটি সেমিনারে তৃতীয় বিশ্বের এ সব সঙ্কট নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। সে আলোচনা সভার বিবরণী থেকে একটি অংশ (অনূদিত) এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। "ক্রমবর্ধমান হারে সম্পদ এবং সমৃদ্ধি, জ্ঞান এবং দক্ষতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। উন্নত দেশগুলি এত সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন আগে কখন-ও ছিল না। তারা তাদের মস্তিস্ক শক্তি এবং সৃজনশীলতা ব্যবহার করে পৃথিবীকে নতুন নুতন দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন প্রকার সেবা দিয়ে প্লাবিত করছে। তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ এবং অত্যন্ত দক্ষ ও অব্যাহত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমশক্তির ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল"।

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উন্নয়নের চাবিকাঠি। অর্থাৎ জ্ঞান নির্ভর সমাজ যার বাহন হবে শিক্ষা ও গবেষণা তা গড়ে তোলার মধ্যেই আমাদের আজকের আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়।

অর্থাৎ বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত দেশের জনগণকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা, অস্বাস্থ্য এবং সর্বরকম বঞ্চনার কবল থেকে মুক্ত করতে প্রয়োজন সুশিক্ষার ও গবেষণার। আর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠানগুলিকে দায়িত্ব নিতে হবে জ্ঞানের নব নব দিগন্ত উন্মোচনের। এটি আজ প্রমাণিত সত্য যে, এছাড়া আমাদের আর্থসামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানের অন্য কোন বিকল্প নেই। অবশ্য গবেষণা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেহেতু ব্যয়বহুল তাই কতকগুলি বিষয় আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন–

১. দেশের চাহিদা;

২. গবেষণার জন্য আমাদের অর্থলগ্নির সামর্থ্য;

৩. সমস্যাগুলিকে সামগ্রিকভাবে দেখবার এবং বুঝবার চেষ্টা।

উপরের আলোচনা থেকে যা বোঝা যায় তা এই যে, প্রথমেই আমাদের উচ্চতর শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। আমরা জানি যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে আমরা উন্নত মানের গবেষণা আজই করতে হয়তো পারব না। স্বভাবতই এর সুবিস্তৃত রাজ্য থেকে কিছু এলাকা আমাদের চিহ্নিত করে নিতে হবে। দেশের সামগ্রিক চাহিদার কথা বিবেচনা করলে এই মুহূর্তে যে সব ক্ষেত্র অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে সেগুলি হচ্ছে জৈব প্রযুক্তি, জ্বালানি, পরিবেশ, তথ্য প্রযুক্তি, কৃষি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি (এসব বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে, যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল বেশ কিছু রয়েছে। এরাই নতুন যুগের বার্তাবহ হিসেবে বিজ্ঞান এবং

প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিকে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তথ্য-প্রযুক্তি উন্নয়নের গতি এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণার যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। জাপান, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর এবং ভারতের উদাহরণ থেকে কয়েক দশকের উন্নয়ন প্রক্রিয়া যে অল্প সময়ে উল্লম্ফনের মাধ্যমে সম্ভব তা স্পষ্ট।

তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, এই প্রযুক্তি পরিবেশ বান্ধব। দ্বিতীয়ত, এটি একটি ক্ষেত্র যেখানে দ্রুতগতিতে উন্নয়ন সম্ভব। তৃতীয়ত, এ প্রযুক্তি নিজস্ব প্রয়োজনে বিস্তৃতি লাভ করে বলে এর প্রবেশাধিকার বলা যায় সবার জন্য উন্মুক্ত। অতএব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, যেখানে শ্রম কম মূল্যে পাওয়া যায় এবং যাদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধার করা প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে হয়, প্রতিযোগিতায় টিকে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের জনবলের অবস্থা কী তা দেখে নেয়া যেতে পারে। নিম্নের সারণি থেকে তা বোঝা যাবে।

কয়েকটি দেশের জাতীয় আয়, প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানীর তুলনামূলক চিত্র

মানব উন্নয়ন সূচক অবস্থান	দেশের নাম	ক্রয়ক্ষমতা মাথাপিছু জাতীয় আয় (ppp)	গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় (শতকরা জাতীয় আয়ের)	বিজ্ঞানী/প্রকৌশলীর সংখ্যা (১০ লাখে)	উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানের ছাত্র (শতকরা হিসাবে)
২	সুইডেন	২৪,২৭৭	৩.৮	৪,৫০৭	৩১
৬	কানাডা	৩৪,১৪২	১.৭	৪,১০৩	..
১৩	যুক্তরাজ্য	২৩,৫০৯	১.৮	২,৬৭৮	২৯
২৫	সিঙ্গাপুর	২৩,৩৫৬	১.১	২,৮৭৩	..
২৭	গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া	১৭,৩৮০	২.৭	২,১৮২	৩৪
৬০	রাশিয়া	৮,৩৭৭	০.৪	৩,৩৯৭	৪৮
৭০	থাইল্যান্ড	৬,৪০২	১.১	১০২	২১
৯৬	চীন	৩,৯৭৬	০.১	৪৫৯	৫৩
১১৫	মিশর	৩,৬৩৫	১.৯	৪৯৩	১৫
১২৪	ভারত	২,৩৫৮	০.৬	১৫৮	২৫
১৩৮	পাকিস্তান	১,৯২৮	..	৭৮	..
১৪৫	বাংলাদেশ	১,৬০২	..	৫১	..

স্পষ্টতই আমাদের অবস্থান উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সর্বনিম্নে। এ অবস্থা পরিবর্তনের পথে পা-পা করে এগোলে আমরা কখনই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। এ অন্ধকূপ থেকে বেরোবার জন্য প্রয়োজন উল্লম্ফন অর্থাৎ মহা এক কর্মযজ্ঞ।

সত্যি সত্যিই যদি আমরা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে চাই তাহলে এ মহাযজ্ঞে সামিল হতে হবে একসাথে অনেককে। এগিয়ে আসতে হবে দেশের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-গবেষক, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী ইত্যাদি সকলকে। এ সম্পর্কে আমাদের সুপারিশ হবে নিম্নরূপ।

ক. সরকারের করণীয়

১. দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ গবেষকদল গড়ে তোলার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

২. গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অকৃপণ হাতে অর্থলগ্নি করতে হবে।

৩. উন্নত বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য সে সব দেশ থেকে গবেষণা বৃত্তি সংগ্রহ করতে হবে।

৪. দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বৃদ্ধি এবং তা নামমাত্র মূল্যে যাতে সবাই ব্যবহার করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৫. শিক্ষক/গবেষকদের Academic Freedom নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে যাতে তারা নির্বিঘ্নে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন।

৬. প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরে বিজ্ঞানশিক্ষা এবং বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য সরকার একটি "বিজ্ঞান নীতি প্রণয়ন বিশেষজ্ঞ কমিটি" গঠন করতে পারে।

খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয়

১. অপচয় বন্ধ করে গবেষণা এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয়বৃদ্ধি করতে হবে।

২. শিক্ষক/গবেষকদের Academic Freedom সুনিশ্চিত করতে হবে।

৩. দেশে/বিদেশে সেমিনার/কনফারেন্স ইত্যাদিতে শিক্ষকদের যোগদানের ব্যাপারে সর্বরকম বাধা অপসারণ করতে হবে।

৪. গবেষণা/প্রকাশনার peer evaluation পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং স্বীকৃত মানের প্রকাশনার জন্য বেতনবৃদ্ধি ও পদোন্নতির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫. গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৬. আন্ত:বিষয় (interdisciplinary) গবেষণার উপর জোর দিতে হবে। উল্লেখ্য যে একটি বিষয়কে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভাজন করে দেখবার পরিবর্তে আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে বরং বিভিন্ন কোণ থেকে দেখবার চেষ্টা উন্নত দেশে লক্ষণীয়।

৭. স্নাতক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে একটি মূল বিষয়ের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের অনেকগুলি কোর্স নিতে পারে পাঠ্যসূচি সেভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

৮. চারটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় যে সব ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বিভাগ/শ্রেণী অর্জন করবে বিশ্ববিদ্যালয় সে সব ছাত্র-ছাত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে বিভাগে গবেষণা সহকারী হিসাবে নিয়োগ দিতে পারে।

৯. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। গবেষণা কেন্দ্রের সবগুলি যাতে একই বিষয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা না-করে এজন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানের যে বিষয়ে অবস্থানগত, অবকাঠামোগত এবং জনশক্তির বিচারে অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধা আছে সে সব প্রতিষ্ঠান সে সব বিষয়ে গবেষণায় অন্যদের তুলনায় অধিকতর মনোনিবেশ করতে পারে, যাতে প্রাপ্ত অর্থের সর্বাধিক ব্যবহার হয়। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিবেশ, জৈব প্রযুক্তি; BUET পানি সম্পদ; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় mangrove research; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে অধিকতর জোর দিতে পারে।

১০. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজেদের মধ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (Atomic Energy Centre, BCSIR প্রভৃতি) মধ্যে যোগাযোগ ও গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রয়োজন।

গ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয়

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন প্রতিষ্ঠানকে সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার অনুমোদন দেওয়ার আগে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সুবিধা, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক আছে কিনা তা ভালভাবে যাচাই করে দেখবে।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্য summer course চালু করবে।

৩. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য এম.ফিল, পি.এইচডি কোর্স চালু করার জন্য আগামী দশবছর মেয়াদি এক পরিকল্পনা করবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে।

ঘ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের করণীয়

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উপরে সুপারিশকৃত বেশকিছু কর্মসূচির ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে। যেমন-

১. মঞ্জুরী কমিশন ঢাকা শহরে গবেষকদের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারে।

২. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ও গ্রন্থাগারের মধ্যে আন্ত:গ্রন্থাগার সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা (ভৌত বিজ্ঞান)

১। ভূমিকা

এশিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১৯৯৯ সনের ৩৭তম থেকে ২০০০ সালে ৬৪তম অবস্থানে নেমে আসে। তুলনামূলকভাবে বহির্জগতে স্বল্পপরিচিত রুরকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১৪তম এবং এমনকি পাকিস্তানের সদ্যস্থাপিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানও আমাদের উপরে।

স্পষ্টতই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপদ্ধতির সব কিছুই ঠিকমতো এখন চলছে না। স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকালের গত বত্রিশ বছরে বিজ্ঞান জগতে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে বিভূষিত হয়েছেন আহমেদ জেওয়াইল–রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর পথপ্রদর্শক কাজের জন্যে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে অণুর মধ্যে পরমাণুর কম্পনের সময়স্কেলে অর্থাৎ ফেমটো সেকেন্ডে ($১০^{-১৫}$ সেকেন্ড)। জেওয়াইল সম্প্রতি বলেছেন :

"উন্নয়নশীল জগতে একটা ভুল ধারণা আছে যে, বিজ্ঞানের উন্নতির চালিকাশক্তি হলো ভবন এবং স্লোগান। এটা মোটেই ঠিক নয়। ক্যালটেকে একজন তরুণ অস্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে আমাকে দেওয়া হয়েছিল একটা খালি গবেষণাগার এবং শুরু করার জন্য কিছু অর্থ। এটাই সব– অবশ্য একটা জিনিস ছাড়া; আমার যা ইচ্ছা তা করার অগাধ স্বাধীনতা।"

একজন মুসলমানের এই দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ঠিক বিশ বছর আগে একজন পাকিস্তানি, আবদুস সালাম, পদার্থ বিজ্ঞানের জন্য একই পুরস্কারে বিভূষিত হন। তাঁর বিশিষ্ট অবদান ছিল বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল এবং ক্ষীণ কেন্দ্রিক বলের একীভূত করা সম্পর্কে গবেষণা। সালাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের পর দেশে ফিরে এলে তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাঁর সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করলেন এবং

"বললেন যে তিনি জানেন সালাম কিছু গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। কিন্তু তিনি তা এখন ভুলে যেতে পারেন। তিনি সালামকে তিনটি কাজের মধ্যে পছন্দ করে নিতে বললেন; বৃত্তি বণ্টকের কাজ, ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের কাজ, অথবা ফুটবল ক্লাবের সভাপতির পদ। আমি ফুটবল ক্লাব পছন্দ করেছিলাম।"

জেওয়াইলের জন্য শূন্য গবেষণাগার এবং সালামের জন্য ফুটবল ক্লাব। কিন্তু ক্যালটেকের অগাধ স্বাধীনতা এবং ইম্পেরিয়াল কলেজের সতীর্থ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এটাই সব পার্থক্য সৃষ্টি করে একজন জেওয়াইল এবং একজন সালামের সৃষ্টি করল। সৃষ্টিলগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এস.এন. বোসকে পেয়ে ভাগ্যবান ছিল। তিনি সতীর্থ বিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পান নি কিন্তু তাঁর স্বাধীনতা ছিল যথেষ্ট যার জন্য তিনি কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। বলা হয়েছে যে, কোয়ান্টাম তত্ত্বে বোসের কাজ ছিল সর্বশেষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ–এ বিষয়ে অন্য তিনটি প্রবন্ধ হলো প্ল্যাংক, আইনস্টাইন এবং বোরের কাজ। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানউন্নত দেশ হলো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার বিজ্ঞানে এবং আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে বিশাল পরিবর্তন ঘটল তা জানাও আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। নোয়াম চমস্কি বলেছেন :

"এই বিশাল পরিবর্তন ঘটল অনেকটা ১৯৬০ সালের দিকে দেশে বিজ্ঞান এবং গণিতে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে। স্পুটনিক কিছুটা স্ফুলিঙ্গের কাজ করে যার ফলে বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গণিত শিক্ষায় বেশ পরিমাণ সম্পৃক্ততার সৃষ্টি হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই এম আই টি তে এমন সব ছাত্র আসা শুরু করল যারা অনেকবেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এই সময়েই এমআইটিতে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে........। চিরায়ত প্রকৌশল শিক্ষাব্যবস্থায় অবক্ষয় শুরু হয়ে গেল.........। যে প্রকৌশল বিভাগগুলি পিছনে পড়েছিল তারা সাধারণত বিজ্ঞান শিক্ষাসূচিকে হুবহু নকল করা শুরু করল। সুতরাং বিদ্যুৎ প্রকৌশল বিভাগে আপনি কীভাবে বিদ্যুৎবর্তনী একত্র করতে হয় তা আর শিখবেন না, আপনি শিখবেন পদার্থ বিজ্ঞান এবং গণিত যা পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিভাগে শেখানো হয় তার থেকে খুব আলাদা নয়। একই কথা সত্য বিমান চালনা ও যন্ত্রকৌশল ইত্যাদি প্রকৌশল বিজ্ঞান সম্বন্ধেও। এটা তাই একটা বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেল, প্রকৌশলভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় আর নয়।"

৩. ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার সৃষ্টি করে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের উন্নত মানের গবেষণার জন্য সুযোগ দিতে পারে।

৪. যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামতের জন্য একটি বা একাধিক Instrument Repair and Maintenance Centre গড়ে তুলতে পারে।

৫. উপরের (৯) এবং (১০) নম্বর সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঙ. **শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের করণীয়**

১. দেশের এবং তাদের নিজেদের শিল্প-ব্যবসায়ের স্বার্থে গবেষণার জন্য দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা প্রকল্পভিত্তিক অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে উপরের অনেক কার্যসূচি বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারেন।

২. শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালীন দানের সাহায্যে ফাউণ্ডেশন গড়ে তুলতে পারেন।

৩. নিজেদের শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সেল সৃষ্টি করতে পারেন, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা নিয়োগ লাভের সুযোগ পেতে পারেন।

মূল রচনা :
প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

সুতরাং ''অবাধ স্বাধীনতা'' ''সতীর্থ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক'' এবং "বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গণিত শিক্ষায় গভীর সম্পৃক্ততা''- এগুলিই হলো বিজ্ঞানে অগ্রগতির অপরিহার্য শর্ত। একটি সুন্দর উদাহরণ হলো ভারত যা পৃথিবীর বৃহত্তম, সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অত্যাধুনিক বিজ্ঞানী সমাজের বাসস্থান। ৪০০ জাতীয় পরীক্ষণাগার এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্পক্ষেত্রে ১৩০টি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র নিয়ে ভারতে কাজ করছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০ লক্ষের বেশি কর্মী।

যদিও বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় একটা গর্বিত ঐতিহ্য রয়েছে, বিশেষ করে বহুদিনের বোস ও সালামের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের ফলে, তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের সম্প্রতিক কৃতিত্বের পরিমাণ বিশেষ করে বিগত দশ পনের বছরে এমন কিছু নয় যা আমাদের মধ্যে আত্মশ্লাঘার সৃষ্টি করতে পারে। এটা ঘটেছে যদিও ত্রিশ বছরের মধ্যে ছয়টি শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৯৭২,১৯৭৭,১৯৮৬,১৯৯৭,২০০২ এবং ২০০৩ সালে)। সম্ভবত আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞ নীতিনির্ধারকগণ এবং সর্বব্যাপী রাজনীতিকেরা আশা করেন একটি কমিশন রিপোর্টের আবরণে একটি ম্যাজিক ফর্মুলা পাওয়া যাবে যা আমাদের পৃথিবীর সব দরজা খুলে দিয়ে আমাদের সব সমস্যা, ব্যর্থতা এবং হতাশা দূর করে দেবে। এধরনের কোন ম্যাজিক ফর্মুলার অস্তিত্ব নেই, কঠিন পরিশ্রমের বিকল্পও কিছু নেই।

২। পূর্ববর্তী শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সারাংশ

যদিও ছয়টি বিজ্ঞ শিক্ষাকমিশন গঠিত হয়েছে এবং তারা বাংলাদেশের বহু বিস্তৃত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করেছেন কিন্তু জনসাধারণের কাছে শুধু দুটি কমিশনের রিপোর্টই অতিপরিচিত। এর একটি হলো অনেকের কথামতো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রথম কমিশনের (মে, ১৯৭৪) রিপোর্ট যাকে কুদরত-ই-খুদা কমিশন বলে।

উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণা সম্বন্ধে কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টে (পৃষ্ঠা ৮৯) বলা হয়েছে:

"উন্নত মানের শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশই আজ পর্যন্ত দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে নি। জনগণের কর্মদক্ষতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। কীভাবে আমরা এই জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন সাধন করব, তার উপর আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি নির্ভর করছে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, যারা উচ্চশিক্ষা থেকে লাভবান হবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে, তারা সমাজের যে স্তরেরই হোক না কেন, তাদের সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের অবশ্যই প্রতিভা খুঁজে বের করতে হবে এবং তার বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।"

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উচ্চতর শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ কেননা এই ব্যবস্থায় মুখস্থবিদ্যাকে উৎসাহিত করা হয় এবং পরীক্ষার ফলের উপর অসমীচীন অধিকমূল্য দেয়া হয়। তৃতীয়ত, বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন সত্যিকারের মেধাবী ছাত্রের সংখ্যাও সাধারণত খুব কম এবং চতুর্থত, খুব স্বল্পসংখ্যক শিক্ষকই আমাদের উচ্চতর শিক্ষার পীঠস্থানসমূহে একাডেমিক গবেষণায় প্রকৃতপক্ষে ব্যাপৃত। এই সব এবং অন্যান্য ত্রুটির ফলে আমাদের উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানের শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

কুদরত-ই-খুদা কমিশন একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন যা অনুমোদিত কলেজগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে; আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞানে নতুন জ্ঞানের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাক্রমকে আধুনিক করার জন্য। কমিশনের বক্তব্য অনুসারে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার একত্রিকরণ ছাড়া কোন সমন্বিত ও উৎপাদনশীল বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয় এবং তাই সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কৃষি, প্রকৌশল ও চিকিৎসা অনুষদ থাকা প্রয়োজন।

১৯৯৭ সালের শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টেও উচ্চশিক্ষার একটি একীভূত ও সমন্বিত পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে জ্ঞানের জগতে বিভক্তিকরণের সমস্যা দূর করার জন্য। তাছাড়া মাদ্রাসাসহ সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সুষম ও সদৃশ হওয়া প্রয়োজন বলা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের কমিশন রিপোর্টে একটি ৪ বছরের সমন্বিত ডিগ্রি এবং ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষাদান এবং গবেষণা কর্মের জন্য সেন্টার অব এক্সেলেন্স স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

৩। সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন

একথা বলা যাবে না যে বিগত ত্রিশ বছরের যে কোন সময়ে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ সরকার খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কলেজসমূহের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কোন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অনুসন্ধান কমিটি স্থাপন করা হয় নি। আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সব ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞানের বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাক্রম সম্বন্ধেও কখনও অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত করা হয় নি। কিন্তু কুদরত-ই-খুদা কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল নিম্নলিখিত প্রস্তাব (পৃ: ২১৭) :-

"চিরকালের জন্য উপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। জ্ঞানের পরিধি এবং সমাজ ও ব্যক্তির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, পাঠ্যসূচিকে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়। আগামী দশ বছরে একথা আমাদের দেশের বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ আমরা প্রচলিত শিক্ষাক্রম হতে উন্নতির পথে অগ্রসর হব এবং এই রিপোর্টে যে সব পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে তা কার্যকর করার জন্য প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন অপরিহার্য। তাই আমাদের অভিমত এই যে আমাদের প্রস্তাবাবলির আলোকে বর্তমান ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনার জন্য এই রিপোর্টের কার্যকরীকরণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে অবিলম্বে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি (কারিকুলাম ও সিলেবাস) কমিটি গঠন করা উচিত।"

এই সুনির্দিষ্ট ও অত্যন্ত সময়োপযোগী সুপারিশের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালে একটি শিক্ষাসূচি ও পাঠ্যক্রম কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও কলেজের শিক্ষাসূচির উপর ব্যাপক অনুসন্ধান করেন এবং তাঁদের ছয়খণ্ডের রিপোর্টে এই পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু বৈপ্লবিক প্রস্তাব পেশ করেন। একটি সুপারিশ ছিল শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে পরিবেশ পরিচিতি বিষয় প্রবর্তন এবং অন্য একটি ছিল শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী অংশ হিসেবে নিজের হাতে পরীক্ষণের ধারণা চালু করা। উভয় সুপারিশই পরবর্তীকালে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক এবং বিজ্ঞান গবেষণাগারে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির পথে শুভ সূচনাই হয়েছিল বলা যায়।

আবার কুদরত-ই-খুদা কমিশন এবং শিক্ষাসূচি ও পাঠ্যক্রম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটি পরীক্ষাসংস্কার কমিটি বাংলাদেশ সরকার স্থাপন করেছিলেন। এই কমিটির অন্যতম প্রধান সুপারিশ ছিল দেশব্যাপী পরীক্ষার অংশ হিসেবে "বিষয়মুখী প্রশ্নে"র প্রবর্তন যার ফলে মুখস্থ করার অভ্যাস নিরুৎসাহিত করা যায় এবং তরুণ-তরুণীদের চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এই সুপারিশটিও বাস্তবায়িত হয়েছে যদিও শিক্ষকদের মধ্যে এব্যাপারে বিতর্ক আছে যে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বিষয়মুখী প্রশ্নের অনুপাত কতটা হওয়া উচিত।

স্পষ্টতই গত কয়েক বছরে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টসমূহে যে সব ধারণার অবতারণা করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকার তার অনেকগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যে সব সুপারিশ শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটায় এবং যার সঙ্গে বিশাল পরিমাণের অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত সে সব সুপারিশ বোধগম্য কারণেই সরকারের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি।

এই ধরনের বিশেষ সাংগঠনিক পরিবর্তনের একটি সুপারিশ করেছিলেন ১৯৯৭ সালের শিক্ষাকমিশন যার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলিতে ব্যাপক সাংগঠনিক পরিবর্তন আনার জন্য বলা হয়েছিল। বর্তমান মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এবং বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলিতে নবম ও দশম শ্রেণী স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রথমে একটা দেশব্যাপী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (মাধ্যমিক পার্ট-১) দশম শ্রেণীর পরে এবং আর একটি পরীক্ষা হবে (মাধ্যমিক পার্ট-২) দ্বাদশ শ্রেণীর পরে। এই দুই পরীক্ষার মোট মার্কস্ হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল।

১৯৯৭ সালের শিক্ষা কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে এটা স্পষ্ট নয় যে এই প্রস্তাব দিয়ে কী উদ্দেশ্য সাধন এবং এই পরিবর্তন দিয়ে কী সুফলই বা লাভ করা হবে তা চিন্তা করা হয়েছিল। এটা আমাদের সৌভাগ্যের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মেনে নিতে হবে যে এই বিশেষ সুপারিশটি পরবর্তীকালে উপেক্ষা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ন্ত্রিত সৃষ্টি ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতির কারণ হয়েছে, বিশেষ করে ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্যে। সম্প্রতি পার্লামেন্টে প্রকাশ করা হয়েছে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১ যার অন্তত ৩০টি গত বিশমাসে সরকারি অনুমোদন লাভ করেছে। ১৯৯৭ সালের শিক্ষা কমিশন যথার্থভাবেই একটি "স্বীকৃতিদান সংস্থা" স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন যার মাধ্যমে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড এবং দায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করা যায়। এটা অবশ্যই একটি উত্তম সুপারিশ যা বিলম্বে হলেও এখনও বাস্তবায়ন করা উচিত।

৪। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বলা হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুই ধরনের, সবুজ এবং ধূসর। সভ্যতা শুরু হয়েছে সবুজ প্রযুক্তি দিয়ে যেখানে ছিল কৃষি এবং পশুপালন, বিজ্ঞান খুব বেশি নয়। এর পরে আসে ধূসর প্রযুক্তি যেখানে ছিল খনিশিল্প, ধাতুশিল্প ও যন্ত্রপাতি তৈরি এবং এখানেও বিজ্ঞান বিশেষ ছিল না। বিগত পাঁচশত বছর ধরে ধূসর প্রযুক্তি, এফ. জে. ডাইসনের কথামতো, "সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং নগর, ফ্যাক্টরি ও সুপারমার্কেটের আধুনিক জগত সৃষ্টি করেছে।" প্রথম দিকে রসায়ন বিজ্ঞান ছিল অগ্রগামী তার বিশাল রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে; এর পরে আসে পদার্থবিজ্ঞান তার রেডিও, টিভি এবং ইলেকট্রনিক্স নিয়ে। টি.ডি. লী'র কথামতো, "কেন্দ্রীন শক্তি, লেজার, এনএমআর ইমেজিং, অর্ধ পরিবাহী বস্তু, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, পরম পরিবাহী এসবই এসেছে কারণ আমরা পেয়েছি আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান।" বাস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞান গবেষণার বিশাল অর্থনৈতিক লাভ সম্ভব হয়েছে সবসময়ই মৌলিক জ্ঞানের প্রগতির জন্যে। ট্রান্সজিস্টর কোন বিনোদন ব্যবসায়ী আবিষ্কার করে নি, কম্পিউটারের বাইনারি লজিক-বর্তনী চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়নি এবং পারমাণবিক কেন্দ্রীন শক্তি রাজনীতিকরা বা তেল কোম্পানির মালিকরা আবিষ্কার করেন নি; এ সব আবিষ্কার হয়েছিল আইনস্টাইন, রাদারফোর্ড এবং ফার্মির মতো বিজ্ঞানীদের দ্বারা। এ সব কিছুর ফলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির একটা বিশেষ শৃঙ্খল সৃষ্টি হয়েছে যা বিগত শতাব্দীর বিশাল বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের জন্যে সবচেয়ে বেশি দায়ী। এখন বিজ্ঞানের পেছনে প্রযুক্তি আসে ১০-১৫ বছরের ব্যবধানে এবং বিজ্ঞানকেও নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্মুখবর্তী করে প্রায় একই সময় ব্যবধানে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে ১৯২০ সালে বাণিজ্যিক রেডিও বাজারে এসেছিল কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর গেছে ৫ কোটি শ্রোতার কাছে তা পৌঁছাতে। কিন্তু ব্যক্তিগত কম্পিউটার যা ১৯৮০ সালে বাজারে এসেছে তা একই সংখ্যার ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছেছে ১৫ বছরের কম সময়ে। আগামী পঞ্চাশ বছরে যে সব বিজ্ঞান প্রধান ভূমিকা পালন করবে মনে হয় সেগুলো হলো,

(ক) আণবিক জীববিজ্ঞান, বংশ গতিবিদ্যার বিজ্ঞান এবং আণবিক পর্যায়ে কোষীয় শারীরবিদ্যা;

(খ) নিউরোফিজিওলজি, জটিল তথ্য-প্রক্রিয়াকরণ নেটওয়ার্কের বিজ্ঞান এবং মস্তিস্ক;

(গ) মহাকাশ পদার্থ বিজ্ঞান, সৌরমণ্ডলের এবং পৃথিবীর পরিবেশের অনুসন্ধান।

বিজ্ঞানের এই সব অঞ্চলের এক একটি থেকে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেটিক প্রকৌশল, কৃত্রিম মেধা এবং মহাকাশে উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কীয় প্রযুক্তিতে গভীর বিপ্লব যা চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের উপকারেই আসবে। আমরা আগামী একশ বছরকে দেখতে পারি আজকের ধাতু এবং সিলিকন ভিত্তিক প্রযুক্তি থেকে আগামীকালের এনজাইম এবং নার্ভ ভিত্তিক প্রযুক্তিতে উত্তরণের সময় হিসেবে যেখানে জেনেটিক প্রকৌশল এবং কৃত্রিম মেধার হাতিয়ারসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে।

আগামী দিনগুলি নিয়ে অবশ্যই ভবিষ্যদ্বাণী করা দুরূহ কিন্তু কিছু কিছু উত্থানশীল ধূসর প্রযুক্তি সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যা বর্তমান শতাব্দীর উপর আধিপত্য করবে বলে মনে হয়। এগুলি হলো :

(ক) নতুন বস্তু। বিশেষ বস্তুর উপরে উচ্চ প্রযুক্তির উৎপাদন নির্ভর করে যেমন বিশেষ সংকরবস্তু এবং পলিমার। এই সব বস্তুর প্রক্রিয়াকরণের জন্যে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয় এবং এগুলি তাত্ত্বিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানীদের একটি কাজে জোর দিয়ে বলা হয়েছে (ফিজিকা বি, ৩৩৪ (২০০৩), ১৪৭-১৫৯)।

(খ) ন্যানো প্রযুক্তি। এই নতুন প্রযুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সক্রিয় গঠন এবং বস্তুর নির্মাণ এবং তার ব্যবহার যার অন্তত একটি বিশেষ মাত্রা হলো ন্যানোমিটার স্কেলের। ন্যানোস্কেল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সম্ভাবনা বিশাল। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ন্যানোপ্রযুক্তি গবেষণায় ৫০ কোটি ডলারের বেশি ব্যয় করছে। এর ব্যাপক ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে আধুনিক সব প্রযুক্তিতে যেমন ইলেকট্রনিক সুইচ কৌশল এবং কম্পিউটার স্মৃতি ব্যবস্থা।

এই ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে অনেক যন্ত্রপাতির বস্তুগত আকার হ্রাস করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে যার ফলে তাদের ব্যবহার এবং নির্মাণে অর্থ এবং স্থানের সংকুলান করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বাস্তবিকপক্ষে ন্যানোপ্রযুক্তি এবং অজৈব বস্তুর তুলনা হলো জৈবপ্রযুক্তি এবং জীবন্ত বস্তুর মধ্যে তুলনা। ভারতে এই বিষয়ে প্রধান গবেষণাকেন্দ্র হলো কলকাতার এস.এন.বোস সেন্টার ফর বেসিক রিসার্চ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উক্ত কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন না করার কোন কারণ নেই।

(গ) তথ্য প্রযুক্তি। এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কম্পিউটারে তথ্যের উচ্চ ঘনত্বই আজকের দিনের চাহিদা। উদাহরণস্বরূপ উচ্চ শক্তির পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় সার্ন গবেষণাকেন্দ্রের বৃহৎ হ্যাড্রন কোলাইডারে সক্রিয় নিবিড় মুয়ন সিলিকন ডিটেক্টর থেকে তথ্য আহরণের হার আশা করা যায় প্রায় প্রতিসেকেন্ডে ১০০ এমবি হবে এর জন্য প্রয়োজন বিশাল কম্পিউটারের। কম্পিউটার শিল্পের গত কয়েক বছরের প্রগতির ফলে এই সব যন্ত্রের শক্তি এবং ধারণ ক্ষমতা কয়েক হাজার গুণ বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে বিশ্বের সর্বত্র তাদের দামও কমেছে।

একথা স্মরণ রাখা ভাল যে ভারতে প্রথম কম্পিউটার ছিল একটি আইবিএম-১৬২০ যা ১৯৫৯ সালে ইন্ডিয়ান পরিসংখ্যান ইনস্টিটউটে স্থাপন করা হয়েছিল। ঢাকায় প্রথম কম্পিউটারটিও ছিল একটি আইবিএম-১৬২০ যা আণবিক শক্তি কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছিল। আজ ভারত পৃথিবীর একটি প্রথম সারির "আইটি প্লেয়ার" কিন্তু এ খেলার মাঠে বাংলাদেশ কোথাও নেই। ১৯৯৮ সালে ভারত আইটির জন্য ব্যয় করেছিল ২.৭ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার যা পৃথিবীর আইটি ব্যয়ের শতকরা ০.২৭ ভাগ। ১৯৯৯ সালে ভারতে, সফ্টওয়ার কোম্পানিগুলি ২০০০০০ (দুই লক্ষ) পেশাজীবী নিয়োগ করেছিল। এরা রাজস্ব সৃষ্টি করেছিল প্রায় ৪ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার (রপ্তানি হলো ২.৭ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার) যা পৃথিবীর আইটি সেবা বাজারের ২২০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের অতিক্ষুদ্র শতকরা ১.৮ ভাগ। একথা বলা মুস্কিল বাংলাদেশ তার সর্বব্যাপী আমলাতন্ত্র নিয়ে আদৌ আইটি বাজারে প্রবেশ করতে পারবে কি না। এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

(ঘ) মহাকাশ প্রযুক্তি। পৃথিবী গ্রহের ভৌত পরিবেশের গবেষণাই হবে আগামী বছরগুলির মুখ্য গবেষণার বিষয়। এই জাতীয় গবেষণায় প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে পরিবেশের উপর সৃষ্ট ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে জানা যায়, বিশেষ করে দূষণ, মরুকরণ, পরিবেশ অবক্ষয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে।

(ঙ) জেনেটিক প্রকৌশল। জীবন্ত কোষে যে সব প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় গত পঞ্চাশ বছরে সে বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে দুজন পদার্থবিজ্ঞানী কর্তৃক ডিএনএ আবিস্কারের পর থেকে এবং তা চূড়ান্ত পর্যায়ে জেনোম চালচিত্রে এসে পৌঁছেছে। জীবন্ত প্রাণীসত্তার জিনভিত্তিক আণবিক ব্যাখ্যা থেকে নতুন পদ্ধতির এবং উৎপাদনের সৃষ্টি হতে পারে যা কৃষি, শিল্প এবং মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্যগত পরিবেশ সম্পর্কে ভূমিকা রাখতে পারে। স্বপ্ন হলো স্বাভাবিক পরিবেশের মোটেই ক্ষতি না করে এই পৃথিবী পৃষ্ঠের বিশাল অঞ্চলসমূহকে উৎপাদনশীল করা।

(চ) ন্যানো চিকিৎসা। এটা হলো নতুন আণবিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধ করার বিজ্ঞান। যেখানে ব্যবহার হয় ক্ষিপ্র ঔষধ যা সুনির্দিষ্ট অঙ্গ বা কোষের দিকে অভিলক্ষ্য করে যায় অথবা অতিক্ষুদ্র রোবোট যা কোষের মধ্যে বস্তু আদান-প্রদান করতে পারে এবং এমনকি কোষকেন্দ্রীনে (nucleus) প্রবেশ করে ক্ষতিগ্রস্ত জীনকে সারিয়ে তুলতে পারে।

৫। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া :—

(ক) মাইক্রোইলেকট্রনিক্স যার অন্তর্ভুক্ত সফটওয়ার উন্নয়ন, মাইক্রোপ্রসেসর, কম্পিউটার ভিত্তিক ডিজাইন, মাইক্রোচিপ প্রস্তুত করা এবং তাদের ব্যবহার;

(খ) মাইক্রোফোটেনিক্স, লেজার এবং ফাইবার আলোকবিদ্যাসহ;

(গ) মহাকাশ প্রযুক্তি যার অন্তর্ভুক্ত উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ;

(ঘ) নতুন বস্তু যার অন্তর্ভুক্ত যৌগিক বস্তু এবং উচ্চ তাপমাত্রায় পরমপরিবাহিতা;

(ঙ) ফার্মাসুটিকাল এবং অত্যন্ত উচ্চমানের সূক্ষ্ম রাসায়নিক দ্রব্য এবং

(চ) জীব প্রযুক্তি যার অন্তর্ভুক্ত জেনেটিক প্রযুক্তি এবং কৃষি ও চিকিৎসার জন্য জিন বিভাজন।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই হবে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার মূল কেন্দ্র যা "আন্তর্জাতিক একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা কমিশন" জোর দিয়ে বলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে :–

(ক) শিক্ষার্থীকে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী করে তোলা;

(খ) দেশের আর্থসামাজিক প্রয়োজন মনে রেখে অত্যন্ত উচ্চমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যাতে তা জীবনব্যাপী শিক্ষার সবদিকের চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং

(ঘ) শিক্ষা ও গবেষণায় অর্থবহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করবে।

এই কমিশনের কথামতো, "বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার উপর বক্তব্য রাখবে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে যা একধরনের মননশীল কর্তৃত্বের অধিকারী যা সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করতে ও অনুধাবন করতে পারে এবং সে ব্যবহারে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মূল লক্ষ্য হবে বিজ্ঞান সংস্থা এবং জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে কাজ করা যেখান থেকে উচ্চ পর্যায়ের পেশাভিত্তিক জ্ঞান এবং দক্ষতা পাওয়া সম্ভব। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির শৃঙ্খল বর্তমানে অনেক হ্রস্বকালীন হয়ে গিয়েছে যার ফলে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার খুব দ্রুত আত্মীকৃত হয়ে প্রাগ্রসর প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়। একারণেই আজকের পেশাদারি কাজ অনেক পরিশীলিত এবং বিশেষজ্ঞনির্ভর হয়ে পড়েছে যা ব্যবহারকারীর কাছে অভিজ্ঞ জ্ঞানের দাবি করে। ভবিষ্যতের কোন মানুষকে তার সমগ্র জীবনকালে একটির বেশি পেশায় নিযুক্ত হতে হবে এমন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। সেক্ষেত্রেও প্রয়োজন হবে ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষা এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান লাভের ক্ষমতা ও ইচ্ছা–মুখস্থ বিদ্যা এবং অকালে বিশেষজ্ঞ হওয়া নয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় হবে নতুনধরনের প্রতিষ্ঠান যার ছত্রছায়ায় থাকবে বিজ্ঞান থেকে প্রকৌশল, অর্থনীতি থেকে রাষ্ট্রীয় নীতি, ব্যবস্থাপনা, সামাজিক পর্যালোচনা এবং আইন অর্থাৎ জ্ঞানের এক সম্পূর্ণ বর্ণালি। একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে মৌলিক গবেষণাগার যা অবশ্যই সরকার এবং শিল্প ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠা থেকে পৃষ্টপোষকতা এবং সাহায্য-সহযোগিতা আশা করে।"

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের সংখ্যা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

লক্ষণীয় যে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় প্রশাসন ব্যতিরেকে বিজ্ঞান কোর্স রয়েছে যে পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার মধ্যে চট্টগ্রামের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চিকিৎসা ও ফার্মাসি), কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি), এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় অব সায়েন্স এন্ড টেকনলজি (স্থাপত্য, সিভিল, তড়িৎ এবং বস্ত্র প্রকৌশল), ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক (স্থাপত্য, সিভিল এবং তড়িৎ প্রকৌশল ও ফার্মাসি) এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় (স্থাপত্য বিষয়ে পাঠদান করে)। অন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রধানত কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে পাঠদান করে।

এই ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মান এবং কার্যাবলি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে।

৬। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ন্যূনতা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ দুর্বলতা হলো বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া। বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯০ থেকে সমস্যার ব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায় (তালিকা-১)।

তালিকা-১ : শিক্ষা গ্রহণে ভর্তিকৃত বয়সদলের শতকরা হিসাব

ক্রমিক নং	দেশ	প্রাথমিক (৬-১১) ১৯৮৭	মাধ্যমিক (১২-১৯) ১৯৮৭	তৃতীয় পর্যায়ের (২০-২৫) ১৯৮৭
১.	বাংলাদেশ	৫৯	১৮	৫
২.	পাকিস্তান	৫২	১৯	৫
৩.	চীন	১৩২	৪৩	২
৪.	জাপান	১০২	৯৬	২৮
৫.	শ্রীলংকা	১০৪	৬৬	৪

এই সংখ্যাগুলিতে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের পার্থক্য করা হয় নি কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় একতৃতীয়াংশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে। মাধ্যমিক এবং ডিগ্রি কলেজসমূহে শিক্ষার্থীর এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তালিকা-২ এ দেওয়া হলো।

তালিকা-২ : বিগত ৪ বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	বছর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১.	মাধ্যমিক কলেজ	১৯৯৫	২৫৫৮১৭
		১৯৯৯	৩৪৭৯৮৬
		২০০০	৩৫৯২১৭
		২০০১	৩৩০৬৮৬
২.	ডিগ্রি কলেজ	১৯৯৮	১১৩১৪৯
		১৯৯৯	১২৫১৯৭৩
		২০০০	১৩৭০৩৮৪
		২০০১	১২০৪১৪৭
৩.	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯৮	৬৭১৪৫
		১৯৯৯	৭০৩৫৫
		২০০০	৭৭৮৬৫
		২০০১	৮০১১১
৪.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯৮	৮৭১৮
		১৯৯৯	১২৫২১
		২০০০	৩২৭৯১
		২০০১	৩৫৯৬৮

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান এবং গণিত নিয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা তালিকা-৩-এ দেওয়া হয়েছে।

তালিকা-৩ : পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং গণিত নিয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	বিষয়	বছর		
			১৯৯৯	২০০০	২০০১
১	কলেজ	রসায়ন	২,২২,৪০৮	২,২১,২৯৬	২,২১,৫১৭
		গণিত	১,৮০,০৬২	১,৭৭,৫৪১	১,৭৬,৪২৯
		পদার্থবিজ্ঞান	২,২২,৯০০	২,২২,০০৫	২,২২,৮৯৬
২	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত	৬৪১৬	৯৮৮৪	৮৩৯৩

আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান হলো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সংখ্যা তালিকা ৪-এ দ্রষ্টব্য।

তালিকা-৪ : বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	বিষয়	বছর		
			১৯৯৯	২০০০	২০০১
১	কলেজ	রসায়ন	৯৭,২৩৯	৯৭,৫৮২	৯৭,২৯৪
		গণিত	৪১,৭৩২	৪২,০৬৬	৪১,৯৮২
		পদার্থবিজ্ঞান	৫৪,৮১৭	৫৫০৩৬	৫৪,৩৭৫
২	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত	৩,৫৯৫	৪৪২০	৫৩০৪

সবশেষে এইচএসসি এবং ডিগ্রি পর্যায়ের কলেজসমূহে বিজ্ঞান ধারায় পাশের হিসাবটিও বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। ২০০১ সালের এই সংখ্যা তালিকা-৫ এ দেওয়া হয়েছে।

তালিকা-৫ : বিজ্ঞান ধারায় (২০০১) পাশের শতকরা হিসাব

ক্রমিক নং	পর্যায়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাস	শতকরা
১.	এইচএসসি	১২৬৩১৫	৪১৫৮৯	৩২.৬৯
২.	ডিগ্রি	২৬৫৭৪	১১৩৩৮	৪২.৬৬

তালিকাগুলি থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট :–

(ক) বিজ্ঞান শুধু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই অধ্যয়ন করা যায়;

(খ) ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা হতাশাজনক; এবং

(গ) বিজ্ঞান ধারায় পাশের সংখ্যাও সন্তোষজনক নয়।

৭। উচ্চ শিক্ষার আর্থিক সংস্থান

এটা নি:সন্দেহে বলা যায় যে কোন অর্থবহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজ (গবেষণা, উন্নয়ন, পরিবর্তন এবং ব্যবহার সম্পাদন করা) সম্ভব হয় না একটা নিম্নতম পরিমাণের অর্থ ব্যয় ছাড়া। শিল্পোন্নত দেশে সাধারণত এর জন্য রাষ্ট্র এবং বেসরকারি শিল্পসমূহ জিএনপির প্রায় শতকরা ২-৩ অংশ ব্যয় করে। উন্নত দেশে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা শিক্ষাখাতে ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৪-১০ ভাগ এবং প্রায় একই পরিমাণের অর্থ ব্যয় করা হয় ফলিত বিজ্ঞান গবেষণায়। উল্লেখ্য যে শিক্ষাখাতে সামগ্রিক ব্যয়ের প্রায় শতকরা ১৬ থেকে ৪০ ভাগ ব্যয় করা হয় বিজ্ঞান (মৌলিক এবং ফলিত) ও বিজ্ঞান ভিত্তিক উচ্চতর প্রযুক্তির জন্যে। তৃতীয় বিশ্বের 'একাডেমি অব সায়েন্সের' হিসাব অনুযায়ী, এমন কি শতকরা ১৬ এই নিম্নতম সংখ্যাটি নিলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্যে দক্ষিণের দেশগুলি তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকেই প্রায় ১২.২ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে পারে।

তালিকা-৬ : স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যয় ক্ষেত্রে।

ক্রমিক নং	দেশ	জনসংখ্যা	জিএনপি/প্রতিজনে (১৯৮৬) ইউএস ডলার	স্বাস্থ্য (১৯৮৬) % জিএনপির	শিক্ষা (১৯৮৬) % জিএনপির	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (১৯৮৬) % জিএনপির
১.	বাংলাদেশ	১০.৪ কোটি	১৯১	০.৬	২.২	০.২
২.	ভারত	৮০.০ কোটি	৩৪৬	০.৯	৩.৪	০.৯
৩.	পকিস্তান	১০.৫ কোটি	৩৪৩	০.২	২.২	১.০

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য বাংলাদেশ জিএনপির প্রায় শতকরা ০.২ ভাগ ব্যয় করে। উল্লেখ করা যায় প্রফেসর সালামের বাংলাদেশ ভ্রমণের সময়ে রাষ্ট্রপতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সরকার এই সংখ্যাটি পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা ০.২ থেকে শতকরা ১.১-এ উন্নীত করবেন। এটা হয় নি।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৯০-৯৫) তেরশ কোটি টাকা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়েছে।

তালিকা-৭ : চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	ব্যয় (কোটি টাকা)
১.	মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক	৯৩৭.৫৬
২.	বিশ্ববিদ্যালয়	২২৮.৯১
৩.	কারিগরি	৮০.৪৪
৪.	অন্যান্য	৯৪.৪১
	মোট	১৩৪১.৩২

বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রায় একশত কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার জন্য ব্যয় করে; এই অর্থের বেশির ভাগই শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার জন্য ব্যয় করা হয় যার ফলে গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত কম পরিমাণ অর্থই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব কম হবার এটিই একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এই সমস্যার সচেতনতা থেকেই ১৯৯৭-৯৮ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রায় ১২ কোটি টাকার একটি বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করে, যা দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কর্মক্ষমতা সৃষ্টির প্রায় ৬৫টি প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা দান করা যায়। প্রকল্পগুলির ফলাফল বাংলাদেশ 'একাডেমি অব সায়েন্সের' একটি বিজ্ঞানী কমিটি মূল্যায়ন করে। মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে এই প্রথম বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কিছু অর্থ হাতে পেয়েছিলেন যা দিয়ে আধুনিক অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনে গবেষণাগারগুলি সজ্জিত করতে পারেন। বলা হয়েছিল যে বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের একটি নিজস্ব তালিকা থাকা উচিত যা আমাদের জাতীয় প্রয়োজন এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা মনে রেখে তৈরি করা হবে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে কৃষি, জীববিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং এমনকি মৌলিক বিজ্ঞানের প্রকল্পসমূহের একটি ন্যায়সঙ্গত বণ্টন।

দু:খের ব্যাপার এই যে রাজনীতিকদের বাগাড়ম্বর বাদ দিয়ে দেখা যায় যে আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় হলো সর্বাপেক্ষা রাজনীতিদুষ্ট অঞ্চল। শিক্ষার ক্ষেত্রে আজকের বাংলাদেশের ব্যয় ১৯৬০ সালের কোরিয়ার ব্যয়ের সমান-জিডিপির শতকরা ২ ভাগ।

লেখচিত্র

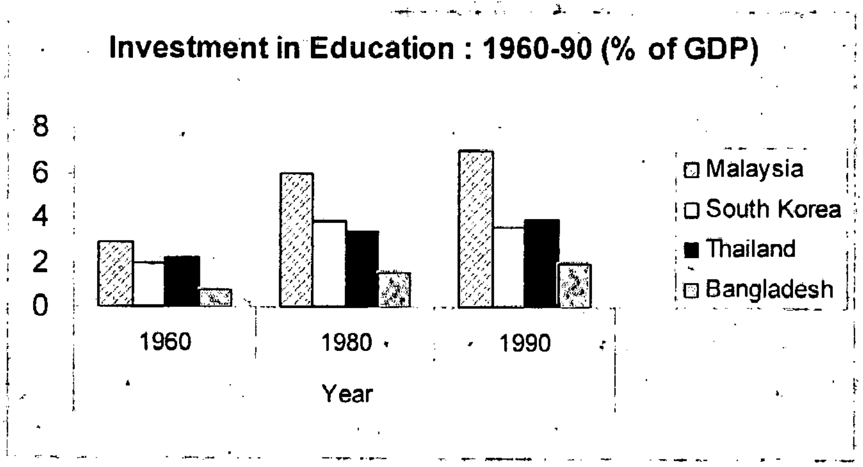

সূত্র: ইউএনডিপি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৪-৯৬

বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণাগ্রন্থ "বাংলাদেশ-২০২০" যথার্থই বলেছে, "যদি শিক্ষাগত কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে দিতে হয় তাহলে ঐ অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ২০০০ সালের মধ্যে জিডিপি'র শতকরা ৩ ভাগে উন্নীত করতে হবে। অতিরিক্ত এই অর্থ দিয়ে শুধু যে শিক্ষার মান উন্নীত করতে হবে, তাই নয়, শিক্ষালাভের সুযোগও বৃদ্ধি করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে এই সুযোগ বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা সর্বজনীনভাবে সকলের কছে পৌঁছায় যাতে বিদ্যালয় পদ্ধতির সর্বত্র ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-বৈষম্য দূর করা যায়।"

৮। শিক্ষা সংস্কার

উচ্চ শিক্ষার, বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি মোটামুটি সকলেই জানেন। এর সমাধানের জন্য আলাদীনের প্রদীপও অবশ্য নেই, এমনকি নির্বাচিত সরকারের কালও এজন্য যথেষ্ট নয়। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে যা ছয়টি শিক্ষা কমিশনের অস্তিত্ব থেকেই সুস্পষ্ট কিন্তু এটা বোধ হয় নির্দ্বিধায় বলা যায় যে এতদিনেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেরকম কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নি। তবু মানুষের অন্তরে আশা অনন্তকাল ধরেই জাগে। তাই ব্যাপক পটভূমির উপর কিছু কিছু পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

(ক) **সাংগঠনিক পরিবর্তন**

ছয়টি শিক্ষা কমিশনের অভিজ্ঞতা থেকে সুস্পষ্ট যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটামুটি রক্ষণশীল ও কল্পনাহীন এবং তাই সম্ভবত তারা কোন ক্ষেত্রেই বড় ধরনের সাংগঠনিক পরিবর্তন প্রবর্তন করতে খুব বেশি উৎসাহী নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে তো মোটেই নয়। একটি সুন্দর উদাহরণ হলো তথাকথিত "কোর্স" বা সেমিস্টার পদ্ধতির প্রবর্তন যা প্রায় বিশ বছর পরেও সর্বজনীনভাবে এবং সুষমভাবে দেশের সর্বত্র বাস্তবায়িত হয় নি। আর একটি নতুন ধারণা হলো তিনবছর থেকে চার-বছরের অনার্স কোর্সে উৎক্রান্তি, যে ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরণ পরিবর্তনের সমর্থক যতজন আছেন, এর বিরোধীর সংখ্যাও প্রায় একই। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী চার-বছরের অনার্স কোর্স তিনবছর অনার্স এবং একবছর এমএসসি কোর্সের সমতুল্য এই সরকারি সিদ্ধান্ত এবং তার বাস্তবায়নের অভাবের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকতর আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এম.এসসি ডিগ্রি কীভাবে বিএসসি অনার্স ডিগ্রির সমতুল্য হতে পারে তার লজিক বোঝা কষ্টকর কিন্তু লজিক বা যুক্তি এমন ব্যাপার যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেকসময়ে স্বল্পই প্রতিফলিত হয়। বহিরাগতের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শিক্ষার মান এবং এই ব্যাপারে মনে হয় সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে একটা ঐকমত্য আছে যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উৎপাদন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অনেক কিছুই আশানুরূপ পরিমাণে থাকে না, বিশেষ করে আজকের কঠিন প্রতিযোগিতার জগতে।

সুতরাং প্রথম যে পরামর্শ দেওয়া যায় তা হলো এই যে, ব্যাপক সাংগঠনিক পরিবর্তন পরিহার করে শিক্ষার মানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা উচিত, বিশেষ করে সব পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষকের মানের ক্ষেত্রে। শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারণের একটা পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন, সম্ভব হলে আমেরিকান পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায় যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সুযোগ থাকে তার শিক্ষকদের মূল্যায়ন করার। শিক্ষকদের ছাত্র কর্তৃক মূল্যায়নের পদ্ধতি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় জরুরি প্রয়োজন বলে মনে হয়।

(খ) **পরিচালনা পরিবর্তন**

শিক্ষকবৃন্দ সব সময়ে বাধ্য জনগোষ্ঠী ; তাই তাদের পরিচালনা পৃথিবীর কোথাও সমস্যার সৃষ্টি করে না শুধু বাংলাদেশ ছাড়া। ১৯৯২ সালের টাস্ক ফোর্স রিপোর্টে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অংশে বলা হয়েছে,

"বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে একটা নৈর্ব্যক্তিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যেই একটা সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষাদান, গবেষণা এবং প্রাপ্তব্য সম্পদ সমন্বিতকরণের ক্ষেত্রে অদক্ষতার সৃষ্টি হয়েছে। কার্যকরী জবাবদিহিতার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন অদক্ষ আমলাতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে যা অনেক সময়ে দলীয় একনায়কতন্ত্রের কাছাকাছি চলে যায়।"

টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যে সব স্ট্যাটিউট ও রেগুলেশন দিয়ে পরিচালিত হয় সেগুলির পুনর্বীক্ষণের জন্য বলেছে। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতি প্রায় সব সমস্যার সূতিকাগার যার অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের "সংঘাতময় পরিবেশ"। এর চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি হলো একটি অন্বেষণ কমিটি নিয়োগ করা যার সদস্য হবেন প্রখ্যাত অরাজনৈতিক শিক্ষাবিদেরা এবং এই কমিটির কাজ হবে সরাসরি চ্যান্সেলরকে ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া, যে ভাইস-চ্যান্সেলর হবেন সুপরিচিত একজন শিক্ষাবিদ এবং তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। সে যাই হোক, কিছু একটা করা প্রয়োজন যাতে নিচের যে ধারণা এখন খোলাখুলি প্রকাশ করা হচ্ছে তা দূর করা সম্ভব হয়,

"উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসগুলি চরমভাবে রাজনীতিদুষ্ট যেখানে প্রধান রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র যুবসংগঠনগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করার মাধ্যমে একাডেমিক কার্যকলাপকে বিপর্যস্ত করে দেয়। মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে যোগ্যতার প্রমাণপত্রের মূল্য শ্রমের বাজারে খুবই কম কেননা একে মনে করা হয় সম্পূর্ণ একাডেমিক কার্যকলাপ।"

এটা অবশ্যই একটা অর্থহীন সমালোচনা কেননা একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের কাজই হলো একাডেমিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া শ্রমের বাজার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাভাবনা না করে। সমস্যা হলো আমাদের একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের একাডেমিক কাজ ঠিকমতো ও সুষ্ঠুভাবে করছে কিনা। এই প্রশ্নের একটি ইতিবাচক উত্তর দেওয়া খুবই কষ্টকর।

(গ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন

অবকাঠামোগত পরিবর্তনের একটা আশ্চর্যজনক পরামর্শ হলো শিক্ষা কমিশন-১৯৯৯ এর দ্বিস্তরবিশিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রস্তাব যা বাস্তবায়নের জন্য বিশাল অংকের অর্থের প্রয়োজন। এটা করার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ কোন উন্নতি হবে না, অবশ্য বিবেকহীন কিছু ব্যক্তির হাতে বিশাল পরিমাণ অর্থের যোগান দেওয়া ছাড়া।

স্পষ্টতই সব শিক্ষায়তনের ক্ষেত্রেই অবকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রথম থেকেই যোগ্য ব্যক্তি থাকতে হবে যাঁরা এসব উন্নয়নের পরিকল্পনা সময় থাকতে করতে পারেন। সরকারের করণীয় হলো ঠিক কাজের জন্য ঠিক ব্যক্তিটিকে পছন্দ করা।

(ঘ) শিক্ষাসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক

যে কোন বিষয়ে যে কোন পর্যায়ে একটি আধুনিক শিক্ষাসূচি প্রণয়ন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞের কাজ এবং তা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া যার জন্য প্রয়োজন অনেক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির আন্তরিক সহযোগিতা। যদি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা না হয় শিশু-কিশোর-তরুণদের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা থেকে, সব ধরনের রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে থেকে এবং শুধু জাতির প্রতি, আমাদের ইতিহাসের প্রতি এবং জাতিপুঞ্জের মাঝে আমাদের সম্মানজনক অবস্থান অর্জনের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে, তাহলে আমাদের সব শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। দেশে প্রতিভাবান শিক্ষকদের কোন অভাব নেই যারা সব বিষয়ে স্বেচ্ছায় উপযুক্ত শিক্ষাসূচি প্রণয়নে এবং আধুনিক পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসবেন যাতে একবিংশ শতাব্দীর আমাদের শিশুদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। যা প্রয়োজন তা হলো আরও কম বিতর্ক এবং অনেক বেশি কঠোর পরিশ্রম যার মাধ্যমে জাতি গঠন করা যায়।

(ঙ) পরিবর্তন এবং মনিটরিং

ব্রিটিশ আমলে স্কুল এবং কলেজে পরিদর্শনের ব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল কিন্তু দু:খের বিষয় বর্তমানে এই ব্যবস্থা ততটা ব্যবহৃত হয় না। একটা সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ অংশ হিসেবে এই ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রস্তাব তৈরি করেছেন যার ফলে স্কুল পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানকে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতেই হবে। বলাইবাহুল্য এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ধারণা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবপর্যায়ে অনুস্রাবণ পদ্ধতিতে প্রবেশ করা উচিত।

একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আইন অনুসারে কমিশন যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন সময়ে পরিদর্শন করতে পারেন এবং তার শিক্ষকতা ও গবেষণা কার্যক্রমের ব্যাপারে পরামর্শ দান করতে পারেন। বর্তমানে পৃথিবীতে জ্ঞান বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(চ) শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা

এই প্রশ্ন বহুকাল ধরে আলোচিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং এমনকি রাজনৈতিক কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে কিন্তু শিক্ষকদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। সরকার আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এসব দেশের বেতনকাঠামো পর্যালোচনা করতে পারেন এবং তাহলেই দেখতে পারবেন যে আমাদের শিক্ষকসম্প্রদায় কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। সম্পদের অভাব একথা খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া যায় না।

মূল কথা হলো সত্যিকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া তেমন কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয় এবং রাজনৈতিক নেতারা যদি শিক্ষকদের সম্মান জানাতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে সমাজও আপনা আপনি তা করবে।

৯। আগামী ১৫ বছরে আর্থিক চাহিদা

১৯৯২ এবং ১৯৯৫ এই সময় কালের মধ্যে এডিপিতে শিক্ষার বরাদ্দ শতকরা ৮ থেকে ১৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে যার ফলে বর্তমান ব্যয়ের শিক্ষার অংশ প্রায় শতকরা ২০-এ চলে এসেছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক হতাশাজনক অবস্থা লক্ষ্য করে বলা যায় যে এই সংখ্যাটি আরও উন্নীত করা প্রয়োজন যাতে তা আগামী ১৫ বছরের শেষে বর্তমান ব্যয়ের শতকরা ৪০-এ চলে আসে।

১০। চূড়ান্ত সুপারিশসমূহ

এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর মানুষ কতগুলি মৌলিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। এর অন্যতম হলো জ্ঞানের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ এবং মানুষের অনুধাবন শক্তি দিয়ে তা যথাযথ আত্মস্থ করার ক্ষমতা এই দুয়ের মধ্যে আপাতবিরোধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান প্রগতি এবং অদূর ভবিষ্যতে তার উত্তরোত্তর প্রগতি এবং বস্তু ও সেবার সৃষ্টিতে তার অবিসংবাদী গুরুত্ব—এই পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন যা সর্বস্তরের শিক্ষাসূচিতে অধিকতর বৈচিত্র্যের স্থান দেবে। একটা সম্পূর্ণ আধেয়ভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর পরিবর্তিত শিক্ষা প্রবর্তনের চিন্তা করা যায়, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে, যা আধুনিকতম প্রযুক্তিভিত্তিক হবে, এমনকি মাধ্যমিক পর্যায়েও জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ধারার সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হবে (উদাহরণস্বরূপ লেজার, ইন্টারনেট, অথবা ডিএনএ-অণুর প্রাথমিক ধারণা); যা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই নেটওয়ার্কিং-এর সুবিধাসমূহ ব্যবহার করতে সচেষ্ট হবে; যা সব পর্যায়ে নিজের হাতে পরীক্ষণভিত্তিক কাজ করতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহী করবে; যা গ্রামাঞ্চলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ভ্রাম্যমাণ ভ্যানের সাহায্যে গ্রামবাসীদের বিজ্ঞানমনস্ক করতে উদ্যোগী হবে এবং যা অবশ্যই বিজ্ঞান বিষয়সমূহে একটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানশিক্ষার জাতীয় মানদণ্ড হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ পথচলার আলোকবর্তিকার মতো কাজ করতে পারবে।

এই পটভূমিতে স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য হিসেবে নিম্নের পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যায়। এগুলি খুব ব্যয়সাধ্য নয় এবং অর্জন করা অসম্ভবও নয় :

১. আধেয়ভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তন যা আধুনিকতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতির উপর বিশেষ আলোকপাত করবে;

২. বিজ্ঞান বিষয়সমূহের তাত্ত্বিক জ্ঞানই যে শুধু আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন তা নয়, পরীক্ষাগারের শিক্ষাদানও যুগোপযোগী করতে হবে;

৩. উপযুক্ত বেতনসহ উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য একটি জাতীয় সার্ভিস ক্যাডার সৃষ্টি করতে হবে;

৪. বিজ্ঞান বিষয়ে একটি জাতীয় শিক্ষাদান মানদণ্ড প্রস্তুত করতে হবে;

৫. বিজ্ঞান শিক্ষা অবশ্যই কৌতূহলভিত্তিক হতে হবে যা শিক্ষার্থীর মনে সত্যিকারের প্রশ্নের সৃষ্টি করে এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতিকে জানার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত আনন্দের জন্ম দেয়;

৬. কলেজগুলিতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা এবং গণিতের দক্ষ শিক্ষকের অভাব সর্বব্যাপী এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা শহরের বাইরের কলেজগুলিতে সঙ্গত কারণেই যোগদান করতে অনিচ্ছুক। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তরুণ শিক্ষকদের মফঃস্বল অঞ্চলে আবাসনের বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য মোবাইল ভ্যানের ব্যবস্থা করা যায়;

৮. সব শিক্ষকের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য 'ছাত্র কর্তৃক মূল্যায়ন' পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায় যা যুক্তরাষ্ট্রে বহুল প্রচলিত;

৯. বাংলাদেশের সব শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নেটওয়ার্কিং সুবিধা প্রচলন করা প্রয়োজন;

১০. ঢাকা এবং চট্টগ্রামে বিজ্ঞান পার্ক এবং নোভোথিয়েটার স্থাপন করা প্রয়োজন;

১১. টিভি চ্যানেলগুলিতে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম চালু করা প্রয়োজন;

১২. পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা এবং গণিতে অলিম্পিয়াড জাতীয়ভিত্তিতে প্রবর্তন করা প্রয়োজন;

১৩. চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের মতো পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া আশু প্রয়োজন;

১৪. বাংলাদেশের সবগুলি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিষয়ের সেন্টার অব একসেলেন্স স্থাপন করা প্রয়োজন;

১৫. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা অর্জনের জন্য বিশেষ ভাষাকোর্স প্রবর্তন করা প্রয়োজন;

১৬. বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুল এবং কলেজে উপযুক্ত শিক্ষকসহ একটি করে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন;

১৭. বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব পর্যায়ে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা প্রয়োজন, বিশেষ করে সামার সায়েন্স প্রোগ্রামটি অবিলম্বে পুনরায় চালু করা অতীব জরুরি;

১৮. সব পর্যায়ের শিক্ষদের উপযুক্ত বেতনভাতার ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় জাতীয় কর্তব্য;

১৯. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বা মূল্যায়ন সংস্থা স্থাপন করে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা প্রয়োজন;

২০. সবশেষে, ঢাকার কেন্দ্রস্থলে জাতীয় মনুমেন্ট হিসেবে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন স্থাপন করা প্রয়োজন।

এই সব স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী একটি বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পরিমণ্ডল তৈরি করা যা হবে সম্পূর্ণ আধুনিক, জিজ্ঞাসাভিত্তিক এবং যার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সত্যিকারের আনন্দ এবং প্রকৃতিকে বোঝা ও অনুসন্ধান করার প্রেরণা সৃষ্টি করা যায়। একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে যে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা আজকাল সৃষ্টি হয়েছে তা হলো "আজীবন শিক্ষার" ধারণা। দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে সারাজীবনই আমাদের শিখতে হবে এটাই বোধ হয় প্রকৃত শিক্ষা।

আবার একথাও ঠিক যে এই প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের জন্য আমাদের অতি পরিচিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্পও কিছু নেই। চিরায়ত শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শবাদী বলিষ্ঠ তরুণ মনই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রজ্ঞা ও তারুণ্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট ছাত্র-শিক্ষকের নিবিড়তম সম্পর্ক এটাই সব শিক্ষাব্যবস্থার মূল কথা। এবং শিক্ষকের একমাত্র দায়িত্ব হলো ছাত্রের কাছে সর্বশেষ অর্জিত জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া যা মনুষ্যজাতির নিষ্ঠাবান কঠোর সংগ্রামের ফল এবং যা কোন প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান নয়।

মূল রচনা :
প্রফেসর এ. এম. হারুন-অর-রশিদ

নবম অধ্যায়
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা (জীববিজ্ঞান)

১। জীববিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য

বর্তমান যুগকে অনেক সময় জীববিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নততর গবেষণা কার্যক্রমে, পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টিতে এবং শিল্প-কারখানার কাঁচামাল উৎপাদনে জীববিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের অবদান অসামান্য। তাই জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গুরুত্ব বিবেচনা করে এখন জ্ঞানের অন্য শাখার সঙ্গেও জীববিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। এভাবেই এখন গড়ে উঠেছে Biophysics, Biochemistry, Biostatistics, Biotechnology, Biogeography, Enviornmental Biology, Zoogeography ইত্যাদি। বিশ্বব্যাপী জীববিজ্ঞান শিক্ষা, শিক্ষাদান ও গবেষণার প্রধান লক্ষ্য বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসরত সমগ্র পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ও তাদের অর্থনৈতিকভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে জীববিজ্ঞানের বিবর্তন ও অগ্রগতি হয়েছে অতি দ্রুত এবং এ পরিবর্তন এখনও অব্যাহত ধারায় চলছে। যদিও কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল, তথাপি Biology-কে ইউরোপে স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা হিসেবে বিবেচনা শুরু হয় ১৮০২ সালে। ঐ সময় চিকিৎসক এবং প্রকৃতিবিদগণই এ বিষয় সম্পর্কে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত কাজ শুরু করেন। ঐ সময় ইউরোপে এটি ছিল একটি মৌলিক বিষয় এবং বিভিন্ন জীবের গঠনবৈচিত্র্য ও জীবনপদ্ধতি প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বস্তুত তখন জীববিজ্ঞানের প্রধান উপাদান হিসেবে উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অনুজীববিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞান(Anthropology) অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্প্রতি এ শাখার সাথে Molecular and Cell Biology, Genetic Engineering & Biotechnology, Functional Anatomy, Histology, Physiology, Morphology, Systematics, Taxonomy, Ecology, Conservation Biology ইত্যাদি শাখা যুক্ত হয়েছে। এই দ্রুত সম্প্রসারণের পাশাপাশি শুরু হয়েছে অনেক বৈশিষ্ট্যমূলক (specialized) শাখায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম। ইলেক্ট্রোন মাইক্রোসকোপ, ইলেক্ট্রোফোরেটিক যন্ত্রপাতি এবং জীব প্রকৌশলে ব্যবহারযোগ্য অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়ে কোষ পর্যায়ের অতিসূক্ষ্ম গঠন ও কার্যাদি পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের কাজে প্রচুর সহায়ক হয়েছে। এর পাশাপাশি জীববিজ্ঞান যতই জটিলতর হচ্ছে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা। কম্পিউটারের অভাবনীয় উন্নয়নের ফলে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সহজেই জমা করে রাখা যাচ্ছে এবং সার্বিক মানবকল্যাণে তা ব্যবহার করাও যাচ্ছে।

পাশ্চাত্যে জীববিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিপুল অগ্রগতি হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কেবল যুক্তরাজ্যের Institute of Biology-তেই বর্তমানে এ বিষয়ে অন্তত ৩০টি শাখায় বিশেষজ্ঞসুলভ শিক্ষাদান ও গবেষণা চলছে। পরিবেশ, মানুষ, বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে সেবামূলক বিষয় হিসেবেই জীববিজ্ঞান এখন চিহ্নিত। ইউরোপীয় দেশসমূহে জীববিজ্ঞানীদের পেশাগত দক্ষতার অনুপ্রেরণা জোগাতে European Countries Biologists Assoctation সম্মানসূচক পুরস্কারের ব্যবস্থা চালু করেছে।

সম্প্রতি জীববিজ্ঞানের দুইটি বিশেষ ধারা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এর একটি Stem cell research এবং অপরটি Bio-ethics। ২০০২ সালে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে Human Genome Project।

জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্যে এ বিশেষ ধারার ফলাফলের আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে গেলে উপরের বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

পৃথিবীর প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এক সময়ে জীববিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা শুরু হতো উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠনবৈশিষ্ট্য এবং অঙ্গসংস্থান শিক্ষাদানের মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে জীবের গঠন প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গাদির বিন্যাস ও কার্যাদি, স্বভাব ও আচরণ ইত্যাদি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এখনও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধারা বহাল রয়েছে। বিজ্ঞানের এ শাখার অব্যাহত উন্নয়ন ও জটিলতার প্রেক্ষাপটে এসব বিষয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে এখন। জীবজগতের সঙ্গে জৈব ও অজৈব পরিবেশের সম্পর্ক, জীববৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ, Biotechnology, Tissue Culture, Genetic Engineering, DNA studies ইত্যাদি গুরুত্ব পাচ্ছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে, উন্নততর পশু, ফসল ও ফল উৎপাদনে, পরজীবী ও রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে জীববিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণা এখন অনেক অবদান রাখছে।

DNA বা জিন গবেষণার ফলে মানুষ আজ ক্রমে ক্রমে জীব-রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। নতুন জ্ঞান মানুষকে দিচ্ছে নতুন শক্তি ও কর্মের অনুপ্রেরণা। অনুজীবকে নির্দেশ দিয়ে মানুষ তৈরি করছে কৃত্রিম ইনসুলিন, দেহ-বৃদ্ধির হরমোন; সহজ হয়েছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা, কৃষিতে দেখা দিচ্ছে উন্নত আর প্রাচুর্যময় ফসলের সম্ভাবনা; শিল্প পদ্ধতিতে ঘটছে বিপ্লব, সম্ভব হচ্ছে ইচ্ছেমতো গুণাগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীর জাত উদ্ভাবন। অণুজীবের সাহায্যে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তৈরি হচ্ছে প্রোটিন। জীববিজ্ঞানীরা আশা করছেন বংশগতির রহস্য উদঘাটনের ফলে জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি প্রয়োগে আগামী দিনে সম্ভব নানা বংশগত ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ, ক্যান্সার নিরাময়, পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্তি, এমনকি জ্বালানি সংকটের নিরসন।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জীববিজ্ঞানে শিক্ষাদান শুরু হয় ১৯৩৯ সালে। ঐ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে এ বিভাগ উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ভাগ হয়ে পৃথকভাবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কাজ শুরু করে। মূলত কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জীববিজ্ঞানের শিক্ষাদান শুরু হলেও এখানকার পাঠক্রমে বিষয়বস্তু ব্যাপকভাবে আলোচনা করার সুযোগ নেই। স্বাধীনতার পর উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং মৌলিক বিষয়ের পাশাপাশি শ্রেণীবিন্যাসতত্ত্ব এবং পরিবেশ ও বাস্তুতত্ত্বসহ আধুনিক জীববিজ্ঞানের কোর্স চালু হয়েছে। তবে ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের মতো জীববিজ্ঞানকে শিল্পপণ্য উৎপাদনকারী বিষয় হিসেবে এখন বিবেচনা করা হয় না।

নানা কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম দুর্বল। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান করার ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব প্রকট। এ বিষয়কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও পূর্ণ সফলতা এখনও আসে নি। প্রকৃতি ও মানুষকে জানার কৌতূহল গড়ে না-উঠলে এ দুর্বলতা কাটানো যাবে না। এদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে শুরুতেই শিশুদের মধ্যে প্রকৃতিকে জানবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে হবে।

উন্নত দেশে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীববিজ্ঞান শিক্ষার পাঠ্য বিষয়সমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির সঙ্গে তুলনা করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম তৈরি করে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্বভাবে। এ সময় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম তেমন বিবেচনায় আনা হয় না। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে উচ্চশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য নতুন জ্ঞানের উদ্ভব ঘটানো, যা হতে পারে মৌলিক অথবা প্রয়োগমুখী।

প্রকৃত উচ্চশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে জীববিজ্ঞানকে করতে হবে আরও কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণীয়। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু প্রাণী বা উদ্ভিদের পরিচিতি নয়, জীববিজ্ঞানকে গতিশীল বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের জীবন যে জীবসম্পদের উপর নির্ভরশীল তা তীব্রভাবে অনুধাবন করতে হবে।

২। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় জীববিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা

এদেশে জীববিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয় ১৯৩৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৯৫৪ সালে এ বিভাগ বিভক্ত হয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা নামে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে দেশের আরও কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণার কাজ শুরু করে। এছাড়া এখন মূল উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যার কয়েকটি বিশেষ শাখার উপরও স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জীববিজ্ঞান কোর্স চালু করার তেমন উৎসাহ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

জীববিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও এখন অন্তত ২০টি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের কোর্স অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধিভুক্ত কলেজসমূহ বাদ দিলে বাংলাদেশে বর্তমানে ১২টি পাবলিক (৫টি টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ) ও ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা ভর্তি হচ্ছে। আরও ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে। ইতোমধ্যে ৬টির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনুরূপভাবে ২০-২৫ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স কোর্সেও প্রতি বছর ভর্তি হচ্ছে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের সকল ধারায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রতি বছর ৫০-৬০

হাজার। বলতেই হবে উচ্চশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে, যদিও উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামোর দারুণ অভাব রয়েছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে।

সারা বিশ্ব জুড়েই জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান দ্রুত বিকাশলাভ করছে। নতুন নুতন আবিষ্কার, উদ্ভাবন, সংযোজন ও রূপান্তরের ভেতর দিয়েই জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি। এ অগ্রগতির মূলে কাজ করছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, তত্ত্ববিশ্লেষণ, যুক্তিপ্রয়োগ এবং বিভিন্ন তত্ত্ব ও উপাত্তের ব্যাখ্যা ও সমন্বয়সাধন।

বিগত কয়েক দশকে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট যে সব নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, অ্যাকুয়াকালচার অ্যান্ড ফিশারিজ বিভাগ, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ, জনসংখ্যা বিজ্ঞান ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, জেনেটিক্স ও ব্রিডিং বিভাগ, বায়োটেকনোলজি ডিসিপ্লিন, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন ইত্যাদি। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীববিজ্ঞানের গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং খাদ্য, স্বাস্থ্য,ঔষধপত্র ও শিল্প কারখানায় উপকারী জীবের ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগ ও দূরবর্তী এলাকার মৎস্যসম্পদসহ সামুদ্রিক জীবসম্পদের টেকসই আহরণ,সংরক্ষণ ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদের পরিমাণ ও তালিকা তৈরির গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউট অব মেরিন বায়োলজি স্থাপিত হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বনভূমি সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ দারুবৃক্ষের উন্নয়ন, ব্যবহার ও প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য যথাক্রমে ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এবং ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিন যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন বিভাগ খোলা হলেও উপযুক্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও ব্যবহারিক শিক্ষা উপকরণের অভাবে কাঙ্ক্ষিত মানের গ্রাজুয়েট তৈরি হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্রম আধুনিক মানের নয় এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদান মানসম্মত নয়। অধিকন্তু উচ্চশিক্ষার ব্যবহারিক শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বরাদ্দ যথেষ্ট কম। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্বাচিত কিছুসংখ্যক কোর্স নিয়ে (জীববিজ্ঞান ছাড়া) পড়াশোনার সুযোগ থাকলেও এগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হবার ঝোঁক বাড়ছে। তবে পরিবেশ বিজ্ঞানসহ জীববিজ্ঞানের বিশেষ কোর্স কোন কোন শাখায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকলে, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি হলে এবং নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হলে হয়তো জীববিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদান শুরু হবে। ফলে, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একদিকে ক্রমবর্ধমান চাপ হ্রাস পাবে, অন্যদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেকার মানের তারতম্য বোঝা যাবে। সে সঙ্গে উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মানোন্নয়নের প্রতিযোগিতাও শুরু হবার সম্ভাবনা থাকবে।

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের সবগুলো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের প্রতিষ্ঠালগ্নে শ্রেণীকক্ষগুলোতে আসনসংখ্যা ছিল অনুর্ধ্ব ৪০। বিগত দুই দশকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে অন্তত দ্বিগুণ। ফলে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য আসনব্যবস্থা করা অনেক বিভাগের জন্য গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ব্যবহারিক ক্লাস ও গবেষণাগারগুলোর অবস্থাও একই রকম। কোন কোন বিভাগ বড় ক্লাসগুলো সেকশনে বিভক্ত করে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেও সাম্প্রতিককালে ৪ বছর মেয়াদি বি.এস-সি অনার্স কোর্স চালু করার ফলে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০১) অনুযায়ী দেশের প্রধান কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীসংখ্যা নিম্নরূপ– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৬২০; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৭১১; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১১৭১; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৬৮৬; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩০৭ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগ) ১৭১। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির চাপ এখনও অব্যাহত রয়েছে। বিভাগগুলোতে বর্তমানে আর যাই থাক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ বহুলাংশে অনুপস্থিত। লক্ষ্য করা যায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা শতকরা অন্তত ২৫ ভাগ। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদে এ সংখ্যা ছিল শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ।

বিজ্ঞানবিষয়ক বিভাগগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:১০ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করা হলেও বর্তমানে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অনুপাত ১:১৫ অথবা তার বেশি। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও অর্থবহ করতে হলে এ অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৬ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক পদে বহাল ছিলেন শতকরা প্রায় ৮ জন এবং প্রভাষক পদে শতকরা প্রায় ৩৭ জন। ব্যক্তিগত পদোন্নতি পদ্ধতি চালু হবার ফলে ২০০০ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে অধ্যাপক শতকরা প্রায় ৩৪ জন এবং লেকচারার শতকরা প্রায় ২৩ জন। সম্প্রতি এ অবস্থার আরও পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রতি বিভাগে মোট শিক্ষকের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগের বেশি এখন অধ্যাপক। পদোন্নতির এ ধারা আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকলে এবং নতুন প্রভাষকের পদ সৃষ্টি না হলে অনেক বিভাগে কেবল অধ্যাপক পদেই শিক্ষক কর্মরত থাকবেন।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত অনার্স ডিগ্রি কোর্স এবং দুই বছরের মাস্টার্স ও এম.ফিল ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হচ্ছে। জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এসব কোর্স পড়ানো হয় এবং গবেষণার জন্য নানা বিষয় নির্বাচন করা হয়-। পি-এইচ.ডি কোর্সের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা না-থাকলেও তিন থেকে ছয় বছরের মধ্যেই শেষ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। গবেষণা কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশ গ্রহণ করতে হয় এবং মৌলিক গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

দেশে বর্তমানে জীববিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের কিনা এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আছ। দেশ এবং জাতি যে মানের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আশা করে তা যে হচ্ছে না এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। গবেষণার ক্ষেত্রেও অনুরূপ মন্তব্য করা যায়; কারণ, উচ্চশিক্ষা অর্জনের সাথে গবেষণার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। নিত্যনতুন তত্ত্ব ও তথ্যের উন্মেষ ঘটায় গবেষণাকর্ম। এক সময়ে এই ধারণা বাস্তবে রূপ দেবার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে উচ্চতর গবেষণার যে ঐতিহ্য কতিপয় গবেষক গড়ে তুলেছিলেন তা আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। আজ বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এই ঐতিহ্য ঠিকমতো লালন করতে পারছে না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার মান এখন নিম্নমুখী বলে অনেকে মন্তব্য করেন।

বলা যায়, গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মোটামুটি এক অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। অধিকাংশ গবেষণা কাজ খণ্ডিতভাবে এবং সমন্বিত সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। জীববিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব গবেষণা চলছে, অনেক ক্ষেত্রে তা এককভাবে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে। গবেষণার মূল এলাকাগুলো দেশীয় সমস্যাবিষয়ক হলেও অধিকাংশ গবেষণার কাজ ভাসা-ভাসা, গভীরতাবিহীন। গবেষণাগার-ভিত্তিক গবেষণা এখনও প্রাধান্য পাচ্ছে, অথচ জীববিজ্ঞানের গবেষণার বড় অংশ মাঠ পর্যায়ে হওয়া উচিত।

জীববিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগেই স্পেশালাইজড কোর্সের শিক্ষাদান চালু রয়েছে। এসব শাখায় পৃথক পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কাজ চলে। উল্লেখযোগ্য, যে দিকগুলোতে গবেষণা কাজ চলছে সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী শনাক্তকরণ, তাদের বিস্তৃতি ও বর্তমান অবস্থা; সমন্বিত ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা; পুকুরে মৎস্যচাষ সংক্রান্ত বিষয়াদি; জলজ সম্পদের ব্যবহার ও উন্নয়ন; শিল্পকার্যে ব্যবহার্য অণুজীব; সিল্কওয়ার্ম এবং তুঁতগাছের জাত উন্নয়ন; জীবজ সার; বিভিন্ন অর্থকরী উদ্ভিদের উপর জিনতাত্ত্বিক গবেষণা; টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভিদের বংশবিস্তারকরণ; ভেষজ উদ্ভিদ; ক্রোমোজোম ব্যান্ডিং; মুখে খাবার উপযোগী টীকা উৎপাদন; DNA প্রোফাইল; মৎস্য উন্নয়ন ও উৎপাদনে জীব প্রযুক্তির ব্যবহার; জলাভূমির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

অনেক গবেষণা কাজ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ফেলোশিপ অথবা অনুদানের অর্থে পরিচালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি রিসার্চ সেন্টার এবং অ্যাডভান্সড সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল রিসার্চও গবেষকদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য পৃথক গবেষণা বাজেট বা ফান্ড থাকলেও তা অতি নগণ্য।

৩। দুর্বলতা ও অন্তরায়

অন্য বিষয়গুলোর মতোই জীববিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার মানের ক্রম অবনতির পিছনে যেসব কারণ চিহ্নিত করা হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অনুপস্থিতি, গবেষণাগারে আধুনিক মানের যন্ত্রপাতির অভাব, ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কম মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার সুযোগদান,শিক্ষকদের প্রতিশ্রুত দায়িত্বের অভাব, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পাঠক্রমের সমন্বয়

ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা না-থাকা ইত্যাদি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট বরাদ্দের মাত্র সামান্য অংশ শিক্ষা, ল্যাবরেটরি ও গবেষণা খাতে ব্যয় হয়। বাকি প্রায় সব অর্থ ব্যয় হয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা বাবদ। শিক্ষকদের আলাদা বেতনস্কেল নেই। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, মানসম্মত বইপুস্তক রচনা ও মুদ্রণ, পাঠ্যসামগ্রী প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিক্ষা বাজেটে প্রায়ই বিবেচনা করা হয় না।

জীববিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বছর ভর্তি হয় তাদের একটি বড় অংশ স্কুল-কলেজ পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা পায় নি। এরা ভোগান্তির শিকার হয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে পড়াশোনায় নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। পাশাপাশি, এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠে নি এবং তা বলবৎ করাও দুরূহ কাজ। এ ব্যাপারে যোগ্যতা পরিমাপের জন্য শিক্ষকেরা নিজেরাই একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। বিষয়টি এখন গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ গবেষণা ও শিক্ষার মান বাড়াতে হলে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য দায়িত্ববান জনগোষ্ঠী থেকে শিক্ষকদের পৃথক ভাবার কোনো কারণ নেই। দূরদৃষ্টি, দায়িত্ব পালনের কঠোর মনোভাব, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি নিঃসন্দেহে শিক্ষকদের বিচ্যুতিগুলোর অবসান ঘটাতে পারে।

অতি সাধারণ ও মামুলি ধরনের অবকাঠামোসহ আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব জীববিজ্ঞান গবেষণায় বড় অন্তরায়। ফলে সনাতন পদ্ধতির শিক্ষাদান ও গবেষণার ধারা থেকে শিক্ষক-গবেষকরা বের হয়ে আসতে পারছেন না। গ্রন্থাগারে রয়েছে প্রয়োজনীয় জার্নাল, পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বইয়ের অপ্রতুলতা। এ সব মিলে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বছর-বছর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেলেও শ্রেণীকক্ষের পরিসর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বের মতোই রয়ে গেছে। ফলে শ্রেণীকক্ষে আসনের সঙ্কুলান হয়ে ওঠে না।

ছাত্র রাজনীতি উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতিতে বড় এক অন্তরায়। দেশের দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে মাঝে মধ্যেই ক্যাম্পাসে মিছিল, সভা, আন্তঃদলীয় সংঘাত হয় এবং নিয়মিত ক্লাস পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায়। শিক্ষার পরিবেশের উপর এর প্রভাব হয় নেতিবাচক। দেশের ও উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং এ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে যৌথভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বহু কলেজে এখন জীববিজ্ঞানের বিষয়গুলোতেও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ কলেজেই রয়েছে অবকাঠামোগত দৈন্যের পাশাপাশি শিক্ষক ও বইপুস্তকের দারুণ অভাব। এ অবস্থা চলতে থাকলে কেবল 'সার্টিফিকেটধারী' গ্রাজুয়েট তৈরি হবে, প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত জনবল গড়ে উঠবে না।

দেশের প্রায় সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক অফিসসময় মেনে চলেন না। ক্লাস থাকলে ঐ সময় বিভাগে উপস্থিত হন, অন্য সময়ে তাঁদের প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে interaction-এর সুযোগ হয় না, অপরদিকে গবেষণা কর্ম দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

সামগ্রিকভাবে এসব বিচ্যুতি সঠিকভাবে উচ্চশিক্ষাদানে, গবেষণা কার্যক্রমে ও মান উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। বিজ্ঞানের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থায়নের কথাই আগে ভাবতে হবে।

৪। যা করণীয়

জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা আরও আধুনিক করতে হলে উন্নত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, শিক্ষক/গবেষক বিনিময় ও যৌথ গবেষণা কর্মসূচি গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের আছে এক অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান। এখানকার নদী, জলাভূমি, সমুদ্র, উপকূলভাগ, পাহাড়, বনভূমি, সুন্দরবন ও উপকূলীয় দ্বীপসমূহে রয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীসম্পদের বিশাল সমাবেশ। জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ দেশটিতে উদ্ভিদ প্রজাতিরসংখ্যা ৬০০০-এর বেশি। এর মধ্যে সপুষ্পক উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় ৫০০০। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ১৬০০। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যা কয়েক হাজার। অসংখ্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শনাক্তকরণসহ তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য এখনও অপ্রতুল। প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা, প্রাপ্যতা ও বর্তমান অবস্থা একটি ভূখন্ডের সার্বিক পরিবেশ ও বাস্তুতাত্ত্বিক অবস্থা নির্দেশ করে। ব্যাপক গবেষণার অভাবে এদেশের জীববৈচিত্র্যের বিশাল ভাণ্ডার গবেষক, বিনিয়োগকারী, পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও বিদেশীদের কাছে এখনও অপরিচিত।

দেশের বর্তমান জনসংখ্যার চাপে এবং বনভূমি ও জলাভূমিসহ আবাসস্থল ধ্বংস, সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার ও দূষণ প্রভৃতি কারণে পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির মুখে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৮০০ প্রজাতির মেরুদণ্ডী প্রাণী (মাছ, উভচর; সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী) ও প্রায় ১০০ প্রজাতির উদ্ভিদ নানা ধরনের হুমকির সম্মুখীন। গত ১০০ বছরে দেশ থেকে গণ্ডার, বনগরু, বুনোমহিষ, নীলগাই ও ময়ূরসহ আরও কিছু প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। আরও অনেকগুলোর হারিয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দেশের জীবসম্পদ কী আছে, কী নেই, যেগুলো আছে সেগুলোর বর্তমান অবস্থা কেমন, তা জানবার, জরিপ করবার বা লিপিবদ্ধ করার আন্তরিক উদ্যোগও আজ পর্যন্ত জাতীয়ভাবে গৃহীত হয় নি। তবে সম্প্রতি সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা প্রণয়নের জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় নিম্নে উপস্থাপিত বিষয়াদি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা করতে হবে।

- প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা ও তার বর্তমান অবস্থা।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থলের বর্ণনা এবং বাস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কর্ম পরিকল্পনা।
- বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা ও এদের সংরক্ষণের কর্মকৌশল প্রণয়ন।
- দেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর উপযুক্ত কোর্স ও ব্যবহারিক শিক্ষাদান।
- কৃষি-জীববৈচিত্র্যের তালিকা (জার্মপ্লাজমাসহ), ব্যবহাররীতি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষাসূচি।
- জীববিজ্ঞান বিষয়ক নতুন দিকগুলো সম্পর্কে, বিশেষ করে Biotechnology, Genetic Engineering, Tissue Culture, DNA Technology, Conservation Biology এবং Biodiversity Conservation -এর উপর কোর্স ও গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান।
- নতুন শতাব্দীর চাহিদার দিকে তাকিয়ে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে এবং লব্ধ ফলাফলের ব্যবহার ও প্রয়োগের দিকগুলো অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে। জীববিজ্ঞানের যে দিকগুলোর প্রতি বিলম্ব না-করে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জিনপ্রযুক্তি, জিন প্রকৌশল এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ। পরিবেশ দূষণে দেশ যে এখন ভয়াবহভাবে আক্রান্ত এবং এর ফলে যে রোগ-বালাইয়ের বিস্তার ঘটছে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। এসব বিষয়ে গবেষণার বিভিন্ন দিক অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করে সে-সম্পর্কিত গবেষণা–কর্মসূচি হাতে নেওয়া প্রয়োজন।
- দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান এবং বিষয় নির্বাচন জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির নিরিখে তৈরি হতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভাগসমূহের এবং শিক্ষাক্রমের নিয়মিত পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। উন্নত দেশসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পাঠক্রম, অবকাঠামো এবং পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক বিকাশের সাথে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরিচিত করে তোলার জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে লিংকেজ প্রোগ্রাম স্থাপন করতে হবে।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হলে শিক্ষকদের আরও বেশি সময় বিভাগে ব্যয় করতে হবে এবং ক্লাসরুম শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণা কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে হবে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ফলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও তার ব্যবহারের অবনতি ঘটেছে; বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার মান সাধারণ স্তরের নিচে নেমে এসেছে। ইংরেজি ভাষায় লিখিত বইপুস্তক, জার্নাল ও অন্যান্য রেফারেন্স বিষয় ব্যবহার তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। উন্নত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রয়োগ দ্রুততর করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের একটি বাধ্যতামূলক ইংরেজি কোর্স (Functional English-Written and Spoken) চালু করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা ব্যয়বহুল ব্যাপার এবং বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় সমস্যা। চাহিদার তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থবরাদ্দ অপ্রতুল। উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য যে ব্যয় তাকে ব্যয় হিসেবে ভাবলে চলবে না, তা আসলে দেশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ। তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটে মোট যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার ৯০%-৯৫%-এর উৎস হলো সরকারি অনুদান আর মাত্র ৫%-১০% আসে নিজস্ব আয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ব্যয়ের ১০০% আসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি-এর আওতায় সরকারি উন্নয়ন মঞ্জুরী হিসেবে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি অনুদানের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুদানের অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে। বিগত কয়েক বছর যাবত পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত অনুদান দিয়ে বিশ্ববিদ্যায়গুলোর রাজস্ব ব্যয় মেটানো যাচ্ছে না। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে।

অর্থ বরাদ্দের দিক থেকে সরকারের ক্ষমতাও সীমিত। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে তাদের নিজেদের আয়ের উৎস খুঁজতে হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবেতন অতি নগণ্য। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া যেহেতু দেশের বহু কলেজে এখন অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স শুরু হয়েছে, তাই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লভ্য অবকাঠামো ও সুযোগ সুবিধের নিরিখে কাম্য ছাত্রসংখ্যা কত হতে পারে তা ভেবে দেখতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন

জীববিজ্ঞানসহ জ্ঞানের সব বিষয়েই উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের উপর। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন বহুলাংশে নিশ্চিত হয়েছে। সিন্ডিকেট এবং সিনেট সব ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখে। নতুন বিধি-বিধান প্রণয়নের জন্য সিনেটের ভূমিকা মুখ্য। একাডেমিক পরিষদ শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের নীতিনির্ধারক। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ এবং গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য একাডেমিক পরিষদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাস্তবায়িত করে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে অবশ্যই গতিশীল, ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবিধান মোটামুটি একই ধরনের হতে হবে এবং বাইরের যে কোন ধরনের চাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রচলিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অনেক পদের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি চালু আছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে ও বজায় রাখতে এবং নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এসব নির্বাচন জাতীয় দলভিত্তিক রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশন প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল কেন্দ্র। সমগ্র উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা একই ছত্রছায়ায় আনয়ন এবং শিক্ষার মান সংরক্ষণ ও সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে মঞ্জুরী কমিশনের উপর। যেহেতু কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ করে এবং সরকারের নিকট থেকে তহবিল গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ খাতের চাহিদা ও সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ করে, তাই কোন বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার যথাযথ মান বহাল রাখতে ব্যর্থ হলে মঞ্জুরী কমিশনকে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ এবং উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যে কোন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করার ক্ষমতাও কমিশনের রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং কমিশন কর্তৃক প্রেরিত বিশেষজ্ঞদল নিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার নীতি কার্যকর করতে হবে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম এবং পারস্পরিক সুবিধেগুলো ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাঝে-মধ্যেই মতবিনিময় করার নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাধারণ সমস্যাদিও চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব এ বোর্ড পালন করতে পারে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি যখন প্রথম চালু হয় তখন অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধে ছিল নেহাৎ মামুলি ধরনের। অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ১০-২০ জন শিক্ষার্থীর ভর্তি করার সুযোগ ছিল। ঐ সময় ব্যবহারিক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল শুধু মাইক্রোসকোপ, ইনকিউবেটর, স্টেরিলাইজার ইত্যাদির মতো সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং সেগুলোও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম। ল্যাবরেটরি টেবিলগুলোও ছিল সাধারণ। তখন জীববিজ্ঞান বলতে ক্লাসিক্যাল (classical) জীববিজ্ঞানকেই বোঝানো হতো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এবং বিজ্ঞানের সীমানার সম্প্রসারণ ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের ফলে বিজ্ঞানের এ শাখা দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। আধুনিককালে এটি জীববিজ্ঞানের অতি সম্ভাবনাময় একটি শাখা।

বাংলাদেশে জীববিজ্ঞানের উন্নতি এখনও তেমনটি ঘটে নি। অবকাঠামোগত দুর্বলতা একটি বড় অন্তরায়। গবেষণাগারগুলোতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে নি। অপরদিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবের পাশাপাশি সাধারণ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধেও অতি সীমিত।

জীববিজ্ঞানের গবেষণাগারগুলোকে গতিশীল করতে হলে অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যালস গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য আইটেম। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরি আধুনিক করতে হবে এবং নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করতে হবে। সব মূল্যবান যন্ত্রপাতিই যে প্রতিটি বিভাগে থাকতে হবে তা নয়। অনুষদ পর্যায়ে আধুনিক ও অতি মূল্যবান যন্ত্রপাতিসজ্জিত কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি গড়ে তোলার বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে। অনুষদের বিভিন্ন বিভাগ প্রয়োজনে এ সুযোগ ব্যবহার করবে। এ গবেষণাগারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন দক্ষ ইন্সস্ট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (Instrument Engineer) নিযুক্ত থাকবেন। প্রতিটি বিভাগে একজন করে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক ইন্সস্ট্রুমেন্টেশন মাঝে মধ্যে এঁদের প্রশিক্ষণ দান করবে।

ক্লাসরুম শিক্ষার জন্য অডিওভিসুয়াল ইকুইপমেন্ট, স্লাইড ও ওভারহেড প্রজেক্টর এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার সকল ক্ষেত্রেই অত্যাবশ্যক। প্রতিটি গবেষণা ল্যাবরেটরিতে তাই স্ক্যানিং যন্ত্র ও প্রিন্টারসহ কম্পিউটার থাকা অপরিহার্য। কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রশিক্ষণের জন্য অনুষদ কেন্দ্রীয়ভাবে স্পেশাল কোর্স চালু করতে পারে।

মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রথমে দরকার বই এবং জার্নাল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও এখন জীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সব বিভাগেই বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। উভয় ধরনের গ্রন্থাগারেই মূল্যবান বইপত্র ও জার্নালের অভাব লক্ষণীয়। কিছু সংখ্যক মূল্যবান জার্নাল আগে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করা হতো। এখন অর্থের অভাবে তা আর করা যাচ্ছে না। ফলে গবেষকেরা অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছেন।

প্রাণীবিজ্ঞান এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য এনিম্যাল গার্ডেন ও বোটানিক্যাল গার্ডেন নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিয়মিতভাবে Specimen সংগৃহীত না হওয়ায় এ দুটি অবকাঠামোর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে। এগুলো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আবশ্যক।

পাঠ্যক্রম/পাঠ্যপুস্তক

জ্ঞানবিজ্ঞানের যেকোন শাখায় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সমকালীন চাহিদা ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটবে এটাই প্রত্যাশিত। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সেদেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, নৈতিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মনমানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তন করে দক্ষ, দায়িত্ববান, আত্মনির্ভরশীল ও যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলাই উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রথম সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। এসবের আলোকেই তৈরি করতে হবে পাঠ্যপুস্তক।

জীববিজ্ঞানসহ উচ্চ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরও আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার বিকল্প নেই, তবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। ব্যবহারযোগ্য বিজ্ঞানের বই ও সাময়িকীসহ অসংখ্য রচনা আছে ইংরেজি ভাষায়। মানসম্পন্ন জীববিজ্ঞানের সব শাখার বইপুস্তক এখনও বাংলা ভাষায় লেখা বা অনূদিত হয় নি। উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজি ভাষা কম গুরুত্ব পাবার ফলে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিগোগিতামূলক শিক্ষার মান সাধারণ স্তরের নিচে

অবস্থান করছে। ইংরেজি ভাষায় লেখা জীববিজ্ঞানের বইপুস্তক ও জার্নাল তাদের নিকট খুবই কঠিন মনে হয়। পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রয়োজন জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিশ্বায়নের এ যুগে দেশের উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ আছে। মানসম্পন্ন শিক্ষাই কেবল এই প্রতিযোগিতার যুগে টিকে থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারে। জীববিজ্ঞানের শিক্ষাক্রমে মূল বিষয়াদির পাশাপাশি language proficiency, professional skill, computerized management information system, biotechnology, biosafety, genetic engineering, environment, conservation biology ইত্যাদি জ্ঞানের শাখাগুলোও ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত করতে হবে। নতুন শতাব্দীর প্রতিটি বছরে নতুন নতুন তথ্য, প্রযুক্তি, ধ্যান-ধারণা ও উদ্ভাবন মানুষের কাছে হাজির হচ্ছে। জ্ঞান জগতের শাখাগুলোতে জটিলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সমকালের চিন্তাধারাকে অবহেলা করা যাবে না, তাই শিক্ষাক্রমসহ গবেষণা কর্ম ও চিন্তার চর্চা প্রতিনিয়ত আধুনিকীকরণ বা updated করতে হবে। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জীববিজ্ঞানের পাঠক্রম মাঝেমধ্যে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনের নিরিখে ঢেলে সাজাতে হবে।

আধুনিক জীববিজ্ঞান শিক্ষা এবং শিক্ষাদনের কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের জন্য সব পর্যায়ের শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করতে হবে। মঞ্জুরী কমিশনের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়োজনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের গবেষণার জন্য বিদেশে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের কর্মসূচি উদারভাবে চালু করা আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যান তাদের অধিকাংশই বিদেশী কোনো সংস্থা অথবা সরকার থেকে ফেলোশিপ অথবা বৃত্তি পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ সরকারও নিয়মিতভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য ফেলোশিপ/বৃত্তি চালু করে উচ্চতর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

সবগুলো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন ৪ বছরের বি.এস-সি (অনার্স) কোর্স এবং ১-২ বছরের এম.এস./এম.এস-সি কোর্স চালু আছে। সেইসঙ্গে বার্ষিক অথবা সেমিস্টার সিস্টেম চালু হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি ও ফলাফল নির্ণয় পূর্বের মতোই রয়ে গেছে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য এখন গ্রেডিং ও গ্রেড পয়েন্ট পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং 'মার্কসিট'-এর পরিবর্তে 'ট্রান্সক্রিপ্ট' প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত গড় গ্রেড পয়েন্ট হবে মেধানির্দেশক। যেহেতু গ্রেডিং পদ্ধতির প্রশ্নপত্র তৈরিকরণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে সব শিক্ষক অভ্যস্ত নন, তাই এ পদ্ধতি চালু করতে হলে তাদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষাতেই কোর্সের মূল্যায়ন করবেন কোর্স শিক্ষক এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা অন্য প্রতিষ্ঠানের একজন পরীক্ষক। উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার সময় পরীক্ষার্থীর মৌলিকত্বের দিকটা বিবেচনায় আনতে হবে।

জীববিজ্ঞানের প্রতিটি ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় কোর্সের শতকরা ২০ ভাগ নম্বর ইনকোর্স পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতির হারকে বিবেচনায় আনতে হবে।

জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা সঠিকভাবে পরিচালনা ও মূল্যায়ন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বহিরাগত পরীক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা বহাল রাখতে হবে।

কোন কোর্সের ফলাফল খারাপ হলে শিক্ষার্থী পরের বছর উক্ত কোর্সের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থেকে পরবর্তীকালে পুনরায় পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে। মানোন্নয়নের এ সুযোগ প্রতি কোর্সের জন্য মাত্র একবার দেওয়া যাবে। মানোন্নয়নের ফলাফল যাই হোক না কেন, তা পরীক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট-এ অবশ্যই উল্লেখ থাকবে।

বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল মনিটর করবেন। পরীক্ষার ফলাফল, ক্লাসে উপস্থিতি এবং আচার-আচরণ সন্তোষজনক না হলে তা শিক্ষার্থীকে এবং তার অভিভাবককে লিখিতভাবে জানাবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিবেন।

এম.এস/এম.এস-সি/এম.ফিল/পি-এইচ.ডি কোর্সের গবেষকরা গবেষণা কাজ শুরু করার পূর্বে তাদের গবেষণা কার্যক্রমের প্রস্তাব নির্দিষ্ট প্রোফরমা অনুযায়ী তৈরি করে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিটির নিকট জমা দেবে। এ প্রস্তাবনায় গবেষণা কাজের শিরোনাম উল্লেখসহ কাজের গুরুত্ব, লক্ষ্য, পদ্ধতি ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

থাকবে। তত্ত্বাবধায়কের মন্তব্য/মতামতেরও উল্লেখ থাকতে হবে। কমিটি প্রস্তাবটি সুষ্ঠুভাবে মূল্যায়ন করে মতামতসহ পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যান-এর কাছে পাঠাবেন।

সব গবেষককেই থিসিস জমা দেবার পূর্বে অথবা পরে তাদের গবেষণা কাজের ফলাফল বিভাগীয় সেমিনারে উপস্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে মূল্যায়নের পদ্ধতিগত বিষয়টি নিয়ে একাডেমিক পরিষদ, অনুষদ অথবা বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করবে। নবতর জ্ঞান উদ্ভাবনে, তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণে এবং দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে থিসিস মূল্যায়নে তার প্রতিফলন থাকতে হবে।

শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা

শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষাদান ও নৈতিকতা বিকাশের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষক। সর্বস্তরেই তাই শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যে প্রতিষ্ঠানেই চাকুরি করুক না কেন একজন শিক্ষকের বেতন ও মর্যাদা তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং অধিষ্ঠিত পদ বিবেচনায় নির্ধারণ করতে হবে। কার্যকরতা, দক্ষতা এবং জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষকতা পেশার অবদান বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন,শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ও নৈতিকতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ দুটি পরস্পরসম্পৃক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে একটি অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক অধিকার এবং অপরটি তাদের পেশাগত যোগ্যতা, চারিত্রিক স্বচ্ছতা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একজন শিক্ষক শিক্ষাদানের পাশাপাশি গবেষণা কাজেও নিয়োজিত থাকেন। যেহেতু আর্থিক সচ্ছলতা উদ্ভাবনী কাজের অনুপ্রেরণা যোগায়, তাই উপযুক্ত বেতনকাঠামো, সুযোগ-সুবিধে ও সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি গভীর বিবেচনায় আনতে হবে। শিক্ষকদের অধিকারের সঙ্গে তাদের দায়িত্বের সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

সমাজের উচ্চশিক্ষিত, অতি মেধাবী ও দক্ষ ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার জন্য সম্মানজনক, উদার, পৃথক বেতনকাঠামো থাকা উচিত। তাঁদের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে সরকারের বিধি মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষকদের বেতনস্কেল নির্ধারণের সময় উন্নত ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর বেতনকাঠামো পর্যালোচনা করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের সময় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে মেধার পাশাপাশি প্রার্থীর ভাষাগত পারদর্শিতা এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার কৌশল ও দক্ষতা কঠোরভাবে যাচাই করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ও গবেষণায় বিশেষ অবদান, মৌলিক রচনা ও প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করতে হবে।

শিক্ষকদের পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষকতার মান বিবেচনায় আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শিক্ষকতার মান নির্ণয় করার পদ্ধতি নির্ধারণ করবে ও অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তাছাড়া এসময় উন্নতমানের মৌলিক প্রকাশনা ও গবেষণা কর্মকাণ্ড বিবেচনায় আনতে হবে।

একজন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করার পূর্বেও গবেষণা ও শিক্ষাদানসহ তাঁর যাবতীয় পেশাগত কার্যাদি কঠোরভাবে মূল্যায়ন ও যাচাই করতে হবে। আশানুরূপ না হলে বিবেচনা স্থগিত রাখা হবে অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এমন নীতি বিশ্বের সব উন্নত দেশেই অনুসরণ করা হয়।

উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে গবেষণাখাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং শিক্ষকদের গবেষণাকর্ম, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে অন্যান্যদের অবগত করার সুব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া শিক্ষকদের পেশাগত কাজকর্মের জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা বিধানের নীতিমালা থাকতে হবে।

দেশের অন্যান্য নাগরিকের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আইনের উর্ধ্বে নয়। তাই পেশাগত আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যমান আইনের আওতায় ব্যবস্থা নিতে থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনগুলো শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারে এবং তা সঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে পারে।

সুপারিশ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার বর্তমান অবস্থার নানান দিক পর্যালোচনা করে এর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল, যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রয়াসে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন :–

১. জীববিজ্ঞান বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নিয়মিত পর্যালোচনা করে উন্নত দেশসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পাঠক্রম, অবকাঠামো এবং পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি অনুদান অপ্রতুল। সার্বিক প্রয়োজনের চাহিদা নির্ধারণ করে সরকারি অনুদান উদারভাবে বাড়াতে হবে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের অতিরিক্ত সময়ে বিভাগে অবস্থান অত্যাবশ্যক যাতে তারা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন।

৪. কেবল সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন করার জন্য কমিশনের বিশেষজ্ঞদল কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার নীতি কার্যকর করতে হবে।

৬. আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম এবং পারস্পরিক সুবিধাগুলো ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাঝে মধ্যে মতবিনিময় করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাধারণ সমস্যাদি চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৭. শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখতে এবং নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুমোদিত সব নির্বাচন জাতীয় দলভিত্তিক রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে।

৮. ছাত্র রাজনীতিকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯. জীববিজ্ঞানের গবেষণাকে গতিশীল করার উদ্দেশ্যে এবং বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বিভাগগুলোর ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ ও নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

১০. অনুষদ পর্যায়ে আধুনিক যন্ত্রপাতিসজ্জিত কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি গড়ে তুলতে হবে। এ গবেষণাগারে একজন দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত থাকবেন।

১১. আধুনিক জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষাদানের কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের জন্য সব পর্যায়ের শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. উন্নত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে Functional English–Written and Spoken কোর্স চালু করতে হবে।

১৩. উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য এখন সব বিশ্ববিদ্যালয়েই সেমিস্টার সিস্টেম এবং সে সঙ্গে গ্রেডিং এবং গ্রেডিং পয়েন্ট পদ্ধতি চালু করতে হবে। পরীক্ষার্থীর গড় গ্রেড পয়েন্ট হবে মেধানির্দেশক।

১৪. মার্কসিটের পরিবর্তে ট্রান্সক্রিপ্ট (Transcript) ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৫. পরীক্ষার মান বজায় রেখে কী পদ্ধতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষাতেই কোর্সের মূল্যায়ন করে দ্রুতগতিতে ফলপ্রকাশ করা যায় সে বিষয়ে সকল বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।

১৬. জীববিজ্ঞানের প্রতিটি ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় কোর্সের শতকরা ২০ ভাগ ইনকোর্স পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতির হারকে বিবেচনায় আনতে হবে।

১৭. কোন কোর্সের ফলাফল খারাপ হলে শিক্ষার্থী পরের সেমিস্টারের উক্ত কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থেকে পরবর্তীকালে পুনরায় পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে। মানোন্নয়নের এ সুযোগ প্রতি কোর্সের জন্য মাত্র একবার দেওয়া যাবে।

১৮. বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের সময় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে মেধার পাশাপাশি প্রার্থীর ভাষাগত পারদর্শিতা এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার কৌশল ও দক্ষতা কঠোরভাবে যাচাই করতে হবে।

১৯. শিক্ষকদের পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নতমানের প্রকাশনার পাশাপাশি তাঁদের শিক্ষকতার মান বিবেচনায় আনতে হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পদ্ধতি নির্ধারণ করবে এবং অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

২০. পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান আইনের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২১. জীববিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা আধুনিকতর করার লক্ষ্যে উন্নত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, শিক্ষক/গবেষক বিনিময় ও যৌথ গবেষণা কর্মসূচি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২২. দেশের প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা, বর্তমান অবস্থা এবং বিপন্ন প্রজাতিসমূহের তালিকা ও সংরক্ষণ কর্মকৌশলের উপর গবেষণা পরিচালনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২৩. জীববিজ্ঞান বিষয়ক নতুন দিকগুলোর উপর, বিশেষ করে জিন প্রকৌশল, জীবপ্রযুক্তি, টিস্যু কালচার, DNA প্রযুক্তি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২৪. গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে গবেষণাগারগুলোর অবকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং সেসঙ্গে শিক্ষকদের গবেষণার জন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

২৫. এম.ফিল./পি.এইচডি. গবেষণা কাজ শুরু করার পূর্বে গবেষকদের গবেষণা কার্যক্রমের প্রস্তাব(Research Proposal) নির্দিষ্ট প্রোফরমা অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য বিভাগে জমা দিতে হবে। বিভাগীয়/অনুষদীয় নির্দিষ্ট কমিটি প্রস্তাবটি মূল্যায়ন করে কার্যকর ব্যবস্থার জন্য মতামত পেশ করবে।

২৬. সব গবেষককেই থিসিস জমা দেবার পূর্বে অথবা পরে তাদের গবেষণা কাজের ফলাফল বিভাগীয় সেমিনারে উপস্থাপন করতে হবে। নবতর জ্ঞান উদ্ভাবনে, তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণে এবং গবেষণাকর্মে দক্ষতা অর্জনে তিনি কতটা সফল হয়েছেন থিসিস মূল্যায়নে তার প্রতিফলন থাকতে হবে।

মূল রচনা :

প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর

দশম অধ্যায়
কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা

ভূমিকা

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ও গবেষণার মান উন্নয়নের বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষাদান ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমেই জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞানের ফলপ্রসূ অবদান রাখা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলোর পর্যালোচনা করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ ও জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন। কারণ বিজ্ঞানের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় সকল ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ও পরিবর্তন আনা সহজতর হয়। আর এ উন্নয়নের পূর্ব শর্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠ্যসূচি আধুনিক করা এবং যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলা। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য রয়েছে–সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। আর রয়েছে প্রায় ১৫০টি স্নাতক(পাস), স্নাতক(সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠদানকারী কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহ। এসব কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তিদান ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ধরন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের উচ্চ শিক্ষার কমপক্ষে ৮০% ভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষার দায়ভার বহন করে। দেশের কলেজ শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন সাধন এবং শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতাবৃদ্ধিসহ কলেজ ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ১৯৯২ সালে অর্পিত হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বি.এ বি.এস.এস., বি.কম (পাস ও অনার্স), এম.এস.এস, এম.এস.সি, এম.কম., বি.এড., বি.পি.এড., এল.এল.বি., বি.বি.এ. ও সমমানের বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রায় আট লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী এসব কোর্সে অধ্যয়ন করছে। কলেজসমূহে স্নাতক ডিগ্রির জন্য ৩ বৎসর মেয়াদি কোর্স ও স্নাতক অনার্সের জন্য ৪ বছর মেয়াদি কোর্স চালু আছে। এটি উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ইন-ক্যাম্পাস পাঠদানকারী এবং একই সঙ্গে অফ-ক্যাম্পাস শিক্ষাদান ও অনুমোদনদানকারী একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাস শিক্ষার অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাকপি.এইচ.ডি.,এম.এস./এম-ফিল কোর্স পরিচালনা করছে এবং বিভিন্ন কলেজে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান করছে।

বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানকারী কলেজসংখ্যা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে ১৪৮২। এর মধ্যে ১২৩২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ। বি.এস.সি. পাস কোর্সে পাঠদান করা হয় ৩৬৮টি কলেজে। তাছাড়াও আছে ৬৭টি আইন কলেজ, ৬৮টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ৬৪টি কম্পিউটার এবং বিবিএ ইনস্টিটিউট, ৬টি চারুকলা কলেজ, ২টি সঙ্গীত কলেজ, ২টি বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, প্রতিরক্ষা বাহিনীর একাডেমী ১টি, সেনাবাহিনী স্টাফ কলেজ ১টি, অর্ডন্যান্স সেন্টার এন্ড স্কুল ১টি, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী একাডেমী ১টি, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী ১টি ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ১টি। ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট ১টি, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ১০টি, ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১টি, গার্মেন্টস এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কলেজ ১টি, প্রেস ইনস্টিটিউট ১টি এবং শারীরিক শিক্ষা কলেজ ১৯টি। ডিগ্রি পর্যায়ের কলেজগুলোর মধ্যে আবার বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম অনার্স পাঠদানকারী কলেজ সংখ্যা মাত্র ১৫০টি, মাস্টার্স (১ম পর্ব) কলেজ ৭৪টি, মাস্টার্স (শেষ পর্ব) পাঠদানকারী কলেজ সংখ্যা ৮৭টি। বিজ্ঞান পড়ানো হয় তেমন কলেজের সংখ্যা পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স ৫৪টি, রসায়নে অনার্স ৪৫টি, গণিতে অনার্স ৬৩টি। তাছাড়া উদ্ভিদবিজ্ঞানে অনার্স আছে ৫৫টিতে, প্রাণিবিদ্যায় অনার্স আছে ৫৬টিতে, পরিসংখ্যানে অনার্স আছে ১১টিতে, মনোবিজ্ঞানে অনার্স আছে ১১টিতে এবং ভূগোলে অনার্স আছে ২০টিতে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রধান বিষয়ে (গণিত, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান) মাস্টার্স কোর্স চালু আছে ২৮-৩৫ টি কলেজে।

বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রি (পাস) কোর্সের ফলাফল

সম্প্রতি ডিগ্রি (পাস) পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমেছে অনেক এবং ডিগ্রি পাস পর্যায়ে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও কম। অনেক কলেজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা সমান সমান বা শিক্ষার্থীর সংখ্যা শিক্ষক সংখ্যার চেয়েও কম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিগ্রি পাস পর্যায়ের বিএসসি কোর্সদানকারী ৩৬৮টি কলেজের অধিকাংশেরই ফলাফলের অবস্থা নাজুক। বিজ্ঞান বিষয়গুলির ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ডিগ্রি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পাশের হার কমেছে; যেমন ২০০১ সালে বি.এস.সি.তে নিয়মিত, অনিয়মিত ও মান-উন্নয়নসহ মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২১,৩৬৪ জন, পাশ করেছিল মোট ৮৮৩১ জন; পাশের হার ছিল শতকরা ৪১.৩৪; ২০০২ সালে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৮,১৭২ জন, পাশ ৩৪৬৮ জন, অর্থাৎ পাশের হার ছিল শতকরা মাত্র ১৯.০৮।

বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পাঠদানকারী কলেজ ১৫০টির মতো। মোট ৩৬৮টি কলেজে বি.এসসি পাস কোর্স চালু আছে। বিজ্ঞানের বিষয়ে অনার্স পাঠদানকারী বিভিন্ন বিষয়ের কলেজসংখ্যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ের পাশের হার বি.এসসি পাস কোর্সের চেয়ে ভালো। ২০০০ সালে বি.এসসি অনার্সের বিভিন্ন বিষয়ের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭১৩৭ জন, পাশ করেছে মোট ৩৬৬১ জন, পাশের হার ছিল শতকরা ৫০.২০। তেমনি প্রায় কাছাকাছি সংখ্যার পরীক্ষার্থী ছিল ২০০১ সালে এবং পাশের সংখ্যাও ছিল ২০০০ সালের মতোই। মাস্টার্স কোর্সের (বিজ্ঞান বিষয়ে) ফলাফল ভালো। ১৯৯৯ সালে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৮২২ জন, পাস করেছে মোট ৫২৬৫ জন, পাশের হার ছিল শতকরা ৭৭ ভাগ; কিন্তু ২০০০ সালের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (৮৬১৬ জন) বাড়লেও পাশের হার কমেছে, পাশ করেছে ৬৫%।

কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষকসংখ্যা

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকসংখ্যা নিম্নরূপ

রসায়ন : রসায়নে অনার্স আছে ৪৫টি কলেজে, সেগুলোর মধ্যে মাস্টার্স কোর্স আছে ২৮টিতে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী এসব কলেজে মোট কর্মরত শিক্ষক থাকা উচিত ৪৪৮ জন, কিন্তু আছেন মোট ২১৯ জন। এসব কলেজে রসায়নের শিক্ষকের মোট পদ আছে ৩০৪টি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের মাত্র ৪৯% কর্মরত আছে, আর কলেজে বিদ্যমান মোট পদসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৬৮%।

গণিত : গণিতে অনার্স কোর্স চালু আছে মোট ৬৩টি কলেজে, এর মধ্যে মাস্টার্স কোর্স আছে ৩৫টিতে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী এসব কলেজে কর্মরত মোট শিক্ষক থাকা উচিত ছিল ৬১৬ জন, কিন্তু মোট পদ আছে ৩৯৪টি। আর কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ৩০৬জন। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৫০%.আর পদ আছে প্রয়োজনের তুলনায় ৬৪%।

পদার্থবিজ্ঞান : পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স কোর্স চালু আছে ৫৪টি কলেজে। এর মধ্যে মাস্টার্স কোর্স আছে ২৮টিতে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী কর্মরত মোট শিক্ষক থাকা উচিত ছিল ৫১৮ জন কিন্তু আছে ৩৪১ জন। আর কর্মরত আছেন মাত্র ২৫৬ জন যা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৪৯%। শিক্ষকপদ আছে প্রয়োজনের তুলনায় ৬৬%।

উদ্ভিদবিজ্ঞান : অনার্স কোর্স চালু আছে ৫৫টি কলেজে, মাস্টার্স কোর্স আছে ৩৩টি কলেজে। মোট শিক্ষক দরকার ৫৫০ জন, পদ আছে মোট ৩৪১টি আর কর্মরত আছেন ২৫৬ জন অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক ৪৬%, পদ ৬২%।

প্রাণীবিদ্যা : অনার্স কোর্স চালু আছে ৫৬টি কলেজে, মাস্টার্স কোর্স চালু আছে ৩০টি কলেজে। মোট শিক্ষক থাকা উচিত ছিল ৫৩৫জন, কিন্তু পদ আছে ৩২৯টি (৬১.৫%); আর কর্মরত আছেন মাত্র ২৪৮জন শিক্ষক (৪৬%)।

ভূগোল : ১৯টি কলেজে অনার্স কোর্স আছে; আর মাস্টার্স কোর্স আছে ১৭টিতে। মোট শিক্ষকের পদ থাকা উচিত ১৯৮টি, বর্তমানে পদ আছে ১৪৮টি (৭৫%); আর কর্মরত আছেন মাত্র ১০৭জন শিক্ষক (৫৪%)।

মনোবিজ্ঞান : অনার্স চালু আছে ১১টি কলেজে, মাস্টার্স কোর্স ৭টিতে। এতে মোট শিক্ষক প্রয়োজন ১১২ জন, পদ আছে মোট ৬৭টি (৬০%), আর কর্মরত আছেন মাত্র ৪৯ জন শিক্ষক (৪৪%)।

পরিসংখ্যান : অনার্স কোর্স চালু আছে মোট ১১টি কলেজে, মাস্টার্স কোর্স আছে মোট ৮টি কলেজে। শিক্ষকসংখ্যা হওয়া উচিত ১১৭ জন, কিন্তু পদ আছে মাত্র ৮২টি (৭০%); আর শিক্ষক কর্মরত আছেন মাত্র ৫৯জন (৫০%)।

কলেজগুলোর কর্মরত শিক্ষকসংখ্যার তারতম্য : ঢাকা শহরসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে অবস্থিত কলেজগুলোতে শিক্ষকগণের শূন্য পদসংখ্যা কম; এসব কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিটির জন্য ১২টি পদের মধ্যে কমপক্ষে ৮টি পদে কর্মরত শিক্ষক আছেন। কিন্তু জেলাশহর ও মফস্বলের কলেজগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিটিতে কর্মরত শিক্ষক থাকার কথা কমপক্ষে ৭ জন, অথচ আছেন অনেক ক্ষেত্রেই মাত্র ১ জন বা ২ জন শিক্ষক।

বেসরকারি পর্যায়ের অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স দানকারী কলেজগুলোর অবস্থা : বেসরকারি পর্যায়ের মাত্র হাতে গোনা ১৫-১৬টি কলেজে বিজ্ঞানের একাধিক বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। এই কলেজগুলোতে বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কর্মরত আছেন মাত্র ২০%-এর মতো শিক্ষক।

কম্পিউটার শিক্ষার অবস্থা : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কম্পিউটার বিজ্ঞানের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। জনগণের অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ অবদান রাখতে পারে। এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তির দেশে-বিদেশে প্রচুর চাহিদাও রয়েছে। তাই কম্পিউটার বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা এ জন্য জাতীয়ভাবেই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৬৪টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট ও কয়েকটি ডিগ্রি কলেজে কম্পিউটারে স্নাতক অনার্স ডিগ্রি দেওয়া হয়। তবে কম্পিউটার ইনস্টিটিউটগুলোতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও উপযুক্ত ল্যাবরেটরির অভাব প্রকট।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : কলেজে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন। তাদেরকে ডিগ্রি (পাস ও অনার্স) মাস্টার্স পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে হয়। কাজেই শিক্ষার মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনেক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, কলা ও বিজনেস স্টাডিজের বিষয়গুলোর উপর শিক্ষকগণের পাঠদান কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত চলমান কর্মসূচি। বিজ্ঞানের বিষয়গুলিসহ প্রতিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো হয়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃন্দকে রিসোর্স পার্সন হিসেবে প্রশিক্ষণ কোর্সে সম্পৃক্ত করা হয়। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৬৮টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। সেগুলোতেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যার স্বল্পতা রয়েছে। অনেক কলেজেই শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভৌত অবকাঠামো নেই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার সমস্যাবলি :

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার প্রধান অন্তরায় বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠদানের শিক্ষকস্বল্পতা। প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৫০% শিক্ষক কর্মরত আছেন। যাঁরা কর্মরত আছেন তাঁদের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা কম। আধুনিক পাঠক্রম অনুসারে মানসম্মত পাঠদান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কলেজগুলোতে বর্তমানে শিক্ষকের অভাবেই মূলত শিক্ষাদান কার্য ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া দেশে প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা খুবই নিম্নমানের, গতানুগতিক ও তত্ত্বীয়। ফলে উচ্চ শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণের শিক্ষাদানও মানসম্মত নয়।

২. গ্রন্থাগারগুলো মোটেও সমৃদ্ধ নয়। এগুলোতে বইপুস্তকের দারুণ অপ্রতুলতা রয়েছে। বিশেষ করে ইংরেজি ও বাংলায় বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাবলির চরম অভাব বিদ্যমান। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের উপযুক্ত বই না-থাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সকলেরই পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। মানসম্মত শিক্ষার প্রধান উপকরণ বই, যার অভাব রয়েছে কলেজের প্রন্থাগারগুলোতে। অনেক কলেজে উপযুক্ত প্রন্থাগারও নেই।

৩. ব্যবহারিক ক্লাশ কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অপরিহার্য । উপযুক্ত পরীক্ষাগার না-থাকায় এবং পরীক্ষাগারগুলোতে ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতির অভাবে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ব্যবহারিক ক্লাশ নেওয়া সম্ভব হয় না। এ বিষয়টি বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার মান অর্জনের পথে একটি বড় বাধা।

৪. অনেক কলেজেই বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী ভৌত অবকাঠামো নেই। তবুও সেখানে বিজ্ঞান কোর্স চালু আছে।

৫. এক দিকে বিজ্ঞানের শিক্ষক স্বল্পতা প্রকট, অপর দিকে বিজ্ঞানের শিক্ষকগণের অনেকেই প্রাইভেট পড়াতে ব্যস্ত থাকেন। নিজ নিজ কলেজের সার্বিক পাঠদান কাজে অনেকেই অমনোপযোগী থাকেন। ফলে শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়।

৬. সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকদের ঘন ঘন বদলি করা হয়। ফলে শিক্ষাদান কাজ ব্যাহত হয় চরমভাবে। সময়মতো পাঠ্যসূচি শেষ করা যায় না। শিক্ষার্থীগণ পড়ে বিপাকে।

৭. সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষার মান-উন্নয়নের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করার কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি সরকারিভাবেও তেমন কার্যক্রম নেই।

৮. শিক্ষকগণ দীর্ঘক্ষণ ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কাজ করতে উৎসাহ বোধ করেন না। কারণ তাঁদের ঝুঁকিভাতা প্রদান করা হয় না।

৯. মেধাবী নিষ্ঠাবান শিক্ষগণের মেধা ও নিষ্ঠার মূল্যায়ন যথাযথভাবে হয় না বিধায় তাঁরা হতাশায় ভোগেন।

১০. কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যযোগাযোগ প্রযুক্তির আধুনিক বিষয়সমূহে প্রশিক্ষিতদের বিস্তর চাহিদার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়গুলোর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ও ইনস্টিটিউটগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষাদানের মান সব প্রতিষ্ঠানে সমান নয় এবং অধিকাংশ কলেজেই বিষয়গুলোর পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক ও ল্যাবরেটরি নেই। ফলে উন্নত শিক্ষাদান হচ্ছে না।

১১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কলেজ পরিচালনা পরিষদ, অধ্যক্ষ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ অপচয় ও অর্থ আত্নসাতের অভিযোগ আছে। অনেক কলেজেই অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিরাজমান। এতে করে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

১২. মফস্বলের প্রায় প্রতিটি কলেজেই শিক্ষার্থীর স্বল্পতা রয়েছে। এতে করে কলেজগুলো আর্থিক সংকটে ভুগছে।

১৩. পরীক্ষার ফলপ্রকাশে বিলম্ব ঘটায় শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিপাকে পড়ছে।

১৪. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে উচ্চতর বিজ্ঞানের গবেষণার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়গুলো

১. বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার ও গবেষণার মান উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানের শিক্ষক সংখ্যা অপ্রতুল রেখে এ কাজ করা অসম্ভব। এ জন্য সরকারকে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের আশু ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু শিক্ষক নিয়োগের জন্যই পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিশেষ নির্বাচনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রাইভেট কলেজগুলোতে অনেক সময়ই উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় না। এ সমস্যা দূরকরণার্থে সকল বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগ জন্য "বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ কমিশন"-এর মাধ্যমে হওয়া উচিত। তাতে করে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হবে।

২. বইপুস্তকের অপ্রতুলতা শিক্ষার মান উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। গ্রন্থাগারে দেশী-বিদেশী উচ্চতর শ্রেণীর বিজ্ঞান বই ক্রয়ের ব্যাপারে সরকারি আর্থিক অনুদান বাড়াতে হবে। সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ যাতে নগদ অর্থে পুস্তক ক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বেসরকারি কলেজগুলোতে বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। অনেক কলেজেই গ্রন্থাগারিক নাই। সরকারি কলেজগুলোতে গ্রন্থাগারিক অবসর গ্রহণ করলে সে পদ পূরণ হচ্ছে না। ফলে গ্রন্থাগারের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। গ্রন্থাগারের পদটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে কলেজগুলোতে যাতে গ্রন্থাগারের পদ খালি না থাকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত পরীক্ষাগার, যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি না-থাকা। এ অভাব দূর করার পরই কেবল বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের কথা ভাবা যায়। ল্যাবের সুযোগ-সুবিধাদির অভাবে ব্যবহারিক ক্লাশ হয় না প্রায় কলেজেই। কলেজে ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য গবেষণাগার উন্নয়নের বিকল্প নেই। এখানে অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং সরকারি কলেজগুলো যাতে নিজস্ব ফান্ড থেকে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক জিনিস ক্রয় করতে পারে তার সুযোগ থাকতে হবে।

৪. সরকারি কলেজগুলোতে বিজ্ঞানের শিক্ষকগণের ঘন ঘন বদলি করা বন্ধ করতে হবে ও শিক্ষকগণের প্রাইভেট পড়ানো বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. বেসরকারি কলেজগুলোর 'পরিচালনা পরিষদে' সদস্যদের ব্যবহার ও কাজ নিয়ে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণের বেশ ক্ষোভ রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের বিষয় মিটিয়ে ফেলার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৬. যে সব কলেজে বিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন, সে সব কলেজে অবশ্যই বিজ্ঞানে 'উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি' নিতে হবে। প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকেও কলেজ থেকে প্রাপ্ত বিজ্ঞানের গবেষণা প্রকল্পগুলোকে বিবেচনা করতে হবে।

৭. বাংলাদেশে বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মান বাড়াতে হলে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, লাইব্রেরি, পরীক্ষাগার ও গবেষণার উন্নয়ন করতে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারি কলেজগুলোর ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ ও সরকারের সহযোগিতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে। যেহেতু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে সেহেতু এ সকল বিষয়ের উচ্চতর ডিগ্রিধারীদেরকে শিক্ষকতার জন্য বিদেশ থেকে দেশে আসার ব্যাপারে উচ্চতর বেতনভাতা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে এ সব বিষয়ের চাহিদা পূরণের জন্য দেশের শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করতে হবে।

৯. কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পাঠক্রম ও শিক্ষাকার্যক্রম হালনাগাদ করে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রয়োগিক কাজে কোন ফাঁক না থাকে।

১০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো মফস্বল পর্যায়ে রয়েছে বিধায় সেসব কলেজগুলোতেও কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে করে তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষার বিস্তার লাভ করে।

১১. বিজ্ঞানের মেধাবী ও সৃজনশীল উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতাদি দিতে হবে ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. কলেজের বিজ্ঞানের শিক্ষকগণকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম যোগদানের সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন করতে হবে।

১৩. কলেজগুলোর বিজ্ঞানের শিক্ষকেরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য গবেষণা করতে আগ্রহী হলে, তাঁদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১৪. গবেষণার জন্য কলেজগুলোতে গবেষণাগার তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে, এর জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে ও গবেষকদের জন্য ভালো অঙ্কের বৃত্তির প্রচলন করতে হবে।

১৫. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য কলেজগুলোর শিক্ষকদের গবেষণা করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবেই গবেষণাগার ও উন্নত গ্রন্থাগার তৈরি করতে হবে।

১৬. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে তথ্য প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক মেইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সকল কলেজে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বই পুস্তকের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. আমাদের দেশে বিজ্ঞানের জার্নাল পাওয়া দুরূহ। দেশ-বিদেশের অতি প্রয়োজনীয় জার্নালগুলি শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে ব্যবহার করতে পারে তজ্জন্য গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করতে হবে।

১৮. বিজ্ঞান বিষয়ে কর্মরত শিক্ষকগণের দক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯. শিক্ষক প্রশিক্ষণ দ্বারা কলেজের মান-উন্নয়ন করতে হবে।

২০. বিজ্ঞানের প্রথিতযশা শিক্ষকদের ও ভালো ফলাফলকারীদের জাতীয়ভাবে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২১. বিজ্ঞান শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রকাশনার গুরুত্ব দিতে হবে।

২২. শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বেতনভাতা প্রদান সকল ক্ষেত্রেই বেসরকারি কলেজগুলোকে একটি সমন্বিত নীতিমালায় আনতে হবে।

২৩. পরীক্ষার ফলপ্রকাশ ত্বরান্বিত করতে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষার্থীরা দেশবিদেশে কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল না-প্রকাশ হওয়ায় প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত না হয়।

২৪. উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার মান-উন্নয়নে ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সরকারি কলেজের পাশাপাশি বেসরকারি কলেজকে সর্বপ্রকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

মূল রচনা :

প্রফেসর খলিলুর রহমান

একাদশ অধ্যায়
কলেজ পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা: মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান

বর্তমান অবস্থা

মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখার বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম চলছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় একশত পঞ্চাশটি (১৫০) কলেজে। কলেজ পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে দেশের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী। এ পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত দুর্বল। ফলে বিপুল সংখ্যক ডিগ্রিধারী অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এতে করে বেকারত্ব বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন ফল লাভ সম্ভব হয় নি বা হচ্ছে না।

প্রতিকার অনুসন্ধানের আগে প্রয়োজন কারণ নির্ধারণ করা। কারণ বহুবিধ। একদিকে যেমন রয়েছে প্রশাসনিক দুর্বলতা, তেমনি রয়েছে অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি। দুর্বলতাগুলোকে একে একে চিহ্নিত করা প্রয়োজন :

১. কলেজসমূহে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা বিপুল। কোন একটি কলেজে এমন বিভাগও রয়েছে যেখানে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬/৭শরও বেশি। শিক্ষার্থী সংখ্যার ভার এতো বেশি যে সেখানে কোনভাবেই মানসম্মত শিক্ষাদান সম্ভব নয়। একথা কেবল কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা কোন কোন বিভাগে মানসম্মত শিক্ষাদানের একান্তই পরিপন্থী।

২. কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকের সংখ্যাও এতো কম যে, মানসম্মত শিক্ষাদানের কথা চিন্তাও করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে এমনও কলেজ রয়েছে যেখানে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান কার্যক্রমে নিয়োজিত আছেন মাত্র একজন (০১) শিক্ষক। শিক্ষাক্ষেত্রের এহেন চিত্র শিক্ষার নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহের বিভিন্ন বিভাগে বিপুল শিক্ষার্থীসংখ্যা এবং ব্যাপকহারে শিক্ষকস্বল্পতা শিক্ষাদান কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

৩. শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই বিষয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পর্কে খুব কমই খোঁজখবর রাখেন। ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বমানের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এতে করে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানও হয়ে পড়ে সেকেলে (outdated)। শিক্ষকদের পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত নয়। ফলে আক্রান্ত হয়েছে শিক্ষাদানের মান। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক উচ্চ শিক্ষাদানের মান গুণগত শিক্ষার পথে অন্তরায়।

৪. স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার দুর্বলতা সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক। এ কারণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারে তাদের স্ব স্ব বিষয়ে যে অগ্রগতি ঘটছে তার সাথে পরিচিত নন। শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের বিষয়ের অধুনালব্ধ গবেষণা ও জ্ঞান আহরণ থেকে অবস্থান করছেন অনেক দূরে; ফলে তাদের শিক্ষাদানের মানও আশানুরূপ হচ্ছে না।

৫. কলেজসমূহের পাঠাগারে গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং সাময়িকী (Journal)-র সংযোজন নেই বললেই চলে। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি না থাকার কারণে শিক্ষকদের মধ্যেও জ্ঞানের পিপাসা বিলুপ্তপ্রায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষাদান তাই হয়ে পড়েছে পুরোনো জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

৬. শিক্ষার্থীরাও সম্ভাব্য প্রশ্নের বাইরে তেমন কিছুই পড়তে আগ্রহী নয়। অনুশীলন ক্লাস (tutorial) কলেজ পর্যায়ে নেই বললেই চলে। ফলে ছাত্র/ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির কোন প্রবণতাও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাদান কার্যক্রমে অনুপস্থিত। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রবণতা বিদ্যমান থাকায় সেখান থেকে যেসকল শিক্ষার্থী তৈরি হচ্ছে তাদের শিক্ষার মানও অত্যন্ত দুর্বল ও সীমিত। তাই মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের সৃষ্ট মানবসম্পদ অত্যন্ত নিম্নমানের। ডিগ্রিধারী এসকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বেকারত্ব, কর্ম-সংস্থানের অভাব ও হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ লাভ করলেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের দুর্বলতা প্রশাসনসহ শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

৭. কলেজসমূহের প্রশাসনিক দুর্বলতাও শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অধিকাংশ কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান একজন শিক্ষক যিনি চাকুরি জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থান করছেন। এতে করে তাঁর মধ্যে কোন উদ্যম বা মান-উন্নয়নের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। কোন রকমে সময়টুকু কাটাতেই যেন তিনি ব্যস্ত থাকেন। শিক্ষাদান কার্যক্রমকে গতিশীল করতে তাঁর কোন পরিকল্পনা বা উদ্যমও নেই বললেই চলে। ফলে কলেজসমূহে পাঠদান কার্যক্রম চলছে বটে, কিন্তু তাকে কোন বিবেচনায়ই উচ্চ শিক্ষাদান কার্যক্রম বলে গণ্য করা যায় না। নেহায়েৎ গতানুগতিকভাবে কলেজগুলিতে চলছে শিক্ষাদান কার্যক্রম–শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে, শিক্ষকগণ খাতা দেখছেন, পরীক্ষার ফল দীর্ঘকাল পরে হলেও বেরুচ্ছে–তবে সত্যিকারের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কেউ বেরুচ্ছে বলে এক্ষেত্রে দাবি করা যাবে না।

৮. ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে অধিক নম্বর প্রদানের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেদের বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয় করা এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

৯. সরকারি কলেজগুলিতে তদারকির (supervision) ব্যবস্থা ভীষণ দুর্বল। একই সঙ্গে রয়েছে জবাবদিহিতারও অভাব। ফলে দেশের অত্যন্ত খ্যাতিমান কলেজগুলিও বর্তমানে গুণগত মান অর্জনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। বেসরকারি কলেজে পরিচালনা পর্ষদ থাকলেও সেখানে স্থানীয় রাজনীতি, জাতীয় রাজনীতি এবং কোন্দল কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগের কথাও শোনা যায়। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চলছে কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই, এতে করে আক্রান্ত হচ্ছে শিক্ষার মান এবং সৃষ্টি হয়েছে উচ্চ শিক্ষার নামে প্রহসন।

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কারণের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে একথা বললে ভুল হবে না যে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহে উচ্চশিক্ষার নামে যা চলছে তা আদৌ উচ্চশিক্ষা কিনা সে বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন করা যায়। ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিদ্যমান পাঠ্যসূচি ও পাঠদান প্রক্রিয়া খুব একটা বদলেছে বলে বলা যায় না। কিছু কিছু নতুন বিষয় (যেমন- সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ প্রভৃতি) সংযোজিত হয়েছে বটে, কিন্তু পাঠদান চলছে সেই সনাতন প্রক্রিয়ায়। শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভারে জর্জরিত কলেজে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনতে চাইলেও আনা সম্ভব হচ্ছে না।

শিক্ষাদান কার্যক্রমে তেমন কোন পরিবর্তন বিগত দুই/তিন দশকে লক্ষ করা যায় না। শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা ব্যতিরেকে শিক্ষাদানের অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতি (যেমন- আলোচনা, সেমিনার, এ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি) ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। আধুনিক উপকরণ (যেমন- ওভারহেড প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি) ব্যবহার সীমিত এবং সাধারণভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। বিশ্বের সর্বত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন শিক্ষাদান কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যাদি হয়েছে অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকগণের মধ্যে কম্পিউটারের ব্যবহার নেই বললেই চলে, যেটুকু আছে তা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সারা বিশ্ব যখন কম্পিউটার ইন্টারনেট ব্যবহার করছে বেশ কয়েক বছর আগে থেকে, আমরা সেখানে শিক্ষাদান কার্যক্রমে তার ব্যবহারই শুরু করতে পারি নি। ফলে একদিকে উচ্চজ্ঞান ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষকের যেমন অভাব তেমনি পাঠদান পদ্ধতিতেও কোন উন্নতি ঘটে নি।

তাই যদি উপসংহারে এমন মন্তব্য করা যায় যে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে যা ঘটেছে তা আদৌ উচ্চশিক্ষা নয়, তাহলে তা হয়তো দোষের কিছু হবে না। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় অতিক্রম করে ৪/৫ বছর উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে কাটাবার পরও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, পড়া এবং লেখায় তেমন কোন অগ্রগতি ঘটছে বলা যায় না। যা ঘটছে তাহলো বিপুল সংখ্যক উচ্চডিগ্রির সনদপ্রাপ্ত বেকার যুবসমাজ। তাই উচ্চশিক্ষা বলে যা চলছে তা দেশ ও জাতির কোন প্রকার উন্নয়নে সাহায্য করছে কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। সুতরাং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) ব্যাপকভাবে 'শল্য সংশোধন' (surgical correction)-এর প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রয়োজন উপলব্ধি করেই সবার আগে দরকার নীতি নির্ধারক পর্যায়ে ঐকমত্য এবং ব্যাপক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণ (বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার মান সম্পর্কিত কারণসমূহ):

১. অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি না করে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি উচ্চশিক্ষার মানের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২. শিক্ষক নিয়োগদানে যোগ্যতার চাইতে অনেক ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্যই প্রাধান্য পেয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে ইংরেজি ভাষার দুর্বলতা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তাদের অর্জিত জ্ঞানের সাথে উচ্চতর এবং অধুনালব্ধ জ্ঞান সংযোজনের ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

৩. দেশের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরও একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়– এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি পর্যায়ে ডিগ্রি প্রদানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈথিল্য এবং অতি সরলিকরণের প্রবণতা। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কমে যাবার ফলে দেশে গবেষণার প্রসার ঘটেছে ঠিকই, তবে তা নিতান্তই সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে মাত্র–মানসম্মত গবেষণার সংখ্যা মোটেই বৃদ্ধি পায় নি বলা যায়। এ মন্তব্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে উচ্চতর গবেষণার প্রবণতা বলতে গেলে একেবারে শূন্যের কোঠায়। কেবল চাকুরিকালের ভিত্তিতে পদোন্নতির নিয়ম চালু থাকার কারণে কলেজ শিক্ষকগণ গবেষণা ও উচ্চতর জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছেন।

৪. মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহে ছাত্রভর্তির সংখ্যা অপরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি শিক্ষার মান হ্রাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ভবিষ্যত কর্মসংস্থানের সাথে এ সংখ্যার কোন যোগসূত্র না থাকার কারণে বিপুল সংখ্যক বেকার সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই ঘটছে না।

৫. শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কোন কার্যকর পরিবর্তনই এপর্যন্ত সাধিত হয় নি বলা যেতে পারে। শিক্ষাদানের আধুনিক উপকরণ ব্যবহার আদৌ প্রসারিত হয় নি। ফলে বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে মানসম্মত শিক্ষাদানও দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলতে হয়।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক দুর্বলতা অত্যন্ত স্পষ্ট, তা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক বা সরকারি-বেসরকারি কলেজেই হোক।

৭. উচ্চশিক্ষার আরেকটি প্রধান অন্তরায়, প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে বটে, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয় যে, মানের অবনতিও অবশ্যই ঘটেছে। একথা একইভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মাধ্যমিক পর্যায়ে নবম শ্রেণী থেকেই বিভিন্ন বিভাগে (যেমন- মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য) বিভক্তিকরণ আদৌ কোন সুফল বয়ে এনেছে কি না তা বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। স্কুল পর্যায় পেরিয়ে শিক্ষার্থীরা দেশ ও নৈতিকতা সম্পর্কিত শিক্ষা এবং ভালো মানুষ হবার শিক্ষা পাচ্ছে কি না একথা বিচার করার সময় এখন এসেছে। দুইবছরব্যাপী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানেও ব্যাপক ধস লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষাদান ব্যর্থ হবার প্রধান কারণ বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী। তাই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কেও এ মন্তব্য করা যায় যে, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও গুণগত মানের বৃদ্ধি ঘটে নি।

৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু ভাষা শিক্ষার তেমন কোন উন্নয়ন ঘটে নি। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সর্বমোট চার'শ (৪০০) নম্বরের ইংরেজি পরীক্ষা দিয়ে বেশ ভালো নম্বর পেয়ে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে আসে বটে, কিন্তু তাদের ইংরেজির জ্ঞান থেকে যায় সেই প্রাথমিক পর্যায়েই। এ দুর্বলতা নানান কারণে ঘটেছে, তবে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানে দুর্বলতা বিশেষ করে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের অন্যতম অন্তরায় একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৯. বিপুল সংখ্যক কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এ পর্যায়ের শিক্ষার মান তদারকি করার উদ্দেশ্যেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা হলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ এবং এর ফলে কলেজ শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি।

১০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক (পাস) পর্যায়ে প্রায় ১,৩০০ কলেজ; স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে প্রায় ১৫০টি কলেজে। স্নাতক পর্যায়ে অপরিকল্পিত এই ব্যাপক প্রসার বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই কেবল সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাই সফল তো হয়ই নি, বরঞ্চ উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক উপাদানেরই সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে।

১১. স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) বেশ কয়েক বছর ধরে চার বছর মেয়াদি সমন্বিত সম্মান শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। তবে এ সমন্বিত (integrated) কোর্স সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত হয় নি। প্রধান বিষয়ের সাথে কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ের কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা পরিকল্পিতভাবে করা হয় নি। বর্তমান বিশ্বে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুব সমাজের জন্য কিছু কিছু আধুনিক বিষয় যেমন–কম্পিউটারের ব্যবহার, গবেষণা পদ্ধতি, এবং দেশের সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এ প্রয়োজনের কথা চিন্তা করা হয় নি। ফলে এখনও বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনাই প্রাধান্য পাচ্ছে–দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার ধারার সাথে অনুকূল শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি।

প্রতিকারের সুপারিশ:

১. **প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন (structural change):**

ক) স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার অনুপাত এবং বিভিন্ন বিষয়ের চাহিদা বিবেচনা করে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যুক্তিসংগত পর্যায়ে না-থাকলে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স পাঠদানকারী কলেজগুলোর ভৌতিক অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২. **ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন**

(ক) বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে মানের ক্রমাবনতির অন্যতম প্রধান কারণ প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থা। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩-এর আইন ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান। একাডেমিক কার্যক্রমই সেখানে সবচেয়ে বেশি অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত। একথা স্বীকার করে নিয়ে একাডেমিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করা প্রয়োজন।

(খ) সরকারি কলেজসমূহে ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা উপরে আলোচিত হয়েছে। এ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরে Inspection এবং Monitoring পর্বে আরও সুপারিশ করা হবে।

(গ) বেসরকারি কলেজসমূহের ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে যে পদ্ধতি (পরিচালনা পর্ষদ) চালু রয়েছে, তা কোন ভূমিকা রাখতে পারছে বলে মনে হয় না। সুতরাং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পর্ষদের বিষয়টি নতুন করে চিন্তা করা যেতে পারে। তবে সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা (জেলা প্রশাসন) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি ও পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। জেলা প্রশাসকগণ এমনিতেই বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বভারে জর্জরিত। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁরা খুব একটা নজর দিতে পারেন না। তাই প্রফেসর বারী কমিটি এ বিষয়ে যে সুপারিশ করেছে তা গ্রহণ করে স্থানীয় পর্যায়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা যেতে পারে।

(ঘ) সমস্ত দেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত হবার কারণেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে বলে মনে হয় না। সমগ্র দেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বিপুল সংখ্যক উচ্চ শিক্ষাদানকারী কলেজের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ব্যর্থ হয়েছে এ অভিমত বিভিন্ন মহলের। এর বিকল্প খোঁজার প্রয়োজন রয়েছে।

৩. **শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়ন**

(ক) স্নাতক (সম্মান) ও সাধারণ স্নাতক পর্যায়ের কারিকুলামে কম্পিউটার ব্যবহার বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কারণ আগামী ১০ বছরের মধ্যে কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান ছাড়া কোন কর্মসংস্থানই সম্ভব হবে না বলে বিবেচনা করা যায়।

(খ) কারিকুলাম প্রণয়নে inter-disciplinary approach প্রয়োগ করে শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী করা প্রয়োজন।

(গ) ইংরেজি ভাষার জ্ঞান বৃদ্ধি না করতে পারলে আইটি (IT) জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হবে না। তাই সব বিষয়ে পড়াশোনার সাথে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েই ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে।

(ঘ) উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে সব বিষয়ে বাংলা ভাষার গ্রন্থাদি কিছু প্রণীত হলেও পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক উচ্চ শিক্ষা কখনোই ফলপ্রসূ হতে পারে না। তাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞানের প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজি ভাষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগের জন্য, বিশেষ করে ICT-এর মাধ্যমে, ইংরেজির দক্ষতা অপরিহার্য।

৪. **Inspection and Monitoring**

(ক) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার জন্য Inspection and Monitoring-এর যে ব্যবস্থা রয়েছে তা প্রায় অকার্যকর বলেই বলা যায়। তাই প্রতিটি পর্যায়ের জন্যে স্থানীয়, আঞ্চলিক (বিভাগীয় পর্যায়) এবং জাতীয়- এ তিনটি Monitoring Cell গঠন করা যেতে পারে।

৫. **শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা :**

(ক) বর্তমানে শিক্ষকদের বেতনকাঠামো অত্যন্ত অবাস্তব। এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। মেধাবীদেরকে শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে হলে তাদের জন্য আকর্ষণীয় বেতনকাঠামো থাকতে হবে। যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক সৃষ্টি করতে হলে তাদের বেতনকাঠামো অবশ্যই আকর্ষণীয় করতে হবে। সরকারি অন্যান্য কর্মকর্তাদের বেতনকাঠামোর সাথে যোগসূত্র রেখে বর্তমানে যে বেতনকাঠামো শিক্ষকদের জন্যে করা হয়েছে তা মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পেশায় নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক পেতে হলে শিক্ষকদের জন্যে শিক্ষার প্রতি পর্যায়েই ভিন্ন এবং উচ্চতর বেতনকাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পার্শ্ববর্তী সার্কভুক্ত দেশসমূহে ইতোমধ্যেই শিক্ষকদের জন্য আলাদা (ভিন্ন) বেতনকাঠামো করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সম্মানজনকভাবে জীবন নির্বাহের জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে শিক্ষকদের জন্য ভিন্ন বেতনকাঠামো গড়ে তুলতে না পারলে এবং মেধাবীদের এ পেশার প্রতি আকৃষ্ট করতে না পারলে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব হবে না। নেহায়েত জীবন ধারণের ন্যূনতম বেতন না পাবার কারণেই শিক্ষকরা অপেশাদারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হচ্ছেন। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নানান দুর্নীতি ঢুকে পড়ছে এবং সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদারও হানি ঘটেছে। সুতরাং এ অবস্থা দূর করার জন্যে শিক্ষকদের বেতনকাঠামোর উচ্চতর বিন্যাস প্রয়োজন।

মূল রচনা :

প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরী

দ্বাদশ অধ্যায়
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা

বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষার ক্রমবিকাশ

ব্যবসায় শিক্ষা একজন ব্যক্তির জ্ঞানকে ব্যবসায়িক পরিবেশ উপযোগী করে তোলে। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক শিক্ষা বলতে প্রায়শই করণিক, সাচিবিক বা হিসাবরক্ষণ পদসমূহ বা দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি পরিচালনাকে বোঝানো হত। কিন্তু ব্যবসায় শিক্ষার পরিধি এর চেয়েও ব্যাপক। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চলে ব্যবসায় শিক্ষার পথ সুগম হয়। ১৯৪৭ সালের পর ভারত সরকার ক্রমাগত শিল্প উন্নয়নের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করে। উক্ত সমীক্ষায় পেশাবিদগণ বাণিজ্য শিক্ষার স্থলে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা চালুর সুপারিশ করেন। বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষা বলতে দুই বছরের স্নাতক পাস ডিগ্রি বোঝাত। অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষকরা এর উদ্যোক্তা ছিলেন। সাধারণ অর্থনীতি, অর্থ, ব্যাংকিং, বীমা, ব্যবসায়, সংগঠন, পরিবহন, বাণিজ্যিক ভূগোল এবং বাণিজ্যিক ইংরেজি ইত্যাদি বিষয় ছাত্রদের পড়ানো হতো। বি.কম ডিগ্রি পাস করার পর দুই বছর মেয়াদি এম. কম ডিগ্রি অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হলে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু করা হয়। এদেশে বাণিজ্য শিক্ষা প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রসার ঘটে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০ বছরের পাঠ শেষ করে একজন ছাত্র বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিষয়ে পড়তে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দুই বছর পড়ার পর বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অনেক বিভাগে পড়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু এক সময় বাণিজ্যের ছাত্রদের একটি মাত্র বিভাগে পড়ার সুযোগ ছিল। এদিকে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে বাণিজ্য শিক্ষায় শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা পূরণের স্বার্থে ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে বাণিজ্য অনুষদ শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিভাগসহ ৪টি বিভাগ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য অনুষদ চালু হয়। ক্রমান্বয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করে বাণিজ্য শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখে।

১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই.বি.এ তে ব্যবসায় প্রশাসন কোর্স চালু করে এম.বি.এ ডিগ্রি প্রদান শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় শিক্ষা কারিকুলাম বি.বি.এ এবং এম.বি.এ এদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফলে এই কোর্সসমূহের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সবগুলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭১ সালে অস্থানীয় ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা এবং তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ইদানীং বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে অনেক বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসা এদেশে সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, হিসাবনিকাশ, অর্থ, বীমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সাধারণ প্রশাসনে নির্বাহী পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারকদের উপযুক্ত মানবসম্পদ তৈরির জন্য ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ব্যবসায় শিক্ষা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যবসায় শিক্ষা বর্তমানে একটি লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত। ব্যবসায়সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তিচ্ছুদের অত্যধিক চাপ থেকেই বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সরকারের মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিশ্রুতি থেকে এটা ক্রমশই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, স্ব-কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোক্তা বা আকর্ষণীয় উচ্চ বেতনের নির্বাহী হিসেবে ব্যবসায় গ্রাজুয়েটদের জন্য চাকুরির বাজার বেশ উজ্জ্বল। মেধাবী ব্যবসায় গ্রাজুয়েটদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আনুষঙ্গিক সেবা অনেকটা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ব্যক্তি শিল্পউদ্যোগের প্রতি উৎসাহ প্রদান ছাত্র ও অভিভাবকদেরও এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছে। ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস পেশাকেন্দ্রিক দক্ষ হিসাববিদ তৈরি করছে। বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমী বীমা নির্বাহীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমীগুলি ব্যাংক কর্মকর্তাদের চিন্তাচেতনা প্রসারে সচেষ্ট আছে। বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট সাধারণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

ব্যবসায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব.

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে বাণিজ্য বা ব্যবসায় একটি দ্রুত উন্নয়নশীল বিষয় হিসেবে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা শিল্পবিপ্লব ও বাণিজ্যিক বিপ্লব দুটোই যুগপৎ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার উৎপত্তি ও সম্প্রসারণের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ব্যবসায় শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞান বিশেষভাবে এ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। লোক প্রশাসনিক ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায়, বাণিজ্যে, শিল্প ও ব্যবসায়, বীমা, ব্যাংক প্রভৃতি পরিচালনায় ব্যবসায় শিক্ষা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে ব্যবসায় শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন সেজন্য ব্যবসায় শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। সাধারণ প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাংকিং, বীমা, আমদানি, রফতানি ও শ্রম সম্পর্কে জানার জন্য এবং উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ, পণ্যদ্রব্য পরিবহন এবং জনশক্তি সরবরাহ করার জন্য ব্যবসায় শিক্ষার দিকে সরকারের আরও দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবসায় শিক্ষা প্রোগ্রাম বলতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহে নিম্নবর্ণিত ডিগ্রি প্রোগ্রাম রয়েছে :–

(ক)	বি. কম (পাস)	:	দুবছর মেয়াদি (ইদানীং তিন বছর মেয়াদি করা হয়েছে)
(খ)	বি. কম (অনার্স)	:	তিন বছর মেয়াদি (ইদানীং চার বছর মেয়াদি করা হয়েছে)
(গ)	বি.বি.এ	:	চার বছর মেয়াদি
(ঘ)	বি.বি.এ (অনার্স)	:	চার বছর মেয়াদি
(ঙ)	এম.বি.এম	:	এক বছর মেয়াদি
(চ)	এম. কম	:	এক/দুবছর মেয়াদি
(ছ)	এম.বি.এ	:	এক/দেড়/দুবছর মেয়াদি
(জ)	এম.ফিল	:	দুবছর মেয়াদি
(ঝ)	পি.এইচ.ডি	:	তিন বছর মেয়াদি

ব্যবসায় একটি ব্যবহারিক ও বাস্তবানুগ বিষয় হলেও আমাদের দেশে বিষয়গুলিকে শুধু তত্ত্বীয়ভাবে পড়ানো হয়। পরীক্ষা পাশের জন্য শিক্ষার্থীগণ মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করার চেষ্টা করে। কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম, আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা কম, গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই নেই। শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগও সীমিত। কলেজে ব্যবসায় বিষয়ে শিক্ষকগণ তাদের কর্মতৎপরতা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমিত রাখেন। গবেষণা কার্যক্রমে আগ্রহ কম। স্থানীয় শিল্প ও ব্যবসায় প্রতষ্ঠানের সঙ্গে কলেজগুলির ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় নি। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের একটা বিরাট অংশ দেশের এসব শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়।

অনার্স কোর্স চালু আছে এমন কলেজগুলিতে কোথাও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ নেই। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের অধীনে সীমিত আকারে এ সুযোগ পায়। ফলে ব্যবসায় শিক্ষা মোটেও পূর্ণাঙ্গ হয় না।

ব্যবসায় শিক্ষা পুস্তককেন্দ্রিক থাকার কারণ হল কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব। প্রায় কলেজেই একদিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষক পদ নেই অপরদিকে সরকারি কলেজগুলিতে বছরের পর বছর পদ শূন্য থাকতেও দেখা যায়। এসব কারণে কলেজগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ক্লাশ হয়ে থাকে। টিউটোরিয়াল ক্লাশ হয় না বললেই চলে। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উপকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কম। এসব কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষা প্রদানে গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের ৭ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলিই ব্যবসায় শিক্ষা ক্ষেত্রে বি.বি.এ ও এম.বি.এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিষয়ে বিশেষায়িত ডিগ্রি প্রদান করছে। অপরদিকে ১৯৯২ সালে সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলির দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত করেছে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১০০৫ টি কলেজ ও ২৪ টি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ব্যবসায় বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে।

দেশের প্রায় ৮০ ভাগ ব্যবসায় বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষালাভ করছে। কিন্তু এদের লেখাপড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত কলেজগুলির অবস্থা অনেক কারণে মোটেও সন্তোষজনক নয়। ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় 'মার্কেটিং' ও 'ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং' বিষয়ের কোন শিক্ষক সরকারি কলেজে নেই, এমনকি পদও নেই। ফলে সরকারি কলেজের ব্যবসায় শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বেসরকারি কলেজের আর এক চিত্র হল এই, সেখানেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। গ্রন্থাগারে বই নেই, শ্রেণীকক্ষের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব ইত্যাদি। ফলে পরীক্ষার ফলাফলে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বিগত ডিগ্রি পরীক্ষা ২০০১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪৩ টি কলেজে পাশের হার ০%, ২৪৪ টি কলেজে পাশের হার ১০%-এর নিচে আবার ৭১ টি কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০-এর নিচে। অথচ এই কলেজগুলিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকসংখ্যা গড়ে ২৫-৩৫ জন। ফলে সরকারি অর্থের একটা বিরাট অংশের অপচয় হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং পর্যায়ক্রমে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। আধুনিকায়নের মাধ্যমে সিলেবাস যুগোপযোগী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং এর সাথে সাথে প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সীমিত সামর্থ্যে কলেজগুলির জন্য শিক্ষা উপকরণ যেমন, বই ও কম্পিউটার সরবরাহ করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে কলেজগুলিতে সাময়িক ভিত্তিতে শিক্ষক প্রেরণ করে শিক্ষক স্বল্পতার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সহযোগিতা দেওয়ার চিন্তা করছে। কিন্তু এসকল ব্যবস্থা সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে এক্ষেত্রে আরও ব্যাপক সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমানে ব্যবসায় বিষয়ক উচ্চতর পর্যায়ের ডিগ্রির জন্য যেসকল কোর্স পড়ানো হয় তা হচ্ছে : হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বাণিজ্যবিষয়ক কোর্স। তাছাড়া সহায়ক কোর্স হিসেবে ব্যবসায়িক গণিত, বাণিজ্যিক আইন, অর্থনীতি, কর আইন, পরিসংখ্যান এবং কম্পিউটারসহ অন্যান্য কোর্স সমূহ। কিন্তু এগুলোর সিলেবাস এবং বিন্যাস আধুনিক নয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এ কোর্সগুলো ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয় বিধায় এবং শিক্ষকের গুণগত পার্থক্য থাকায় দুই ধারা থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও বিরাট। বর্তমানে ব্যবসায় শিক্ষাপদ্ধতির দুটি approach প্রচলিত আছে। এর একটি উত্তর আমেরিকার প্রচলিত approach যা বি.বি.এ, এম.বি.এ-তে বিদ্যমান, অপরটি সনাতন ব্রিটিশ approach যা বি.কম, এম.কম ও অনার্স ডিগ্রিতে বিদ্যমান। ফলে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের একদিকে যেমন জ্ঞানের পার্থক্য থাকে অন্যদিকে চাকুরি বাজারে তাদেরকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হয়। এই দ্বৈত approach বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে বিধায় অবিলম্বে এর একটা সমাধান প্রয়োজন।

ব্যবসায় শিক্ষার সমস্যাবলি

১. সমন্বিত এবং যুগোপযোগী সিলেবাসের অভাব।

২. সিলেবাস অনুযায়ী বাংলায় উন্নতমানের বইয়ের অভাব।

৩. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রির নামের বিভিন্নতা, কোর্স সংখ্যার পার্থক্যে ডিগ্রির মূল্যায়নের সমস্যা।

৪. সরকারি কলেজে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ের শিক্ষকের পদ না-থাকায় সরকারি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এ দুটি বিষয় পাঠ করার সুযোগ না-থাকা।

৫. ব্যবহারিক শিক্ষার অভাবে শুধুমাত্র তত্ত্বীয় শিক্ষার কারণে বাস্তবানুগ শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত।

৬. সরকারি কলেজে পদ শূন্য থাকায় এবং বেসরকারি কলেজে পদ না-থাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব।

৭. কলেজের শিক্ষকদের পর্যাপ্ত ট্রেনিং না-থাকায় যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানে অক্ষমতা।

৮. গবেষণা এবং প্রকাশনার সুযোগ না-থাকায় শিক্ষকদের গতানুগতিকতার মধ্যেই আবর্তমান থাকা।

৯. ক্লাশরুমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব।

১০. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত শিক্ষাদানের অনুপযোগী।

১১. কলেজ পর্যায়ে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের সর্বাত্মক প্রয়াস না-থাকা।

১২. বেসরকারি কলেজ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রভাবশালীদের অশুভ তৎপরতা।

১৩. কলেজ গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বইয়ের স্বল্পতা।

১৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইচ্ছামাফিক কোর্স-সিলেবাস প্রবর্তন করা।

১৫. অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত দুর্বলতা।

১৬. কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়িক মানসিকতা থেকে উদ্ভূত অত্যধিক ফি ধার্য করার প্রবণতা।

১৭. ব্যবসায় জগতের সাথে সম্পর্কহীনতার কারণে অবাস্তব শিক্ষা প্রদান।

১৮. কলেজগুলিতে কম্পিউটারসংশ্লিষ্ট ব্যবসায় শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষক ও সুযোগসুবিধার অভাব।

১৯. কলেজসমূহে শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি না-থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার আলোচনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

২০. টিউটোরিয়াল ক্লাশের ব্যবস্থা নেই।

২১. ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়া।

২২. ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীপরীক্ষার ফলাফলের বিষয়ে অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা না-থাকা। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সহযোগিতার অভাব।

২৩. বেসরকারি কলেজে উপযুক্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়াই অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে শিক্ষা প্রদান করা।

২৪. যত্রতত্র অবকাঠামোবিহীন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধাবিহীন ডিগ্রি কলেজ স্থাপন এবং নিম্নমানের শিক্ষা প্রদান।

২৫. আমেরিকান ও ব্রিটিশ এই দ্বৈত শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করাতে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের জন্ম।

২৬. সমন্বিত ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থাপনার অভাব থাকায় শিক্ষাব্যবস্থায় অব্যবস্থা।

সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত সুপারিশ

১. সারা দেশের জন্য সমন্বিত ও যুগোপযোগী ব্যবসায় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে অভিন্ন নীতিমালা তৈরি করা।

১.১. এই নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগের নজরদারির জন্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, উপাচার্য, বিচারক, প্রিন্সিপাল ও সরকারি কর্মকর্তা সমন্বয়ে জাতীয় কমিটি গঠন।

১.২. কমিটির কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট ও সম্মানীর ব্যবস্থা।

২. আমেরিকান ও ব্রিটিশ শিক্ষাদান পদ্ধতির দ্বৈতাবস্থা পরিহার করে বর্তমানে বহুলপ্রচলিত আমেরিকান শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করা।

২.১. এ লক্ষ্যে সিলেবাস প্রণয়ন ও সিলেবাস অনুযায়ী পুস্তক তৈরি বা অনুবাদের ব্যবস্থা করা।

২.২. ব্যবসায় শিক্ষাকে বাস্তবানুগ করার জন্য সিলেবাসে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্তি।

২.৩. সিলেবাস অনুযায়ী উপযুক্ত পাঠদানের সুবিধার্থে শিক্ষকদের যথাযথ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা।

২.৪. অধিভুক্তি প্রাপ্তির জন্য কলেজ গ্রন্থাগারে সিলেবাসভুক্ত বই পুস্তকের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং তা বাধ্যতামূলক করা।

২.৫. কলেজ পর্যায়ে Remedial English কোর্স চালু করা।

৩. কম্পিউটার ব্যবহার ব্যবসায় শিক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এজন্য কলেজসমূহে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন বাধ্যতামূলক করা।

৩.১. কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিয়োগ দান।

৩.২. এজন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া।

৪. কলেজসমূহের অবকাঠামোগত সমস্যা দূর করার জন্য অনুমোদনের পূর্বশর্ত হিসেবে কঠোরভাবে নিয়মনীতির অনুসরণ করা।

৪.১. শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা ও শিক্ষা উপকরণজনিত সুবিধা সৃষ্টি করা।

৪.২. প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা।

৪.৩. যত্রতত্র অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলা নিরুৎসাহিত করা।

৪.৪. অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স শিক্ষাদানকারী কলেজগুলিকে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা দিয়ে উন্নত করা।

৫. পাঠদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের আশু করণীয়।

৫.১. প্রতি বিষয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাশ বাধ্যতামূলক করা।

৫.২. সাময়িক পরীক্ষার উপর জোর দেওয়া এবং পরীক্ষার ফলাফল ও ছাত্র-ছাত্রীর Performance অভিভাবকদের জানানো।

৫.৩. কলেজে শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

৫.৪. ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক অভিভাবক সমন্বয়ে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা।

৬. ব্যবসায় শিক্ষাকে একই ধারায় নিয়ে আসার জন্য ক্রমান্বয়ে সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.বি.এ, এম.বি.এ পদ্ধতি চালু করা।

৬.১. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ব্যবসায় বিষয়ে ডিগ্রি অনুক্রমসমূহের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার কাল, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষাপদ্ধতি, পাঠক্রম পদ্ধতির তারতম্য দূর করা। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৬.২. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে চার বছর মেয়াদি স্নাতক (বি.বি.এ) এবং এক বছর মেয়াদি (এম.বি.এ) অনুক্রম রাখা।

৬.৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.বি.এ এবং এম.বি.এ কোর্সসংখ্যা অভিন্ন হওয়া বিধেয় এবং বিজ্ঞান, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ডিগ্রি কোর্স সংখ্যার মধ্যে সমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কোর্স সংখ্যা অভিন্ন করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৬.৪. সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বি.বি.এ এবং এম.বি.এ অনুক্রম সেমিস্টার ছয় মাস মেয়াদি পদ্ধতি প্রচলন করা। প্রতি সেমিস্টার অন্তে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৬.৫. বিবিএ কোর্সের মধ্যে ৪০% সাধারণ কোর্স (যথা: গণিত, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ভাষা ও প্রচলিত প্যাকেজেস, বাংলাদেশের কারবার পরিচিতি, অর্থনীতি, যোগাযোগ, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স) এবং ৬০% বিশেষ কোর্স (যথা: মার্কেটিং, ব্যাংকিং, ফিন্যান্স, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, শিল্পসম্পর্ক, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক কারবার, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান ও অপারেশন রিসার্চ ইত্যাদি) থাকবে।

৬.৬. এমবিএ কোর্সেও ২০% মৌলিক বিষয় (যথা: ব্যবস্থাপনীয় নীতি ও পদ্ধতি, কারবার গবেষণা) এবং ৮০% বিশেষ কোর্স (যথা: ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, বীমা, শিল্পসম্পর্ক, মার্কেটিং প্রভৃতি) থাকা প্রয়োজন। যারা বিবিএ ব্যতীত অন্য ধারা থেকে এমবিএ কোর্সে ভর্তি হবে, তাদের বিবিএ-এর মূল পত্রসমূহ আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রথম বর্ষে অধ্যয়ন করতে হবে।

৬.৭. বিবিএ এবং এমবিএ পরীক্ষাব্যবস্থায় প্রতি পত্রের ফলোন্নয়ন পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে, ফলোন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষা দেবার বিধান রাখতে হবে।

৬.৮. বিবিএ ও এমবিএ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা।

৬.৯. যে সমস্ত শিক্ষার্থী বিবিএ ডিগ্রি লাভ করে নি অর্থাৎ বিজ্ঞান, কলা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেছে, কিন্তু এমবিএ ডিগ্রি অনুক্রমে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.১০. চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী বা সনাতন পদ্ধতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীর জন্য দুই বছর মেয়াদি এমবিএ অনুক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। এ সমস্ত শিক্ষার্থী এক বছর ব্যবসায় বিষয়ক মৌলিক বিষয়ে অধ্যয়ন করবে এবং বিবিএ ধারা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ এমবিএ প্রোগ্রাম অধ্যয়ন করবে।

৬.১১. বিবিএতে মোট আটটি সেমিস্টার কোর্সের সংখ্যা ৩৮ থেকে ৪০ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রতি সেমিস্টার ১৬ সপ্তাহব্যাপী করা বিধেয় এবং প্রতি সপ্তাহে প্রতি কোর্সে এক ঘণ্টা মেয়াদি তিনটি বক্তৃতা / আলোচনা থাকা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থায় ক্রেডিট সংখ্যা ১১৪ থেকে ১২০ হতে হবে।

৬.১২. এমবিএ প্রোগ্রামে লেকচার পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে কেস-স্টাডি ও আলোচনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত। সপ্তাহে এ উদ্দেশ্যে একটি ক্লাস আলোচনার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষাসহায়ক ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.১৩. বিবিএ ও এমবিএ কোর্সে ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের জন্য অডিওভিজুয়াল সহায়কসমূহ ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উপরিউক্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।

৬.১৪. শিক্ষা পরিকল্পনা ও পরীক্ষা গ্রহণের সময়সূচি কোর্স শুরু করার পূর্বে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। শ্রেণীকক্ষ পরীক্ষা নেওয়ার ১০ দিনের মধ্যে ছাত্রদের ইন-কোর্স, টিউটোরিয়াল নম্বর জানাতে হবে।

৬.১৫. ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধি করে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ১ ঃ ১৫-তে আনতে হবে।

৭. তরুণ শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি প্রদান প্রচলন করতে হবে।

৮. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৯. বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষকদের শিল্প, ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. প্রত্যেক বিভাগে নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের উপর মতবিনিময় করার জন্য মাসিক সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. দেশের ব্যবসায় বিষয়ে পিএইচডি কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। দেশে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ছাত্রদের উৎসাহ প্রদানের জন্য মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের পিএইচডি সংক্রান্ত গবেষণার কাজ পরিচালনায় উৎসাহ প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রেষণামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন অতিথি বক্তাদের মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মূল রচনা :

প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের উচ্চ শিক্ষা পরিবেশের উপর পরিচালিত সরেজমিন অনুসন্ধানে প্রাপ্ত সমস্যাসমূহ নিম্নে দফাওয়ারি বিধৃত করা হলো :

১. ক্লাশে উপস্থিতির অতিনিম্নহার

দেশের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের ৪৮টি স্নাতকোত্তর কলেজ সরেজমিন অনুসন্ধানে ক্লাশে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি সর্ম্পকে নিম্নোক্ত চিত্রটি পাওয়া যায় :

একটি শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত ক্লাশের ৫০ ভাগের বেশি ক্লাশে উপস্থিত থাকে মাত্র ১২ % শিক্ষার্থী

৩০ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ ক্লাশে উপস্থিত থাকে ৩০% শিক্ষার্থী

১ থেকে ৩০ ভাগ ক্লাশে উপস্থিতির হার ৫৬%।

কার্যকর ক্লাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ৪টি **প্রতিবন্ধক** সনাক্ত করা হয়েছে;

১. গাইড,ফটোকপি নোট ও প্রাইভেট নির্ভর শিক্ষার্থীর ক্লাশবিমূখতা;

২. ক্লাশে মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি;

৩. স্বতন্ত্র পরীক্ষার হল না থাকায় প্রতি শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য প্রচুর ক্লাশ না হওয়া;

৪. নন কলেজিয়েট বিধি কার্যকর না থাকা।

এগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে :

১. (ক) শিক্ষার্থীর প্রাইভেট, ফটোকপি নোট ও গাইড নির্ভরতা

প্রাইভেট, গাইড ও কোচিং নির্ভরতা কলেজ পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার মান অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া গাইড বা কোচিং নির্ভর নয়। কিন্তু কলেজ শিক্ষার্থীদের গাইড ও কোচিং নির্ভরতা প্রবল। ফলে কলেজ গ্র্যজুয়েটরা মেধার প্রতিযোগিতায় পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে।

দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি প্রধান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজে সরেজমিন অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। সে সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৬৮% শিক্ষার্থী গাইড-ফটোকপি-প্রাইভেট টিউটর নির্ভর। শিক্ষার্থীরা গাইড ও প্রাইভেট টিউটর নির্ভর হয়ে কেবল ডিগ্রিটি পেতে চাইছে। ফলে ক্লাশে উপস্থিতির বিষয়টি গৌণ হয়ে উঠেছে। কলেজ আওয়ারেও অনেক শিক্ষার্থী ক্লাশ বাদ দিয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে। ১০২টি সরকারি অনার্স কলেজ ছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত আরও যে ৪৬টি বেসরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স চালু রয়েছে সে সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের গাইড ও প্রাইভেট নির্ভরতার মাত্রা আরও প্রকট।

গাইড ও প্রাইভেট নির্ভরতার কারণে শিক্ষার্থীরা যে সিলেবাসের গোটা পাঠ্যসূচির সাথে পরিচিত থাকে না তার সহজ প্রমাণ পাওয়া যায় অনার্স বা মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফলে। অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় কম্প্রিহেনসিভ বলে একটি পত্র চালু করা হয়েছে। গোটা পাঠ্যসুচি থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে ৫০ নম্বরের কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা নেওয়া হয়। ২০০১ শিক্ষাবর্ষের অনার্স পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫২% শিক্ষার্থী কম্প্রিহেনসিভ বিষয়ে ফেল করেছে।

১. (খ) প্রতিক্লাশে মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে প্রতি শিক্ষাবর্ষে ক্লাশের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি বৃহত্তর স্নাতকও স্নাতকোত্তর কলেজ সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, ক্লাশে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতের দিকটি গুরুত্ব পাচ্ছে না। তেমনি অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার কথাটিও বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। বিভাগীয় শহর ও বৃহত্তর জেলার শীর্ষ ৩০টি কলেজ ও ৪৮টি জেলা কলেজের কোনটিতে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সমাজকল্যাণ সমাজবিজ্ঞানে ৪ জন শিক্ষকের বেশী শিক্ষকের সৃষ্টপদ নেই (*সূত্র বেনবেইজ,ঢাকা*)। দুইশত শিক্ষার্থীর ধারণক্ষমতার কোন শ্রেণীকক্ষ কলেজগুলোতে নেই। কিন্তু একটি ক্লাশে ছাত্র-শিক্ষকের স্বীকৃত অনুপাত বিবেচনায় না রেখে ৩ জন বা ৪ জন শিক্ষকের বিভাগে অনার্সের প্রতি ক্লাশে ২০০ থেকে ২৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে, যা অত্যধিক। মানবিক ও বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোতে ১৫০ থেকে ২০০ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। এতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে বটে কিন্তু অর্জিত মানের ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
কলেজ শিক্ষা : একটি সমীক্ষা রিপোর্ট

ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের শিক্ষাপরিবেশের উপর সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে কলেজ পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সুপারিশ প্রণয়ন করতে ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ রিসার্চ সেন্টারকে দায়িত্ব প্রদান করে।

কমিশন কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে আনন্দমোহন কলেজ রিসার্চ সেন্টার দুটি সবিস্তার তথ্যছক প্রস্তুত করে। দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি বৃহত্তর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজে (শিক্ষার্থী-শিক্ষক, ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদি বিবেচনায় বৃহত্তর এই কলেজসমূহের নাম সংযুক্ত) ২জন গবেষণাকর্মীকে প্রয়োজনীয় তথ্যছকসহ প্রেরণ করা হয়। গবেষকগণ কলেজসমূহে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করে। কলেজ প্রশাসন ও বিভাগীয় প্রধানের নিকট থেকে পৃথক পৃথক ছকে তথ্য লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিমত গ্রহণ করা হয়।

কলেজগুলো সরেজমিন অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত গবেষণাকর্মীদের দেওয়া প্রতিবেদন ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এ রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে।

প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ

১. দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজ সমূহের অবকাঠামোগত ও জনবল কাঠামোগত সুযোগ সুবিধা চিহ্নিত করা।

২. শ্রেণী ও শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন।

৩. শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের পথে বিদ্যমান প্রধান প্রতিবন্ধকসমূহ চিহ্নিত করা।

৪. কলেজ পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার সংকটসমূহের কারণ ও প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান।

৫. কলেজ পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার চিহ্নিত সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

শিক্ষাপরিবেশের মাননির্ধারক হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে :

১. ক্লাশে শিক্ষার্থী ভর্তি ও ড্রপ আউট;

২. ক্লাশে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার;

৩. শিক্ষক- শিক্ষার্থী অনুপাত;

৪. কলেজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় সেমিনারের অবস্থা;

৫. শ্রেণীকক্ষ ও গবেষণাগারের অবস্থা;

৬. পরীক্ষার ফলাফল;

৭. শিক্ষকগণের যোগ্যতা ও দক্ষতা;

৮. ভৌত অবকাঠামোগত অবস্থা।

১. (গ) স্বতন্ত্র পরীক্ষা হলের অভাব

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১০২টি সরকারি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজের কোনটিতেই পাবলিক পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল নেই। সব কলেজেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষাগ্রহণের জন্য কলেজের ক্লাশ বন্ধ রাখতে হয়। স্নাতকোত্তর কলেজসমূহে একটি শিক্ষাবর্ষে মেজর ও ননমেজর মিলে ৮টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্বতন্ত্র পরীক্ষার হল না থাকায় ক্লাশ বন্ধ রেখে পরীক্ষাগ্রহণের কারণে প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৪০% ক্লাশ থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়।

অনার্স-মাস্টার্স অনেক কলেজেই অডিটরিয়াম আছে যেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত দেখা গেছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা গেলে এসব অডিটরিয়ামকেও পরীক্ষা হল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ কর্তৃপক্ষ অডিটরিয়াম সংস্কার করে সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার পাশাপাশি সেটিকে পরীক্ষার হল হিসাবে ব্যবহার করছে। এতে সেখানে অনার্স-মাস্টার্স পরীক্ষার সময় এখন আর আগের মত ক্লাশ বন্ধ রাখতে হচ্ছে না। আনন্দমোহন কলেজের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে কলেজগুলোর অডিটরিয়াম সংস্কার করে এর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে পরীক্ষাগ্রহণের জন্য ক্লাশ বন্ধ রাখতে হবে না।

১. (ঘ) নন কলেজিয়েট বিধি কার্যকর না থাকা

একাডেমিক শিক্ষায় ক্লাশে উপস্থিতির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সে বিবেচনায় প্রণীত হয়েছে 'নন কলেজিয়েট বিধি'। ক্লাশে উপস্থিতির বিষয়ে 'নন কলেজিয়েট বিধি'(একটি শিক্ষাবর্ষে ন্যূনতম ৭৫% ক্লাশে উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা) থাকলেও শিক্ষার্থী-শিক্ষক,ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদি বিবেচনায় বৃহত্তর কলেজসমূহে তা কার্যকর দেখা যায় নি। এ ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার সংকটটি প্রকট।

দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি বৃহত্তর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজ সরেজমিন জরিপ করা হয়েছে। সে কলেজগুলোতে ৭৫% ক্লাশে উপস্থিত ছাত্রের হার ৯%। এ কলেজগুলো ৯১% নন কলেজিয়েট শিক্ষার্থী নিয়ে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে।

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো শিক্ষার্থীর স্বার্থে প্রণীত 'নন কলেজজিয়েট বিধি' কলেজসমূহে কার্যকর হচ্ছে না কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে। সচেতন অভিভাবকগণের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে শিক্ষা প্রশাসনের ব্যবসায়িক মনোভঙ্গী হিসাবে চিহ্নিত করতে চান। কর্তৃপক্ষ জেনেশুনেই বিপুল সংখ্যক নন কলেজিয়েট শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণের সুযোগ দেয়; কারণ কর্তৃপক্ষ ফরম পূরণ খাতে বিপুল ফি আদায় করে থাকে (সংযুক্তি ৩ এ প্রদর্শিত)। উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানের স্বার্থে আজ 'নন কলেজিয়েট বিধি'র প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়লেও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ নেই।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহে সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে একটি শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত ২৫৪টি ক্লাশের মধ্যে ৬টি ক্লাশে উপস্থিত থেকেও অনার্স-মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম নয়।

অন্যান্য সমস্যা

কলেজগুলি আরও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এগুলো নিম্নে আলাদা আলাদা শিরোনামে বিধৃত করা হচ্ছে।

২. প্রবল শিক্ষক সংকট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত নিয়ম অনুযায়ী অনার্সের জন্য ৮ জন এবং মাস্টার্স শ্রেণীর জন্য ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত যে ১০২টি সরকারি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে সে কলেজসমূহের কোনটিতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকপদ নেই। সৃষ্ট পদেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। অধিকাংশ কলেজে এসব বিভাগ ক্লাশ সামাল দিচ্ছে 'গেস্ট টিচার' ভাড়া করে।

বর্তমানে ৩২৭টি সরকারি কলেজের জন্য সৃষ্টপদের সংখ্যা (অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষকসহ সব মিলিয়ে) ১১৭২৮। (*সূত্র-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর)*

এই ১১৭২৮টি শিক্ষকপদ দিয়ে ২২৫টি উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজের প্রয়োজন মিটিয়ে ১০২টি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। গত দুই দশকে সরকারি কলেজগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয় এতে ব্যাপক শিক্ষক চাহিদা সৃষ্ট হলেও গত তিন দশকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকপদ সৃষ্ট করা হয় নি।

প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্ট করা সম্ভব না হওয়ায় বর্তমানে দেশের ১০২টি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজে ৫০৬১ টি পদের ঘাটতি রয়েছে, যা সারণি থেকে দেখা যেতে পারে।

দেশের কয়েকটি বৃহত্তর মাস্টার্স কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক সৃষ্টপদ ও শূন্য পদসংখ্যা :

কলেজের নাম	মোট শিক্ষার্থী	শিক্ষক			
		*প্রয়োজন	সৃষ্টপদ	শূন্যপদ	ঘাটতি
ঢাকা কলেজ, ঢাকা	১০৮৪৭	২২৮	১৬৫	১২	৬৩
তিতুমীর কলেজ, ঢাকা	১১০৫৭	১৩৭	৯১	৭	৪৬
বি এল কলেজ, খুলনা	২০১৫১	১৮৮	১৩১	৩১	৫৭
মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর	১১০০০	১৯২	১০৭	৪১	৮৫
এম সি কলেজ, সিলেট	৫১৮৯	১৫২	৯৪	৩২	৫৮
আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ	১৮০০০	২২৪	১৬২	১২	৬২
বি এম কলেজ, বরিশাল	৮৬০৭	২০৪	১২৫	৫১	৭৯
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	১৫১২০	১৯৬	১৮১	৪৪	১৫
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	১৫৯৭৫	২৫২	১৯২	৩৫	৬০
এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা	১১৪৮৭	১৮৪	১০১	৪৫	৮৩
ভিক্টোরিয়া কলেজ,কুমিল্লা	১২০০০	২৩৬	১৪২	২৩	৯৪
আযিযুল হক কলেজ,বগুড়া	১৪৩৭৩	২১৬	১৭৭	৩২	৩৯
সাদত কলেজ, টাঙ্গাইল	৬৭৫৩	১৬৪	৯২	১৮	৭২

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী অনার্স কোর্সের জন্য ৮ জন এবং মাস্টার্স কোর্সের জন্য ১২জন শিক্ষক থাকতে হবে। সে অনুযায়ী প্রয়োজন নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. সৃষ্টপদ বণ্টনে সমন্বয়হীনতা

একদিকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রবল শিক্ষকসংকট অন্যদিকে অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সৃষ্ট পদ এবং পদায়নের ঘটনাও রয়েছে। যে সব বেসরকারি কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়েছে সে সব কলেজে বেসরকারিকালে যে পদ ছিল সরকারিকরণের পর সে পদ সৃষ্ট পদ হিসেবে যুক্ত হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সব কলেজে সৃষ্ট পদের সংখ্যা ডিগ্রি পর্যায়ের ছিল। পরবর্তীকালে সরকারিকরণের পর অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু করা হলে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের প্রয়োজন অনুপাতে পদ সৃষ্টি করা হয় নি। ফলে শিক্ষকসংকট এ প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়ী সমস্যা হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জাতীয়করণকৃত বেশকিছু উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজে এমন সৃষ্ট পদ রয়েছে যে পদের প্রয়োজন এখন আর সে কলেজে নেই। কিন্তু সে সৃষ্ট পদটি প্রয়োজন আছে এমন কলেজে স্থানান্তর করা হচ্ছে না। অবস্থাটি এরকম। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে কোন একটি বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপকের পদ আছে এবং সে পদে কর্মরত শিক্ষকও আছেন। অপরদিকে পাশের অনার্স কলেজে সে বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপকের কোন সৃষ্ট পদ নেই। এ সব ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় সৃষ্ট পদের সমন্বয় দরকার।

কোন কোন সরকারি কলেজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থী না থাকলেও ঐ বিষয়ের একাধিক শিক্ষক কর্মরত দেখা গেছে। নিচে এমন সমন্বয়হীনতার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। নেত্রকোণা সরকারি কলেজে ইতিহাস বিভাগে অনার্স-মাস্টার্স নেই। ডিগ্রি ও উচ্চ মাধ্যমিকে বর্তমানে ইতিহাসের ছাত্র মাত্র ৬ জন। ইতিহাস বিভাগে সৃষ্টপদ ৫টি। সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী আধ্যাপক, প্রভাষক কর্মরত রয়েছেন। ৬ জন ছাত্রের জন্য ৫ জন শিক্ষক অন্যদিকে কুড়িগ্রামের ৬৫০ ছাত্রের জন্য ৫জন শিক্ষক কর্মরত। মনিটরিং না থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় পদায়নে সরকারি অর্থের বিশাল অপচয় হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পদায়ন সমন্বয় করে সরকারি অর্থের বিপুল অপচয় রোধের পাশাপাশি বর্তমান সংকট অনেকাংশে লাঘব করার সুযোগ রয়েছে।

৪. প্রয়োজনীয় ক্লাশ না হওয়া

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহে সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় ক্লাশ পায় না।

প্রতি শিক্ষাবর্ষে ৫২দিনের সাপ্তাহিক ছুটি ও অন্যান্য সরকারি ছুটি সব মিলে ১৫০ দিন ক্লাশ বন্ধ থাকলেও প্রতি শিক্ষাবর্ষে ২০০ দিন ক্লাশ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু গত শিক্ষাবর্ষে ৪৮টি বৃহত্তর স্নাতকোত্তর কলেজে গড়ে মাত্র ১০৫ দিন ক্লাশ হয়েছে। যে ৪৮টি কলেজে সরেজমিন অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সে সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অভিমত এরকম যে, কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে যতটা আগ্রহী, শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্লাশ নিশ্চিত করার বিষয়ে ততটা তৎপর নয়।

৫. শ্রেণীকক্ষের তীব্র সংকট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ১০২টি অনার্স-মাস্টার্স কলেজের তীব্র অবকাঠামো সংকটের মধ্যে শ্রেণীকক্ষ সমস্যাটি চরম আকার ধারণ করেছে। স্নাতকোত্তর কলেজে প্রতি বিভাগে অনার্স, প্রিলিমিনারি, মাস্টার্স মিলিয়ে ৬টি বর্ষের ক্লাশ থাকে। ডিগ্রি ও উচ্চ মাধ্যমিক থাকলে ক্লাশের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০এ। এতে সেখানে প্রতি বিভাগের জন্যে গড়ে ৬-৮টি শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজন। তাছাড়া নন মেজর বিষয়সমূহের ক্লাশের জন্যও দরকার আলাদা কক্ষ। কিন্তু স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের তীব্র সংকট রয়েছে। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে প্রতি বিভাগের জন্য যেখানে ৬-৭টি শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজন সেখানে সে সব কলেজে গড়ে ৩টি করে শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাও নেই। অনার্স কোর্স ৪ বছরের হওয়ায় এ সংকট আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

দেশের বৃহত্তর কয়েকটি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ও শ্রেণীকক্ষ সংখ্যা :

কলেজের নাম	মোট শিক্ষার্থী	ক্লাশ ও ক্লাশরুম				
		অনার্স বিষয়	মাস্টার্স বিষয়	প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ (প্রতি বিভাগের জন্য ৫টি হিসাবে)	বর্তমান শ্রেণীকক্ষ	ঘাটতি
জগন্নাথ কলেজ , ঢাকা	৩৩০০০	২০	২০	১০০	৩৮	৬২
ঢাকা কলেজ, ঢাকা	১০৮৪৭	১৭টি	১৯টি	৬৭	৩৩	৩৪
তিতুমীর কলেজ, ঢাকা	১১০৫৭	১৪	৭টি	৫২	৪৪	৮
বি এল কলেজ, খুলনা	২০১৫১	১৪	১৫	৭৫	৪৮	২৭
মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর	১১০০০	১৫	১৬	৭৮	৫৫	২৩
এম সি কলেজ, সিলেট	৫১৮৯	১১টি	১২	৬০	৪৪	১৬
আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ	১৮০০০	১৮	১৮	৯০	৩৮	৫২
বি এম কলেজ, বরিশাল	৮৬০৭	১৭	১৯	৯০	৬৬	২৪
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	১৫১২০	১৪	১৫	৭৫	৬৪	১১
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	১৫৯৭৫	১৯	২১	৯০	৫০	৪০
এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা	১১৪৮৭	১৫	১৫	৭৯	৬৬	১৩
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা	১২০০০	১৮	১৭	৯৪	৬০	৩৪
আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া	১৪৩৭৩	১৮	১৮	৯৬	৪৫	২৪
সাদত কলেজ, টাঙ্গাইল	৬৭৫৩	১৪	১৩	৬০	১৯	৪১

৬. অকার্যকর লাইব্রেরিগুলোর শোচনীয় হাল

গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক অঙ্গ। দেশের বিভাগ পর্যায়ের কলেজসহ অপরাপর জেলা পর্যায়ের ৫১টি স্নাতকোত্তর সরকারি কলেজে গ্রন্থাগারিকের পদ থাকলে ও গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কোন কলেজে লাইব্রেরিয়ানের শূন্যপদে কোন নিয়োগ হয় নি। ফলে লাইব্রেরিগুলোর ব্যবস্থাপনায় মৌলিক ত্রুটিই কেবল নয় লাইব্রেরিগুলো নামে মাত্র চলছে। অনেক গ্রন্থাগার মূলত একেকটি গুহায় পরিণত হয়ে আছে। পাঠকক্ষই একটি গ্রন্থাগারের প্রাণ। কিন্তু কলেজ লাইব্রেরিগুলোতে পাঠকক্ষের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

কয়েকটি বৃহত্তর শীর্ষ কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের চিত্র

কলেজের নাম	শিক্ষার্থী সংখ্যা	পাঠকক্ষে আসন সংখ্যা	লাইব্রেরীয়ান
সরকারি বি এল কলেজ, খুলনা	২০১৫১	৪৮	পদ শূন্য
ইডেন গালর্স কলেজ, ঢাকা	১৪৮২১	১২০	পদ শূন্য
ঢাকা কলেজ, ঢাকা	১০৮৪৭	৩৬	পদ শূন্য
এম এম কলেজ, যশোর	১১০০০	৩০	পদ শূন্য
সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা	১১৪৮৭	২০	পদ শূন্য
সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা	১২০০০	৩০	পদ শূন্য
এম সি কলেজ, সিলেট	৫১৮৯	৩০	পদ শূন্য
আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ	১৮০০০	৪৫	পদ শূন্য
বি এম কলেজ, বরিশাল	৮৬০৭	৩৫	পদ শূন্য
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	১৫১২০	৫০	পদ শূন্য
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	১৫৯৭৫	৪০	পদ শূন্য
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম	১২০০০	৩৫	পদশূন্য

দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি প্রধান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজ সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের এই প্রধান স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জনবলের পরিসংখ্যানচিত্রে দৈন্য আরও প্রকট। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গ্রন্থাগারগুলোতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ কোন জনবল নেই। নেই বুক সর্টার,ক্যাটালগার। গ্রন্থাগারগুলো নামে মাত্র চলছে অনভিজ্ঞ মাস্টার রোল কর্মচারী দিয়ে। এ সব বেসরকারি মাস্টাররোল কর্মচারীরা লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা মাসে একবার একটি বই ইস্যু করে বাড়িতে নেবার সুযোগ পায়। দেশের স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের লাইব্রেরি কার্যক্রম বলতে মাসে শিক্ষার্থীদের বাসায় নেবার জন্য একটি বই ইস্যু করার মধ্যেই সীমিত। অধিকাংশ গ্রন্থাগারের বই আধুনিক ক্যাটালগিং পদ্ধতিতে সাজানো নয়। অনেক শিক্ষার্থী জানারই সুযোগ পায় না গ্রন্থাগারে কী কী বই আছে।

লক্ষণীয়, বৃহত্তর স্নাতকোত্তর সরকারি কলেজগুলোতে বেসরকারি খাতে সরকারি খাতের অর্থের ৪গুণ বেশী অর্থ আদায় ও ব্যয় করা হলেও লাইব্রেরিতে বই কেনায় প্রতিবছর বেসরকারি খাতে কোন বরাদ্দ রাখা হয় না।

৭. বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোর শোচনীয় হাল

তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব অভাবিত অগ্রগতির এ যুগে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন ও ব্যাপক সম্প্রসারণ দরকার। কিন্তু অবকাঠামো, শিক্ষক ও গবেষণা উপকরণের তীব্র সংকটে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল নিদারুণ অবস্থায় পৌছেছে।

ল্যাবিরেটরি হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষার মৌলিক অঙ্গ। দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি প্রধান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজ সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ স্নাতকোত্তর কলেজের বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোর নিদারুণ দৈন্য দশা। জরাজীর্ণ গবেষণাগারগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতির তীব্র সংকট রয়েছে। গবেষণাগারগুলোর প্রাত্যহিক ব্যয় মিটাবার অর্থ যোগান দিতে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বর্ধিত হারে অর্থ নিয়েও প্রয়োজন মিটাতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতার কথা বলে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন বিজ্ঞান শিক্ষকগণ। গ্যাস বিজ্ঞান গবেষণাগারের প্রধান উপকরণ। দেখা গেছে ল্যাবে প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ সুবিধা থাকলেও অনুমোদন বা অর্থাভাবে গ্যাস সংযোগ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ১০২টি অনার্স কলেজ ছাড়াও আরও যে ৪৬টি বেসরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স চালু রয়েছে সে কলেজসমূহের বিজ্ঞান গবেষণাগারের চিত্র আরো নাজুক। তথ্যপ্রযুক্তির অভাবিত অগ্রগতির এই যুগে বাংলাদেশের বৃহত্তর কলেজগুলোর জরাজীর্ণ বিজ্ঞান ল্যাবগুলোই আমাদের কলেজ পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার দৈন্যদশার প্রতীক।

৮. অকার্যকর সেমিনার

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ১০২টি সরকারি কলেজের অনার্স ও মাস্টার্স বিভাগসমূহে ৬০ ভাগ সেমিনার অকার্যকর। দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি প্রধান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজে সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে যে বাস্তব চিত্রটি পাওয়া গেছে তা হলো শীর্ষ কলেজগুলোর স্নাতকোত্তর বিভাগসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেমিনারের জন্য কোন কক্ষ বরাদ্দ নেই। বিভাগের কোন এক কোণে স্থাপিত সেমিনার বলতে একটি ছোট নামফলক, কয়েক আলমারি বই এবং দুএকটি দৈনিক পত্রিকা। সেমিনারের কোন লোকবল নেই। নামমাত্র একজন শিক্ষকের দায়িত্বে সেমিনার চলছে। প্রয়োজনীয় বই নেই। শিক্ষার্থীদের বসে পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় আসন ব্যবস্থা নেই। প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময় সেমিনার খাতে প্রতি ছাত্রের নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমান ফি আদায় করা হলেও সে টাকায় সেমিনার কার্যকর করা হয় না। ভর্তির সময় কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সেমিনার ফি গড়ে ৫০০ এবং বিজ্ঞান অনুষদে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা আদায় করা হলেও সে টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেমিনারে ব্যবহার করা হচ্ছে না। সেমিনার ফি দিয়ে বনভোজন, আপ্যায়ন, নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানের মতো আয়োজনগুলোর ব্যয় নির্বাহের মধ্যে সীমিত দেখা গেছে। প্রতি বছর সেমিনার ফি থেকে বই কেনা হয় না।

৯. বছর ঘুরে পরীক্ষায় একই রকম প্রশ্ন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহের অনার্স-মাস্টার্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে যে সনাতনীপন্থা অবলম্বন করছে সেটি আজকের প্রতিযোগিতার দিনে শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশের উপযোগী নয়। বর্তমান ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীকে পুরো সিলেবাস পড়তে হচ্ছে না কেবল দু তিন বছরের প্রশ্ন একত্র করে যোগ বিয়োগ করে তার পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো অনায়াসেই খুঁজে নিতে পারছে। দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি প্রধান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যে সব কলেজে সরেজমিন অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সে সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মতে, এই সনাতনী প্রশ্নপদ্ধতি বাজারের সস্তা গাইড ও কোচিং ব্যবসাকে নিদারুণভাবে উৎসাহিত করছে উপরন্তু মেধাহীন ফটোকপি জেনারেশন তৈরি হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষবিমুখ হয়ে পড়ছে। উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে বর্তমান প্রশ্নপদ্ধতি অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। কলেজ পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মেধাবী শিক্ষার্থীরাও মনে করে পরীক্ষায় বছর ঘুরে একই রকম প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের শ্রমবিমুখ, পাঠবিমুখ ও শ্রেণীকক্ষবিমুখ এবং সর্বোপরি মেধাহীন করে তুলছে।

প্রশ্নপত্র এমন হওয়া দরকার এমন যেখানে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি বুঝে নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে তার উত্তর লিখবে। অথচ যে ধরনের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি বই বা প্রচলিত গাইড বই থেকে লিখে দেওয়া যায় সে রকম প্রশ্ন দিয়ে বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

১০. শিক্ষকদের দক্ষতা ও মনোনিবেশ সঙ্কট

কলেজ পর্যায়ে মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ও কমিটেড শিক্ষকের স্বল্পতাও একটি প্রধান সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগবঞ্চিত অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরা কলেজে উচ্চ শিক্ষা নিতে আসে। ফলে এসব অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে প্রচুর মেধাবী দক্ষ ও কমিটেড শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মেধাবী শিক্ষক গড়ে তোলার সুযোগ সীমিত। তাছাড়া শিক্ষকতাকে নিছক চাকুরি হিসাবে নেবার প্রবণতা আশঙ্কাজনকহারে বাড়ছে ফলে শিক্ষক গড়ে উঠছে না এবং শিক্ষাঙ্গনে মনোনিবেশ তৈরি হচ্ছে না। দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি প্রধান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যে সব কলেজে সরেজমিন অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সে সব প্রতিষ্ঠানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৮৫% শিক্ষক কোন গবেষণার সাথে যুক্ত নন। পরিস্থিতির নিরিখে আজ এমনটিও মনে করা হচ্ছে যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদানকারী সরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরির পদোন্নতি নিছক বয়সভিত্তিক থাকায় জাতি যথোপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাচ্ছে না। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদানকারী সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে গবেষণার শর্ত যুক্ত করার পক্ষে মত দিয়েছেন নুতন প্রজন্মের শিক্ষকগণ। অত্যুচ্চ প্রতিযোগিতার বিশ্বে মেধার কোন বিকল্প যেখানে নেই সেখানে শিক্ষকদের মেধার অনুশীলন করা অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এর সুযোগ নেই। তাছাড়া ভয়াবহ টিউশনি প্রবণতা তো রয়েছেই। সরকারি কলেজ শিক্ষকগণের অনেকেই গোটা চাকুরীজীবনে একটি মাত্র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়েই পদোন্নতি পেয়েছেন এবং চাকুরীকাল শেষ করেছেন। এমন ব্যবস্থা উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন বা যোগ্য শিক্ষক তৈরির পক্ষে ইতিবাচক নয়।

১১. ব্যাপক সংখ্যক প্রাইভেট টিউশনি প্রবণ শিক্ষক

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজ শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি প্রবণতা উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পীড়াদায়ক প্রতিবন্ধক। টিউশনি প্রবণতা অনৈতিক এবং উচ্চ শিক্ষার আদর্শ পরিপন্থী। দেশের শীর্ষ কলেজ সমূহের শিক্ষাপরিবেশ সরেজমিন জরিপ করে ভয়ানক বাস্তবতার প্রমাণ মিলেছে।

দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি প্রধান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যে সব কলেজে সরেজমিন অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সে সব প্রতিষ্ঠানের, মানবিক শাখার ২০%, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ৪৫%, বাণিজ্য অনুষদের ৬৫%, বিজ্ঞান অনুষদের ৮৫% শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং ব্যবসার সাথে যুক্ত।

টিউশনি প্রবণতা এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে একাধিক স্নাতকোত্তর কলেজে শিক্ষকদের কলেজ ক্যাম্পাসেই প্রাইভেট টিউশনি করতে দেখা গেছে। যে প্রাইভেট নির্ভরতা শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষবিমুখ করে তুলছে, মেধার বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষক সমাজকে সেই অবক্ষয়ের পথ থেকে ফিরিয়ে আনা দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

১২. আবশ্যিক ইংরেজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল অকৃতকার্য শিক্ষার্থী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সিলেবাসে সব অনুষদ বা বিভাগের শিক্ষার্থীর জন্য ১০০ নম্বরের ইংরেজি আবশ্যিক যেখানে পাশ নম্বর ৩৩ এবং ৩৩ এর উপর পাওয়া নম্বরের সর্বোচ্চ ১০ নম্বর টোটাল নম্বরের সাথে ক্রেডিট নম্বর হিসাবে যুক্ত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি প্রধান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজে সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে ইংরেজি আবশ্যিকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর অকৃতকার্য হবার কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর অকার্যকর ক্লাশ;

২. প্রয়োজনীয় ক্লাশ না হওয়া;

৩. প্রবল শিক্ষক সংকট;

৪. প্রাইভেট কোচিং নির্ভরতা;

৫. প্রবল ইংরেজি শিক্ষক সংকট।

১৩. মেধা অর্জন,মেধার মূল্যায়ন ও উচ্চ ডিগ্রি লাভের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উৎসাহের অভাব

সরকারি কলেজ পর্যায়ে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা নেই। যেখানে উচ্চ শিক্ষায় মেধাবী শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে সে পর্যায়ে বিদ্যমান মেধাবীদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। এ অবহেলাটি শুরু হয় নিয়োগদানের পর প্রথম পোস্টিং দেওয়া থেকে। পিএসসি মেধাতালিকা অনুযায়ী মন্ত্রণালয় যখন শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের নিয়োগ দেয় তখন মেধার ভিত্তিতে পোষ্টিং দেয়া হয়না। দেখা যায় মেধা তালিকার শীর্ষে যিনি রয়েছেন তাকে পোস্টিং দেয়া হয় দেশের সীমান্তবর্তী কোন কলেজে যেখানে হয়ত অনার্স-মাস্টার্স নেই আর মেধাতালিকার পেছনের দিকের প্রার্থীরা অবলীলায় দেশের শীর্ষ কলেজগুলোতে পোস্টিং পান। এ অবস্থায় মেধার মূল্যায়ন না হওয়ায় হতাশা নিয়েই মেধাবীদের যাত্রা শুরু হয়। শিক্ষকতায় মেধার উন্নয়ন ঘটাতে যারা উচ্চতর ডিগ্রি করতে আগ্রহী হন সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন উৎসাহ পাওয়া যায় না বলে তাঁরা জানিয়েছেন। উপরন্তু উচ্চতর শিক্ষা লাভের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় নানা হয়রানির শিকার হতে হয় বলে অনেকেই সুস্পষ্ট অভিযোগ করেছেন। জাতীয়ভাবে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে অবশ্যই মেধাবী শিক্ষক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

১৪. ছাত্র-শিক্ষক সর্ম্পক সংকট

উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সর্ম্পক উন্নত করার কোন সুযোগ নেই। শিক্ষার্থীদের জীবনবোধ, দেশপ্রেমসহ অপরাপর মানবিক গুণাবলি সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবার জন্য কোন পক্ষ থেকেই কোন রকম 'মোটিভেশন ওয়ার্ক' করা হয় না। নম্বর প্রাপ্তিই শিক্ষার্থীদের একমাত্র সাধনা। শিক্ষকদের জীবনাচরণকে আদর্শ ভাবতে পারছে না বরং অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকের যত্ন ও মনোযোগ কেনা যাচ্ছে– এটি দেখেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে তারা। সহশিক্ষা কার্যক্রম ছাত্র-শিক্ষক সর্ম্পক উন্নয়নের ক্ষেত্র হতে পারে। কিন্তু

কলেজগুলোতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের কোন গুরুত্ব নেই। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম খাতে বিপুল পরিমান বেসরকারি ফি আদায় করা হলেও নিয়মিতভাবে বাংলা ইংরেজি বিতর্ক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাট্যানুষ্ঠান, ইনডোর-আউটডোর গেম ইত্যাদি সহশিক্ষাকার্যক্রম অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকারি কলেজগুলো তেমন আগ্রহী বলে দেখা যায় না। অধিকাংশ কলেজে অডিটরিয়াম থাকলেও তা দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত। এসব পরিত্যক্ত অডিটরিয়াম সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই। কিছু কলেজে নতুন অডিটরিয়াম নির্মিত হলেও সেগুলোর ব্যবহার নেই। ক্লাশের ফাঁকে বা বিকালে Student counselling চালু করে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা যায়। এতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন হবে এবং শিক্ষার্থীও উপকৃত হবে।

১৫. নতুন সিলেবাস সংকট

মাঠপর্যায়ে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অনেকের মতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রনীত নুতন সিলেবাসের সাথে বাস্তব অবস্থার মিল নেই। নতুন সিলেবাস বাস্তবায়নের জন্য কলেজগুলোকে প্রস্তুত করা হয় নি। দেশের ৬টি বিভাগের ৪৮টি প্রধান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজ সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, নতুন কোর্স নিয়ে খোদ শিক্ষকরাই অনেক ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার শিকার বলে জানালেন। চালুর আগে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয় নি।

অবকাঠামোগত সংকট, বইসংকট তো রয়েছেই তদুপরি পীড়াদায়ক বিষয় হলো আবশ্যিক ননমেজর বিষয় পড়ানোর কোন শিক্ষক অনেক কলেজে নেই। ঐসব বিষয়ের শিক্ষকের সৃষ্ট পদ সেসব কলেজে নেই। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীর জন্য ননমেজর সমাজকল্যাণ ও সমাজবিজ্ঞান ননমেজর আবশ্যিক করা হয়েছে । এমন ২৮টি কলেজে সমাজ বিজ্ঞান বা সমাজকল্যাণের কোন সৃষ্টপদ না থাকায় শিক্ষক নেই ঐ কলেজগুলোর কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা আবশ্যিক ননমেজরের ক্লাশ নিয়ে বিপাকে পড়েছে।

১৬. ঢালাভাবে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু করে দিয়ে তদারকির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাসীনতা

সরকারি কলেজে অনার্স মাস্টার্স কোর্স চালুর বিষয়ে কোন বিশেষ নীতিমালা না থাকায় এক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকলেও দেশের সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের আগ্রহে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু করে আসছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যে সব শর্তে নতুন নতুন বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালুর অনুমোদন দেয় পরবর্তী একদশক পরেও কলেজগুলো সে শর্ত পুরণ করেছে কিনা তা অনুসন্ধান করে না। তা হলে এ শর্ত প্রদানের অর্থ কি তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কেননা শর্ত পূরণ করতে সংশ্লিষ্ট কলেজ ব্যর্থ হলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন নজির নেই। তাই শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে অনার্স-মাস্টার্স খোলার ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধতার বিষয়টি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

১৭. সরকারি মহিলা কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৈন্যদশা

বৃহত্তর জেলা বা বিভাগীয় শহরের সরকারি মহিলা কলেজে অনার্স-মাস্টার্স চালুর বিষয়ে যৌক্তিকতা থাকলেও প্রত্যন্ত জেলা পর্যায়ে শিক্ষক, অবকাঠামো ও চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় না এনে অনার্স -মাস্টার্স চালুর বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তীব্র অবকাঠামো সংকট, শিক্ষক সংকট ও শিক্ষার্থী সংকটের কবলে মহিলা কলেজগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে সরকারি মহিলা কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির দীন চিত্র

নাম	বাংলা	ইংরেজি	অর্থনীতি	ইতিহাস	উদ্ভিদবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	দর্শন
কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা	৫	৭	৫	০০	০০	০০	০
সরঃ মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া	০০	০১	০	০০			০৭
বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ	০০				০১		
মুমিনুন্নিসা সরঃমহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ	০৫	১৪	০৫	-	-	-	-

১৮. বেসরকারি খাতের আয়-ব্যয়ে ব্যাপক অনিয়ম

দেশের প্রধান সরকারি কলেজসমূহের আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যানে দেখা যায় সরকারি খাতের আয়-ব্যয়ের তুলনায় বেসরকারি খাতে আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কয়েকগুণ বেশি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহ সাধারণত যে সব খাতে বেসরকারি অর্থ সংগ্রহ করে তা প্রায় অভিন্ন। স্নাতকোত্তর কলেজসমূহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোন পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি ও পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় এসব বেসরকারি খাতে গড়ে ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা গ্রহণ করে থাকে। কলেজ কর্তৃপক্ষ দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সরকারি বেসরকারি আয়-ব্যয়ে ব্যপক পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। নিচের পরিসংখ্যান চিত্রে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

কয়েকটি শীর্ষ কলেজের ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের সরকারি ও বেসরকারি খাতের আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

প্রতিষ্ঠানের নাম	সরকারি খাতে আয়	সরকারি খাতে ব্যয়	বেসরকারি খাতে আয়	বেসরকারি খাতে ব্যয়
চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ	১৯,০৮,৮৮৭	১৯,০৮,৮৮৭	১,২৭,২৭,০১২	৮১,১৮,১৯৮
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	১৬,৫০,৬৮৪	১৬,৫০,৬৮৪	১,০০.০২,২৯৮	১,০৬,৫৩,৭৫৬
জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা	১৭,৮৫,৩৪০	১৭,৮৫,৩৪০	১,৫৮,৯৪,৫৩১	১,৩২,৭৫,৮৩৭
সরকারি বি এল কলেজ, খুলনা	৩২,১৯,৫১০	৩২,১৯,৫১০	২,৯৬,২৫,৮০৭	২,৪৬,৫৩,৯২৪
আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ	২৩,৩২,৩৩৫	২৩,৩২,৩৩৫	২,১৪,৪৪৮২০	২,০৫,৪৮,৫৪০

এছাড়াও নিম্নোক্ত সংকটগুলো কলেজপর্যায়ে উচ্চ শিক্ষাকে চরমভাবে বিঘ্নিত করছে :

১৯. শিক্ষার্থীদের প্রবল আবাসন সংকট;

২০. অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের তীব্র আবাসন সংকট;

২১. অনার্স ও মাস্টার্স বিভাগগুলোতে তীব্র জনবল সংকট;

২২. জনবল সংকট ও সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণে দীর্ঘসূত্রিতা;

২৩. সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অভাব;

২৪. ক্যাম্পাসে চিকিৎসা কার্যক্রমের অভাব।

সুপারিশসমূহ

১. শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের প্রয়োজনে ক্লাশে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে 'নন কলেজিয়েট বিধি' কার্যকর করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

২. ক্লাশে অযৌক্তিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ শিক্ষার গুণগতমানের প্রশ্নে জরুরি হয়ে পড়েছে।

৩. প্রয়োজনীয় শিক্ষকপদ সৃষ্টি ও শূন্যপদ পূরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগদান করা প্রয়োজন।

৪. শিক্ষাবর্ষের প্রয়োজনীয় ক্লাশ অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিটি স্নাতকোত্তর কলেজে স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল নির্মাণ আবশ্যক।

৫. পরিত্যক্ত অডিটরিয়ামগুলো সংস্কার করে বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী করে পরীক্ষাহল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এতে ত্রিবিধ সুবিধা পাওয়া যাবে :

(ক) স্বতন্ত্র পরীক্ষাহলের সংকট মেটানো যাবে;

(খ) ক্লাশ বন্ধ রেখে পরীক্ষা চালাতে হবে না;

(গ) সীমিত সম্পদ ও ভৌত অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

৬. লাইব্রেরিগুলো কার্যকর করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে :-

(ক) দ্রুত লাইব্রেরিয়ান নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা;
(খ) প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা;
(গ) লাইব্রেরির জন্য নুতন বই সংগ্রহ করা;
(ঘ) লাইব্রেরিতে পুস্তক,জার্নাল নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
(ঙ) লাইব্রেরির পাঠকক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত আসনের ব্যবস্থা করা;
(চ) লাইব্রেরিতে পাঠাভ্যাস প্রবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ;
(ছ) শিক্ষকদের জন্য পাঠকক্ষে আলাদা আসন ব্যবস্থা করা;
(জ) লাইব্রেরিতে ফটোস্ট্যাট মেশিন ব্যবস্থা করা;
(ঝ) লাইব্রেরিতে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করা।

৭. ক্লাশ নিশ্চিত করতে শ্রেণীকক্ষ সংকট নিরসনে আলাদা একাডেমিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. বিভাগীয় সেমিনার কার্যকর করার ক্ষেত্রে নিমোক্ত উদ্যোগ নেওয়া দরকার–

(ক) সেমিনারের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা;
(খ) প্রতি শিক্ষাবর্ষে সেমিনার ফি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের রেফারেন্স বই ক্রয় করা;
(গ) সেমিনার সহকারী নিয়োগ দেয়া;
(ঙ) সেমিনারে প্রয়োজনীয় আসনের ব্যবস্থা করা;
(চ) প্রয়োজনীয় জার্নাল, পত্রপত্রিকা ও সাময়িকি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

৯. গতানুগতিক প্রশ্ন ও বছর ঘুরে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি পরিহার করে প্রশ্নপত্র প্রণয়নে নুতন পন্থা উদ্ভাবন এবং এ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান।

১০. পাঠ্যক্রম বা শিক্ষাক্রমে নিম্নোক্ত বিষয় যুক্ত করা দরকার :–

(ক) আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিষয়াদি পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করা;
(খ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয় এমন বিষয় যুক্ত করা;
(গ) দেশাত্ববোধ ও মানবতাবোধ জাগ্রত হয় এমন বিষয়াদি পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করা;
(ঘ) বিজ্ঞানমনষ্কতা সৃষ্টি, প্রগতিশীল মানসিকতার উন্মেষ ঘটে এমন বিষয় পাঠ্যসূচিতে যুক্ত করা;

১১. শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষা-উপকরণ সংকট নিরসনে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১২. জাতীয় প্রচার মাধ্যমে (রেডিও, টেলিভিশন) গাইডবই ও কোচিং ব্যবসার বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করা আবশ্যক।

১৩. শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে শিক্ষকদের দক্ষতা ও মনোনিবেশ সঙ্কট নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৪. স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষকদের গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত করতে প্রতিটি স্নাতকোত্তর কলেজে একটি করে রিসার্চ সেল বা সেন্টার গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১৫. পি এস সি মেধাতালিকা অনুযায়ী শিক্ষকদের পদায়ন করা প্রয়োজন।

১৬. রিসোর্স টিচার্স তালিকা করে তাদের আলাদা পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হলে সুফল পাওয়া যাবে।

১৭. মেধাবী ও উচ্চ ডিগ্রিধারীদের শীর্ষ স্নাতকোত্তর কলেজসমূহে পদায়ন নিশ্চিত করা।

১৮. শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সময়কাল ডেপুটেশন হিসাবে গণ্য করা।

১৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয় সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২০. বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোর উন্নয়ন সাধনের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২১. শিক্ষকগণের মেধা অর্জন ও উচ্চ ডিগ্রি লাভকে প্রশাসনিকভাবে উৎসাহিত করা হলে শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে বিষয়টি সহায়ক হবে।

২২. ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নে সময়োপযোগী সহশিক্ষা কার্যক্রম সক্রিয় করণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ দরকার।

২৩. নুতন সিলেবাসের বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২৪. শিক্ষা কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও সুপারভিশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন জরুরি হয়ে উঠেছে।

২৫. অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা শিক্ষা পরিবেশ উন্নয়নের স্বার্থে অতি জরুরি।

২৬. সরকারি কলেজে ঢালাও অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালুর প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা পুনর্বিবেচনা করা।

২৭. শিক্ষা পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষা প্রশাসন বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

২৮. Student Counselling ব্যবস্থা চালু করলে সুফল পাওয়া যাবে।

২৯. স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য Job Market অনুযায়ী পরামর্শ সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩০. বেসরকারি খাতের আয় ব্যয়ে অগ্রাধিকার, শিক্ষার্থীদের দাবি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা দরকার।

৩১. শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে বেসরকারি আয়ব্যয়ের ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩২. নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে উঠেছে।

৩৩. শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের অনার্স ও মাস্টার্স বিভাগগুলোতে অফিস সহকারীর পদ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

৩৪. ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়ে একটি বিধান করা দরকার।

৩৫. শিক্ষার্থীদের আবাসিক সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় হল নির্মাণ প্রয়োজন।

৩৬. আবশ্যিক ইংরেজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

৩৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও শরীরচর্চার জন্য পরিত্যক্ত জিমনেসিয়ামগুলোর উন্নয়ন ও নতুন জিমনেসিয়াম নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৩৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে চিকিৎসা কার্যক্রম চালু করা হলে সুফল পাওয়া যাবে।

৩৯. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন দিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা আবশ্যক।

মূল রচনা :
মোঃ আফজালুর রহমান

কলেজসমূহের নাম

১.	জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা	২৬.	খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, বয়রা, খুলনা
২.	চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম	২৭.	মুজিবুর রহমান সরকারি মহিলা কলেজ, বগুড়া
৩.	ঢাকা কলেজ, ঢাকা	২৮.	কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা
৪.	ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা	২৯.	মুমিনুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ
৫.	তিতুমীর সরকারি কলেজ, ঢাকা	৩০.	বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল
৬.	বি এল কলেজ, খুলনা	৩১.	মাদারগঞ্জ সরকারি কলেজ, জামালপুর
৭.	এম এম কলেজ, যশোর	৩২.	বক্সিগঞ্জ সরকারি কেয়ামত উল্লাহ কলেজ, বক্সিগঞ্জ
৮.	এম সি কলেজ, সিলেট	৩৩.	নেত্রকোণা সরকারি কলেজ, নেত্রকোণা
৯.	আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ	৩৪.	কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া
১০.	বি এম কলেজ, বরিশাল	৩৫.	ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, নড়াইল
১১.	কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	৩৬.	শরীয়তপুর সরকারি কলেজ, শরিয়তপুর
১২.	রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	৩৭.	লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা
১৩.	এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা	৩৮.	সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ,সুনামগঞ্জ
১৪.	ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা	৩৯.	তেজগাও কলেজ . ঢাকা
১৫.	সরকারি আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া	৪০.	গফরগাও সরকারি কলেজ
১৬.	সরকারি সাদত কলেজ, টাঙ্গাইল	৪১.	গৌরীপুর সরকারি কলেজ
১৭.	ভাওয়াল বদরে আলম, গাজীপুর	৪২.	নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ,নেত্রকোণা
১৮.	দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর	৪৩.	সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ
১৯.	গাইবান্ধা সরকারি কলেজ , গাইবান্ধা	৪৪.	সরকারি শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজ, মুক্তাগাছা
২০.	ব্রাহ্মনবাড়িয়া সরকারি কলেজ , ব্রাহ্মনবাড়িয়া	৪৫.	নরসিংদী সরকারি কলেজ,নরসিংদী
২১.	সরকারি কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ	৪৬.	সরকারি ইসলামিয়া কলেজ, সিরাজগঞ্জ
২২.	নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজ , লাকসাম	৪৭.	বাগেরহাট পিসি কলেজ,বাগেরহাট
২৩.	গুরুদয়াল সরকারি কলেজ,কিশোরগঞ্জ	৪৮.	শাজাদপুর সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ
২৪.	আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর		
২৫.	দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর		

সংযোজনী-১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	কলেজের শ্রেণী	মোট
০১।	মোট ডিগ্রি কলেজ	১২৩২
	ক) অনার্স কলেজ	১৫০
	খ) মাস্টার্স ১ম পর্ব কলেজ	৭৬
	গ) মাস্টার্স শেষ পর্ব কলেজ	৮৯
০২।	আইন কলেজ	৬৭
০৩।	শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (বি.এড) (এ ছাড়াও খুলনা এলাকায় ১টি কলেজে লাইব্রেরি সায়েন্সের সাথে বিএড পড়ানো হয়)	৬৮
০৪।	বি.পি.এড কলেজ	১৯
০৫।	বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ কলেজ	০২
০৬।	কম্পিউটার সায়েন্স ও বি বি এ (অনার্স) কলেজ কম্পিউটারঃ ঢাকা-৪০, রাজশাহী-০২,খুলনা-০১,চট্টগ্রাম-০২=৪৫ বিবিএঃ ঢাকা-৪০, খুলনা-০১, চট্টগ্রাম-০২=৪৩ (এ ছাড়াও ৬টি কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স ও ৬টি কলেজে বি বি এ পড়ানো হয়)	৬৪
০৭।	অর্ডন্যান্স সেন্টার এন্ড স্কুল (ওসি এন্ড এস) রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর।	০১
০৮।	সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ	০১
০৯।	বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী	০১
১০।	বাংলাদেশ নেভাল একাডেমী	০১
১১।	বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একাডেমী	০১
১২।	মেরিন একাডেমী	০১
১৩।	মেরিন ফিসারিজ একাডেমী	০১
১৪।	আর্ট কলেজ	০৬
১৫।	গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	০১
১৬।	সংগীত কলেজ	০২
১৭।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এ ছাড়াও একটি ইনস্টিটিউট-এ এম.বি.এম পড়ানো হয়)	০১
১৮।	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কলেজ (ডিপ্লোমা)	১০
১৯।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০১
২০।	প্রেস ইনস্টিটিউট	০১
২১।	গার্মেন্টস এন্ড ম্যানুফেকচারিং কলেজ	০১
সর্বমোট:		১৪৮২

সংযোজনী-২

কলেজ ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও সমাধান : কলেজ গভর্নিং বডির সদস্যদের মতামত

ক) প্রশাসনিক সমস্যা

১. কলেজ ব্যবস্থাপনায় অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই।
২. কলেজ পরিচালনা কমিটি আমলাতন্ত্রের ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে শিক্ষার স্বার্থ ও কলেজ উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়।
৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দুর্নীতি ও অসৎ আচরণের কারণে কলেজ উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হয়।
৪. অধ্যক্ষ কলেজ পরিচালনায় পর্যাপ্ত সময় দিতে আগ্রহী নন।
৫. গভর্নিং বডির সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষকদের যোগাযোগের অভাব।
৬. গভর্নিং বডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর অন্তবর্তীকালীন কমিটি গঠন সম্পর্কে বিধিতে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই।
৭. উন্নয়নমূলক কাজে গভর্নিং বডির সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয় না।
৮. কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে অধ্যক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা।
৯. কলেজের সভাপতি হিসাবে সংসদ সদস্য কলেজ উন্নয়নমূলক কাজে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য মোটেই সময় দিতে পারেন না।
১০. নির্ধারিত অশিক্ষিত গভর্নিং বডির সদস্যগণকে অধ্যক্ষ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন।
১১. কলেজ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা বিভাগের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকায় গুরুত্ব অনুসারে কাজ করা সম্ভব হয় না।
১২. প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কলেজ পরিচালনা করতে চান।
১৩. অধিকাংশ কলেজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ানের অভাব।
১৪. অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির সদস্যদের মধ্যে সমঝোতার অভাব।
১৫. অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের মধ্যে সমঝোতার অভাব।
১৬. অধ্যক্ষ শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি করেন এবং দলসৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন।
১৭. কলেজ নবায়ন ও গভর্নিং বডি অনুমোদনের ক্ষেত্রে অনিয়ম।
১৮. গভর্নিং বডির কিছু কিছু সদস্য অধ্যক্ষের সাথে আঁতাত করে কলেজের সম্পদ আত্মসাৎ করে।
১৯. গভর্নিং বডিতে অভিভাবক প্রতিনিধির স্বল্পতা।
২০. কলেজ সম্পদ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থার অভাব।
২১. নথিপত্র বেশির ভাগ কলেজে ঠিকমত সংরক্ষিত হয় না।
২২. কলেজ নিয়োগবিধিতে অস্পষ্টতার দরুন অনেক ক্ষেত্রে ডোনেশন ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।
২৩. ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মে গভর্নিং বডির সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয় না বা কোন তথ্য জানানো হয় না।
২৪. শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঠিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব।
২৫. নিয়মিত গভর্নিং বডির সভা না হওয়ায় জিবি সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারছেন না।
২৬. একই ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন।
২৭. কলেজ ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতার অভাব।
২৮. অবৈধ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ।

খ) আর্থিক সমস্যা

১. সরকারি অনুদান অপ্রতুল এবং অসম।
২. হিসাবাদি এবং ক্যাশ বই হালনাগাদ সম্পন্ন না করা।
৩. অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষদের অধিক ব্যয়ের প্রবণতা।
৪. কলেজের হিসাবনিকাশের অনিয়ম।
৫. সরকারি অডিট নিয়মিত না হওয়া।
৬. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার অভাব।
৭. বিনা রশিদে টাকা আদায় করে আত্মসাৎ করার প্রবণতা।
৮. কলেজের আপদকালীন অর্থ চুরি হওয়া।
৯. ভর্তি ফরম বিক্রি করে অর্থ ভাগাভাগি করা।
১০. ফল্‌স ভাউচার তৈরি করে অর্থ আত্মসাৎ করা।

গ) অবকাঠামোগত সমস্যা

১. প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরির অভাব।
২. অধিকাংশ কলেজেই অধ্যক্ষের থাকার ব্যবস্থা নেই।
৩. ছাত্রীদের থাকার কোন ছাত্রীনিবাস নেই।
৪. অনেক কলেজেই বাউন্ডারি ওয়াল নেই।
৫. অনেক কলেজেই খেলাধুলার মাঠ নেই, বিশেষ করে মহিলা কলেজগুলোতে।

ঘ) একাডেমিক সমস্যা

১. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষকমণ্ডলীর প্রশিক্ষণের অভাব।
২. যোগ্য ইংরেজি শিক্ষকের অভাব।
৩. বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাব।
৪. কলেজ গভর্নিং বডির সদস্যদের কলেজ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের অভাব।
৫. কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের অভাব।
৬. কম্পিউটারের অভাব।
৭. গ্রন্থাগারে বইপত্র/ম্যাগাজিন/পত্র পত্রিকার অভাব।
৮. শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানাগারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব।
৯. খেলাধুলার মাঠের ও সরঞ্জামাদির অভাব।
১০. প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব।
১১. শিক্ষকগণের অনেকেই সময়মতো কলেজে আসা প্রয়োজন মনে করে না।
১২. পাঠদানে অনেক শিক্ষক আন্তরিক নন।
১৩. শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনে শিক্ষকগণকে কলেজে পান না।
১৪. অধিকাংশ শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা নেই।
১৫. শিক্ষকগণের অনেকেই কলেজের চাকুরিটা লেবেল হিসাবে ব্যবহার করে টিউশনির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে নিয়োজিত।
১৬. শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে অধিকাংশ শিক্ষক নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন না।
১৭. জাতীয় শিক্ষানীতি না থাকায় পুরো শিক্ষাঙ্গনে দিকনির্দেশনার অভাব।
১৮. বর্তমান স্টাফিং প্যাটার্ন শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের বাধাস্বরূপ।
১৯. উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠদান গ্রহণে উপযোগী শিক্ষার্থীর অভাব।
২০. পরীক্ষায় কলেজিয়েট ও নন কলেজিয়েট মার্কিং না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা কলেজে উপস্থিত থাকেন না।
২১. শিক্ষকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।
২২. কলেজে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

২৩. বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের শ্রেণী উত্তরণ করা ।
২৪. লম্বা ছুটি এবং পরীক্ষার জন্য শ্রেণীকক্ষে পাঠদান বন্ধ থাকা।
২৫. টিউটোরিয়াল ক্লাস না হওয়া।
২৬. টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া।
২৭. ছুটিকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের হোমটাস্ক (বাড়ির কাজ) না দেওয়া।
২৮. শিক্ষার্থীদের প্রগ্রেস রিপোর্টের ব্যবস্থা না থাকা।
২৯. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ কর্তৃক শ্রেণীকক্ষের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিংয়ের অনুপস্থিতি।

ঙ) পরীক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা

১. ধারাবাহিক মূল্যায়নের অভাব।
২. প্রশ্নপত্র প্রণেতাদের আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জ্ঞানের অভাব।
৩. বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতি গতানুগতিক ও মামুলি ধরণের।
৪. পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সকল স্তরের জনগণের অবক্ষয়।
৫. দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চলতে থাকায় সময় ও অর্থের অপচয়।
৬. পরীক্ষার উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানে শিক্ষকগণ সৎ ও আন্তরিক নন।
৭. ব্যবহারিক পরীক্ষায় অযোগ্য শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রদান।
৮. অনেক ক্ষেত্রে নামে মাত্র ব্যবহারিক কাজ করানো হয়।
৯. পরীক্ষা ছাড়া ব্যবহারিক বিষয়ে নম্বর প্রদান করা হয়।
১০. ব্যবহারিক কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনীহা।
১১. অনেক সময় ব্যবহারিক পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করা।
১২. অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষকদিগকে ভয় দেখিয়ে ব্যবহারিক বিষয়ে বেশি নম্বর আদায় করে থাকে।
১৩. অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর দেবার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করা হয়।

চ) সামাজিক সমস্যা

১. অনেক শিক্ষক নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতে জড়িয়ে যায় এবং দল সৃষ্টি করে কলেজের শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটায়।
২. ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ক আন্তরিক নয়।
৩. অভিভাবকদিগকে শিক্ষাঙ্গনের বাস্তব দৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয় না।
৪. অনেক অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ রাজনীতিবিদদের সাথে জড়িয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন এবং শিক্ষকমণ্ডলীকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মুখে রাখেন।
৫. অনেক শিক্ষক লেজুড়বৃত্তি রাজনীতির মাধ্যমে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষকে তোপের মুখে রাখেন এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটান।
৬. কলেজগুলোতে নৈতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের কোন অনুশীলন না থাকা।
৭. অনেক ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/শিক্ষকমণ্ডলীর নৈতিক অবক্ষয় দেখা যায়।
৮. ছাত্রদের লেজুড়বৃত্তি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া।
৯. শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ও দলীয় রাজনীতির প্রভাব।
১০. স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কলেজকে এক্সপ্লয়েট করার মনোবৃত্তি।
১১. প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের কলেজ উন্নয়নে সহযোগিতার মনোভাব না থাকা।
১২. স্থানীয় মাস্তানরা শিক্ষক ও ছাত্রদের সহযোগিতায় কলেজে বিশৃঙ্খলা ঘটায়।
১৩. রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্য উন্নয়নের কাজে গভর্নিং বডির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ও দলাদলি।
১৪. মেয়েদের যাতায়াত পথে মাস্তানদের উৎপাত।

১৫. শিক্ষকদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও আস্থার অভাব।
১৬. বিধিবহির্ভূতভাবে কাছাকাছি কলেজ গড়ে উঠায় অহেতুক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি।
১৭. অবৈধ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ।
১৮. অধ্যক্ষের দ্বৈত ভূমিকায় শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হয়।
১৯. গভর্নিং বডির সদস্যদের সাথে অধ্যক্ষের অসহযোগিতার মনোভাব।
২০. রাজনৈতিক ছত্রছায়ার কারণে সন্ত্রাসী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

সংযোজনী-৩

সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত সুপারিশ

ক) প্রশাসনিক সমস্যা

১. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা।
২. কলেজ পরিচালনা কমিটিকে আমলাতন্ত্রের ও প্রভাবশালীদের ছত্রছায়া থেকে মুক্ত রাখা।
৩. মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড দুর্নীতি বন্ধের জন্য দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. গভর্নিং বডির সদস্যগণ কর্তৃক অধ্যক্ষের কাজ তদারকিকরণ এবং অধ্যক্ষগণের কলেজ ক্যাম্পাসে বসবাসের আবাসিক ব্যবস্থা করা।
৫. প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর গভর্নিং বডির সদস্যগণের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।
৬. অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন সম্পর্কিত বিধিমালাতে সুনির্ধারিত নির্দেশ রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৭. উন্নয়নমূলক কাজে গভর্নিং বডির সদস্যদের সম্পৃক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নির্দেশ প্রদান করা।
৮. বিধি মোতাবেক শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করা।
৯. নির্বাচনের মাধ্যমে কলেজ সভাপতি নির্বাচিত করা।
১০. কলেজ গভর্নিং বডির দাতা ও অভিভাবক সদস্যদের ন্যূনপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া থাকা প্রয়োজন।
১১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এর অনুলিপি প্রত্যেক কলেজে সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া।
১২. গভর্নিং বডি সচেতন থেকে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষগণ সম্পর্কে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
১৩. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইব্রেরিয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
১৪. গভর্নিং বডির সদস্যগণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে আগ্রহী ভূমিকা পালনে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১৫. অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের লক্ষ্যে অধ্যক্ষগণকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা ।
১৬. কলেজের দলাদলি বন্ধের জন্য সভাপতি ও গভর্নিং বডির সদস্যদের মুখ্য ভূমিকা পালন করা।
১৭. শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাসময়ে কলেজ নবায়ন ও গভর্নিং বডির অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ডকে নির্দেশ প্রদান করার প্রয়োজন।
১৮. গভর্নিং বডির মধ্য থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট নিরপেক্ষ কমিটি কলেজের সম্পদ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর নিরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া।
১৯. গভর্নিং বডির মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্য অভিভাবক গ্রুপ থেকে নির্বাচিত করার জন্য সরকার কর্তৃক সার্কুলার জারি করা।
২০. নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য অফিস কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২১. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ন্যূনপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।
২২. কলেজ কমিটিতে সহ-সভাপতির পদ সৃষ্টি করা।

খ) আর্থিক সমস্যা

১. হিসাব নিকাশ হাল নাগাদ করার জন্য অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে তাদের তৎপর থাকা। গভর্নিং বডির সদস্যগণ কর্তৃক এগুলো তদারকির দায়িত্ব গ্রহণ করা।
২. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষদের অধিক ব্যয়ের প্রবণতা ও হিসাব নিকাশের অনিয়ম বন্ধ করার জন্য গভর্নিং বডির তিন সদস্য বিশিষ্ট অর্থসংক্রান্ত সাব-কমিটি গঠন করে তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান।
৩. সরকারি অডিট নিয়মিত করার ব্যবস্থা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

গ) অবকাঠামোগত সমস্যা

১. অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক অর্থ বরাদ্দ করার ব্যবস্থা নেওয়া।

ঘ) একাডেমিক

১. বিষয়ভিত্তিক ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক নিয়োগ করা।
২. নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে পাঠদান, নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও টিউটরিয়াল পরীক্ষা গ্রহণ করা।
৩. পর্যায়ক্রমে নিয়মিতভাবে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৪. ক্লাশে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির ব্যবস্থা করা।
৫. প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার ছাত্র/শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান করা।
৬. কলেজের লাইব্রেরি সমৃদ্ধ করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
৭. বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করা এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করা।
৮. শিক্ষকদের পাঠদান মূল্যায়ন করা এবং যোগ্য শিক্ষকদের দ্বারা পাঠ কর্মসূচি পরিচালনা করা।
৯. কলেজের সামগ্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিমাসে গভর্নিং বডিকে অধ্যক্ষ কর্তৃক অবহিত করা।
১০. কলেজের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন ও পাঠদান অধ্যক্ষ কর্তৃক মনিটরিং করা।
১১. অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের প্রশাসন ও কলেজ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া।
১২. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ প্রদান।
১৩. যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম চালুকরণ।
১৪. শিক্ষক/কর্মচারীদের এসিআর চালুকরণ ও মূল্যায়ন।
১৫. শিক্ষকগণের পাঠদানের পূর্বে প্রস্তুতি, নিয়ম শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব সম্পাদনে সচেষ্ট রাখার ব্যবস্থা করা
১৬. ভর্তিপরীক্ষা, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সুষ্ঠু মূল্যায়ন ও সহপাঠক্রমিক কার্যাদি পরিচালনা।

ঙ) পরীক্ষাসংক্রান্ত

১. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।
২. শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়মিত হাজিরা এবং পাঠদান নিশ্চিতকরণ।
৩. সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান সমাপ্ত করার পর প্রতি অধ্যায় শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মনিটরিং করা।
৪. অভিভাবক সভা করে সকলের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা এবং নকল প্রতিরোধে উৎসাহিত করা।
৫. সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষায় (নকলমুক্ত) ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা।
৬. পরীক্ষা চলাকালে জি.বি. সদস্যদের তদারকির ব্যবস্থা রাখা।
৭. নকল প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা।
৮. নকল প্রতিরোধে শিক্ষকদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা।
৯. নকলের কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

১০. গভর্নিং বডির সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য সৎ ব্যক্তিগণকে নিয়ে নকল প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে কেন্দ্রের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১১. কক্ষ পরিদর্শক অন্যান্য কর্মচারী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

১২. নকল প্রতিরোধকারীগণকে নিরাপত্তা প্রদান।

১৩. শিক্ষার্থীগণকে ভর্তির শুরু থেকে প্রতি বিষয়ে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তোলা।

১৪. পরিদর্শকগণকে সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ করে তোলা।

১৫. পাঠদানের উপর জবাবদিহিতা সৃষ্টি করা।

১৬. পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা।

১৭. মেধাভিত্তিক বৃত্তিপ্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

১৮. পরীক্ষাকেন্দ্রে স্থানীয় প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

১৯. পরীক্ষা চলাকালে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা নিশ্চিত করা।

২০. সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষসহ বিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ।

২১. কলেজে প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করা।

২২. নকলে সহায়তাকারী শিক্ষকের শাস্তিবিধান করা এবং নকল প্রতিরোধকারীকে পুরস্কার দেয়া।

২৩. স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করে পরীক্ষাগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা।

২৪. পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পর বিষয় শিক্ষকগণের মূল্যায়ন।

২৫. কেন্দ্রের প্রাচীরবেষ্টনী তৈরি করা।

২৬. শিক্ষকগণ কর্তৃক সপ্তাহে ২৪টি সেশন/ক্লাশ নেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

২৭. পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২৮. নকলের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ।

২৯. পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত বর্তমান আইনের কড়াকড়ি বাস্তবায়ন।

৩০. নকল প্রতিরোধের জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা।

৩১. যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ঐ কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের কোচিং করান সেই সমস্ত শিক্ষক.শিক্ষিকাদের ঐ কলেজের পরিদর্শক (পরীক্ষায়) নিয়োগ না করা।

৩২. আইন করে নকলের জন্য প্রস্তুত বিশেষ গাইড প্রকাশনা বন্ধ করা।

৩৩. শিক্ষক কর্মচারী নকলে সহায়তাকারী হিসাবে প্রমাণিত/নিশ্চিত হলে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা।

৩৪. কলেজ ভবন দোতলা হলে,.দোতলায় পরীক্ষা নেওয়া।

চ) সামাজিক

১. শিক্ষকদের নিয়োগপত্রে তারা রাজনীতির সাথে জড়িত হতে পারবেন না তা উল্লেখ থাকার ব্যবস্থা করা এবং জড়িত হলে শৃঙ্খলাবিরোধী কার্য বলে বিবেচিত করা।

২. ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক আন্তরিক করার জন্য অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির সদস্যগণ কর্তৃক সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

৩. কলেজে অভিভাবক দিবসের মাধ্যমে অভিভাবকগণকে কলেজের বাস্তবচিত্র বুঝিয়ে সচেতন করা।

৪. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষদের নিয়োগের সময় তারা রাজনীতির সাথে জড়িত হতে পারবেন না বলে তা লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া। এবং জড়িত হলে গভর্নিং বডির সদস্যগণ বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এমন বিধান থাকা।

৫. ছাত্রদের লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে রাজনীতিতে জড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া।

৬. প্রত্যেক কলেজে সকল ধর্মের অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা।

৭. স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যাতে কলেজকে বিভিন্নভাবে এক্সপ্লয়েট করতে না পারেন তার জন্য কলেজের গভনিং বডির সভাপতি, গভর্নিং বডির সদস্য এবং অধ্যক্ষকে সে ব্যাপারে সজাগ থাকা।

৮. গভর্নিং বডির সদস্যগণ এবং অধ্যক্ষ সম্মিলিতভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে কলেজের উন্নয়নে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা। মাস্তানদের সৎপথে এনে ভাল কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। উদ্বুদ্ধ না হলে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করা।

৯. কলেজের বৃহত্তর স্বার্থে গভর্নিং বডির সদস্যদের দলীয় মতবিরোধ পরিহার করা।

১০. কলেজের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা।

১১. প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে অবৈধ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ আইনের মাধ্যমে বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া।

১২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ আইনের মাধ্যমে বন্ধ করা।

১৩. অধ্যক্ষ দ্বৈতভূমিকার মাধ্যমে যাতে কোন্দল সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য গভর্নিং বডির সজাগ থাকা এবং সমঝোতার মাধ্যমে কোন্দল বন্ধ করা।

১৪. একজন সরকারি কর্মকর্তা একই সময়ে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়া।

উপসংহার

গভর্নিং বডির সদস্যগণ দ্বারা শনাক্তকৃত সমস্যাবলি এবং সুপারিশমালা অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক। অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষগণ যদি এ সমস্যাসমূহ এবং সুপারিশমালা পাঠ করেন এবং নিজ নিজ কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যদের সংগে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের প্রচেষ্টায় যতগুলো সমস্যার সমাধান সম্ভব তার সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তাহলে কলেজের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়া যে সব সমস্যা অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির সদস্যদের আওতার বাইরে সেগুলো সমাধানের জন্য যদি অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষগণ সম্মিলিতভাবে সচেষ্ট হন তাহলে কলেজের সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সংযোজনী-৪

উপাচার্য পদের জন্য সার্চ কমিটি

১. গঠন:

প্রস্তাবিত সার্চ কমিটির গঠন নিম্নরূপ হতে পারে–

(ক)	সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি অথবা তাঁর মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি	-	চেয়ারম্যান
(খ)	মাননীয় চ্যান্সেলরের মনোনীত তিনজন শিক্ষাবিদ	-	সদস্য
(গ)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ	-	সদস্য
(ঘ)	সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(ঙ)	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান	-	সদস্য

২. **সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম সংগ্রহের পদ্ধতি**

সার্চ কমিটি বিভিন্ন সূত্র থেকে নাম সংগ্রহ করতে পারবে। সম্ভাব্য বিভিন্ন সূত্র হতে পারে-সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, উপাচার্যদের সংস্থা এ-ইউ-বি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বি-ম-ক) প্রভৃতি। তবে শর্ত থাকে যে কোন্ সূত্র থেকে এবং কীভাবে সার্চ কমিটি নাম সংগ্রহ করবে তা সার্চ কমিটি-ই নির্ধারিত করবে।

৩. **নির্বাচন পদ্ধতি**

সার্চ কমিটি কী পদ্ধতিতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রণয়ন করবে তা কমিটি নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। সার্চ কমিটি তিনজন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করে মাননীয় চ্যান্সেলরের নিকটি তাদের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগদানের জন্য সুপারিশ করবে। সার্চ কমিটি অবশ্য তার কার্য-পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করবে। চ্যান্সেলর মহোদয় এই তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে উপাচার্য নিয়োগ করবেন।

৪. যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(ক) উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের জন্য কেবল ৬৫ বছর বয়সের অনূর্ধ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(খ) সার্চ কমিটির কোন সদস্য অথবা তার নিকটতম কোন আত্মীয় উপাচার্য পদের জন্য বিবেচিত হবেন না।

দ্বিতীয় অংশ : পেশাগত শিক্ষা

		পৃষ্ঠা
১.	কৃষি শিক্ষা	২০১-২১৩
২.	প্রকৌশল শিক্ষা	২১৪-২৩৫
৩.	চিকিৎসা শিক্ষা	২৩৬-২৬৯

কৃষি শিক্ষা

১. কৃষিশিক্ষার উদ্দেশ্য

কৃষি আদি কাল থেকে মানব জাতির খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ন্যায় মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করছে। মানব সভ্যতা বিকাশে কৃষির অবদান সর্বজনস্বীকৃত। কৃষিই বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে। সারা বিশ্বে প্রায় দু'তৃতীয়াংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবন ধারণের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। মানব জাতির দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নয়ন ও দ্রুত পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বে একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়। সুতরাং কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণগত এবং গুণগত মান বৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং ব্যবহারের বিকল্প নেই। বস্তুত কৃষিবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ব্যবহার নিশ্চিত করতে মেধাবী, দক্ষ ও উন্নতমানের কৃষিবিজ্ঞানে শিক্ষিত জনবল অপরিহার্য।

কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে দেশে কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ। বাংলাদেশের জিডিপিতে (GDP) ২০০১-২০০২ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কৃষির অবদান শতকরা ২৩.৯৯ ভাগ (শস্য ১৩.৭৫%, পশুসম্পদ ২.৯৬%, মৎস্যসম্পদ ৫.৪০% এবং বনজসম্পদ ১.৮৮%)। দেশের শ্রমশক্তির শতকরা ৬২ ভাগ পুরুষ ও ৫৫ ভাগ মহিলা কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত। খাদ্য ঘাটতি বাংলাদেশে একটি জাতীয় সমস্যা। অথচ স্বাধীনতাউত্তর গত প্রায় তিন দশক জুড়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বাড়িঘর ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮৬ হাজার হেক্টর আবাWD জমি হ্রাস পাচ্ছে। বিগত তিন দশকে জনসংখ্যা প্রায় ৭ (সাত) কোটি বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে খাদ্য ঘাটতি বাড়ে নি। আগামী ২০২০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১৬% ভাগ কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও দেশে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২০ কোটির কাছাকাছি। সুতরাং ২০২০ সাল নাগাদ এদেশে খাদ্যের প্রয়োজন হবে প্রায় ৪ কোটি টন। ক্রমহ্রাসকৃত জমি থেকেই ২০২০ সালের মধ্যে বর্তমানের তুলনায় প্রায় ১.৫ কোটি টন বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। জাতির অস্তিত্ব, অগ্রগতি ও উন্নয়নের স্বার্থে খাদ্য উৎপাদনের এ চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। জাতীয় পুষ্টিসমস্যা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে মৎস, পশুসম্পদ ও দুগ্ধজাত খাদ্য উৎপাদনের বর্ধিত হার এবং গুণগত মান উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যে মেধাবী, সুশিক্ষিত, দক্ষ, দায়িত্বশীল ও কর্মনিষ্ঠ জনবল। দেশের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে কৃষিসম্পর্কিত প্রাধিকারমূলক নিম্নলিখিত জাতীয় কর্মসূচি অপরিহার্যভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১.১ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

১.২ সার্বিক অর্থে সুষম খাদ্য (দানাদার শস্য, শাকসব্জি, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি) সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের পুষ্টিহীনতা দূর করা।

১.৩ উন্নতমানের কৃষিজ দ্রব্য (খাদ্যসহ) উৎপন্ন করে বিশ্ববাজারে খাদ্যসহ অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা।

১.৪ দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা, যাতে কৃষিজ দ্রব্যের যথাযথ ব্যবহার ও মূল্য নিশ্চিত হয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

১.৫ কৃষি উৎপাদনের কারণে যাতে জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট না হয় ও পরিবেশ দূষণ না ঘটে তা নিশ্চিত করা।

১.৬ সর্বোপরি, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা (National food security) ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে যে-কোন অবস্থাতেই দেশে খাদ্যাভাব না হয়।

উপরিবর্ণিত বিষয়াবলি বিবেচনা করে কৃষিতে সাফল্য অর্জনের জন্য কৃষিশিক্ষার গুণগত মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা জরুরি, যাতে দেশে বিশ্বমানের দক্ষ কৃষিবিদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং কৃষিশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে দেশে মানসম্পন্ন কৃষিবিদ তৈরি করা, যারা সার্বিকভাবে কৃষি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জাতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

২. কৃষি শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা

২.১ সামগ্রিক অর্থে শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদসহ মানবজাতির খাদ্য, ঔষধ ও জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্যভাবে ব্যবহৃত নানাবিধ বনজ ও জলজ সম্পদ কৃষির অন্তর্ভুক্ত। কৃষিবিজ্ঞান মূলত জীববিজ্ঞানের ফলিত শাখা, যা কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন (Production), সংরক্ষণ (Protection) এবং উন্নয়ন (Improvement)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কৃষিবিজ্ঞানের সাথে প্রাকৃতিক ও মৌল বিজ্ঞানের শাখাসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদ্ভাবিত কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের নিশ্চয়তা ও সাফল্য ব্যবহারকারী কৃষকদের নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত, যা সমাজবিজ্ঞানেরও বিষয়। কৃষির সাথে উৎপাদক (কৃষক), ভূমি ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষিজ দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (Agro-processing), কৃষিভিত্তিক শিল্প, বিপণন, বাণিজ্য, কৃষির উপকরণ (বীজ, সার, কীটনাশক, পানি ইত্যাদি) সরবরাহ এবং এসবের বাজার নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলো কৃষি অর্থনীতিরও আওতাভুক্ত। কৃষিকাজের সাথে পরিবেশ - প্রতিবেশের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। এসব বিবেচনায় কৃষি একটি জটিল বিজ্ঞান এবং এর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সাথে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তঃসম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য।

২.২ বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই একটি নতুন সম্ভাবনাময় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কৃষিবিজ্ঞানে এ উৎকর্ষের প্রভাব ও ব্যাপ্তি অত্যন্ত ব্যাপক। এসময়ে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি (High technology) যেমন-Bio-technology and Genetic Engineering, Molecular Techniques, Hybrid Development, GMOS, Tissue Culture, Embryo Culture ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্যের ফলন বা পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটানোসহ জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশের কর্মসংস্থানের অঙ্গীকার পূরণে কৃষিপ্রযুক্তি ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

২.৩ সাম্প্রতিক বিশ্বে কৃষিবিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে কৃষিকাজে ব্যবহৃত উপাদান ও উপকরণসমূহের শতকরা ৯৫ ভাগই উচ্চ মূল্যের ক্রয়খাতভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে সার্বিক বিবেচনায় কৃষির বাণিজ্য ও বাজারমুখী প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

২.৪ বিশ্বায়নের কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ বাজারমুখী কৃষিব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন কৃষি উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

২.৫ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত ও প্রথাগত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি (Traditional Production System) ভেঙ্গে গিয়ে প্রযুক্তিমুখী ও বাণিজ্যমুখী (Technological and Commercial) রূপান্তর পর্যায় অতিক্রম করছে। বর্তমান সময়ে এদেশে বাণিজ্যমুখী কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের অনিবার্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং সীমিত আকারে হলেও তা শুরু হয়েছে।

২.৬ কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত কৃষি কর্মী, কলাকুশলী ও উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানীদের বিদেশে কাজ করার মতো যোগ্য করে গড়ে তোলা সম্ভব হলে বিদেশেও এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্যে শস্য, পশুসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ বিষয়ে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং ভূমি, পানি ও বনজ সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন আবশ্যক।

২.৭ নতুন বিশ্বব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উন্নয়নে কৃষির অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টিতে তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত মেধাবী, দক্ষ, উঁচুমানসম্পন্ন, সুশিক্ষিত ও নিষ্ঠাবান কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত জনবল অপরিহার্য। একারণেই একটি কৃষি শিক্ষানীতি অতীব প্রয়োজনীয়, যাতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত জনবল তৈরি করা সম্ভব হয়, যারা কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

৩. পূর্বতন কমিশনসমূহের কৃষিশিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের সারাংশ

স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি গঠিত ৬ (ছয়) টি শিক্ষা কমিশন/কমিটির (কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন-১৯৭৪, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৭৯, মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন-১৯৮৮, ইউজিসি কর্তৃক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ টীম-১৯৯০, শামসুল হক শিক্ষা কমিশন-১৯৯৭, বারী শিক্ষাসংস্কার কমিশন-২০০১) প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক কমিশন/কমিটি এদেশে কৃষি উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে কৃষিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সুপারিশ প্রদান করেছে। দেশে কৃষিশিক্ষা উন্নয়নে কমিশন/কমিটির সুপারিশে বৈপরীত্যের চেয়ে সাযুজ্যই অধিক পরিলক্ষিত হয়। দেশে শিক্ষিত ও দক্ষ কৃষি কর্মী ও কলাকুশলী তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করাসহ ৩ (তিন) বছর মেয়াদি কৃষি প্রশিক্ষণ কোর্স আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার সুপারিশ করা হয়। অঞ্চলভিত্তিক উচ্চতর কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কৃষিশিক্ষার প্রচলন করা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মৌল বিজ্ঞান বিষয়গুলি পড়ানোর ব্যবস্থা করা এবং কৃষিশিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। সুপারিশে কৃষিশিক্ষার মান উন্নয়নে কোর্স কারিকুলাম সময়োপযোগী করা, সময়ের চাহিদা অনুসারে নতুন বিষয় সংযোজন এবং (Semester/Course Credit System) চালু করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উচ্চতর কৃষিশিক্ষার গুণগত মান-উন্নয়নে উচ্চতর কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের (শস্য, বন, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, মৃত্তিকা ও পানি ব্যবস্থাপনা গবেষণা প্রতিষ্ঠান) নিবিড় ও অর্থবহ যোগাযোগ স্থাপন, যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ এবং গবেষক বিনিময়ের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করা হয়। এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্যাম্পাসে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির গবেষণা কেন্দ্র/উপকেন্দ্র স্থাপনের বিষয় সুপারিশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত উচ্চতর কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, গবেষণাগার ও হালনাগাদ বই ও জার্নাল সংগ্রহ করে উন্নত গ্রন্থাগার স্থাপন এবং তথ্য প্রযুক্তি যথা ইন্টারনেট- এর ব্যবস্থা রাখা আবশ্যিক হিসেবে সুপারিশ করা হয়।

৪. পূর্ববর্তী শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনসমূহের কতটুকু কার্যকর হয়েছে

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে গঠিত মোট ছয়টি শিক্ষা কমিশন/কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেদনসমূহের সুপারিশমালার আংশিক কার্যকর হয়েছে বা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কার্যকর করা অংশের একটি সারসংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হল।

৪.১ দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিশেষ করে, কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ATI), ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ATI), ডিগ্রি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আঞ্চলিক বিষয় বিবেচিত হয়েছে।

৪.২ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুলনা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এবং উচ্চতর কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে (যা ইতঃপূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হয়েছে।

৪.৩ পূর্বতন কৃষি কলেজসমূহের মধ্যে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজ দুইটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে তাতে কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৪.৪ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কৃষিশিক্ষায় নতুন পঠিত বিষয় হিসেবে কৃষিবনায়ন, পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology) ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত কৃষির অন্যান্য শাখা যেমন ভেটেরিনারি, মাৎস্য বিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষি প্রকৌশল অনুষদেও সময়ের চাহিদা বিবেচনায় নতুন বিষয়াদি সংযোজিত হয়েছে।

৪.৫ সূচনালগ্ন থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে M.S এবং Ph.D উভয় ক্ষেত্রেই কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতি (Course Credit System) চালু রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (M.S) পর্যায়ে সেমিস্টার/কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল স্নাতক পর্যায়ে সেমিস্টার/কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে বা চালু করার প্রচেষ্টা চলছে।

৪.৬ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কাজের ব্যবস্থা রয়েছে।

৪.৭ কৃষিশিক্ষায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এবং কৃষিশিক্ষার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. কৃষিশিক্ষার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমানে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিশিক্ষার সীমিত ব্যবস্থা রয়েছে। এতদ্ব্যতীত কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ৩ (তিন) বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। মূলত তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে সক্ষম কৃষিকর্মী ও কলাকুশলী তৈরি করাই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য। উচ্চতর কৃষিশিক্ষায় (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) মুখ্যত উন্নত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন, সুশিক্ষিত, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কৃষিবিদ তৈরির ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান সময়ে দেশে কৃষিশিক্ষার সার্বিক অবস্থা, সুযোগ-সুবিধাদি, সমস্যা ইত্যাদি নিম্নে বর্ণিত হল।

৫.১ প্রাথমিক পর্যায়

দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে সরাসরি কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থা না থাকলেও পাঠক্রমে প্রকৃতি, পরিবেশ, আবহাওয়া, গাছপালা, শস্যাদি, মাটি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা জন্মানোর সীমিত ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কৃষিশিক্ষা আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রায়োগিক বিষয় বিধায় প্রাথমিক পর্যায়ে তা প্রবর্তনের প্রয়োজন নেই।

৫.২ মাধ্যমিক পর্যায়

মাধ্যমিক স্তরে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে একটি সমন্বিত কৃষি পাঠক্রম চালু রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে কৃষিশিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া সকল বিদ্যালয়ে তা চালু নেই এবং যে সব বিদ্যালয়ে কৃষি পড়ানো হয় সেখানে যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে। হাতেকলমে কৃষিশিক্ষা দেওয়ার অবকাঠামো কোন বিদ্যালয়েই বিদ্যমান নেই। প্রকৃতপক্ষে এপর্যায়ে প্রদত্ত বিষয়টি বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে (কৃষিকর্মী তৈরির জন্য) পর্যাপ্ত নয়।

৫.৩ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়

৫.৩.১ বর্তমানে দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও মাধ্যমিক পর্যায়ের অনুরূপ সমন্বিত কৃষি বিষয়টি ঐচ্ছিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এক্ষেত্রেও হাতেকলমে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া বিষয়টি পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চতর কৃষিশিক্ষায় ভর্তির জন্য বিবেচিত না হওয়ায় মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি একটি গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবেই পড়ানো হয়। উপরন্তু যোগ্য শিক্ষক ও অবকাঠামো কোন কলেজেই নেই। এ পর্যায়ে পঠিত বিষয়টি বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে (কৃষি কলাকুশলী তৈরির জন্য) পর্যাপ্ত নয়।

৫.৩.২ দেশে এস.এস.সি পাশের পর তিন বৎসর মেয়াদি একটি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অধীন সরকারি মোট ১২টি এবং বেসরকারি উদ্যোগে ১২টি এটিআই (ATI) চালু রয়েছে। মূলত কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের তৃণমূল পর্যায়ের (Grassroot level) কৃষিকর্মী তৈরি করাই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব। দেশে পশুসম্পদ উন্নয়ন ও পশু চিকিৎসার জন্য অনুরূপ ৪টি ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (VTI) রয়েছে।

৫.৩.৩ বিগত কয়েক বছর যাবৎ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এগ. এড. (B. Ag. Ed.) নামে একটি কোর্স চালু রয়েছে। মূলত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কৃষিশিক্ষক তৈরির জন্য এ কোর্সটি চালু করা হয়। এইচ.এস. সি পাশ অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী যে কেউ B. Ag. Ed. কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও যোগ্য শিক্ষকের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে।

৫.৪ উচ্চ পর্যায়/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে উচ্চতর কৃষিশিক্ষা প্রদানের জন্য ময়মনসিংহে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে একটি স্নাতক কলেজ চালু ছিল। পরবর্তী সময়ে জাতীয় প্রয়োজন বিবেচনায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। বর্তমান সময়ে উচ্চতর কৃষিশিক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমসহ একটি বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

৫.৪.১ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

১৯৬১ সনে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামে ১২০০ একর জমির উপর ময়মনসিংহে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতাউত্তর কালে এটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ নামে পরিচিতি লাভ করে। কৃষিশিক্ষার বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এতে ছয়টি অনুষদ যথা কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি, মাৎস্যবিজ্ঞান এবং কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ চালু রয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (GTI), সম্প্রসারণ কাজের জন্য বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি এক্সটেনশন সেন্টার (BAUEC) এবং গবেষণা কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সিস্টেম (BAURES) নামে সমন্বিত গবেষণা সংগঠন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ (আট) সেমিস্টারে বিন্যস্ত ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি এবং কোর্স-থিসিস পদ্ধতিতে ৩ (তিন) সেমিস্টারে MS ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বিগত ২০০২ - ২০০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক পর্যায়েও সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে Ph. D পর্যায়ে এখন পর্যন্ত মূলত (Thesis based) ডিগ্রিই প্রদান প্রদান করা হচেছ।

৫.৪.২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

ইনস্টিটিউট অভ্ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) নামে ১৯৮৩ সন থেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU), ময়মনসিংহ-এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম শুরু হয়। ১৯৮৮ সনে ইপসা BAU থেকে আলাদা হয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিজস্ব শিক্ষাক্রম শুরু করে। ১৯৯১ সনে ইপসাতে প্রথম কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতিতে MS এবং Ph.D ডিগ্রি শিক্ষাক্রম শুরু করা হয়। ১৯৯৪ সনে আইন পাশের মাধ্যমে ইপসা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সনে আইন পাশের মাধ্যমে ইপসা কৃষির বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরিত হয় এবং বর্তমান নামে এর নামকরণ করা হয়। বর্তমানে কৃষির (শস্য) বিভিন্ন শাখায় (কৃষি অর্থনীতিসহ) MS ও Ph.D শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। স্নাতক (কৃষি অনুষদ) পর্যায়ে কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতিতে ডিগ্রি প্রদানের অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষাসূচি সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে Animal Science, Fisheries ও Forestry নামে তিনটি অনুষদ চালু করার কর্মসূচি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশ, আমেরিকা ও জাপান সরকারের ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা (Tripartite Cooperation) চুক্তির মাধ্যমে স্থাপিত হয়। শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। দেশে Course based curriculum (Course Credit System) সর্বপ্রথম ১৯৯১ সনে এ প্রতিষ্ঠানটিতে চালু করা হয়।

৫.৪.৩ শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Bengal Agricultural Institute নামের প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৮ সনে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে স্থাপিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর কৃষিশিক্ষার সূচনা ও ভিত্তি এ প্রতিষ্ঠানটিই গড়ে তোলে। ১৯৬১ সনে BAU প্রতিষ্ঠার পর এটি BAU-এর অধিভুক্ত হয়। স্বাধীনতাউত্তর কালে এটি বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত হয়। ২০০১ সনে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনের দ্বারা এটি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি কৃষি অনুষদে ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে।

৫.৪.৪ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী

১৯৭৯ সনে বেসরকারি কলেজ হিসেবে পটুয়াখালীর দুমকীতে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে BAU-এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলেজটি সরকারি করা হয়। ২০০১ সনে কলেজটিকে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু কৃষি অনুষদে ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করছে। অতি সম্প্রতি বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজটি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয়েছে।

৫.৪.৫ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে দিনাজপুরের বাঁশেরহাটে ১৯৮৮ সনে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় সংসদে পাশ করা আইনে ২০০১ সনে এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। কৃষি অনুষদে ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত। দিনাজপুর সরকারি ভেটেরিনারি কলেজটি সাম্প্রতিক সময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয়েছে।

৫.৪.৬ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

১৯৮৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৪ সনে এতে জীববিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের আওতায় এগ্রোটেকনোলজি, ফিসারিজ অ্যান্ড টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি এবং ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি শিক্ষাক্রম চালু করা হয়।

৫.৪.৭ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

১৯৯৫-৯৬ সনে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কৃষি কলেজটিকে ২০০২-২০০৩ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একীভুত করে কৃষি অনুষদ নামে পুনর্গঠন (Reorganize) করা হয়। এখান থেকে কৃষিতে (শস্য) স্নাতক সম্মান এবং স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষাসূচিতে (Syllabus) কৃষির বিভিন্ন বিষয় সমন্বয় করে পড়ানো হয়। এটি কৃষিশিক্ষার জন্য যথাযথ নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন।

৫.৪.৮ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

ভেটেরিনারিতে ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি প্রদানকারী চট্টগ্রাম সরকারি ভেটেরিনারি কলেজটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত রয়েছে। সমুদ্রবিজ্ঞান ও বনবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং জীববিজ্ঞান বিভাগে (উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যা) কৃষিসম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয়ে পাঠদান ও ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থাও বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে।

৫.৪.৯ শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

সিলেট সরকারি ভেটেরিনারি কলেজটি শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করছে। এছাড়াও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বনবিজ্ঞান বিভাগে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

৫.৪.১০ অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ; অ্যাকুয়াকালচার অ্যান্ড ফিশারিজ; জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি; উদ্ভিদবিদ্যা) কৃষিসংশ্লিষ্ট কিছু কিছু বিষয়ের পাঠক্রম রয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের Life Science Institute-এর বিভিন্ন বিভাগেও কৃষিসম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয় পাঠদান করা হচ্ছে।

৫.৪.১১ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অভ্ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (IUBAT), ঢাকা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে IUBAT-তে কৃষি শিক্ষাক্রম রয়েছে। তবে এ শিক্ষাক্রমের সঠিক Programme স্পষ্ট নয়।

৫.৪.১২ বাংলাদেশ - জাপান মৈত্রী কৃষি প্রযুক্তি কলেজ, যশোর

বেসরকারি উদ্যোগে যশোরে কলেজটি কৃষিতে (শস্য) স্নাতক ডিগ্রি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ বর্ষে কলেজটির শিক্ষা কার্যক্রম চালু হতে যাচ্ছে।

৫.৪.১৩ শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিশারিজ কলেজ, জামালপুর

দেশে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ফিশারিজ কলেজ BAU-এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাৎস্যবিজ্ঞানে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছে। কলেজটি থেকে ১/২ বৎসরের মধ্যেই প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীগণ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে বের হবে।

৬. কৃষিশিক্ষার ঘাটতিসমূহ

৬.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে হাতেকলমে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা অপ্রতুল বা একেবারেই অনুপস্থিত। এ পর্যায়ে যোগ্য শিক্ষকের অভাব প্রকট। পাঠক্রমও যথাযথ মানসম্পন্ন নয়। কৃষি বিষয়টি ঐচ্ছিক হওয়ায় এবং পরবর্তীসময়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ না থাকায় এর গুরুত্ব অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কম।

৬.২ স্নাতক পর্যায়ের কলেজগুলিতে অবকাঠামোগত সমস্যা থাকায় শিক্ষকদের গবেষণা করার সুযোগ অনুপস্থিত এবং ছাত্রদের হাতেকলমে শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। যোগ্য শিক্ষকের অভাব প্রকট। লাইব্রেরির সুবিধা অপ্রতুল। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন ইন্টারনেট নেই। আর্থিক সংস্থান পর্যাপ্ত নয় । ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার ফলে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব।

৬.৩ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে Non-teaching Staff এবং Officer প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হওয়ায় বেতনভাতা এবং অন্যান্য খরচের বাহুল্যেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট বাজেটের ৯০-৯৫% ব্যয়িত হয়। ফলে শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে অর্থের সংকুলান হয় না।

৬.৪ নতুন প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার জন্য কেবল কৃষি অনুষদ চালু রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কৃষি (শস্য) শিক্ষা প্রদানের জন্য অপরিহার্য শর্তসমূহ যেমন-গবেষণার জন্য মাঠ, গবেষণাগার ইত্যাদি একান্তই অপর্যাপ্ত। অন্যান্য অনুষদ যেমন- ভেটেরিনারি, মাৎস্যবিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল ও কৃষি অর্থনীতি অদ্যাবধি চালু করা হয় নি বা চালু করার প্রচেষ্টাও নেওয়া হয় নি।

৬.৫ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাধিক্য এবং উপযুক্ত শিক্ষকের স্বল্পতাহেতু স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণায় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থবহ স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা সম্ভব হয় নি।

৬.৬ সূচনালগ্ন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে Course Credit System চালু রয়েছে। এখানে GPA পদ্ধতিতে ছাত্রদের মূল্যায়ন করা হয়। অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সম্প্রতি Traditional Examination system (Annual Examination System) পরিবর্তন করে Semester/Course Credit System চালু করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এর মূল্যায়ন সময়সাপেক্ষ।

৬.৭ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) রাজনৈতিক ও অন্যান্য শিক্ষাবহির্ভূত কারণে সেশন জট থাকায় শুধু যে শিক্ষাকালই প্রলম্বিত হচ্ছে তা নয় বরং কৃষির মতো জীববিজ্ঞানের শাখায় গবেষণা ও হাতেকলমে শিক্ষা প্রদানও ব্যাহত হচ্ছে।

৬.৮ কোর্স কারিকুলামে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন যথাসময়ে না হওয়ায় শিক্ষার গুণগত মান অব্যাহতভাবে উন্নত হচ্ছে না।

৬.৯ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত নতুন টেক্সট বই ও জার্নালের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থা এখনও চালু করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

৬.১০ প্রায়শই নানাবিধ, অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উপরিবর্ণিত হস্তক্ষেপের ফলে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে মানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে যা শিক্ষার পরিবেশ ও মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য জনবল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগে ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও এজাতীয় হস্তক্ষেপের প্রভাবে অযোগ্য লোকের আধিক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধিও এজাতীয় হস্তক্ষেপের কারণেই ঘটেছে।

৬.১১ শিক্ষক, কর্মকর্তা, ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিষয়টি যথাবিহিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা অতীব জরুরি।

৬.১২ পর্যায় উন্নয়ন (Restructuring) নীতিমালার দুর্বলতার কারণে এবং এর যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নতর যোগ্যতা নিয়ে শুধু চাকরির সময়কাল বিবেচনায় উচ্চতর পদে পদোন্নতি পাচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সাহায্য সেবা (Support Service) দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। সার্বিকভাবেই (শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী) পর্যায় উন্নয়ন বিষয়টির একটি ফলপ্রসূ নীতিমালা প্রণয়ন করা অতীব জরুরি।

৬.১৩ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা শিক্ষকদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা চালু না থাকায় শিক্ষকদের শিক্ষকতার গুণগত মান নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৬.১৪ প্রতি বৎসর মূল্যায়নের মাধ্যমে স্তরভিত্তিক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও গবেষক নির্ধারণ ও তাঁদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা নেই। ফলে শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে ভাল করার প্রবণতা বা প্রতিযোগিতা নেই।

৬.১৫ শিক্ষকদের বেতন সম্মানজনক পর্যায়ে না থাকায় অধিকাংশ মেধাবী শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে চাকরি করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলছেন। ফলে Brain drain প্রবাদটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পষ্ট হচ্ছে। দু'টো বিশ্ববিদ্যালয়কে (BAU এবং BSMRAU) বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত ১০ বৎসরে গড়ে প্রায় ৩০% জন শিক্ষক স্থায়ীভাবে বিদেশে চলে গিয়েছেন।

৭. সমস্যা উত্তরণের সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগতমান উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে । জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ মান অর্জন অত্যন্ত জরুরি। কৃষির উন্নতির ফলে কৃষিজাত বিভিন্ন উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষিত জনবল দেশের বাইরে নিয়োগ লাভ করে দেশকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে। কৃষিশিক্ষার পরিকল্পনায়ও বিষয়টি যথাগুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা ও সম্পৃক্ত রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে নিচে থেকে উপরে (Bottom Up) পরিকল্পনা কৌশল অনুসরণ করতে হবে। তবে কৃষি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রায়োগিক বিষয় বিধায় প্রাথমিক পর্যায়ে কোমলমতি শিশুদের জন্য এটি পঠিত বিষয় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিশিক্ষার স্তরবিন্যাস

৭.১ মাধ্যমিক স্তরে কৃষিশিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে পঠিত হওয়া উচিত, যাতে করে ঝরে পড়া বা মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া সমাপ্ত করা ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কৃষিকর্মী হিসেবে চাকরি অথবা স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারে। পঠিত বিষয়টি সমন্বিত হলেও এর ৫০% ভাগ তত্ত্বীয় এবং ৫০% ভাগ ব্যবহারিক (হাতে-কলমে) হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে নবম ও দশম শ্রেণীর পূর্বে বিষয় হিসেবে কৃষি না পড়ানই সমীচীন হবে। এক্ষেত্রে ঝরেপড়া ছাত্রদের জন্য সরকারি/বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত Vocational শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

৭.২ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পঠিত বিষয়টির ৫০% ভাগ তত্ত্বীয় এবং ৫০% ভাগ ব্যবহারিক (হাতে-কলমে) হতে হবে। এর ফলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পর শিক্ষার্থীগণ (পড়াশোনা বন্ধ করে দিলে) কৃষি কলাকুশলী হিসেবে চাকরি করার অথবা স্বকর্মসংস্থান যেমন-কৃষি খামার, হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য চাষ, গরু-ছাগল পালন, দুগ্ধ খামার, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বা কৃষিভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পরিচালনার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ এপর্যায়ে বিষয়টিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে পুনর্গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রদের একাংশের কৃষিতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থাকতে হবে।

৭.৩ এস.এস.সি পাশের পর ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সটিও একইভাবে বিবেচিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও মেধাবী ছাত্রদের একাংশের উচ্চতর কৃষিশিক্ষার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭.৪ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত B.Ag.Ed. কোর্সটি, যা মাধ্যমিক স্তরে কৃষিবিষয়ক শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট তা অবশ্যই বন্ধ করে দেওয়া জরুরি। কারণ অবকাঠামোবিহীন ও শিক্ষকবিহীন প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষির ন্যায় একটি ফলিত প্রায়োগিক শিক্ষা পরিচালনা করা সমীচীন নয় এবং এ থেকে মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করা একেবারেই অসম্ভব।

৭.৫ মাধ্যমিক স্তরে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। শিক্ষকস্বল্পতা দূরীকরণের জন্য ATI/VTI থেকে পাশ করা ডিপ্লোমাদেরকে Condensed কোর্স প্রদান করে শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

৭.৬ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজসমূহে যেখানে কৃষিবিষয়ক পাঠদানের সুযোগ রয়েছে সেখানে অবশ্যই কৃষি স্নাতকদের নিয়োগের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং ATI/VTI-এর ন্যায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম সময়োপযোগী এবং আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে।

উচ্চতর কৃষিশিক্ষা

কাঠামোগত পরিবর্তন

৭.৭ সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে, কৃষিবিজ্ঞানে বিশ্বের অগ্রগতি, দেশের প্রয়োজন এবং চাকরি বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে বর্তমানে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত অনুষদ/বিষয়সমূহ পুনর্গঠন করা অত্যন্ত অর্থবহ হবে।

৭.৮ সার্বিকভাবে কৃষিশিক্ষায় Biotecnology a nd Genetics Engineering, Molecular Techniques, Tissue Culture, GMOs Development, Agro-processing, Agroforestry, Plant Protection, Agri-business, Bio-environmental Science, Animal Breeding, Animal Health, Fish Farming ইত্যাদি বিষয়গুলো বর্তমানের চাহিদা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন ও কৃষির বিকাশের ধারা বিবেচনা করে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে কোর্স-কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। উপরোল্লিখিত নতুন বিষয়সমূহ Multidisciplinary Center/Institute/Program হিসেবে পুনর্গঠন করে স্নাতকোত্তর (MS, Ph.D) ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৭.৯ কৃষির বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত কৃষির প্রচলিত মৌল বিষয়সমূহকে (Traditional basic courses of agriculture) কৃষিবিজ্ঞানের দ্রুত ক্রমবিকাশমান ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিমিত্তে দুই/ততোধিক বিষয়/বিভাগ একত্র করে নতুন বিষয়/বিভাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে অথবা দুই/ততোধিক বিভাগ একত্র করে নতুন বিভাগ/ইনস্টিটিউট/প্রোগ্রাম তৈরি করা যেতে পারে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কোর্স প্রদান সহজ ও অর্থবহ হবে।

৭.১০ কৃষিশিক্ষার স্তরভেদে-কৃষিকর্মী, কৃষি কলাকুশলী এবং কৃষি বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য বর্তমান সময় ও আগামী ৫০ বৎসরের চাহিদা নিরূপণপূর্বক একটি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজনীয়।

৭.১১ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে (দুই/একটি ব্যতিক্রম বাদে) মাননীয় চ্যান্সেলর কর্তৃক কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের বিধান আছে। কোষাধ্যক্ষ পদটি অবৈতনিক না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্মকর্তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-প্রশাসন পরিচালনা আরও দক্ষ ও সংহত হবে।

ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন

৭.১২ সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ। সুতরাং প্রতিটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিন্ডিকেটের গঠন ও সদস্য সংখ্যা একই রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিত্ব/সদস্য সংখ্যা ও সদস্যের ধরনেও পরিবর্তন প্রয়োজন, যাতে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রক না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

৭.১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এবং সুস্থ বিকাশ ও জ্ঞানচর্চার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে সিন্ডিকেটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত কমিটিসমূহের কার্যক্রম স্বাধীনভাবে বাস্তবায়নের সুযোগ থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিকতা পরিহার অতীব জরুরি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যে-কোন প্রকার অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বন্ধের ব্যবস্থা করা সমীচীন।

৭.১৪ কৃষি একটি প্রায়োগিক শিক্ষণীয় বিষয় বিধায় শিক্ষকদেরকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রায় সমান গুরুত্ব দিয়ে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হয়। তাছাড়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও পালন করতে হয়। সুতরাং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত স্নাতক পর্যায়ে ১:১০ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১:৫ এর অনুপাতে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৭.১৫ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেকলমে শিক্ষাদান, গবেষণা এবং সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণে ব্যবহার উপযোগী (Demonstration এর জন্য) প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন খামার/মাঠ থাকতে হবে।

৭.১৬ কৃষির সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষ, গাছপালা, গৃহপালিত পশু ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই পরিকল্পিতভাবে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১৭ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (MS এবং Ph.D) ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার জন্য আলাদা গবেষণাগারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭.১৮ মৌলিক গবেষণা (Molecular Biology, Biotechnology and Genetic Engineering, Tissue Culture ইত্যাদি) সম্পাদনের জন্য Sophisticated Equipment সম্বলিত একটি করে Common গবেষণাগার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করা উচিত।

৭.১৯ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ ও সংরক্ষণের জন্য যথাক্রমে Containment facility এবং store স্থাপন করা অতীব জরুরি।

৭.২০ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য নিজস্ব জনবল বা ব্যবস্থা থাকা অতীব জরুরি। তবে বিষয়টি জাতীয়ভাবে বিবেচনা করে UGC/BUET বা কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

৭.২১ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে Group Discussion-এর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা দরকার।

৭.২২ উন্নত লাইব্রেরি ব্যবস্থা থাকা জরুরি এবং লাইব্রেরিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগের নিমিত্তে ইন্টারনেট সংযোগ থাকা দরকার।

কারিকুলাম ও টেক্সটবুক/জার্নাল

৭.২৩ সময়ের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে নিয়মিত কোর্স কারিকুলাম মূল্যায়ন (Evaluation) এবং হালনাগাদ (update) করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭.২৪ কৃষিসংক্রান্ত কোর্সসমূহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে/করেজে অন্তত স্নাতক পর্যায়ে একই মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭.২৫ কৃষির মৌলিক বিষয়সমূহের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রাখার জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট অনুষদীয় ডীনদের সমন্বয়ে একটি কারিকুলাম সমন্বয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৭.২৬ হালসময়ের (Recent) প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেক্সটবুক সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশবিদেশের মানসম্পন্ন জার্নাল যথাসময়ে সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা গবেষণার জন্য জরুরি। দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের টেক্সটবুক লেখায় উৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশনা ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, যাতে দেশের সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যমূলক বই ছাত্র-ছাত্রীরা পেতে পারে।

পরিদর্শন ও উপদেশক ব্যবস্থা

৭.২৭ কৃষিশিক্ষা ও গবেষণায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে UGC-এর তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য Monitoring Team/ Accreditation Council গঠন করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত সংস্থা কৃষিশিক্ষার মান বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পরামর্শ প্রদান করবে।

৭.২৮ Monitoring Team/ Accreditation Council-এর কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে Performance - এর ভিত্তিতে UGC অর্থ বরাদ্দ করবে।

৭.২৯ Monitoring Team/ Accreditation Council বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, শিক্ষা প্রশাসন, অর্থব্যবস্থাপনা, তহবিল সংগ্রহ, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরামর্শ প্রদান করবে এবং সার্বিক বিষয়ে UGC /সরকার-এর নিকট সুপারিশ প্রদান করবে।

শিক্ষকদের বেতন/পদমর্যাদা

৭.৩০ শিক্ষাক্ষেত্রে মেধার লালন ও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো অন্যান্য যে-কোন চাকুরি থেকে ভিন্ন ও সম্মানজনক হওয়া উচিত। অন্যথায় মেধাবী শিক্ষকদের বিদেশগমন রোধ করা সম্ভব হবে না।

৭.৩১ শিক্ষকদের পদমর্যাদা (Protocol) সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় ও রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭.৩২ ভাইস-চ্যান্সেলরগণের পদমর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে। তাঁদের বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ বিশেষ ভাতা হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সার্কভুক্ত দেশসমূহের অনুরূপ হওয়া উচিত।

শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ

৭.৩৩ কৃষিশিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত স্নাতক পর্যায়ে অভিন্ন কোর্স-কারিকুলা চালু করা বাঞ্ছনীয়। বহির্বিশ্বের সাথে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৭.৩৪ শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে Semester/Trimester/Course Credit পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং ছাত্রদের জিপিএ সিস্টেমের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। তবে Course Credit System চালু করাই শ্রেয়তর হবে। এ পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযাগী এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সময় নষ্ট না করে শিক্ষামুখী করতে সহায়তা করবে।

৭.৩৫ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের মূল্যায়নের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে গ্রেডিং পদ্ধতির মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা সমীচীন হবে।

৭.৩৬ পাঠদান প্রক্রিয়াকে শ্রেণীকক্ষে বিনিময়ধর্মী (interactive) করার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (Class size) সীমিত করতে হবে। এ জন্য শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রশ্ন করা, সেমিনার প্রদান, গ্রুপ আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.৩৭ পাঠ্যসূচির মধ্যে বাস্তবজ্ঞান আহরণের জন্য স্নাতক পাশের পর Internship বা ফার্ম প্রাকটিস ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। ডিগ্রি শেষে সকল কারিগরি গ্র্যাজুয়েটকে অনধিক ৬(ছয়) মাসের জন্য Farm Attachment-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এটি GO-NGO সহায়তার মাধ্যমে করা যেতে পারে। এ সময়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার আইনগত বিষয় (ভূমিজরিপ ইত্যাদিসহ) জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৭.৩৮ Need based course curriculum (Course Credit System) প্রবর্তন করার লক্ষ্যে প্রতি তিন বছরের মধ্যে অন্তত একবার সিলেবাস ও কারিকুলাম পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করতে হবে। কারণ প্রযুক্তি ও জ্ঞান দ্রুত উন্নতি লাভ করছে।

৭.৩৯ স্বকর্মসংস্থানে সক্ষমতা অর্জনের জন্য গ্র্যাজুয়েটদেরকে কৃষিনির্ভর-শিল্প, কৃষিনির্ভর বাণিজ্য (Agro-industrial, Agribusiness) ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা জরুরি, যাতে করে গ্র্যাজুয়েটদেরকে কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এতদ্ব্যতীত কৃষিতে IT-এর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছাত্রদের GIS সম্পর্কিত কোর্স/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা সমীচীন হবে।

৭.৪০ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা খাতে বৃত্তিদানের জন্য অর্থভাণ্ডারের (Endowment Fund) ব্যবস্থা থাকা দরকার। স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য (গবেষণা/শিল্প সহায়তা ব্যবস্থা (Research/Teaching Assistantship) থাকা প্রয়োজন।

৭.৪১ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন ও ফি বিষয়ভিত্তিক হওয়া এবং তা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করা দরকার। এ ব্যাপারে সরকারি নীতিমালা থাকা জরুরি।

৭.৪২ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার সাথে জাতীয় গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজের সমন্বয় থাকতে হবে। এব্যাপারে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও সমূহের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিবিড় যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

৭.৪৩ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও দক্ষ জনবলের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে অপরিকল্পিতভাবে কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে কৃষিশিক্ষার মান অধোমুখী হওয়াই স্বাভাবিক। অতীতে এজাতীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সাক্ষ্য বহন করছে। একইভাবে কোন কোন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরিবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ না করে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করায় শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ভবিষ্যতে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা চালু না করাই সমীচীন। কোন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর কৃষিশিক্ষা (স্নাতক/স্নাতকোত্তর) চালু করার পূর্বে অবশ্যই প্রয়োজনীয় জনবল ও ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৪৪ বাংলাদেশের চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ খুবই সীমিত হওয়ায় কৃষিশিক্ষা বিষয়ক নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে গিয়ে সীমিত ভূমির উপর আরও চাপ বাড়ছে। সুতরাং আরও নতুন কৃষিবিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করে ইতোমধ্যে স্থাপিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজসমূহের কার্যপরিধির সম্প্রসারণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

৭.৪৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন/বিধিবিধানে নির্ধারিত নিয়ম ও যোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে ও যথার্থরূপে অনুসরণ করে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা, কর্মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধই মুখ্য বিবেচ্য হবে। নিয়োগ ও পদোন্নতির স্বচ্ছতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৭.৪৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল (শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী) বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেবল অনিবার্য প্রয়োজনীয়তাই জনবল বৃদ্ধির একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হবে। কোন হস্তক্ষেপ বা অন্য কোন বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা সমীচীন হবে না। বিশেষত কর্মচারী (Non-teaching staff) এবং অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের অহেতুক ব্যয় বৃদ্ধি করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় অপ্রয়োজনীয় চাপ বৃদ্ধি পাবে।

৭.৪৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হবে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (Annual Confidential Report) যথাযথ ও অর্থবহভাবে কার্যকর করতে পারলে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন (Self e valuation)-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে একজন শিক্ষক কতটি ক্লাশ নিয়েছেন, কতজন ছাত্রের গবেষণা তত্ত্বাবধান করেছেন, কতটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন ইত্যাদি তার বিভিন্ন কর্মের সার্বিক বিষয় প্রতিফলিত হবে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতিসহ সর্বপ্রকার সুবিধাদি এসব মূল্যায়নের ভিত্তিতেই প্রদান করা সমীচীন হবে।

৭.৪৮ পর্যায় উন্নয়নের একটি সুষ্ঠু, কার্যকর ও ফলপ্রসূ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে করে কেবল মেধাবী, পরিশ্রমী, সৎ, একনিষ্ঠ, শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ও যোগ্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণই পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হয়। পর্যায় উন্নয়ন ব্যবস্থাটির যথেচ্ছ ব্যবহার করে ঢালাও পদোন্নতি রোধ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেই অতীব জরুরি।

৭.৪৯ ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে শিক্ষক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষকদের স্তরভিত্তিক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও গবেষক নির্ধারণ করে তাঁদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষিগবেষণা সংক্রান্ত সুপারিশ

৭.৫০ উচ্চতর কৃষিশিক্ষার সাথে গবেষণা ও সম্প্রসারণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং উচ্চতর কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কৃষিসম্পর্কিত জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন কৃষিশিক্ষা তথা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৭.৫১ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণা পদ্ধতিকে জাতীয় কৃষিগবেষণা পদ্ধতির (National Agricultural Research System) অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে, যাতে করে গবেষণা কাজে সমন্বয় সাধন ও গবেষণা বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় Duplication রোধ করে গবেষণায় অর্থ অপচয় পরিহার করা যায়। এ ব্যাপারে BARC-কে শক্তিশালী করে বিষয়টি BARC-এর কার্যক্রম ও দায়িত্বের আওতায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

৭.৫২ প্রতিটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপকেন্দ্র স্থাপন গবেষণা সমন্বয়ে অত্যন্ত কার্যকর ও অর্থবহ হবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষজ্ঞ বিনিময়ও সম্ভব হবে, যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৭.৫৩ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অঞ্চলভিত্তিক সমস্যাসম্পর্কিত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হলে কৃষি শিক্ষা-গবেষণা সম্প্রসারণ বিশেষ মাত্রায় উন্নতি লাভ করবে। এর ফলে সামগ্রিক অর্থেই কৃষির অগ্রগতি ও উন্নতি বাস্তবরূপ লাভ করবে।

৭.৫৪ কৃষি গবেষণার মৌলিক বিষয়সমূহ (জৈব প্রযুক্তি, ট্রেসার টেকনিক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ভ্রূণ হস্তান্তর ইত্যাদি) এবং প্রায়োগিক/ফলিত বিষয়সমূহ (সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, শস্য বহুমুখীকরণ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি) যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে মতামত ও আলোচনার ভিত্তিতে প্রদান করা যেতে পারে, যাতে প্রতিটি সমস্যা সমগুরুত্ব পায় এবং দ্রুত লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়।

৭.৫৫ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েই ইন্টারনেট ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৭.৫৬ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসংস্থান বিষয়ে সরকারি নীতি থাকা জরুরি। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস সৃষ্টিতে প্রাথমিকভাবে সরকারি অনুদান প্রদান করা প্রয়োজন। অর্থসংস্থান বিষয়টি প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকাণ্ডের সাফল্যের ভিত্তিতে হওয়া দরকার। অর্থসংস্থানের বিষয়ে NGO এবং বিদেশী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অধিকতর ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অতীব জরুরি। প্রতিটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্যাটেন্ট করার ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা অতিরিক্ত অর্থসংস্থানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

মূল রচনা :
প্রফেসর মো: আবদুল হালিম খান

প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা

১.০ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বর্তমান উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এটি পরীক্ষিত সত্য যে অর্থনৈতিক প্রগতির প্রাণ হচ্ছে সে সব দেশের প্রযুক্তির প্রয়োগ-ক্ষমতা। এশিয়ার নব্য উন্নত দেশসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও শিল্পায়নের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশের প্রযুক্তি ও শিল্প বিপ্লবের ভাগীদার হবার প্রয়াস পেয়েছে। এসব দ্রুত উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়নের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে সার্বিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যথোপযুক্ত মানবসম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম। ঐ সব দেশে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে প্রয়োগ-ক্ষেত্রের সুন্দর যোগসূত্র সহজেই স্থাপিত হয়েছে এবং একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে গণ্য হয়েছে।

১.১ দক্ষ মানবসম্পদের ভূমিকা

উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রকৌশলীদের ইতিবাচক ভূমিকা সর্বত্র স্বীকৃত। বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমাবার জন্য আমদানিকৃত প্রযুক্তি আয়ত্তকরণ, স্থানীয়ভাবে অভিযোজন ও পরবর্তী পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য স্থানীয় দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। একই সাথে প্রকৌশলীদের আর একটি গুরুদায়িত্ব হল গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। আমাদের দেশ অনুন্নত হলেও সমাজের একটি নিজস্ব প্রযুক্তিগত প্রজ্ঞা আছে। এই প্রজ্ঞার মূল্যায়ন করে এর পরিবর্ধন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দেশে একটি গতিশীল "প্রযুক্তি কৃষ্টি" দেশজ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ও আমদানিকৃত প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সাহায্য করবে। সুতরাং এ ধরনের শিক্ষাকে কেবল সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ হিসাবে চিন্তা না-করে সার্বিক জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা আবশ্যক। এর প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা জাতীয় উন্নয়নের সকল পর্যায়ে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রকৌশল/প্রযুক্তি শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন প্রকৌশলী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি ও দক্ষ কর্মীর সম্মিলিত প্রয়াসে একটি প্রকৌশলী কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়। একটি দেশের শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটি সুবিন্যস্ত ভিত থাকা। এ ব্যবস্থা দেশজ ও গ্লোবাল শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে সদা-পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া ও মুক্ত-বাজার প্রতিযোগিতা শ্রমবাজারকে নিরন্তর অস্থির ও অনিশ্চিত করে ফেলেছে। দক্ষতার চিরাচরিত ধারণা পাল্টে গেছে। আজকের কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থাতে একদিকে থাকতে হবে অতি গতিময়তা ও নমনীয়তা, অন্যদিকে থাকতে হবে বিশ্বজনীন গুণগত মান ও উৎকর্ষ। কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা কখনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা ট্রেনিং সেন্টারের চার-দেয়ালের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে না। বাস্তব কর্ম-অভিজ্ঞতা এ শিক্ষাকে পূর্ণতা দান করে। শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফলপ্রসূ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ শিক্ষা লালিত ও বিকশিত হয়। মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার বিশাল কর্মযজ্ঞে নিজস্ব অবদান রেখে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করা, উন্নয়ন অবকাঠামো তৈরিতে সহায়তা করা, দারিদ্র্য লাঘব করা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

১.২ বৃত্তিমূলক শিক্ষা

হাতে-কলমে শিক্ষাদান করে শিক্ষার্থীদের দক্ষকর্মী হিসাবে গড়ে তোলা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কায়িক পরিশ্রমে অনীহা অনেক সময় আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ অবস্থার পরিবর্তন করার একটি পন্থা হল বৃত্তিমূলক শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করে যুব সম্প্রদায়কে কর্মমুখী করে তোলা।

এ শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী ও উপার্জনসক্ষম দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা। এর ফলে সৃষ্ট জনশক্তি কেবল চাকুরির উপর নির্ভরশীল না-হয়ে প্রয়োজনবোধে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার সাথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে। এ ধরনের কারিগরিশ্রেণী বা "মাস্টার ক্রাফটসম্যান" পণ্যের উৎকর্ষ, শিল্পোন্নয়ন ও উচ্চ উৎপাদনশীলতার জন্য প্রয়োজন। বর্তমানে দেশের সামাজিক মর্যাদা ও বেতনকাঠামো এরূপ উচ্চমানসম্পন্ন কারিগরশ্রেণী গড়ার অনুকূল নয়। দ্রুত উন্নয়নশীল দেশসমূহে উৎপাদনশীল জীবনের সর্বোচ্চ মাপে একজন পেশাদার

প্রকৌশলীর সামাজিক মর্যাদা ও বেতনভাতাদি অপেক্ষা একজন গুণী অতিদক্ষ কারিগরের (মাস্টার ক্রাফটসমানের) মর্যাদা ও বেতন কোন অংশে কম নয়। এ জন্যই সব দেশে সমাজের যে কোন অংশের যুবক-যুবতীরা এ ধরনের পেশায় নিয়োজিত হতে পিছপা হয় না।

১.৩ ডিপ্লোমা স্তরে কারিগরি শিক্ষা

ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষার মধ্যম পর্যায়ের জনশক্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয় সম্পর্কে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করা হয়। দেশের প্রযুক্তিগত তথা সার্বিক উন্নয়নে এই জনশক্তি মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে। এরা একদিকে নিজের হাতে দক্ষতার সাথে কাজ করে উল্লিখিত ক্রাফটসমান বা সুদক্ষ কর্মীর কাজের সুচারু পরিচালনা করতে পারে; অপরদিকে পুথিগত জ্ঞানের দ্বারা ডিগ্রি প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের চিন্তাধারা, পরিকল্পনা ও ডিজাইনসমূহ দক্ষ কর্মীর কাছে ব্যক্ত করতে সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে। নিজের বাস্তব কারিগরি অভিজ্ঞতা ও হাতের কাজের দক্ষতার মূলধন নিয়ে উৎপাদনের সাথে জড়িত কর্মীদের তদারকি করা এই মধ্যম স্তরের কারিগরি জনশক্তির কাছ থেকে আশা করা হয়। এ ছাড়া তাঁরা "ইঞ্জিনিয়ারিং-টেকনিসিয়ান" বা "টেকনোলজিস্ট" হিসাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ, পরিকল্পনা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ডিগ্রি প্রকৌশলীদের সহকারী হিসাবেও কাজ করতে সক্ষম।

১.৪ প্রকৌশল শিক্ষা

প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে এবং গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ডিগ্রিস্তরের প্রকৌশলীরা। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে পরিচিত, দেশের সমস্যা সমাধানে এর প্রয়োগে ও বস্তুনির্ভর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে দক্ষ এই শ্রেণীর কর্মী উন্নয়নশীল দেশসমূহের কর্মকাণ্ডে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। ডিগ্রিস্তরের প্রকৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও তথ্যের অনুধাবন নয় বরং সেই সাথে দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সমন্বয় সাধন করে সমস্যাসমূহের সৃষ্টিধর্মী সমাধান খুঁজে বের করা এবং প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিভিন্ন নিয়ামক সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা। পেশাগত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম হলেই একজন প্রকৌশলীর শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

২.০ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনে প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশনসমূহ বিভিন্ন সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। এই সকল সুপারিশ ও তার বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সুপারিশমালা প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। পূর্ববর্তী কমিশনসমূহের চিন্তাভাবনার একটি সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হল।

২.১ জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৫৯

পাকিস্তান আমলে এই শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় এবং দেশে প্রযুক্তি শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে এই কমিশনই প্রথম পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। দেশের পাঁচসালা অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে যোগসূত্র রেখে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য একটি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবিত কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে তিনটি প্রকৌশল কলেজ, তৎকালীন জেলাসমূহের সদরে একটি করে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও মহকুমা শহরগুলিতে একটি করে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপনের সুপারিশ রাখা হয়।

২.২ বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪

১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন অন্যতম জাতীয় সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে পুথিসর্বস্ব ও কর্ম-অভিজ্ঞতা বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকার কারণে শিক্ষিত সমাজে শ্রমবিমুখতা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারটি। মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮ম শ্রেণীর পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়ে কমিশন আশা করেছিল যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী কর্মজীবনে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করবে। কমিশনের প্রতিবেদনে বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের প্রবর্তন এবং শিল্প-কারখানায়, অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রে ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সমবায়-ভিত্তিক ছোট ছোট কারখানা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উপদেষ্টা ও আর্থিক সাহায্যের কথা আলোচনায় স্থান পায়।

২.৩ অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ১৯৭৯

উৎপাদনমুখী শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে চিহ্নিত করা হয় এই শিক্ষানীতিতে। তৎকালীন বৃত্তিমূলক শিক্ষার নিম্নমানের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই নীতিমালায় ভবিষ্যতে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ক্ষেত্রবিশেষে কোনও আদর্শ খামার, উন্নতমানের ওয়ার্কশপ বা চিকিৎসাকেন্দ্রকে চিহ্নিত করতে বলা হয়। প্রকৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার প্রচলন করার সুপারিশসহ বিভিন্ন শিল্প যেমন ইস্পাত, পেট্রোরসায়ন, পাট, বস্ত্র, চর্ম, চিনি, সার, কাগজ, নৌশিল্প প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় স্নাতক স্তরের কোর্স চালু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়।

২.৪ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮

১৯৮৮ সনের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন দেশের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে বিভেদ দূর করার উপর জোর দেয়। কমিশন সাধারণ শিক্ষার সংকীর্ণ ও সনাতন ধারণা পরিবর্তন করে প্রয়োগমুখী শিক্ষা প্রচলন করার এবং আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারায় শ্রমের প্রতি অনীহা দূর করার উপর এবং শ্রমজীবী মানুষের দক্ষতা ও শ্রমের যথাযথ স্বীকৃতিদান জাতীয় কর্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করে। কমিশনের সুপারিশে জাতীয় ভিত্তিতে সর্বস্তরে আনুষ্ঠানিক পর্যায় ছাড়াও উপানুষ্ঠানিক গুরত্ব আরোপ করে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার বিস্তারের সাহায্যে দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে সঠিক প্রক্রিয়া সূচনা করে দেশে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি' পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হয়।

২.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে স্ট্রাকচার পরিবর্তনের জন্য বলা হয়েছিল। প্রাইমারি শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার কথা বলা হয়েছিল। অষ্টম শ্রেণী পাশের পর সিলেকশনের মাধ্যমে এক বৎসর VTI প্রশিক্ষণের পরে সেমিস্কিলড টেকনিশিয়ান গ্রেড-১ তৈরি হবে। অষ্টম শ্রেণীর পরে দুই বৎসর VTI-তে প্রশিক্ষণ শেষে টেকনিশিয়ান গ্রেড-২ তৈরি হবে এবং অষ্টম শ্রেণীর পরে ৪ বৎসর প্রশিক্ষণ পেয়ে টেকনিশিয়ান গ্রেড-৩ বা মাস্টার্স ক্রাফটমান হয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে নবম এবং দশম শ্রেণীর পরে চার বৎসর শিক্ষালাভের শেষে ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট হয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করবে। আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পাশের পরে ৪ বৎসর বুয়েট/বিআইটি থেকে শিক্ষা লাভ করে ডিগ্রি প্রকৌশলী হিসাবে বের হয়ে পরে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করবে। প্রস্তাবিত বিষয়সমূহের কিছুই বাস্তবায়িত হয় নি। সম্ভবত কাঠামোগত পরিবর্তন এবং সেই সাথে বড় ধরনের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ও সময়ের অভাব ইত্যাদি কারণে তা বাস্তবায়িত হয় নি। তাছাড়া অষ্টম শ্রেণী পাশের পর আমাদের দেশের বাস্তবতায় কম ছাত্রই স্বেচ্ছায় টেকনিশিয়ান হতে চাইবে।

৩.০ বর্তমান অবস্থা

৩.১ বৃত্তিমূলক শিক্ষা

আমাদের দেশে ৭-৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে প্রায় ৪০% উত্তীর্ণ হয়। যারা অকৃতকার্য হয় এবং যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ত্যাগ করে তাদের সংখ্যা বিরাট। এদের পুনর্বাসন ও কর্মোপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকলেও সীমিত সুযোগের কারণে এর সামান্য অংশই এই শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান দুই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ভকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ভিটিআই) ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)-এ প্রশিক্ষণ প্রদান ক্ষমতা খুবই সীমিত। ভিটিআইসমূহ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও টিটিসি সমূহ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত। দেশে মোট ৫৯টি ভিটিআই ও ১১টি টিটিসি আছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত বিভিন্ন ট্রেডে ২ পর্যায়ে দুই বৎসর মেয়াদি প্রশিক্ষণ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য) এই প্রতিষ্ঠানসমূহে চালু আছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে মোট ১৮২ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কোর্সে প্রতি বৎসর ১২ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোর্সগুলো বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত নয়। এদের মেয়াদ ২-৩ সপ্তাহ থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত।

এনজিও কর্তৃক পরিচালিত বেসরকারি ট্রেড স্কুল ৫৯টি। ৬ মাস থেকে ৩ বৎসর মেয়াদি কোর্সে এদের মোট আসন সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। এছাড়াও দেশে বহুসংখ্যক বেসরকারি ব্যবসায়িক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নানাভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এদের খুব কম সংখ্যকেরই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন রয়েছে।

দেখা গিয়েছে যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। মাধ্যমিক পাশকরা প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক। তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার আশায় মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এটা হয়ত বর্তমান সামাজিক মূল্যবোধেরই ফল। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দক্ষ ও অর্ধদক্ষ কর্মীর চাহিদা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ভি,টি,আই ও টি,টি,সি হতে পাশকরা ছাত্রদের অধিকাংশ বেকার। নিয়োগকর্তাগণ স্বাভাবিক কারণেই একাডেমিক সনদপত্র অপেক্ষা প্রকৃত দক্ষতার উপর জোর দিয়ে আসছেন। দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় দক্ষতামান প্রতিষ্ঠিত এবং এর দক্ষতা সম্পর্কিত বাস্তব পরীক্ষার সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কাউন্সিল (জ,দ,উ,প,ক) ১৩টি ট্রেডে তিন ধাপ বিশিষ্ট দক্ষতামান গ্রহণ করেছে। তবু কিছু সমীক্ষক লক্ষ্য করেছেন যে নিয়োগযোগ্য দক্ষতা উন্নয়নে নিয়োজিত টি,টি,সি ও ভি,টি,আই সমূহে এমন একটি মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে প্রশিক্ষার্থীগণ শিল্প-কারখানায় শ্রমিক না হয়ে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাদা কলার কর্মী হওয়ার প্রবণতা পোষণ করেন। ফলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। আরও লক্ষ্য করা হয়েছে যে অধিকমাত্রায় হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগের অভাব রয়েছে। একদিকে যেমন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভের জন্য যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাব অপর দিকে দক্ষ কাজে নিয়োজিত সিংহভাগ শ্রমিকের কোন প্রশিক্ষণ নেই, মধ্যস্তরে কারিগরি পদে নিয়োজিত সুপারভাইজারদেরও কোন প্রশিক্ষণ নেই। এ ছাড়া, আনুপাতিক হারে উচ্চস্তরে নিয়োজিত পেশাজীবীদের সংখ্যা মধ্যস্তরে নিয়োজিত কারিগরি পেশাজীবীদের (টেকনিশিয়ান) চেয়ে বেশি। জব মার্কেট এমপ্লয়মেন্ট প্যাটার্নে উল্লিখিত এ তিন ধরনের বৈপরীত্য থাকায় কৃষি, শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে উৎপাদন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অন্য একটি জরিপ থেকে দেখা যায় বিদেশে ক্রমান্বয়ে অধিক হারে অদক্ষ জনশক্তি রফতানির ফলে এ ক্ষেত্রে মাথাপিছু বৈদেশিক মুদ্রার আয় হ্রাস পাচ্ছে।

নব্বই-এর দশকে সরকারি পর্যায়ে ধারণা করা হয় যে ভিটিআই এবং টিটিসির প্রচলিত বৃত্তিমূলক কোর্সসমূহ যথেষ্ট জনপ্রিয় নয়। জনপ্রিয়তার অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি-র সমমানের সনদ লাভের ব্যবস্থা না-থাকা। মনে করা হয় যে, একাডেমিক সনদপত্রের প্রতি জনসমর্থন দক্ষতা–সনদের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জনপ্রিয়তা ও জনমনে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অষ্টম শ্রেণীর পর এস,এস,সি (ভোক) কার্যক্রম চালু করা হয়। এই কার্যক্রম চালু করার নিমিত্তে কোনও বিদেশি সাহায্য পাওয়া যায় নি এবং সম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থায়নে এই প্রকল্প চালু করা হয়। বর্তমানে প্রায় এক হাজারের মত প্রতিষ্ঠানে এই কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। এই কার্যক্রম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, কিন্তু এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির শিল্প কারখানায় হাতে-কলমে কাজ করার দক্ষতা কতখানি বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এতে আদৌ বেকার যুবকের সংখ্যা হ্রাসের সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা এখনও সঠিক ভাবে নিরূপিত হয় নি।

৩.২ ডিপ্লোমা স্তরে কারিগরি শিক্ষা

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে ২০টি পলিটেকনিক (তন্মধ্যে ১টি মহিলা পলিটেকনিক) ইনস্টিটিউটে চার (প্রশিক্ষণ সহ) বৎসর মেয়াদী প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্সে মোট প্রায় ৫০২০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ আছে। (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন তিনটি মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে–গ্রাফিক আর্টস, গ্লাস এন্ড সিরামিকস এবং সার্ভে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহের আসন সংখ্যা ১৭০। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ বা প্রান্তিক পরীক্ষা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নিয়ে থাকে। বন মন্ত্রণালয়াধীন বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক দায়িত্বে রাজশাহী বনস্কুলে মোট ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারে। মুলত এই স্কুলটি কর্মরত বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ৩৬০ টি আসন রয়েছে। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে ৩ বৎসর মেয়াদি মেরিন ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। আসন সংখ্যা ২০।

বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৬টি স্থায়ী ও ২৭টি ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের সব কয়টি বর্তমানে ট্রেড সার্টিফিকেট স্তরে পরিচালিত হচ্ছে, তবে প্রথমোক্ত ৬টিকে ডিপ্লোমা স্তরে উন্নীত করার চিন্তাভাবনা চলছে।

উল্লিখিত শিক্ষায়তনসমূহের পাঠক্রম ও পরীক্ষা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

অফিস, আদালত ও দাপ্তরিক কাজে দক্ষ সহকারী তৈরীতে ৩টি বেসরকারি ও ১৬টি সরকারি বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে মোট ২৫০০ জন ছাত্র ছাত্রীর ভর্তির সুযোগ আছে। এর মধ্যে বেসরকারি তিনটির পাঠক্রম ও পরীক্ষা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের পাঠক্রম ও পরীক্ষা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

গত কয়েক বছর টেকনিশিয়ানদের মধ্যে বেকারত্ব বেড়ে চলছে এবং বর্তমানে দেশে কয়েক হাজার টেকনিশিয়ান বেকার রয়েছে । টেকনিশিয়ানদের বেকারত্ব এবং তার ক্রমবিস্তার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলির শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছে।

১৯৫৪ সালে পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সেই বিবেচনায় যে আমাদের দেশে অধিক সংখ্যায় বৃহদাকার শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং অনেক টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন হবে। ঐ সময় দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা খুবই সীমিত ছিল। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল যেখানে প্রতি বছর মাত্র একশ বিশ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হত। দেশে কিছু সংখ্যক বৃহদাকার শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে তবে আশানুরূপ সংখ্যায় হয় নি। ওদিকে এ-সময়ের মধ্যে বিশটি পলিটেকনিক, চারটি বি,আই,টি এবং একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণ দেশে উন্নয়নমূলক কাজের গতি মন্থর হয়ে যাওয়ায় দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্র অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সিংহভাগের মধ্যে ডিপ্লোমা-উত্তর কোনও যোগ্যতা নেই। কমসংখ্যক শিক্ষকদের শিল্পভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। শিক্ষকগণের মধ্যে কিছু সংখ্যকের তিন মাস মেয়াদি শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা আছে। কিন্তু প্রধান শিক্ষকদের কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই শিল্পে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য স্থাপিত কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ১৯৭৭ থেকে কয়েক বছর বন্ধ থাকাতে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড বহুদিন স্থগিত থাকে।

এদিকে প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র/শিক্ষক অনুপাত ২০:১, যা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি অন্তত ১০:১ হওয়া আবশ্যক। সুযোগ্য শিক্ষক, তাঁদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, শিল্পভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক। সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাতে-কলমে শিক্ষার উপকরণের স্বল্পতা থাকায় ব্যবহারিক শিক্ষা প্রয়োজনীয় মানের নয়। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং 'ডোনেশন' পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগের কারণে মেধাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এগুলোতে ব্যবহারিক শিক্ষার মান উন্নত নয়।

একাডেমিক সুপারভিশন পর্যাপ্ত না-থাকায় মনিটরিং ঠিকমত হয় না, ফলে এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে মানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির অনুকূল পরিবেশের অভাব রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষকদের উচ্চতর ট্রেনিং দেওয়ার জন্য টেকনিক্যাল টিচার্স কলেজে ডিপ্লোমা ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন ও বি এস সি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে। এগুলির মোট আসনসংখ্যা যথাক্রমে ৮০ ও ৪০ জন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এই কলেজে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকলেও এইখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ট্রেনিংয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসে না। Vocational শিক্ষকদের জন্য বগুড়ায় একটি Vocational Teachers Training Institute আছে। সেখানে Certificate in Vocational Education and Diploma in Vocational Education--এ দুই ধরনের পাঠক্রম প্রচলিত আছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় প্রোগ্রাম আবার চালু হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

৩.৩ ডিগ্রিস্তরে প্রকৌশল শিক্ষা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে প্রকৌশল বিদ্যায় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি প্রকৌশল বিষয়াদিতে ডিগ্রি দেওয়া হয়। দেশের ৪টি সাবেক বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এগুলি প্রকৌশল বিদ্যার তিনটি ক্ষেত্রে ডিগ্রি দিয়ে থাকে। নব্য প্রতিষ্ঠিত আরও দুটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল/উচ্চতর প্রযুক্তিতে ডিগ্রি দেওয়া হয়। এছাড়া কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি ও কলেজ অব লেদার টেকনোলজিতে টেক্সটাইল ও লেদার টেকনোলজিতে ডিগ্রি দেওয়া হয়। বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও প্রকৌশল বিষয়ক কিছু ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশে ও বিদেশে পরিচিতি রয়েছে উচ্চমানের শিক্ষাপ্রদানের জন্য। দেশের মেধাবী ছাত্রদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং এর কোর্স সিলেবাস বিশ্বের নামকরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে জন্ম লাভ করে। এখানে বর্তমানে ৫টি অনুষদের অধীন ১৩টি বিভাগে প্রকৌশলবিদ্যা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান ও গণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়াদিতে অবশ্য বর্তমানে কেবল স্নাতকোত্তর (এম.ফিল) ডিগ্রি ও পিএইচডি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে ৮১০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যায়। এবং স্নাতকোত্তর পর্যায় (এম ফিল ও পিএইচডি) ৮০০ জনের গবেষণা করার সুযোগ আছে। (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)। এই প্রতিষ্ঠানের সব ডিগ্রিই আন্তর্জাতিক মানের বলে গ্রহণ করা হয়। তবে গবেষণা কার্যক্রম এখনও আন্তর্জাতিক মানে পৌছাতে সক্ষম হয় নি।

গত ৩০ বৎসর যাবৎ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কোন বড় ধরনের বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ছাড়াই উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে এসেছে। বর্তমানে যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারের সরঞ্জামে আমূল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নবায়ন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের উদ্যোগে উন্নত দেশসমূহের নামকরা প্রতিষ্ঠানের সাথে পাঠক্রম প্রণয়ন ও যৌথ গবেষণা কার্যক্রমের জন্য সংযোগ স্থাপনের কিছু কিছু প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এবং এর মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রম ও গবেষণাকর্মে কিছু উন্নতি সাধন করা গেছে। শিল্প কারখানায় কার্যরত প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবস্থাপকদের জন্য নানা ধরনের শর্ট কোর্স, রিফ্রেসার্স কোর্স প্রভৃতি সাম্প্রতিককালে চালু হয়েছে।

ডিগ্রিস্তরে টেক্সটাইল টেকনোলজি শিক্ষার জন্য ঢাকায় অবস্থিত কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক পর্যায়ে চার বৎসর মেয়াদি কোর্স চালু রয়েছে। বাংলাদেশের মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় অর্ধেকের উৎস বস্ত্র ও পাট শিল্প। এই খাতের জন্য যথোপযুক্ত নেতৃত্বস্থানীয় জনশক্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সবেমাত্র নেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষাকে অনেকটা অবমূল্যায়ন করা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ঘাটতি, ভৌত সুবিধাদির অপ্রতুলতা ও ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি কারণে কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অগ্রসর ভূমিকার দাবিদার এই শিল্পখাত যথোপযুক্ত মানবসম্পদ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার জন্য দক্ষ কর্মী তৈরি করার 'ইনস্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজি' প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫০ সনে। ১৯৭৮ সাল হতে এটিকে কলেজ অব লেদার টেকনোলজিতে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১৯৭৯-৮০ শিক্ষাবর্ষ থেকে চার বৎসর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্সে প্রথম ২০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতার জন্য অনেকেই কোর্সসমাপ্তির আগেই অন্যত্র চলে যায়। টেক্সটাইল কলেজটির ন্যায় এটিও অবমূল্যায়নের শিকার হয়েছে বলে জনমনে প্রতীয়মান হয়। চামড়া দেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দেশজ সম্পদের মান উন্নয়ন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য এই শিল্পখাতে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত মানবসম্পদের বিশেষভাবে ও জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন।

৪.০ প্রধান দুর্বলতা ও ঘাটতিসমূহ

৪.১ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

বর্তমানে বিদ্যমান প্রধান দুর্বলতা ও ঘাটতিসমূহ (Deficiencies) নিম্নে উল্লেখ করা হল :

- শ্রমবাজারের চাহিদা এবং কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহ, এ-দুয়ের মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত বৈসাদৃশ্য (Mismatch)।
- শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফলপ্রসূ দ্বিমুখী আদান-প্রদান (Two-way Communication) ও অংশদারিত্বের (Collaborative Ownership) অনুপস্থিতি
- শ্রমবাজার বিকাশে বন্ধ্যাত্ব, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থবিরতা এবং কারিগরি সনদপ্রাপ্ত যুবকদের বেকারত্ব বৃদ্ধি।
- কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে নমনীয়তার (Flexibility) অভাব।
- শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার (Teaching-Learning Process) গুণগত মানের ক্রমাগত অবনতি।
- কর্ম-পারদর্শিতার (Performance Abilities) ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থী ও শিক্ষকদের অব্যাহত অবহেলা।
- ব্যবহারিক কাজের জন্য কাঁচামাল (Raw Materials) সরবরাহে অপ্রতুলতা।

- বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রমবাজারে প্রবেশে অনীহা; এবং এ শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সহজতর পথ হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতা।
- বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিদপ্তর, ব্যুরো, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে আন্ত-ক্রিয়া (Interactions), সমঝোতা (Understanding), সমন্বয় (Co-ordination) এবং মিথক্রিয়ার (Synergy) অভাব।

৪.২ প্রকৌশল শিক্ষা

- প্রকৌশল শিক্ষায়, বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক দশক যাবত পাঠক্রম ও গবেষণা উপকরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বরাদ্দে অপ্রতুলতা। মেধাবী ছাত্র ও শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও প্রাগ্রসর প্রযুক্তি আত্তীকরণে ও বিকাশে প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।
- শিক্ষকগণের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রমের অভাব।
- পাঠক্রমে সমাজবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান ও যথাযথ সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির সহায়ক বিষয় সংযোজনে অনীহা।
- প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চতর গবেষণা ও Ph D কার্যক্রমের দুর্বলতা।
- পাঠক্রমের বহির্মূল্যায়নের জন্য আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের অভাব।

৪.৩ অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ

প্রকৌশল, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাখাতে বাজেট-বরাদ্দ জাতীয় উন্নয়নে এ ধরনের শিক্ষার গুরুত্বের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব বাজেটের মাত্র ২.৪% কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল। এই বরাদ্দ আরও হ্রাস করা হয় এবং তা ১৯৯৮-৯৯ সনে ১.৪% এ দাঁড়ায়। উন্নয়ন-খাতে বরাদ্দ গত দশকে ০.৪% থেকে ৩.৩% মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার সমূহের উন্নয়ন ও প্রাগ্রসর প্রযুক্তি শিক্ষণে সহায়ক কার্যক্রমের জন্য কোনও অতিরিক্ত/বিশেষ বাজেট-বরাদ্দ করা হয় নি।

৫.০ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষার গোড়াপত্তন ঘটে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। ঐ সময় স্থাপিত শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির অবকাঠামো, পাঠক্রম, পাঠদান-পদ্ধতি, মূল্যায়ন-পদ্ধতি শিক্ষক-নিয়োগ নীতিমালা প্রভৃতি অন্যান্য দেশে তৎকালে প্রচলিত ধারার আলোকেই নিরূপণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলিতে প্রযুক্তি প্রয়োগ ও সফল হস্তান্তরের মাধ্যমে সার্বিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণে অনীহা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি আত্তীকরণের জন্য সহায়ক অবকাঠামোর অভাব প্রভৃতি কারণে আমাদের প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষাব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও অগ্রসর চিন্তার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে নি। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে সেদিন আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম (জাপান ছাড়া) এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব একটা পিছিয়ে না-থাকলেও একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে দেখা গেল আশে-পাশের দেশগুলি অনেক এগিয়ে গেছে এবং প্রযুক্তি আত্তীকরণ-সহায়ক অবকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

৫.১ প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নের পরিবেশ

প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি যদি জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং এ ব্যাপারে একুশ শতাব্দীতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার চিন্তা করা হয় তবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের দক্ষতা ও শ্রমের স্বীকৃতিদান জাতীয় কর্তব্য হতে হবে। প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জাতীয় ভিত্তিতে সর্বস্তরে আনুষ্ঠানিক পর্যায় ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন হবে। এই বিস্তার এমনভাবে হবে যাতে তার প্রভাব কেবল ব্যক্তিজীবনকেই প্রভাবিত করবে না বরং সমগ্র সমাজের জীবনযাত্রা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমেই দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের সঠিক প্রক্রিয়ার সূচনা হবে এবং দেশে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি-পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

৫.২ বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত

একুশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক প্রাগ্রসর প্রযুক্তিশিখন প্রশিক্ষণ ও আত্তীকরণের জন্য কারিগরি ও প্রকৌশল ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত গত শতাব্দীর তুলনায় অনেক জোরদার করা প্রয়োজন হবে। আজকের প্রকৌশল, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পূর্বশর্ত হল ছাত্র/ছাত্রীর বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত। বিজ্ঞান শিক্ষার ভিতটা যথোপযুক্ত না-হলে পরবর্তী পর্যায়ে বৃত্তিমূলক বা পেশাগত শিক্ষা অর্থবহ করে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে পাঠ্য বিষয় সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং বাস্তব সমস্যা-সমাধানে পুঁথিগত জ্ঞানের প্রয়োগে দক্ষতা সৃষ্টি করার পূর্বশর্ত হল তার নিজের বিশ্লেষণ ক্ষমতাবৃদ্ধি, সঠিক প্রশ্ন করার সাহস-সঞ্চার ও সৃজনশীল চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন। শেষোক্ত গুণাবলির আত্তীকরণ কেবল মাধ্যমিক পর্যায়ে সঠিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির শতাব্দীতে একজন স্নাতককে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর ৩-৪ বৎসরের মধ্যেই নতুন প্রযুক্তি মূল্যায়ন, আহরণ ও আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হতে হবে। শ্রেণীকক্ষে যে বিদ্যা অর্জন করেছে সেটা যদি গতিশীল প্রক্রিয়ায় সহায়ক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় তবে অচিরেই সে "সেকেলে" বলে চিহ্নিত হবে। বিজ্ঞানশিক্ষার ভিত শক্ত হলে এবং নতুন জ্ঞান আহরণ করার কৌশল জানলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী একজন স্নাতক গতিশীল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠক্রম এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবর্তন ও পরিচালনা করা প্রয়োজন।

৫.৩ সঙ্কুচিত প্রযুক্তি জীবনচক্র (Life Cycle)

নতুন শতাব্দীতে প্রযুক্তির জীবনচক্র (Life Cycle) প্রতিনিয়তই সঙ্কুচিত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একজন দক্ষ কারিগর, টেকনিশিয়ান বা প্রকৌশলীকে তার চাকরির ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে প্রতিটি প্রযুক্তির জীবনসীমা সমাপ্তির পরপরই পুনরায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের হালনাগাদের ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে একজনের চাকরি জীবনে ৭-১০ বার প্রশিক্ষণ নিতে হবে।.দেশে অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (CET) এবং অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের (CPD) সুযোগ খুবই সীমিত। বিভাগীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত প্রশাসনিক প্রশিক্ষণভিত্তিক। ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট সীমিত আকারে অব্যাহত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিগত দেড়দশক ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি বুয়েট অব্যাহত শিক্ষা দপ্তর খুলেছে। কিছু প্রতিষ্ঠান স্বউদ্যোগে বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তি-বিষয় হালনাগাদ রাখতে পারছে। ব্যাপক ভিত্তিক পেশাগত প্রশিক্ষণের অভাবের ফলে কারখানায় উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদিকায় অদক্ষতার ছাপ থাকছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকভাবে অব্যাহত শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৌশল ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও অব্যাহত পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৪ বিশ্বায়ন, অবাধ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন

বিশ্বায়নের যুগে ও অবাধ বাণিজ্য (বা মুক্তবাজার অর্থনীতি) ব্যবস্থা বাস্তবায়নের আলোকে বিশ্বের সকল দেশের ভোক্তাগণ পণ্য ও সেবার গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক মান সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন। অপর দিকে কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিটি দেশের পণ্য ও সেবা অন্য দেশের পণ্য ও সেবার সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। নিজের দেশের পণ্য, সেবা ও শিক্ষার মানের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে না-পারলে উন্নয়নের গতিধারা ব্যাহত হবে। দেশের নীতি নির্ধারকগণকে বিশেষত যাঁরা কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার সাথে জড়িত, এই বিকাশমান ধারা ও উন্নয়নের গতিধারার উপর তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের শিক্ষাক্রম যাতে বিশ্বমানের বলে বিবেচিত হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য দেশজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহির্মূল্যায়নের (External Peer Review and Accreditation) জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে প্রকৌশল বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে মানের তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানসম্পন্ন দক্ষ কর্মী ও প্রকৌশলীর চাহিদা রয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও উপকরণ বিদ্যায়তনগুলোতে নিশ্চিত করতে হবে। মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিদেশের পেশাগত প্রতিষ্ঠানগুলো কারিগরি ও প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। নতুন শতাব্দীতে বাংলাদেশেও এই বিদ্যায়তনগুলোকে নিয়মিত স্বীকৃতির ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.৫ আধুনিক প্রকৌশল পাঠক্রম

এই শতাব্দীতে উন্নত দেশগুলির প্রকৌশল পাঠক্রমে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, পরিবেশ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং সার্বিক পাঠ্যসূচির প্রায় ১৫% এ সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত। নতুন শতাব্দীর প্রকৌশলী যাতে সঠিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ও বাস্তবধর্মী নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসাবে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্যই এই সব বিষয় প্রতিনিয়ত গুরুত্ব পাচ্ছে। এ ছাড়াও নৈতিকতার বিষয়টি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

সুপারিশ

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
১. ২০২০ সনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা	১.১. প্রকৌশল, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থায় সারাদেশের নগণ্যসংখ্যক শিক্ষার্থীই এই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়। বাস্তবধর্মী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সংখ্যা ২০২০ সনের মধ্যে অন্তত ২০%এ উন্নীত করা দেশের আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষভাবে জরুরি। এর জন্য বিনিয়োগ ও বাজেট-বরাদ্দ বৃদ্ধি, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহ দান, ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। ২০২০ সনের জন্য এ ব্যাপারে বিভিন্ন উপখাতে লক্ষ্যমাত্রা স্থিরকরণ এবং জাতীয় আন্দোলন হিসেবে রূপ দেওয়ার জন্য কালবিলম্ব না-করে কার্যক্রম হাতে নেওয়া প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় টেকনিক্যাল কোর্স প্ররর্তন করতে হবে।	সকল স্তর	অবিলম্বে
২. ছাত্রভর্তি ও নির্বাচন পদ্ধতি	২.১ বৃত্তিমূলক, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র ভর্তিকালে ভর্তিচ্ছু ছাত্র ছাত্রীর সাধারণ মান ও বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত মূল্যায়নের সাথে সাথে স্বাভাবিক প্রবণতা, দেশের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে চিন্তা করার ক্ষমতা, কায়িক শ্রমের প্রতি মনোভাব প্রভৃতি পরীক্ষা করা প্রয়োজন,। এর জন্য প্রয়োজন হবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পন্থায় প্রণীত নির্বাচনপদ্ধতি। বিভিন্ন স্তরের প্রশ্নমালা ও নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন হাতে কাজ করার দক্ষতা পরিমাপ করা প্রয়োজন তেমনি আরেক প্রান্তে প্রকৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রের বিজ্ঞান শিক্ষার মূল্যায়ন করাও অবশ্য কর্তব্য। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে ছাত্রভর্তি ও নির্বাচন পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে যাতে ছাত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।	সকল স্তরে	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
৩. শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	৩.১ শিক্ষক নিয়োগের এবং শিক্ষকের পদোন্নতির প্রত্যেক পর্যায়ে একাডেমিক কমিটি/বোর্ড কর্তৃক তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং কাজের মানের ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রণীত সুপারিশ বিবেচনা করতে হবে। সকল পর্যায়ে সিস্টেমের বাইরে উচ্চতর শিক্ষিত ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রার্থীদের প্রতিযোগিতা করার সুযোগ থাকতে হবে।	সকল স্তর	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
	৩.২ বৃত্তিমূলক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের কোন বিধিনিষেধ থাকবে না এবং এরূপ শিক্ষকের চাকরিকাল ৬৫ বৎসর পর্যন্ত হবে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সুযোগ্য ব্যক্তিদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।	বৃত্তিমূলক	অবিলম্বে
	৩.৩ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ১৫ করার প্রয়োজন।	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	দীর্ঘমেয়াদি (৫-৮ বৎসর)
	৩.৪ সর্বস্তরে সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের শিল্পকারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।	সকল স্তর	অবিলম্বে
	৩.৫ টিটিসিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। ভিটিটিআইতে বৃত্তিমূলক শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ডিগ্রি কোর্স খুলতে হবে। শিক্ষকপ্রশিক্ষণের সকল ক্ষেত্রে প্রাকচাকরি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। এছাড়া দূরশিক্ষণের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা দরকার।	বৃত্তিমূলক	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৩.৬ বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা শিক্ষাক্ষেত্রে সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের জন্য দেশবিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং স্বল্পমেয়াদি কোর্স, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে আপগ্রেডিং ও আপডেটিং-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থাসহ শিক্ষক-প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে প্রাকচাকরি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	দীর্ঘ মেয়াদি (৫-৮ বৎসর)
	৩.৭ বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধান ও সিনিয়র শিক্ষকের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৩.৮ বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, শিল্পকারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা, শিখন-শিক্ষণে জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং কাজের মান ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৩.৯ প্রকৌশলী শিক্ষকদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।	প্রকৌশল	অবিলম্বে
৪. শিল্প কারখানা ও নিয়োগকারী সংস্থার সাথে সম্পর্ক	৪.১ শিল্প-কারখানার সাথে প্রকৌশল, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবিড় সম্পর্ক গড়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্রদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং শিক্ষকদের শিল্প-কারখানা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিল্প-কারখানার প্রতিনিধি সমন্বয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যায়। শিল্প-কারখানার প্রতিনিধিদের একাডেমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে।	সকল স্তর	অবিলম্বে

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
	দেওয়া যেতে পারে। এরূপভাবে প্রাপ্ত অর্থ প্রতিষ্ঠানের আবর্তক বাজেটের সঙ্গে সমন্বয় করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যয় করতে দিতে হবে।		
৫. পাঠসূচি/ শিক্ষাক্রম/ শিক্ষাদান প্রযুক্তি	৫.১ কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম নিয়মিতভাবে সংশোধিত পরিমার্জিত করতে হবে। এ জন্য একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা যেতে পারে। (সুপারিশ নং ৯.৩ দ্রষ্টব্য) শিক্ষাক্রমের ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক ক্লাসের সময় বণ্টনের বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	অবিলম্বে
	৫.২ বেকার সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে যে সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা আছে সেসব ট্রেডে/ টেকনোলজিতে স্বল্পকালীন নমনীয় (flexible) কোর্স প্রবর্তন করলে ফল ভাল হবে। এ কোর্স সান্ধ্যকালীন, দূরশিক্ষণ কিংবা মোবাইল ইউনিটের মাধ্যমে করা যেতে পারে।	বৃত্তিমূলক	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৫.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে বর্তমান প্রচলিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় ক্রেডিট আওয়ারভিত্তিক কোর্স স্ট্রাকচার প্রণয়ন করার প্রয়োজন আছে। জাতীয় পর্যায়ে ক্রেডিট-আওয়ারের মান নির্ধারণ, অনুমোদন, বদলির ব্যবস্থা করতে হবে। আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল পদ্ধতিতে অর্জিত ক্রেডিট/প্রায়র লার্নিং জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষায় ভর্তির জন্য গ্রহণযোগ্য করতে হবে। একইভাবে যে কোন উপায়ে অর্জিত (প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক/ স্বীয়-শিখন) পূর্ব জ্ঞান-দক্ষতার (Recognition of Prior Learning) স্বীকৃতি দিতে হবে।	সকল স্তর	অবিলম্বে
	৫.৪ বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে স্কুল থেকে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় দক্ষতা মানের বিভিন্ন ট্রেডে উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এতে নতুন অবকাঠামোর প্রয়োজন পড়বে না।	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৫.৫ প্রকৌশলের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময়ে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক নীতিশিক্ষা বিষয় কোর্স চালু করা উচিত।	প্রকৌশল	অবিলম্বে
	৫.৬ দেশের প্রচলিত বিভিন্ন স্তরে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার মূল্যায়ন এবং মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পেশাগত/বিশেষজ্ঞ সংস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা দরকার।	সকল স্তর	দীর্ঘ মেয়াদি (৫-৮ বৎসর)
	৫.৭ শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও শিক্ষাদান-প্রযুক্তি আধুনিকীকরণের জন্য আশু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কম্পিউটার-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সকল স্তরে ব্যাপকভাবে প্রচলনের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে ছাত্রদের পরীক্ষাগারসমূহের পাঠক্রম আধুনিক ও অর্থবহ করে তুলতে হবে। দেশে টিভি'র প্রসারের সাথে সাথে বৃত্তিমূলক, ডিপ্লোমা	সকল স্তর	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
	৪.২ সর্বস্তরে সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে এবং দূরশিক্ষণের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	সকল স্তর	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৪.৩ বিদ্যায়তন ও শিল্প-কারখানার যৌথ উদ্যোগে নানাবিধ স্যান্ডউইচ (Sandwich) ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রবর্তন করা যেতে পারে। এতে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ উন্নত ও জোরদার হবে। এসব কার্যক্রম বিটিইবি বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং জাতীয়ভিত্তিক সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।	বৃত্তিমূলক	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৪.৪ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যৌথ গবেষণার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে এজন্য নিবিড় যোগসূত্র থাকার প্রয়োজন আছে।	প্রকৌশল	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৪.৫ সকল স্তরের কোর্সগুলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প-কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাপক অবকাশ, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশি ও ব্যবহারিক কোর্স অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। শিল্প কারখানাগুলোতে শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। উপরিউক্ত অবস্থার বিদ্যায়তনের সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নবিশি শিল্পক্ষেত্রের বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে গবেষণায় দেশের সকল পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স ও চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।		
	৪.৬ প্রশিক্ষণ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট শিল্প-কারখানাকে আয়কর রেয়াত/ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যানুযায়ী আর্থিক মঞ্জুরী বা অন্য কোন বিকল্প সুবিধে বিবেচনা করতে পারেন।	সকল স্তরে	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৪.৭ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্প প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অতিথি বক্তা হিসেবে নিয়োগ করার এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিষয়ক পরিষদে শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংস্থার একাধিক প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে পারে।	সকল স্তর	অবিলম্বে
	৪.৮ বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা শিক্ষা ব্যয়বহুল বলে এসকল প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ভৌত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এগুলোর অব্যবহৃত সময়ে বা ছুটির দিনে বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য সুযোগ	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	অবিলম্বে

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
	ও ডিগ্রি এবং প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব হবে। এর জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কম্পিউটারের ব্যবহার ও কম্পিউটার নির্ভর কিছু কিছু পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা উচিত।		
৬. অত্যাধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা, গবেষণা ও নুতন পাঠক্রম সংযোজন	৬.১ প্রকৌশল শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাগ্রসর বিষয় শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও উৎসাহ প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। সম্ভাবনাময় প্রাগ্রসর বিষয়গুলিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। এই বিষয়গুলির মধ্যে থাকতে পারে কম্পিউটার প্রকৌশল, বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সৌরশক্তি প্রযুক্তি প্রভৃতি।	প্রকৌশল	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৬.২ প্রকৌশল ক্ষেত্রের গবেষণার বিষয়ে সরকারের দিকনির্দেশনা প্রদানসহ সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও অর্থায়নের জন্য সংযুক্ত সংস্থা বা দফতর হিসেবে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ কাউন্সিল গঠন করা যায়।	প্রকৌশল	দীর্ঘমেয়াদি (৫-৮ বৎসর)
	৬.৩ সকল স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত শক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুবা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা ব্যাহত হবে। বর্তমানের হাইস্কুল পর্যায়ের স্কুলগুলিতে খুব শিগগীরই কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সংযোগ হবে। স্কুল পর্যায়ে ICT সম্পর্কিত বেসিক শিক্ষাদান কর্মসূচি প্রবর্তন করতে হবে।	সকল স্তর	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৬.৪ শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।	ডিপ্লোমা স্তর	দীর্ঘ মেয়াদি (৫-৮ বৎসর)
৭. অব্যাহত শিক্ষা ও (CPD) উচ্চস্তরে শিক্ষা লাভের সুযোগ	৭.১ বর্তমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জীবনচক্র ছোট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়ায় চাকরিতে নিয়োজিত পেশাজীবী প্রকৌশলীদের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বা অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকহারে চালু করা উচিত। এ ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ এবং পেশাগত সংগঠন আইইবিকে শক্তিশালীকরাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা প্রদানের লক্ষ্যে মড্যুলার কোর্স চালু করা যেতে পারে।	প্রকৌশল স্তর	অবিলম্বে
	৭.২ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও কারিগরদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল বিদ্যায়তন ইনস্টিটিউটগুলোতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আইইবির মাধ্যমে ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে যে পেশাগত শিক্ষা চালু আছে তার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হালনাগাদ করে তাকে আরও জোরদার করে দেশের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলে সম্প্রসারিত করতে হবে।	ডিপ্লোমা স্তর	অবিলম্বে

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
	৭.৩ বৃত্তিমূলক কোর্সের মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য প্রকৌশল ডিপ্লোমাসহ সমপর্যায়ের অন্যান্য ডিপ্লোমা কোর্সে কমপক্ষে ২০% আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। এ ছাড়া, সাধারণ শিক্ষাসহ নিজ নিজ পর্যায়েও স্পেশালাইজেশন অনুযায়ী অন্যান্য বিশেষ ধারায় উচ্চ শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।	বৃত্তিমূলক	অবিলম্বে
৮. দক্ষতা প্রাপ্তির মান নিশ্চিতকরণ ও অনানুষ্ঠানিক দক্ষতার জাতীয় স্বীকৃতি	৮.১ এস,এস,সি (ভোক) ও এইচ, এস,সি (ভোক) কার্যক্রম হতে সনদপ্রাপ্তদের দক্ষতার মান শ্রমবাজারে স্বীকৃত মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করতে হবে এবং "সাদা কলার" মানসিকতা ও কেবল উচ্চ শিক্ষার সনদ লাভের প্রবণতা দূর করতে হবে। শ্রমবাজারে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা নিশ্চিত করতে হবে এবং এই শিক্ষা/প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বহির্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিল্প-কারখানার দক্ষ কর্মীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। বেসরকারি খাতে এস,এস,সি (ভোক) ইতোমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে দ্রুত-স্বীকৃত এ সব নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও ওয়ার্কশপ/ইকুইপম্যান্ট থাকা নিশ্চিত করতে হবে। এইচ,এস,সি (ভোক) স্তরের আরও সম্প্রসারণের পূর্বে শিক্ষার্থীরা উচ্চ দক্ষতা/যোগ্যতা অর্জন করে শ্রমবাজারমুখী হচ্ছে কিনা তা স্টাডি করা প্রয়োজন। বর্তমান গ্লোবাল পরিবেশে জাতীয় দক্ষতামান (National Skills Standards) সম্পর্কেও নতুন করে ভাবতে হবে।	বৃত্তিমূলক	অবিলম্বে
	৮.২ Inspection ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং অন্তত কোন প্রতিষ্ঠানে বৎসরে যেন দুই বার Inspection হয় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। মনিটরিং ব্যবস্থা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে করার প্রয়োজন। বর্তমানের কাঠামোতে এই মনিটরিং ভালভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। বৃত্তিমূলক পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরও পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ল্যাবরেটরিগুলিতে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা ও প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করা। জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে থানা পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা ও জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোকেশনাল ও কারিগরি শিক্ষার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করতে হবে।	বৃত্তিমূলক	অবিলম্বে
	৮.৩ সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক সকল দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অভিন্ন শৃঙ্খলার আওতায় আনা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে একটি নিবন্ধিকরণ অধ্যাদেশ বা আইন প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এগুলির নিবন্ধিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং তদনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান সাপেক্ষে অনুদান প্রদান করা প্রয়োজন।	বৃত্তিমূলক	অবিলম্বে

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
	৮.৪ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা অনুসারে বর্তমান তিনটি ধাপে বা গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে। যিনি সর্বোচ্চ ধাপ অর্জন করতে সক্ষম হবেন তাঁর সুনিপুণ দক্ষতার সাথে সাথে দীর্ঘদিন কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কয়েকটি উন্নত ও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এ ধরনের, বা আরও অধিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মীকে বৃত্তিমূলক পেশায় “মাস্টার ক্রাফটসম্যান” ও টেকনিশিয়ান পর্যায় “মাস্টার টেকনিশিয়ান” নামে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং আর্থসামাজিক মূল্যায়নে তাঁরা যে কোন প্রকৌশলীর সমমানের স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশেও অনুরূপ স্বীকৃতিদানের সময় এসেছে।	বৃত্তিমূলক	দীর্ঘ মেয়াদি (৫-৮ বৎসর)
৯. প্রশাসনিক কাঠামো ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা	৯.১ প্রতিটি ভিটিআই/টিটিসি এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। এই পরিষদে শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় শিল্পপতি ও অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধি থাকতে হবে। বিটিইবি এই উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করবে এবং এর কার্যপ্রণালী (Rules of Business) নির্ধারণ করবে।	বৃত্তিমূলক	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৯.২ কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে শিক্ষার বিস্তার ও মানবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে আরও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। একই সাথে কারিগরি শিক্ষার যথাযথ প্রসারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	৯.৩ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সকল স্তরেই পাঠক্রম পর্যালোচনা, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের জন্য গতিশীল আনুষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থা বা স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনের নিরিখে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিউদ্যোগে পরিচালিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার নীতিনির্ধারণ, সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি এবং মাননির্ধারণ, উন্নয়ন, সমতাবিধান ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি স্বশাসিত ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে। এটি বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা এবং কর্মক্ষেত্রের সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে গবেষণাকার্য পরিচালনা করবে।	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	দীর্ঘ মেয়াদি (৫-৮ বৎসর)
	৯.৪ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কাউন্সিল (জাদউপ্রক) দেশের দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অধিদপ্তর পরিচালিত সরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহ, দেশি-বিদেশি এনজিও পরিচালিত সরকারি ট্রেনিং কর্মসূচি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ইনস্টিটিউট ব্যবসায়িক কেন্দ্রসমূহের শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচি অনুমোদন, পরীক্ষাগ্রহণ ও	বৃত্তিমূলক	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
	সনদ প্রদান করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। জাতীয় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সংযোগ আরও দৃঢ়, কার্যকর ও বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাদপ্রউক-এর সাচিবিক দায়িত্ব কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করে দেশের ট্রেড দক্ষতার মানসমূহের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বৃত্তিমূলক শাখাকে আরও জোরদার করা প্রয়োজন।		
১০. অর্থায়ন এবং আয় বৃদ্ধি	১০.১ মোট শিক্ষাবরাদ্দের অধিকতর অংশ ক্রমান্বয়ে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ করতে হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যয়ের বড় অংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে আসা উচিত। সংশ্লিষ্ট শিল্প-কারখানার উৎপাদন ব্যয়ের একটি উপযুক্ত অংশ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে শিল্প হিসেবে বিবেচনাপূর্বক এ ক্ষেত্রে সহজ শর্তে, স্বল্পসুদে শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা ঋণ ও অনুদান দিয়ে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে হবে।	বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	১০.২ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্র বেতন বার্ষিক ১৮০/- টাকা আর ছাত্র প্রতি খরচ হয় প্রায় ৪০,০০০/- টাকা। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করে এ অর্থের কিছুটা যোগান দেয়া সম্ভব কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে। রাষ্ট্রীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয় বাড়াতে হলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এই দেশে ক্যাডেট কলেজসমূহে অভিভাবকের আয়ের সাথে সংগতি রেখে ছাত্রদের বেতন নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটিপতি পরিবারের সন্তান ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের কাছ থেকে একই ধরনের ফি আদায় করা হয় (যার পরিমাণ অতি নগণ্য) এবং তারা একই ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে। এ পদ্ধতিটি পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।	প্রকৌশল	দীর্ঘ মেয়াদি (৫-৮ বৎসর)
	১০.৩ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে এই পেশায় শিক্ষকদের পর্যাপ্ত/সম্মানজনক বেতন ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। এইখানে উল্লেখ্য যে, Technical/ Professional teacher-দের সব শিক্ষকের মতো সমপর্যায়ের বেতন ভাতায় আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। কাজেই এই ধরনের শিক্ষকদের টেকনিক্যাল পে হিসাবে কিছুটা হলেও extra incentive দেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।	সকল স্তর	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	১০.৪ ভিটিআই, টিটিসি ও অন্যান্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/ কেন্দ্রে উৎপাদন ও সেবা কেন্দ্র (Production cum Service Centre) গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক/ শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সকলেই এই কেন্দ্রের আয়ের সুবিধা ভোগ করবে। নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	বৃত্তিমূলক	অবিলম্বে

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
১১. বিবিধ	১১.১ মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ সুযোগ দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Women Training Centre) স্থাপন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা গারমেন্টস, প্যারামেডিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার, বিউটি কেয়ার, ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন সেলাই, বাঁশ বেতের কাজ ইত্যাদিতে বিভিন্ন মেয়াদি কোর্স চালু করা যেতে পারে।	বৃত্তিমূলক	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	১১.২ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তি, উপবৃত্তি ও অনুদান প্রদান এবং সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য অধিক উপযোগী ট্রেড/ টেকনোলজির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।	বৃত্তিমূলক	মধ্যম মেয়াদি (৩-৫ বৎসর)
	১১.৩ সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যেই Entrepreneurship বিষয় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করছে। বর্তমান প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীর স্বকর্মসংস্থানের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ঝোঁক, সামর্থ্য, আগ্রহ ও উদ্যোগ সমীক্ষা করা এবং তাদের কর্মসংস্থান বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করার জন্য পরামর্শ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজের উপযুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ব্যাংক-ঋণের ব্যবস্থা, প্রাথমিক পর্যায়ে আয়কর মওকুফ, বিনা খরচে কারিগরি ও অন্যান্য পরামর্শদানের ব্যবস্থা করতে হবে।	বৃত্তিমূলক	অবিলম্বে
	১১.৪ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৌশল শিক্ষাক্রমের অধিকাংশ বইপুস্তকই ইংরেজিতে রচিত। চাকরি জীবনে প্রকৌশলীদের প্রকল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। এ জন্য মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই ছাত্রদের ইংরেজির ভিত মজবুত করতে হবে। বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানদানের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরকে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় জ্ঞানদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল স্তর	অবিলম্বে

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালা		
	১১.৫ কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বর্তমান বরাদ্দকৃত শিক্ষা-উপকরণ ও প্রাকটিক্যাল ক্লাশের জন্য কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের ব্যয় নিতান্তই অপ্রতুল। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে।		
	১১.৬ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক পঠন-পাঠন কৌশলের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন কৌশল প্রবর্তনের ব্যবস্থা নিতে হবে।		
	১১.৭ অন্ততপক্ষে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষানুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		
	১১.৮ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা একটি প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং কর্মক্ষেত্রে হরাইজন্টাল ও ভার্টিকেল ধারাকে সমন্বিত করা যায় এবং সব রকম বৈষম্য দূরপূর্বক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা যায়।		
	১১.৯ জীবনমুখী শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে উপযুক্ত সমন্বয়ের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান প্রবর্তন করলে এ বিষয়ে সকলে পারদর্শী হবে, যা কর্মক্ষেত্র ছাড়া নিজের জীবনযাপনেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।		
	১১.১০ কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযোগী হওয়া ছাড়াও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সামাজিক বন্ধন ও ঐক্য সৃষ্টিতেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। এ জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে হতে হবে "Comprehensive" এবং "inclusive". এবং আরও বেশি open এবং flexible। এ শিক্ষায় থাকতে হবে, – সমাজের সকল স্তরের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুন:প্রশিক্ষণ তথা জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ; – প্রার্থীদের সুবিধামত সময়ে অংশগ্রহণের সুযোগ; – In Campus, Off Campus এবং online এর সুযোগ; – গৃহিনী, বৃদ্ধ/বৃদ্ধা কিংবা ছাটাইকৃতদের জন্য নতুন দক্ষতার প্রশিক্ষণ-সুযোগ; – শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও বাদপড়া গ্রুপের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যাতে তারা মূল ধারায় প্রবেশ করতে পারে।		

বিষয়	সুপারিশ	প্রযোজ্য স্তর	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল
	১১.১১ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা হবে – ক্যারিয়ার গঠনের হাতিয়ার – একাডেমিক অর্জন এবং আরও শেখার আগ্রহ সৃষ্টিকারী – কর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জনে-সহায়ক (দেশে এবং বিদেশে) এবং – জীবনব্যাপী শেখার পথ রচনাকারী। ১১.১২ জাতীয়ভাবে পরিবর্তনশীল কারিগরি জনবল নির্ধারণের জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকবে।		

সারণি-১

সরকারি ৫৯ টি VTI-তে ট্রেডসমূহ ও আসনসংখ্যা

	১৬৮০
অটোমোবাইল	৫৪০
মেশিনিস্ট	৪৫০
অডিও ভিডিও	৬৯০
রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং	৫১০
ওয়েল্ডিং	৬৯০
ড্রাফটিং (সিভিল)	১২০
বিল্ডিং মেইনটেনেন্স	২৭০
কম্পিউটার এপ্লিকেশন এন্ড অপারেশন	৮৪০
উড ওয়ার্কিং এন্ড কেবিনেট ডিজাইন	১২০
ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং	৩৯০
পোল্ট্রি রিয়ারিং এন্ড ফার্মিং	১৮০
ফার্ম মেশিনারি	১১৪০
ফিস কালচার এন্ড ব্রিডিং	১৫০
মোটঃ	৭৭৭০

সারণি-২

এস এস সি পর্যায়ে বিভিন্ন ট্রেডের আসন ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

		প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আসনসংখ্যা
এস. এস. সি (ভোক)		সরকারি	৫৯	৫১৮০
টিটিসি-১১ ভিটিআই-৫৯ টেক্সটাইল-৩০ গ্লাস এন্ড সিরামিক-১	এস. এস. সি (ভোক)	সরকারি	১০১	১২,২৭০
এস. এস. সি (ভোক)		বেসরকারি	১০০৬	৬৫,২৪৯
বেসিক ট্রেড নবম ও দশম		সরকারি বেসরকারি	৮ ৭৫	৭৩০ ৩৪১০
এইচ এস সি (বি এম)		বেসরকারি	৭৮৫	৩৯,৩৪০
দাখিল(ভোক)		সরকারি	১০০	৪০০০

সারণি-৩

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রান্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীন ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে আসনসংখ্যা

বিভাগ	সরকারি	বেসরকারি
সিভিল	১১৮০	১৫০
ইলেকট্রিক্যাল	৯০০	২৩০
মেকানিক্যাল	৭৪০	-
অটোমোবাইল	৪৬০	-
রিফ্রিজারেশন	২২০	-
ইলেকট্রনিক্স	৫৬০	৭৯০
কম্পিউটার	৭৮০	২৪২০
আর্কিটেকচার	৮০	১৫০
কেমিক্যাল	৪০	৩০
ফুড	৪০	-
উড	২০	-
মোট	৫০২০	৩৭৭০

এই ছাড়াও নিম্নবর্ণিত ডিপ্লোমা কোর্সসমূহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চালু আছে। নিম্নে সিট সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও কোর্সগুলির মেয়াদ দেওয়া হল। ডিপ্লোমা কোর্সগুলি ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি।

কোর্সের নাম	প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আসনসংখ্যা
ডিপ্লোমা ইন কমার্স (২ বৎসর মেয়াদি)	বেসরকারি	৭	৫৬০
ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল (৪ বৎসর মেয়াদি)	সরকারি বেসরকারি	৬ ৬	৩৬০ ৩৬০
ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার (৩ বৎসর মেয়াদি)	সরকারি বেসরকারি	১২ ২১	২৩০০ ২৮৬০
ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি (৩ বৎসর মেয়াদি)	সরকারি	১	৫০
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (সার্ভে)	সরকারি	২	২৪০
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (গ্লাস) ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (সিরামিক)	সরকারি	১	৪০ ৪০
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (অফসেট) ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (রিপ্রোডাকশন)	সরকারি	১	২৫ ২৫
ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং (৩ বৎসর মেয়াদি)	সরকারি	১	২০

সারণি-৪

প্রকৌশল শিক্ষাব্যবস্থায় আসনসংখ্যা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

বিভাগ	আন্ডার গ্রাজুয়েট	পোস্ট গ্রাজুয়েট	পি-এইচ ডি প্রোগ্রাম
কেমিকৌশল বিভাগ	৬০	১২	-
বস্ত্র ও ধাতব কৌশল বিভাগ	৩০	৮	-
পুরকৌশল বিভাগ	১৮০	১৮০	২
পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ	৩০	৪৫	-
যন্ত্রকৌশল বিভাগ	১৩০	৫৩	১
নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ	১৫	৫	-
আই পি ই বিভাগ	৩০	৯৫	২
তড়িৎ ও ইলেকঃ কৌশল বিভাগ	১৩০	৯২	৭
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিঃ বিভাগ	১২০	৫২	১
স্থাপত্য বিভাগ	৫৫	১৬	-
ইউ আর পি বিভাগ	৩০	৫০	২
রসায়ন বিভাগ	-	৩১	১
গণিত বিভাগ	-	১৫	-
পি এম আর ই বিভাগ	-	২০	-
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ	-	৪৬	৭

আন্ডার গ্রাজুয়েট

বিভাগ	খুলনা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	ঢাকা
পুরকৌশল	১২০	১২০	১২০	১২০
যন্ত্রকৌশল	৬০	৬০	১২০	৬০
তড়িৎ ও ইলেকঃ কৌশল	১২০	১২০	৬০	১২০
কম্পিউটার কৌশল	৬০	৬০	৬০	৬০
ইলেকট্রনিক এন্ড কমিউনিকেশন	৩০	-	-	-
মোট=	৩৯০	৩৬০	৩৬০	৩৬০

পোস্ট গ্রাজুয়েট

নতুন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সাবেক বি আই টি)

বিভাগ	খুলনা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	ঢাকা
পুরকৌশল	১৫	১৫	১৫	১৫
যন্ত্রকৌশল	১৫	১৫	১৫	১৫
তড়িৎ ও ইলেকঃ কৌশল	১৫	১৫	১৫	১৫
কম্পিউটার	-	-	-	-
ইলেকট্রনিক এন্ড কমিউনিকেশন	১৫	১৫	১৫	১৫
আই পি এম বিভাগ	১০	-	-	-
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ	১৫	-	-	-
রসায়ন বিভাগ	১০	-	-	-
গণিত বিভাগ	১৫	-	-	-
মোট=	১১০	৬০	৬০	৬০

পি-এইচ ডি প্রোগ্রাম

বিভাগ	খুলনা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	ঢাকা
তড়িৎ ও ইলেকঃ কৌশল	৩	-	-	২
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ	২	-	-	-
পুরকৌশল বিভাগ	১	-	-	১
গণিত বিভাগ	২	-	-	-
মোট =	৮	-	-	৩

মূল রচনা :

প্রফেসর আলী মর্তুজা; প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ।

চিকিৎসা শিক্ষা

১.০ জাতীয় উদ্দেশ্য

চিকিৎসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্যকর শিক্ষা সংগঠনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন শাখার পেশায় পারদর্শী, মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, কল্যাণকামী ও উন্নয়নধর্মী মানবসম্পদ উন্নয়ন যাদের সম্মিলিত অবদানে দেশের জনগণের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

২.০ ভূমিকা

দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অপুষ্টিজর্জরিত ও স্বল্পশিক্ষিত একটি বিশাল ও বর্ধিষ্ণু জনসমষ্টি নিয়ে বাংলাদেশ একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে। অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, পশ্চাদপদ মানসিকতা, বিকাশমান গোষ্ঠীস্বার্থ, বিপর্যস্ত ব্যবস্থাপনা ও সর্বোপরি ক্ষয়িষ্ণু নৈতিকতা জাতীয় উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও বিশাল বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্য এবং সেবার (Commodities and Services) বিশ্বময় চাহিদা ও সরবরাহ একটি জটিল রূপ ও সম্পর্ক ধারণ করেছে। মুক্ত বাজার ও অবাধ বিপননের পরিপ্রেক্ষিতে সেবা ও পণ্যের মান গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো একটি স্বল্প গতিসম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি স্বাস্থ্যবান ও কর্মপ্রাচুর্যে উদ্দীপ্ত জনশক্তি আবশ্যক।

স্বাধীনতাত্তোর তিন দশকের বহুমুখী স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন, আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি, সংক্রামক রোগের দমন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার সংকোচন, পুষ্টি অবস্থার উন্নতি, মৌলিক স্যানিটেশন অর্জন ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধে-গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও সার্বিক নাগরিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও আশানুরূপ নয়। প্রথম প্রজন্মের রোগ-ব্যাধির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জনের আগেই উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার, জরা ও আঘাতজনিত পঙ্গুত্বের মত দ্বিতীয় প্রজন্মের রোগ ব্যাধির বিস্তার জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা কর্মকাণ্ডে অর্জিত সুফল ম্লান করতে শুরু করেছে। ডেঙ্গু ও এইডস্-এর মতো নবাগত (Emerging)এবং যক্ষ্মা. কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার মত পুনরাগত (Re-emerging) রোগগুলি সার্বিক জনস্বাস্থ্যের জন্য দৃশ্যমান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি, সহিংসতা ও সন্ত্রাস, বৃক্ষ নিধন, বায়ু ও (আর্সেনিক জনিত) পানি দূষণসহ সার্বিক পরিবেশের বিপর্যয় জনস্বাস্থ্যের জন্য অদূরবর্তী অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা নবীন, প্রবীণ ও মধ্য বয়সের জনসংখ্যার সমানুপাত ও স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনার জন্য একটি জটিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

তিন প্রজন্মের রোগ-ব্যাধি ও তিন প্রজন্মের জনসংখ্যার সমানুপাত স্বাস্থ্য সেবায় সীমিত সম্পদ বন্টন ও ব্যবস্থাপনায় ক্রমশ জটিল সমস্যা সৃষ্টি করছে। সাধারণভাবে সেবাদানকারীদের সেবাসুলভ মনোভাবের ঘাটতি ও সেবামানের প্রতি ব্যবস্থাপকদের যথার্থ মনোযোগের অভাবে বিদ্যমান সম্পদের সন্তোষজনক ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না। সামগ্রিক বিবেচনায় দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান দিনে দিনে এক দুরূহ কর্মে পরিণত হচ্ছে।

এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজন একটি অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য এবং অবকাঠামো, প্রযুক্তি, মানবসম্পদ ও কর্ম-নিষ্ঠার সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য পেশায় পারদর্শী এবং মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, কল্যাণকামী ও উন্নয়নধর্মী মানবসম্পদ তৈরি অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে দেশের স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন শাখায় পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের উপযুক্ত পরিকল্পনা ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার সংগঠন সময়ানুগ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত শিক্ষাবিষয়ক এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.০ বাংলাদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞান-শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ

সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন মানুষের অস্তিত্বের সমকালীন এবং তার অস্তিত্বের সমার্থক। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্ব বহন করে চলেছে। ঐতিহ্যগত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষার পাশাপাশি এ দেশে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার সূত্রপাত হয় বৃটিশ শাসনামলে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে মেডিকেল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে। সেই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও ময়মনসিংহে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে একটি করে মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। এইসব স্কুল থেকে Licentiate in the Medical Faculty (LMF) ডিগ্রি প্রদান করা হতো। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে ব্রিটিশ পরিচালিত শিক্ষা বর্জনের লক্ষ্যে ঢাকায় ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৬ সালে ঢাকায় দেশের প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে এদেশে সর্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি চালু হয়। ১৯৬৫

সাল নাগাদ উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেতের রয়েল কলেজগুলিই ছিল প্রধান অবলম্বন। ঐ সালে পাকিস্তান কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স ও সার্জন্স এবং ঢাকায় আই.পি.জি.এম.আর. প্রতিষ্ঠিত হলে ক্লিনিক্যাল বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তারপর থেকে দেশে নানা বিষয়ভিত্তিক বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচলন হয়। গ্রামীণ জনপদের চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেডিকেল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হলেও এক পর্যায়ে এর কার্যক্রম সংকোচন করা হয়। বর্তমানে দেশে দুই স্তরবিশিষ্ট মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। মেডিকেল কলেজসমূহে স্নাতকপূর্ব কোর্স ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিষয়ভিত্তিক স্নাতকোত্তর কোর্স পরিচালিত হয়। ১৯৯৮ সালে দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার অধিকতর উন্নতিকল্পে আই.পি.জি.এম.আর.কে উন্নত করে প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়। দেশের প্রথম ডেন্টাল কলেজ হিসেবে ১৯৬১ সালে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। আই.পি.জি.এম.আর স্থাপনের পর সেখানে একটি ডেন্টাল ইউনিট গড়ে তোলা হয় এবং পরবর্তী সময়ে এখানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ডি.ডি.এস কোর্স চালুর মাধ্যমে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ৩টি জুনিয়র নার্সিং স্কুলে নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে একটি সিনিয়র নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে ডিপ্লোমা নার্সিং শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ১৯৬০ সালে জুনিয়র স্কুলগুলি বন্ধ করে ১৯৬২-১৯৭০ সালের মধ্যে ৮টি পুরাতন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে সিনিয়র নার্সিং ট্রেনিং কার্যক্রম চালু করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মহাখালিতে একমাত্র নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মেডিকেল কৌশলীদের শিক্ষার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বেই মহাখালিতে ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজী প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে শুধু স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও পরবর্তী সময়ে আরও ৬টি বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়।

আবহমানকাল থেকে দেশে হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু থাকলেও ১৯৮৯ সালের পূর্বে এই সকল শাস্ত্রে শুধু ডিপ্লোমা কোর্স চালু ছিল। ১৯৮৯ সালে ঢাকায় প্রথম বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও পর্যায়ক্রমে ১৯৮৯ সালে সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও দেশজ মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে প্রচলিত ব্যবস্থায় স্নাতক কোর্স চালু হয়।

স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

৪.০ মেডিকেল শিক্ষা

৪.১ ভূমিকা

বর্তমানে দেশে সরকারি ১৩টি ও বেসরকারি পর্যায়ে ০৯টি মেডিকেল কলেজসহ সর্বমোট ২২টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে আরও ১১টি কলেজের কার্যক্রম বর্তমানে সূচনাপর্বে। এ ছাড়া ১টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৮টি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রদান করা হয়। সম্প্রতি ৮টি পুরাতন সরকারি মেডিকেল কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৪.২ স্নাতকপূর্ব শিক্ষার বর্তমান অবস্থা (Undergraduate Education)

দেশে বর্তমানে ৫ বছরব্যাপী শিক্ষা ও ১ বছর প্রশিক্ষণসহ ৬ বছর মেয়াদি স্নাতকপূর্ব শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। Flexenerian Model-এ ২২টি মেডিকেল কলেজ, ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বুনিয়াদি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ক্লিনিক্যাল চিকিৎসা বিজ্ঞান সমন্বয়ে এম.বি.বি.এস. কোর্স পরিচালনা করে। ৩টি পেশাজীবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয় এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি প্রদান করে। উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের ১ বছরের সাময়িক নিবন্ধন (Registration) লাভ করেন এবং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হাসপাতালে ১ বছর প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তি শেষে পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধন লাভ করেন। প্রতি ৫ বছর পর পর নির্দিষ্ট ফি জমাদান করে নিবন্ধন নবায়ন করতে হয়। প্রতি বছর গড়ে ২০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই সকল মেডিকেল কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ পান। এখানে ছাত্র/ছাত্রীর অনুপাত (১:০.৭৬)।

৪.২.১ অনুষদ

১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ২৪৭ জন অধ্যাপক, ৩৯০ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৪২৮ জন সহকারী অধ্যাপকসহ মোট ১৫৮২ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। উচ্চতর ৯৮৪টি পদের মধ্যে ১৭৪টি বর্তমানে শূন্য। ৮১০ জন শিক্ষকের মধ্যে ১০৫ জন মহিলা। শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৯.২৫। বেসরকারি পর্যায়ে এই অনুপাত ১:২ থেকে ১:৫ (সারণি-১,২,৩)।

সারণি- ১ : সরকারি ৮টি মেডিকেল কলেজের অনুষদ এবং শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত।

১.	মেডিকেল কলেজ - অধ্যপকের অনুপাত	১ : ১৯
২.	মেডিকেল কলেজ - সহযোগী অধ্যাপকের অনুপাত	১ : ৩০
৩.	মেডিকেল কলেজ - সহকারী অধ্যাপকের অনুপাত	১ : ৩৩
৪.	মেডিকেল কলেজ - অনুষদের অনুপাত	১ : ৮২
৫.	অধ্যাপক - ছাত্র অনুপাত	১ : ৪০
৬.	সহযোগী অধ্যাপক - ছাত্র অনুপাত	১ : ২৫
৭.	সহকারী অধ্যাপক - ছাত্র অনুপাত	১ : ২৩
৮.	অনুষদ - ছাত্র অনুপাত	১ : ৯.২৫

সারণি-২ : সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা

ক্রমিক	মেডিকেল কলেজ	অধ্যাপক	সহযোগী অধ্যাপক	সহকারী অধ্যাপক	মোট
১.	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	৩৮	৩৯	৪৩	১২০
২.	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	২০	৩৭	৪৭	১০৪
৩.	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ	২০	৩৪	৪৫	৯৯
৪.	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	২৯	৩২	৪৭	১০৮
৫.	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	২২	৩৮	৪৫	১০৫
৬.	সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ	১৯	৩৭	৪৪	১০০
৭.	রংপুর মেডিকেল কলেজ	১৭	৩৫	৪৬	৯৮
৮.	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল	২২	৪১	৪৯	১১২
৯.	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ	১২	১৯	১২	৪৩
১০.	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ	১২	১৯	১২	৪৩
১১.	দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ	১২	১৯	১৪	৪৫
১২.	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া	১২	১৯	১২	৪৩
১৩.	খুলনা মেডিকেল কলেজ	১২	২১	১০	৪৩
মোট		২৪৭	৩৯০	৪২৬	১০৬৩

সারণি-৩ : সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর শিক্ষক এবং ছাত্রের অনুপাত

ক্রমিক	মেডিকেল কলেজ	মোট শিক্ষক	মোট ছাত্র	শিক্ষক/ছাত্র অনুপাত
১.	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১২০	৯৩২	১ : ৭.৭০
২.	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	১০৪	৯৩৯	১ : ৯.০২
৩.	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ	৯৯	১০১০	১ : ১০.২০
৪.	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	১০৮	১২১৬	১ : ১১.২৫
৫.	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	১০৫	১১০৬	১ : ১০.৫৩
৬.	সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ	১০০	১১৫৪	১ : ১১.৫৪
৭.	রংপুর মেডিকেল কলেজ	৯৮	১০৯৮	১ : ১১২০
৮.	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ	১১২	১০৬৩	১ : ৯.৪৯
৯.	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ	৪৩	৩৪০	১ : ৭.৯১
১০.	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ	৪৩	৩১৫	১ : ৭.৩২
১১.	দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ	৪৫	২৯৭	১ : ৬.৬০
১২.	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ,বগুড়া	৪৩	৩৯৮	১ : ৯.২৫
১৩.	খুলনা মেডিকেল কলেজ	৪৩	৩৪৬	১ : ৮.০৫
মোট		১০৬৩	১০২১৪	১ : ৯.৬০

সরকারি পর্যায়ে ৮০-৯০ জন ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষকের চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিগ্রি থাকলেও চিকিৎসা শিক্ষায় (Medical Education) কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। তবে অনুষদ উন্নয়ন (Faculty development) কার্যক্রমের অধীন বর্তমানে Centre for Medical Education পরিচালিত স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারি পর্যায়ে স্বীকৃত নিয়ম-নীতি প্রতিপালিত হলেও বেসরকারি পর্যায়ে এর প্রতিপালন শিথিল।

৪.২.২ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি

মেডিকেল কলেজসমূহের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) সকল ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সরকারি প্রতিষ্ঠনসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ সাধন করে। বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কোর্স-কারিকুলামের সার্বিক নির্দেশনা, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এম.বি.বি.এস. ও উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের নিবন্ধন প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিভুক্তিদান (Affiliation), ছাত্র-ছাত্রীদের নিবন্ধন, পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। সামগ্রিক মান ব্যবস্থাপনায় এই তিন সংস্থার মধ্যে কোন কাঠামোগত সমন্বয় নেই । বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নির্দিষ্ট অনুষদের (Faculty) মাধ্যমে নির্ধারিত কর্মকান্ড সম্পন্ন করলেও এই সকল অনুষদের (Faculty) দায়িত্ব ও কর্মপরিধি সীমিত। শিক্ষণ ও মান ব্যবস্থাপনায় অনুষদ (Faculty) সমূহের সরাসরি অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে।

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ একাডেমিক কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত। তবে একাডেমিক কাউন্সিল মূলত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। নিত্য-নৈমিত্তিক মান ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে একাডেমিক কাউন্সিলের ভূমিকা শুধু অনুষ্ঠিত ক্লাসের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি গণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানসমূহে অভ্যন্তরীণ মান ব্যবস্থাপনার কোন কাঠামো নেই। বিভাগসমূহ কাঠামোগতভাবে বিন্যস্ত নয় বলে মান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অভ্যন্তরীণ সম্পদও অপ্রতুল। সার্বিক বিচারে ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে মান ব্যবস্থাপনার কাঠামো সুসংহত নয়। ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণের কারণে মান ব্যবস্থাপনার বিষয়টি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক নয়।

৪.২.৩ শিক্ষার মান

শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধা ও মানের ভিন্নতা রয়েছে। তেমনি প্রতিষ্ঠানভেদে শিক্ষার সুযোগ ও মানের ভিন্নতাও দৃশ্যমান। ঢাকার বাইরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। পদ থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে তা শূন্য থাকে। শিক্ষকদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাগত যোগ্যতায়ও প্রভেদ রয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের বুনিয়াদি বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে শিক্ষক সংকট উদ্বেগজনক পর্যায়ের। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই সার্বক্ষণিক শিক্ষক পাওয়া যায় না। সংযুক্ত হাসপাতালসমূহে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাতেও বিস্তর ব্যবধান লক্ষণীয়।

কাঠামোগতভাবে বুনিয়াদি বিজ্ঞান পর্যায়ে এবং মেডিসিন, সার্জারি, শিশু ও গাইনি-অবসটেট্রিক্স ইত্যাদি মূল ক্লিনিক্যাল বিভাগসমূহের বিন্যাসে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বিশেষায়িত বিভাগ (যেমন কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, আইসিইউ ইত্যাদি) সমূহের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য ও তারতম্য লক্ষণীয়। যেমন, সকল প্রতিষ্ঠানে নেফ্রোলজি বিভাগ বা এ বিষয়ের শিক্ষক নেই। সরকারি পর্যায়ে এই তারতম্য কম। তবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তারতম্য বেশ প্রকট। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্র-ছাত্রীরা মানসম্মত ও সুষম শিক্ষার সুযোগ লাভ করে না।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। নীতিগতভাবে এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমাধারীদের শিক্ষকের পদে নিয়োগের বিধিনিষেধ থাকলেও সবসময় এই নীতি প্রতিপালন করা হয় না। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। বিভাগসমূহের বিন্যাসে নির্দিষ্ট কোন কাঠামো নেই। ফলে এক একটি বিভাগের কাঠামো এক এক রকম। লোকবল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। ৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ এখনও নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াধীন। অনেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ভাড়াকরা সাময়িক ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে এসকল মেডিকেল কলেজে ভৌত অবকাঠামোর সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত সীমিত।

৪.২.৪ গ্রন্থাগার ও তথ্যপ্রযুক্তি

কারিগরি শিক্ষা (Technical education) হিসেবে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণায় গ্রন্থাগার ও তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিটি মেডিকেল কলেজের একটি করে গ্রন্থাগার রয়েছে। বেশিরভাগ সরকারি প্রতিষ্ঠানে পেশাজীবী কর্মকর্তাগণ গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন, তবে বেসরকারি পর্যায়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ এই দায়িত্বে নিয়োজিত। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা অপ্রতুল এবং পরিসর প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। এ কারণে তথ্য অনুসন্ধান ও পঠন বিঘ্নিত হয়। অনেক মেডিকেল কলেজে ফটোকপির সুযোগ নেই। বইয়ের কপি কম থাকায় ধার নেওয়ার সুযোগও চাহিদার তুলনায় নগণ্য। তবে অধিকাংশ সরকারি মেডিকেল কলেজের গ্রন্থাগারে সন্তোষজনক সংখ্যায় পাঠ্য (Text) ও সহায়ক (Reference) পুস্তক রয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে এই মান সন্তোষজনক নয়। সার্বিকভাবে জার্নাল (Journal) ও সাময়িকীর (Periodical) সংখ্যা কম। অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ সুবিধা নেই। সারণিতে (সারণি-৫) ৮টি প্রধান মেডিকেল কলেজে গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরা হল।

সারণি-৫: সরকারি মেডিকেল কলেজ গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা

Site	Professional Staff	Admin. Staff	Reading Room	Admn. & Process Room	Audiovisual Production Unit	Photocopy Facility	Computer in Library	Medline Search Facility	Internet Search Facility	Net Working Facility	A.C
Dhaka Medical College	√	√	√	X	-	√	-	-	-	-	-
Sir Salimullah Medical College	√	√	√		-	-	-	-	-	-	-
Mymensingh Medical College	√	√	√		-	-	-	-	-	-	-
Rajshahi Medical College	√	√	√			-	-	-	-	-	-
Rangpur Medical College	√	√	√		-	-	-	-	-	-	-
Chittagong Medical College	√	√	√		-	-	-	-	-	-	-
Sylhet MAG Osmani Medical College	√	√	√		-	-	-	-	-	-	-
Sher-E-Bangla Medical College	√	√	√		-	-	-	-	-	-	-

৪.২.৫ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

দেশের একমাত্র মেডিকেল শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হলো সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন। ৯ জন স্থায়ী ও ১৬ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়ে গঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় অবস্থিত। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, সুসজ্জিত ও উন্নত শ্রেণীকক্ষ, সেমিনার রুম এবং সভাকক্ষ থাকলেও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সংযুক্ত আবাসন ব্যবস্থা নেই। এই প্রতিষ্ঠানে ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাগার রয়েছে যেখানে ৩৫টি বিষয়ে ১০০০টির বেশি বই, ৩৫টি জার্নাল এবং ফটোকপির সুযোগ রয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি প্রজেক্টভিত্তিক (আর্থিক আনুকুল্যে) শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। ইতোমধ্যে ৪২টি ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলাম ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য এই সুযোগ সীমিত। পরিমাণগত ও সামগ্রিক বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের আংশিক দায়িত্ব পালন করে মাত্র।

৪.২.৬ আবাসন

চিকিৎসা শিক্ষা একটি নিবিড় প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক সুযোগ-সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৮টি মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের ধারণক্ষমতা সন্তোষজনক, তবে ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা রয়েছে। নতুন পাঁচটি মেডিকেল কলেজসহ অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা তীব্র। এ কারণে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে নিজস্ব ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হলে এই আবাসন সমস্যা দূরীভূত হবে। ধারণক্ষমতা ব্যতিরেকে আবাসিক এলাকার শ্রেণীকক্ষ বহির্ভূত সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে খেলাধূলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত।

ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী ও বরিশাল মেডিকেল কলেজসমূহে শিক্ষকদের জন্য সীমিত আবাসন ব্যবস্থা থাকলেও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে শিক্ষকদের আবাসন কার্যত নেই। ফলে সান্ধ্যকালীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

সরকারি পর্যায়ে সকল পুরাতন মেডিকেল কলেজে একসঙ্গে অনেক শিক্ষার্থী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন শ্রেণীকক্ষ রয়েছে, তবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাড়া অন্যত্র এগুলি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নয়। ছোট ছোট ক্লাসের জন্য সর্বত্রই ক্লাসরুমের সংখ্যা অপ্রতুল ও সুযোগ-সুবিধা সীমিত, বিশেষ করে হাসপাতালসমূহে ক্লিনিক্যাল বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ নেই। বেসরকারি পর্যায়ের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ক্লাশরুমসমূহ যথাযোগ্য মানসম্মত নয়। সরকারি কিছু মেডিকেল কলেজে ক্লিনিক্যাল দক্ষতা গড়ার কেন্দ্রের (Clinical Skill Centre) সীমিত সুযোগ সৃষ্টি হলেও বেসরকারি পর্যায়ে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

বহির্বিশ্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ নিতান্তই কম। FIMC (Further Improvement of Medical College) project-এর অধীনে প্রায় শতাধিক শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও তাদের অধিকাংশই ছিলেন শিশু রোগ, স্ত্রী-রোগ এবং ধাত্রীবিদ্যা ও কমিউনিটি মেডিসিন বিষয়ের শিক্ষক। মেডিসিন, সার্জারি ও অন্যান্য বিষয়ের অধিকাংশ শিক্ষক এই সুযোগ পান নি। ফলে এই সকল বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় নেই। বহির্বিশ্বে ক্লিনিক্যাল বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগও সীমিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্জিত প্রশিক্ষণের স্থানীয় ব্যবহার নিশ্চিতকরণের কোন সংযুক্ত বন্দোবস্ত নেই। এর ফলে দেশে আধুনিক, উন্নত ও প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসার প্রসার ঘটছে সীমিত আকারে, জনগণ স্বাস্থ্য সেবার প্রতি আস্থা হারাচ্ছে এবং অধিক সংখ্যক লোক চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে সরকারি ব্যয় নেই বললেই চলে।

৪.২.৮ শিক্ষাসূচি

১৯৯৮ সালে প্রণীত শিক্ষাসূচি অনুযায়ী বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন শিক্ষাসূচি চালু হলে বছরে দুটি করে প্রফেশনাল পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ১½ বছরের সমাপ্তিতে প্রথম প্রফেশনাল, ৩½ বছরের শেষে ২য় প্রফেশনাল ও পাঁচ বছর সমাপনান্তে ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয়ে সমন্বিত শিক্ষা (Integrated Teaching) নতুন শিক্ষাসূচির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুনিয়াদি ও ক্লিনিক্যাল বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে বিষয়সমূহ সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন করে কোর্স চলাকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative) উভয় ধরণের মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হবে। মূল্যায়নের শতকরা ১০ ভাগ হবে কোর্স চলাকালীন (Formative)। এর ফলে কোর্স চলাকালীন সময়েই শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা যাবে। লিখিত পরীক্ষায় ৭০ শতাংশ বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র (MCQ) এবং ২০ শতাংশ সংক্ষিপ্ত উত্তরসম্পন্ন প্রশ্নপত্র (SAQ) ধরনের প্রশ্ন হবে। মৌখিক পরীক্ষাকেও কাঠামোভুক্ত করা হবে। এই শিক্ষাসূচিতে শিক্ষাপঞ্জি (Academic calendar) প্রণয়নের বিধান থাকছে। যথা সময়ে ও সার্বিকভাবে কোর্স সমাপন করতে শিক্ষাপঞ্জি (Academic calendar) সহায়ক হবে। শিক্ষাসূচির সার্বিক বিষয়বস্তুকে সার (Core) এবং নৈর্বাচনিক শিক্ষাসূচি (Additional curriculum) হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব। নতুন শিক্ষাসূচিতে বুনিয়াদি বিজ্ঞানের অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিহার করে জৈব-পরিসংখ্যান (Biostatistics), আচরণ বিজ্ঞান (Behavioral science) এবং চিকিৎসা বিষয়ক নীতিশাস্ত্রের (Medical ethics) মতো অত্যাবশ্যক বিষয়গুলো সংযোজন করা হয়েছে।

৪.২.৯ মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ সমস্যা

কাঠামোগত :

(ক) **পর্যায় :** বর্তমানে মেডিকেল শিক্ষা কাঠামোগতভাবে স্নাতকপূর্ব ও স্নাতকোত্তর ধাপে বিভক্ত। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (Demography), জীবনযাত্রার ধরন (Life style) এবং পরিবেশের (Environment) পরিবর্তনের সাথে সাথে রোগ-ব্যাধির বিবর্তন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে চিকিৎসা বিদ্যার প্রয়োগে (Practice of Medicine) যে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তার সাথে সংগতি রাখার জন্য অব্যাহত চিকিৎসা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও পদোন্নতিজনিত কারণে চিকিৎসক ও শিক্ষকদের যে সকল নতুন নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় সে ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য অব্যাহত যুগোপযোগী শিক্ষা আবশ্যক। বর্তমানে মেডিকেল শিক্ষার কাঠামোয় অব্যাহত শিক্ষার আনুষ্ঠানিক (Formal) ব্যবস্থা নেই।

(খ) **সাংগঠনিক কাঠামো :** মেডিকেল কলেজ ও তার বিভাগসমূহের কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো নেই। একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ হতে হলে সেখানে ন্যূনতম কোন্ কোন্ বিভাগ থাকা প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট থাকলেও তার সংগঠনে বিশেষায়িত বিভাগসমূহ সম্পর্কে কোন নির্দেশনা বা বাধ্যবাধকতা নেই। প্রতি বিভাগের জনবল কাঠামোও নির্দিষ্ট নয়। ফলে একেকটি বিভাগের কাঠামো-বিন্যাস এক এক রকম এবং একই বিভাগের কাঠামো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিন্নতর।

(গ) **প্রশাসনিক কাঠামো :**

বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ : বর্তমানে মেডিকেল কলেজসমূহ তিনটি স্বতন্ত্র বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারককারী প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত। যেমন :

(১) সরকার : স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মেডিকেল কলেজসমূহ স্থাপনের প্রাথমিক অনুমোদন দান করে। পরিচালন কাঠামো ছাড়া অবকাঠামো ও জনবল অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রধানভাবে বিবেচ্য। অনুমোদন প্রদানের পর অবকাঠামো ও জনবল সংরক্ষণ বা উন্নয়নের উপর পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ কার্য প্রায় অনুপস্থিত। মাঝে মাঝে তদারকি ও পরিদর্শনের অভাবে ক্ষেত্রবিশেষে অবকাঠামো ও জনবল যথার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। শিক্ষণ ও শিক্ষকের মান নিশ্চয়তায় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সীমিত।

(২) বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল : প্রতিষ্ঠানটি মূলত কোর্স ও কোর্স-সূচি, শিক্ষক ও পরীক্ষকদের যোগ্যতা, পরীক্ষাপদ্ধতি, কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মান নির্ধারণ, কোর্স শিক্ষাসূচির স্বীকৃতিদান ও চিকিৎসকদের নিবন্ধন প্রদান করে। শিক্ষাসূচি প্রণয়নে যথার্থ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। তবে শিক্ষাসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে কোন চলমান প্রক্রিয়া নেই এবং প্রণীত শিক্ষাসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিরূপণেরও কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে শিক্ষাসূচি বাস্তবায়ন যথার্থ হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হয় না বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয় না এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষাসূচি প্রণয়নে যথার্থ অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয় না।

চিকিৎসকদের নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রির সার্টিফিকেট ও হাসপাতালকর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেটের উপর নির্ভরশীল। যদিও কাউন্সিলের পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণসমূহ পরিদর্শনের কর্তৃত্ব রয়েছে, এই কর্তৃত্ব কদাচিৎ প্রয়োগ করা হয়। ফলে সার্বিক মান নিয়ন্ত্রণে এই সংস্থার ভূমিকা পরোক্ষ।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সাধারণভাবে শিক্ষার্থী নিবন্ধন, পরীক্ষা পরিচালনা, ফলপ্রকাশ ও ডিগ্রি প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত। নির্দিষ্ট স্নাতকপূর্ব অনুষদের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং রেজিস্ট্রারের দপ্তরের সহায়তায় এসব কার্য সম্পন্ন হয়। অনুষদসমূহের সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল, কার্যপরিধি সীমিত ও ক্ষমতা নগণ্য। কারিকুলাম বাস্তবায়নে, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে রক্ষকের ভূমিকা পালন করলেও শিক্ষার মানব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ : স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরকারি মেডিকেল কলেজ সমূহের নিয়ন্ত্রক ও তদারককারী। বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ আর্থিক ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল যা সাধারণত বহু ধাপ বিশিষ্ট ও দীর্ঘসূত্রী।

(১) আর্থিক : সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ আর্থিকভাবে বার্ষিক জাতীয় রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল। উভয় খাতে বরাদ্দের পরিমাণ অপ্রতুল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যয় ক্ষমতাও সীমিত। স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় বরাদ্দের কোন এখতিয়ার না থাকায় সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ও সঠিক সময়ে করা সম্ভব হয় না।

(২) প্রশাসনিক : মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল স্থানীয় প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। ভাইস-প্রিন্সিপালের সহায়তায় তিনি তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন। বিভাগসমূহের কোন কাঠামোগত সংগঠন নেই। ফলে শিক্ষকগণ প্রশাসনিকভাবে সরাসরি প্রিন্সিপালের কাছে দায়বদ্ধ। বিভাগসমূহের শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত একাডেমিক কাউন্সিল মূলত আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক দায়িত্ব পালন করে। দৈনন্দিন শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কোন প্রশাসনিক বিভাগ নিয়োজিত না থাকায় স্থানীয় শিক্ষাপ্রশাসন কাঠামোগতভাবে দুর্বল ও শিথিলভাবে কার্যকর।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করে ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে শিক্ষকদের পদায়ন ও বদলি নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মকমিশনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শিক্ষক নিয়োগে বিলম্ব একটি সচরাচর বিষয়। শিক্ষকদের পদায়নের ক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা থাকায় পদ পূরণ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা সীমিত। শিক্ষকদের নিয়োগ, বদলি, প্রশিক্ষণসহ সার্বিক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা প্রায় নেই। স্থানীয় প্রশাসন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্বে থাকলেও কর্মজীবনে এই প্রতিবেদনের ভূমিকা নগণ্য। এ কারণে শিক্ষকদের স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দায়বদ্ধতা সামান্য।

নিয়মিত ও ক্ষেত্রবিশেষে ঘন ঘন বদলির কারণে শিক্ষকগণ কোন প্রতিষ্ঠানেই দীর্ঘস্থায়ী মনোনিবেশ করতে এবং কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন না। এই রীতি কার্যকর শিক্ষা সংগঠনের সহায়ক নয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। বাজেটের সীমাবদ্ধতার কারণে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহজ থাকার কোনরূপ কৌশলগত সুবিধা এখানে নেই। শিক্ষক নিয়োগ ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে থাকলেও উপযুক্ত শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এবং আন্ত-রিকতা ও সদিচ্ছার অভাবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপযুক্ত মান নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না।

অবকাঠামো

প্রস্তাবিত পাঁচটি সরকারি নতুন মেডিকেল কলেজের ৪টির এখনও নিজস্ব ভবন নেই। নির্মাণাধীন এই সকল ভবন সমাপ্ত হলে সরকারি মেডিকেল কলেজের ভৌত অবকাঠামোগত অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক হবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংযুক্ত হাসপাতালের অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন। নিদানিক প্রশিক্ষণের (Clinical training) জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ এবং গবেষণাগার (Laboratory) সমূহের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত সংস্কারসহ প্রশিক্ষণের অবকাশ যথার্থ করার প্রয়োজনীয়তা প্রভূত।

অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নিজস্ব কোন ভবন নেই। যেখানে আছে, সেগুলিতেও মান উপযোগী উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দুই একটি বাদে সংযুক্ত হাসপাতালের অবকাঠামো দুর্বল এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ খুবই সীমিত।

৪.২.১০ স্নাতকপূর্ব মেডিকেল শিক্ষার মানের ঘাটতি

১. নিরাময়মুখী হাসপাতাল নির্ভরতা : বর্তমান স্নাতকপূর্ব মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিকভাবে শহরস্থিত নিরাময়মুখী হাসপাতালকেন্দ্রিক। শিক্ষা ও (নিবন্ধনপূর্ব) প্রশিক্ষণ উভয়ই সর্বোচ্চ (Tertiary care) পর্যায়ভুক্ত মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালসমূহে অনুষ্ঠিত হয়। অথচ স্নাতক (MBBS) পর্যায়ের ডাক্তারদের অধিকাংশের মূল কর্মক্ষেত্র প্রাথমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা (Primary care setting) যা মূলত একটি চলমান পর্যায়ের সেবা (Ambulatory setting) কার্যক্রম। ফলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কালে কার্যক্ষেত্রের প্রকৃত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়া বা তা সমাধানে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয় না। ফলে স্নাতক (MBBS) পাশের পর অধিকাংশ চিকিৎসকই আবিষ্কার করেন যে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও কুশলতার সাথে মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কোন মিল নেই, স্বভাবতই তাঁরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রবৃত্ত হন। ফলে দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো আশানুরূপভাবে সমৃদ্ধ হতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং একটি সংকীর্ণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রতিকুলে মাথাভারী, বিস্তীর্ণ এবং ব্যয়বহুল উচ্চতর ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সেবাব্যবস্থা গড়ে উঠছে। বলাবাহুল্য যে, সার্বিক স্বাস্থ্য সমস্যার প্রায় ৮০ শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিচর্যা সংক্রান্ত। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাস্থলই সকল স্বাস্থ্য সমস্যার সর্বনিকট ও প্রারম্ভিক সেবাকেন্দ্র। এখান থেকেই নির্বাচিত হয়ে গুরুতর অসুস্থ রোগীগণ প্রয়োজন অনুসারে দ্বিতীয় (Secondary) ও তৃতীয় (Tertiary) পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রে প্রেরিত হয়। সেবার গুরুত্বপূর্ণ এই ধাপটি কার্যকরভাবে সংগঠিত না হলে স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং উচ্চ পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রে অনাহুত চাপ, অনাকাপিক্ষত ব্যয় ও সেবাপ্রার্থীদের দুর্ভোগ কমানো সম্ভব হবে না। প্রাথমিক সেবাস্থলের প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ বিকাশের উপরই উচ্চতর চিকিৎসা ব্যবস্থার আশানুরূপ বিকাশ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবার পর্যাপ্ত সংগঠন ব্যতীত সন্তোষজনক ও স্বল্পব্যয়ী মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সেজন্য স্নাতকপূর্ব শিক্ষার প্রায়োগিক দিক বিচার করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিপূরক কেন্দ্র হিসেবে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান (উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল) সমূহকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় পর্যাপ্ত দক্ষতাবিহীন স্নাতক পর্যায়ের চিকিৎসকগণ যে শুধু ব্যয়বহুল ও দীর্ঘসূত্রী

(ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রয়োজনীয়) উচ্চতর শিক্ষায় জড়িয়ে পড়বেন তাই নয় বরং সেবাপ্রার্থীরা প্রকৃত সেবা থেকে বঞ্চিত হবেন ও চিকিৎসকেরা উপযুক্ত কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হবেন। শিক্ষা ও সেবা ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে সমন্বয়যুক্ত করতে অধিকাংশ স্নাতক চিকিৎসককে সম্মানজনকভাবে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সেবা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত থাকার প্রেরণা ও সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত স্নাতক চিকিৎসককে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত ও কার্যকর বিকাশ ঘটবে এবং একটি সীমিত সম্পদ সম্বলিত জাতির সামগ্রিক শিক্ষাব্যয় ও শিক্ষাকালের সংকোচন সম্ভব হবে।

২. বর্তমানে যে নতুন শিক্ষাসূচি (Curriculum) প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে মেডিকেল শিক্ষার আধুনিক ধ্যান-ধারণার সমন্বয় করা হয়েছে, তবে তা মূলত বিষয়ভিত্তিক (subjective)। পাঠ্যসূচি (Course content) বাস্তবসম্মত ও উদ্দেশ্যমূলক (objective) করতে হলে কারিকুলামকে মাঠ পর্যায়ের উপাত্তনির্ভর (Data-based) করা দরকার। অন্যথায় পাঠসূচি কার্যত দক্ষতানির্ভর ও প্রাসঙ্গিক হবার পরিবর্তে জ্ঞাননির্ভর ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

৩. মেডিকেল শিক্ষা পেশাজীবী শিক্ষা হলেও এর মূল কারিকুলামের সিংহভাগই এখনও তাত্ত্বিক। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ এ পর্যায়ে খুবই সীমিত। এছাড়াও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকালে অধিকাংশ ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ হাসপাতালের অন্ত:বিভাগকেন্দ্রিক। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ বহির্বিভাগে সেবাদানের কর্মকুশলতা একেবারেই গড়ে ওঠে না। মেডিকেল কলেজের হাসপাতালগুলোর আন্ত:বিভাগসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক বিষয়সমূহের মূল পদ্ধতিকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এবং হাসপাতালসমূহের বহির্বিভাগকে প্রকৃত সেবা প্রদানের প্রশিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করলে নবীন চিকিৎসকদের মধ্যে সেবাপ্রার্থীদের সামগ্রিক সমস্যা ও চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ হবে এবং প্রকৃত সমস্যা নিরূপণ ও সমাধান করতে কুশলতা গড়ে উঠবে। এরূপ হলে, কার্যকর ও সন্তোষজনক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বহির্বিভাগে সন্তোষজনক ও মানসম্মত সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

৪. ক্লিনিক্যাল বিষয়ে মেডিক্যাল শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডের বেশিরভাগ এখনও হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীকে সেবাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চিকিৎসা সেবা একটি সংবেদনশীল কর্মকাণ্ড হওয়ায় তাঁরা শিক্ষাদানের জন্য সময় পান কম। উপরন্তু প্রশিক্ষণের অভাবে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকেই অবগত নন। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের অভাবে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি বা ভারসাম্যমূলক শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ ও তাগাদা খুবই কম, ফলে শিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভঙ্গি (Style) ও পদ্ধতি রীতিমাফিক ও কার্যকর পদ্ধতির উপর প্রাধান্য পায়।

৫. নবপ্রণীত কারিকুলামে মূল-বিষয় (core content) নিশ্চিত হলেও প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা (Evidence-based Medicine) ও সমস্যাকেন্দ্রিক শিক্ষণ (Problem-based learning) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অর্জিত দক্ষতাকে নিশ্চিত, কার্যকর ও সুষম করার জন্য এগুলোর অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসার প্রচলন চিকিৎসাসংক্রান্ত বিভ্রাট হ্রাস ও ব্যয়বহুলতা কমাতে সক্ষম এবং এর ব্যাপক প্রচলন চিকিৎসা পদ্ধতিতে সমসত্ত্বতা নিশ্চিত করবে। সমস্যাকেন্দ্রিক শিক্ষা, প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে এবং চিকিৎসা শিক্ষাকে কার্যকর করতে সহায়ক হবে।

৬. শিক্ষাকালে কোর্সচলাকালীন মূল্যায়নের (Formative Assessment) সুযোগ সীমিত আকারে বিদ্যমান। ফলে শিক্ষণের কার্যকারিতা নিরূপণের ও শিক্ষার্থীদের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অন্তর্বর্তীকালীন সুযোগ প্রায় অনুপস্থিত। এ কারণেই চূড়ান্ত পরীক্ষাসমূহের ফলাফলও অসম এবং অকৃতকার্যতার হার কখনও কখনও হতাশাব্যঞ্জক।

৭. মেডিকেল কলেজসমূহের অবকাঠামো, লোকবল ও প্রযুক্তিগত মান অসম এবং শিক্ষার সুযোগও ভিন্ন ভিন্ন। ফলে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা চিকিৎসকদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মান সমপর্যায়ের নয়। মেডিকেল কলেজসমূহকে একক ও অভিন্ন মান ব্যবস্থাপনার আওতাধীন করে মানের সমতা অর্জন সম্ভব।

৮. শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও গবেষণা অপর্যাপ্ত ও খণ্ড খণ্ড। স্থানীয় ও সার্বিক জাতীয় ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও পদ্ধতিগত উভয় দিক দিয়ে সমন্বয়হীন। প্রচলিত দুর্বল পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন ব্যবস্থায় উদ্দেশ্যমুখিতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে, ফলে তা মান ব্যবস্থাপনায় যথার্থ ভূমিকা রাখতে অক্ষম। এই লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু ও কার্যকর মান ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও উন্নয়ন সহায়ক কৃষ্টি গড়ে তোলা অপরিহার্য।

সাংগঠনিক ও কার্যপ্রণালীগতভাবে চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মত মানবব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি ব্যবস্থাপনার নজর কম। উন্নয়ন সহায়ক প্রতিফলনের মাধ্যমে কার্যপ্রণালী নির্ধারণ (Reflective practice) কার্যত অনুপস্থিত এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে অব্যাহত ধারা রক্ষার প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল। প্রতিফলনের মাধ্যমে কার্যপ্রণালী নির্ধারণ (Reflective practice) কৃষ্টি প্রচলনের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব। ফলে লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর পদ্ধতি ও কাঠামো নির্বাচন সহজতর হয় এবং পদ্ধতিজনিত ক্ষতি (System loss) হ্রাস করা সম্ভব হয়।

৯. মেডিকেল কলেজসমূহের অবকাঠামো সংরক্ষণের ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত। নিয়মিত বা রুটিন মাফিক সংরক্ষণের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ার পর সংরক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়াও বহু ধাপ নির্ভর ও জটিল, ফলে প্রায়ই অব্যাহত কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থায় নিয়মিত পদ্ধতির অবলম্বন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ সংকুলান এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে সক্ষম।

৪.৩ উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষা

৪.৩.১ সংগঠন

বাংলাদেশে মেডিকেল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার সূচনা হয় ১৯৬৫ সালে পর্যায়ক্রমিক আই.পি.জি.এম.আর ও পাকিস্তান কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এন্ড সার্জন্স-এর পূর্বাঞ্চলীয় কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। উচ্চতর শিক্ষায় মূলত দুটি ধারা প্রচলিত রয়েছে। ক্লিনিক্যাল ও প্রি-ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিপ্লোমা, মাস্টার্স, এম ফিল, পিএইচডি ডিগ্রিসমূহের কোর্স ও বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এন্ড সার্জন্স কর্তৃক মেম্বারশিপ ও ফেলোশিপ পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সসমূহ পরিচালনা করে। এই সকল কোর্সের মেয়াদ ১ থেকে ৩ বৎসরকাল। দুই বৎসরের কম কোর্সসমূহের ডিপ্লোমাসমূহ শিক্ষকতার যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয় না। একই বিশেষজ্ঞতায় বিভিন্ন মেয়াদের একাধিক ডিগ্রি/ডিপ্লোমার প্রচলন আছে। ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহের ফেলোশিপ ও মাস্টার্স কোর্সসমূহে বুনিয়াদি বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত। তবে, অন্যান্য ডিগ্রি/ ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে বুনিয়াদি বিজ্ঞান উচ্চতর শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নেই।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় ও BCPS মূলত নিবন্ধন, মূল্যায়ন ও সনদ প্রদান করে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, সিলেট মেডিকেল কলেজ ও রংপুর মেডিকেল কলেজসহ National Institute of Cardio-vascular Diseases (NICVD), Institute of Diseases of Chest Hospital (IDCH), National Institute of Trauma, Orthopedics & Rehabilitation (NITOR), National Institute of Ophthalmology (NIO), National Institute of Kidney Diseases & Urology (NIKDU), National Institute of Cancer Research Hospital (NICRH), Mental Health Institute সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কোর্সসমূহ পরিচালনা করে থাকে। BSMMU তার নিজস্ব কোর্স ছাড়াও BCPS-এর অধীন FCPS কোর্সসমূহ পরিচালনা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরিচালিত কোর্সসমূহের জন্য নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আবশ্যক। পক্ষান্তরে BCPS এর পরীক্ষাসমূহে অবতীর্ণ হতে শুধু অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ আবশ্যক। FCPS ২য় পর্বে উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রশিক্ষণের সাথে সাথে বুনিয়াদি বিজ্ঞানভিত্তিক ১ম পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পূর্বশর্ত। উভয় পর্বের প্রস্তুতি হিসেবে অবশ্য আনুষ্ঠানিক কোর্সের প্রচলন রয়েছে এবং প্রার্থীগণ তা ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। BCPS ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে কোর্সসমূহের সমতা নির্ধারিত রয়েছে এবং এক কোর্স থেকে অন্য কোর্সে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রয়েছে। সাধারণভাবে MD/MS ও FCPS চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ অনুরূপ বিকল্প কোর্সের অনুশাখায় (Subspeciality) ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের কোর্সে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে নির্দিষ্ট অংশ অব্যাহতি পেয়ে থাকেন। Paediatric Haemato-oncology, Paediatric Nephrology, Neonatology বিষয়ে MD course সমূহে ভর্তির জন্য স্বীকৃত বিষয়সমূহে MD/FCPS চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। কোর্সসমূহে অন্তর্ভুক্তির জন্য উন্মুক্ত বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রার্থীগণ নির্দিষ্ট কোটায় সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। FCPS ছাড়া অন্যান্য কোর্সে বছরে একবার শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। FCPS কোর্সসমূহে বছরে দুইবার (জানুয়ারি ও জুলাই পর্বে) অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকে।

৪.৩.২ বর্তমান উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র

১. একাধিক ব্যবস্থা : বর্তমান উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিসিপিএস পরিচালিত দুইটি ভিন্ন ধারার প্রচলন রয়েছে। উভয় কোর্সের উদ্দেশ্য এক হলেও শিক্ষাসুচি (Curriculum) ভিন্ন ভিন্ন, ফলে কোর্স সমাপনান্তে মানের সুষমতা বজায় থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোর্সে নির্দিষ্ট শিক্ষাসুচির (Curriculum) আওতায় নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের সাথে সাথে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স আবশ্যক। পক্ষান্তরে, -learning পদ্ধতি কেন্দ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সনদ প্রদান (Certification) করা হয়। দুই ধারায় বিভক্ত একই উদ্দেশ্যমুখী উচ্চতর শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও পেশাজীবীদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং উপদলীয় সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা যোগায়।

২. শিক্ষার্থী নির্বাচন : শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাইকৃত মেধাকে মূল্যায়ন করা হয়। পেশাগত গুণাবলি ও প্রবণতা যাচাই এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা (Track record) মূল্যায়নের কোন বিধান প্রচলিত ব্যবস্থায় নেই।

৩. প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও মান : অবকাঠামোভেদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের মান ভিন্ন ভিন্ন। প্রশিক্ষণের কোন কাঠামোগত বিন্যাস (Structure) না থাকায় বর্তমানে তা বর্ষপঞ্জি ভিত্তিক (Calendar based)। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যায়নের (Assessment) সুযোগ নেই। সম্প্রতি বিসিপিএস প্রশিক্ষণের কর্মকাণ্ড নথিভুক্তকরণের (Log book) প্রক্রিয়া চালু করেছে। তবে প্রশিক্ষণের তদারকি (Supervision) যথেষ্ট শিথিল। প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থী (Trainer–Trainee) মতবিনিময় (Interaction) এবং তদারকি প্রশিক্ষণের (supervised training) সুযোগ সামান্য। যদিও ডিগ্রি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য অনুমোদন দান করে, কার্যত উভয়ের মধ্যে কার্যকর (Effective) সম্পর্ক দুর্বল। অনুমোদন মূলত অবকাঠামো ও লোকবল ভিত্তিক হওয়ায় প্রশিক্ষণের প্রকৃত মানের মূল্যায়ন পরোক্ষ। অবকাঠামো সংরক্ষণের বিষয়টি কম গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। কার্যত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন এবং ডিগ্রি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অবস্থান তৃতীয় পক্ষীয় (Third party) হওয়ায় সার্বিক মূল্যায়নে দক্ষতা যাচাইয়ের সুযোগ সীমিত ও পরনির্ভরশীল।

প্রশিক্ষণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় কম। সরকারি প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্যে নিয়মিত পদসমূহে (Working post) প্রেষণ প্রদান করা হয়। বেসরকারি প্রার্থীগণ অবৈতনিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অধিকাংশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ সরকারি সাধারণ সেবামূলক হাসপাতাল (Public General Hospital) হওয়ায় সেখানে সেবার চাপ প্রচণ্ড বলে প্রশিক্ষণ তদারকির সুযোগ ও মান বজায় রাখা দুরূহ। অবৈতনিক প্রশিক্ষণার্থীদের দায়দায়িত্ব সীমিত হওয়ায় প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণও শিথিল।

প্রশিক্ষণদানকারী অনেক হাসপাতাল বিশেষায়িত পর্যায়ের, ফলে সেখানে সাধারণ বা সার্বিক রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ট্রেনিংয়ের সুযোগ কম। পক্ষান্তরে কোন কোন হাসপাতালে বিশেষায়িত বিভাগসমূহের অবর্তমানে প্রশিক্ষণ আংশিক সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোন কার্যকর প্রশিক্ষণার্থী বিনিময় সম্পর্ক না থাকায় সার্বিক প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাহত হয়, বিশেষ করে যে সকল হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কার্যক্রম সীমিত বা একেবারেই অনুপস্থিত।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রায় অনুপস্থিত। প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা কোনক্রমেই সহায়ক নয়, ফলে দেশে উচ্চতর চিকিৎসা ব্যবস্থা দিনে দিনে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। প্রশিক্ষণের যে সকল সুযোগ বিদেশি প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় তাও উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় না এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্পৃক্ত নয় এমন ব্যক্তিরা প্রশিক্ষণ লাভ করেন। প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে তার স্থানীয় ব্যবস্থায় নিশ্চিত বা প্রযুক্তি হস্তান্তরের কোন প্রক্রিয়া নেই। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নানাবিধ প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। ফলে প্রশিক্ষণকাল পরিপ্রেক্ষিতভাবে দীর্ঘ হওয়া দরকার। বর্তমানে সর্বাধিক প্রশিক্ষণকাল দুই বৎসর এবং সনদপত্র প্রাপ্তির পর প্রশিক্ষণের সুযোগ কাঠামোগতভাবে অনুপস্থিত। ফলে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। উন্নত বিশ্বে এই প্রশিক্ষণ কালকে যৌক্তিকভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যত অন্তঃবিভাগে সীমাবদ্ধ থাকে, ফলে বহির্বিভাগে রোগনির্ণয়, পরামর্শ প্রদান ও চিকিৎসা পরবর্তী অনুসরণ (Follow-up) সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ কম। এ কারণে তৃণমূল বা Community পর্যায়ের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যাবলির সাথে প্রশিক্ষণার্থীর পরিচয় ঘটে কম এবং রোগীর সার্বিক পরিচর্যায় অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। সেদিক থেকেও প্রশিক্ষণের অপূর্ণতা থেকে যায় এবং স্বাধীন (Independent) পেশাজীবীর প্রকৃত যোগ্যতা অর্জিত হয় না। মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণের স্থান হিসেবে জেলা হাসপাতালগুলোর প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে মেডিকেল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে প্রশিক্ষণার্থীদের ভিড় প্রচণ্ড হলেও প্রকৃত প্রশিক্ষণের সুযোগ যথার্থভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের অভাবে প্রশিক্ষণদাতাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা কম, ফলে প্রশিক্ষণদাতাদের মধ্যে পেশাজীবীর চেতনার অভাব রয়েছে। কর্মজীবনে প্রশিক্ষণদানের যোগ্যতার মূল্যায়নের কোন বিধান নেই। উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রেষণার (Incentive) ব্যবস্থা নেই। পদায়ন পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদানের যোগ্যতা কোন মাপকাঠি নয়। ফলে সার্বিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচর্যাহীন, দুর্বল এবং গতানুগতিকতার ধারায় পরিচালিত। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও উন্নয়নের যথাযথ প্রক্রিয়াও অনুপস্থিত; ফলে প্রশিক্ষণ কতটুকু কার্যকর হচ্ছে বা তা উন্নয়নের কী কী তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।

প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোও আধুনিক প্রশিক্ষণের জন্য অপর্যাপ্ত এবং মানসম্মত নয়। অবকাঠামোগত দুর্বলতার সাথে সাথে প্রচণ্ড কাজের চাপে প্রশিক্ষণের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। নিদানিক নথিভুক্ত (Clinical recording) ব্যবস্থাও আশানুরূপ নয় এবং নিদানিক নিরীক্ষা (Clinical audit) সহ প্রশিক্ষণের যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বনেও ঘাটতি রয়েছে, ফলে স্বকীয় চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানার্জনের (Reflective learning) সুযোগ বা চেতনা একেবারেই গড়ে ওঠে নি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর সংখ্যা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও তুলনামূলকভাবে কম।

প্রশিক্ষণের নিয়ন্ত্রণ : এখন পর্যন্ত উচ্চতর প্রশিক্ষণের সিংহভাগ সুযোগ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান। উচ্চতর কোর্সভুক্ত প্রার্থীগণই বেশিরভাগ প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তার স্বাভাবিক নিয়োগ-বদলি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের পদায়ন করে। সেন্টার ফর মেডিক্যাল এডুকেশন সময়ে সময়ে কোর্সবহির্ভূত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রার্থিতা যাচাই করে। প্রশিক্ষণের মান নিশ্চয়তা ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব সীমিত। সার্বিক মূল্যায়নে প্রশিক্ষণের অভিভাবকত্ব সর্বত্রই খুব দুর্বল। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণের উপরও সার্বিক অভিভাবকত্ব মামুলি ধরনের।

প্রশিক্ষণ হিসাবে মূল্যায়ন : BCPS এর সাম্প্রতিক চাহিদানুযায়ী FCPS ২য় পর্ব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে দুই বছরের প্রশিক্ষণকালীন কর্মকাণ্ডের নথি (Logbook) রাখার প্রচলন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিচালিত কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের এই ন্যূনতম আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাও নিশ্চিত নয়। প্রশিক্ষণকালের কোর্সচলাকালীন (Formative) এবং চূড়ান্ত মূল্যায়নের (Summative Assessment) বিধান কোন ক্ষেত্রেই নেই। ফলে সমগ্র প্রশিক্ষণকাল বর্ষপঞ্জি-নির্ভর (Calendar-based) এবং মূল্যায়ন এক ব্যক্তির ধারণানির্ভর (Single trainer-based and subjective)।

প্রশিক্ষণ সামগ্রী : সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগীর ভিড় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে; তবে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, প্রশিক্ষণ মডিউল (Module) না থাকায় কর্মপালনের সুষম কর্মপদ্ধতির অভাব, প্রযুক্তির ঘাটতি ও অস্বাভাবিক কাজের চাপের ফলে প্রশিক্ষণে যথার্থ মান অর্জন সম্ভব হয় না। গবেষণাগার ও অস্ত্রোপচার কক্ষের অপর্যাপ্ততা ও কারিগরি দুর্বলতা এবং আনুষঙ্গিক দক্ষতা গড়ার কেন্দ্রের (Skill centre) অভাবে কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যাহত হয়। প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক (Formal) কাঠামো ন্যূনতম। ফলে প্রশিক্ষণকালকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত ও প্রতি পর্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (skill) ও আচরণ (attitude) নির্ধারিত না থাকায় প্রশিক্ষণ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ (comprehensive) হবার পদ্ধতিগত সুযোগ নেই। গ্রন্থাগার ও আনুষঙ্গিক e-learning সুবিধাদিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের সামগ্রীর অভাবে প্রশিক্ষণের সুযোগ যথার্থই সীমিত থেকে যায়।

৫.০ জনস্বাস্থ্য শিক্ষা

দেশে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM)। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান যুগপৎ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠান স্নাতক পর্যায়ে ৮টি ও M.Phil পর্যায়ে ১টি কোর্স পরিচালনা করে। সকল MPH course এক বৎসর মেয়াদি এবং ৬ মাস করে ২টি পর্বে বিভক্ত। ১২টি বিভাগে বিন্যস্ত এই প্রতিষ্ঠানে একজন পরিচালকসহ মাত্র ৫৩ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে যাঁদের মাত্র ৫ জন পিএইচ.ডি ডিগ্রিধারী। বিভাগসমূহের পদবিন্যাসও সুষম নয়। শিক্ষক নির্বাচন ও পদোন্নতির জন্যও সুষম নীতিমালা নেই। শিক্ষকদের অনেকেই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় তাঁদের কর্মস্পৃহা কমিয়ে দেয়। কোন কোন সময় বিভাগসমূহে বিষয়বহির্ভূত বিশেষজ্ঞগণ অযৌক্তিকভাবে পদে নিয়োজিত থাকেন।

উপরিউক্ত ভৌত অবকাঠামোগত দিক বজায় থাকলেও প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। সহযোগী অধ্যাপকের অধস্তন পদে নিয়োজিত শিক্ষকদের কর্মসম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত ও মানসম্মত স্থান নেই। ক্লাসরুমের সংখ্যা সীমিত এবং এর আকার অপরিসর। সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্যে পর্যাপ্ত স্থান নেই। বহির্বিভাগের অবর্তমানে স্বাস্থ্য শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই। গবেষণাগারসমূহ অসমৃদ্ধ এবং এগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রকট অভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা সীমিত। শিক্ষার অন্যান্য আধুনিক উপকরণও পর্যাপ্ত নয়। মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সুযোগ সামান্য। গ্রন্থাগারে শিক্ষাসহায়ক প্রযুক্তির অভাব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত। প্রয়োজনীয় স্থান সংকটের পাশাপাশি বইপুস্তকের সংগ্রহও সীমিত। দারিদ্য, অপুষ্টি, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ, প্রজনন স্বাস্থ্যসমস্যা ও জনসংখ্যাভার, নগরায়ন, আচরণগত সমস্যা, জীবন যাপনের ধরণে পরিবর্তন এবং পরিবেশের দ্রুত অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্ববহ হয়ে উঠছে। বর্তমানকালে সুপেয় পানির স্বল্পতা, আর্সেনিকসহ অন্যান্য সূত্র থেকে পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, ধূমপানজনিত রোগের বৃদ্ধি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পরিবর্তন জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যাপক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাকে বাস্তবানুগ ও সম্প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন।

৬.০ ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা

দেশের ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থাও প্রয়োজন অনুযায়ী আশানুরূপ নয়। সরকারিভাবে ঢাকায় একটি মাত্র ডেন্টাল কলেজ এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ একটি করে সংযুক্ত ডেন্টাল ইউনিট স্নাতকপূর্ব কোর্স পরিচালনা করে। সম্প্রতি বেসরকারি মালিকানায় ৭টি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি এবং সেগুলোর ভৌত অবকাঠামো যথাযথ মানসম্মত নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেন্টাল অনুষদ দেশে উচ্চতর শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডি.ডি.এস. কোর্স, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এম.এস., এম.ডি.এস এবং BCPS এর অধীন MCPS ও Conservative Dentistry and Endodontics বিষয়ে FCPS ডিগ্রির প্রচলন রয়েছে। আরও তিনটি অনুশাখায় FCPS কোর্স চালুর বিষয় বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।

দেশে বর্তমানে ১৩০০ জন ডেন্টাল সার্জন কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে ৬১৬ জন সরকারি খাতে নিয়োজিত। জনসংখ্যার ৮০% মানুষের কোন-না-কোন দন্তসমস্যা রয়েছে। বর্তমানে দেশে কর্মরত ডেন্টাল সার্জন ও জনসংখ্যার অনুপাত ১:১০৩২৮০। প্রতি বছর প্রায় ২০০ জন (৩৫-৪০ জন বিদেশীসহ) ডেন্টাল সার্জন (সরকারি ও বেসরকারি খাতে ১০০ জন করে) পেশাজীবনে প্রবেশ করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এই হার বহাল থাকলে বর্তমানে বিদ্যমান ডেন্টাল সার্জন ও জনসংখ্যার অনুপাতের আরও অবনতি ঘটবে। এই কারণে দেশে স্নাতকপূর্ব ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডেন্টাল চিকিৎসক উৎপাদনের সুযোগ দ্রুত বৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন অপরিহার্য।

বর্তমান কাঠামোয় ডেন্টাল শিক্ষার স্তরবিন্যাস মোটামুটি সন্তোষজনক, তবে উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষার ন্যায় এখানেও একই লক্ষ্যে বহু কোর্স (যেমন, ডিডিএস, এমএস, এফসিপিএস, এমডিএস, এমসিপিএস) পরিচালিত হয় বলে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমতাসংক্রান্ত বিভ্রান্তি দেখা দেয়। মেডিকেল শিক্ষার মত এখানেও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সমন্বয়হীন বহুসংস্থার নিয়ন্ত্রণ লক্ষণীয়, যার ফলে মান নিশ্চয়তা ও মান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনিশ্চিত থেকে যায়।

সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে অবকাঠামোর মান সন্তোষজনক নয়। উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষকের বেশ প্রকট, বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যরত শিক্ষকগণের অধিকাংশই খণ্ডকালীনভাবে নিয়োজিত। শিক্ষকগণ যুগপৎ শিক্ষা ও সেবা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় শিক্ষাদান প্রকৃতপক্ষে খণ্ডকালীন পেশায় পর্যবসিত হয়। সংখ্যার স্বল্পতা ছাড়াও আধুনিক দন্তরোগ বিজ্ঞানের বহু বিশেষজ্ঞতায় (যেমন- Laser therapy, implants therapy) একজনও বিশেষজ্ঞ নেই, ফলে উচ্চতর শিক্ষা ও চিকিৎসা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি উপেক্ষিত এবং চিকিৎসাসংক্রান্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগও সীমিত। ফলে শিক্ষকতা ও শিক্ষার কার্যকারিতা ও অগ্রসরমানতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

৬.১ সরকারি খাতের ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট ও অনুষদ

দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ডেন্টাল কলেজ হিসাবে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অনুষদে মাত্র ৩ জন অধ্যাপক, ৭ জন সহযোগী অধ্যাপক, ২৩ জন সহকারী অধ্যাপক ও ২৬ জন প্রভাষক রয়েছেন। এছাড়াও ১ জন অধ্যক্ষ ও ১ জন উপাধ্যক্ষ প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত ডেন্টাল ইউনিট সমূহে প্রতি বছর ২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও এখানে নিয়মিত কোন শিক্ষকের পদ নেই। বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে রাজশাহীতে ১ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৪ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ৮ জন প্রভাষক প্রেষণে নিয়োজিত হয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করছেন। একইভাবে চট্টগ্রাম ডেন্টাল ইউনিটে ২ জন সহকারী অধ্যাপকসহ ৮ জন প্রভাষক ও ২ জন ডেন্টাল সার্জন শিক্ষকতা করছেন। উক্ত দুটি ইউনিটের জন্য কেন্দ্রীয় কোন ব্যয়বরাদ্দ নেই। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়বরাদ্দের মাধ্যমে ইউনিট দুটি সচল রাখা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো : ঢাকা ডেন্টাল কলেজের নির্মীয়মান নতুন ক্যাম্পাসে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণাধীন পর্যায়ে রয়েছে। রাজশাহী ডেন্টাল ইউনিট সাবেক সদর হাসাপাতালে ৪০০০ বর্গফুট এলাকায় সীমাবদ্ধ। এখানেও পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। চট্টগ্রাম ডেন্টাল ইউনিট বর্তমানে ১৫টি কক্ষে সমগ্র কার্যক্রম পরিচালনা করে, এই প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণাধীন নতুন ভবন সমাপ্ত হলে ভৌত অবকাঠামোর সন্তোষজনক উন্নয়ন হবে। উভয় ডেন্টাল ইউনিটে শুধু বহির্বিভাগীয় কার্যক্রম চালু আছে।

গ্রন্থাগার : ঢাকা ডেন্টাল কলেজের নতুন ক্যাম্পাসে ২০০০ বর্গফুটের গ্রন্থাগার রয়েছে। সেখানে বর্তমানে ৭৪০৩টি বইয়ের সংগ্রহের পাশাপাশি ফটোকপির সুযোগ থাকলেও ইন্টারনেটসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল। অন্য দুটি প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত মেডিকেল কলেজের গ্রন্থাগারে স্বল্প সংখ্যক ডেন্টাল বিষয়ক বইয়ের সংগ্রহ চাহিদার তুলনায় সামান্য। সর্বক্ষেত্রে জার্নালসমূহের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

শিক্ষার উপকরণ : সকল পর্যয়ে আধুনিক শিক্ষার উপকরণের অভাব দৃশ্যমান। ক্লাসরুমগুলি পর্যাপ্তভাবে সজ্জিত নয় এবং আধুনিক যন্ত্রপাতিও নেই।

গবেষণাগার : গবেষণাগারসমূহের অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, স্থানসংকট এবং গবেষণাগার কৌশলীর অভাবে প্রশিক্ষণের মান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

প্রশিক্ষণের যন্ত্রপাতি : অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের যন্ত্রপাতি পুরোনো মডেলের এবং সংরক্ষণের অভাবে তাও আংশিকভাবে কার্যকর। চাহিদার তুলনায় এ সবের সংখ্যা অপ্রতুল।

৬.২ বেসরকারি খাতের ডেন্টাল কলেজ

এই খাতে ১টি ডেন্টাল কলেজের নির্মীয়মান নিজস্ব ভবন ছাড়া বাকি সবগুলি কলেজ ভাড়া বাড়িতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সার্বিকভাবে ভৌত অবকাঠামোর মান অসন্তোষজনক, শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল ও পদানুযায়ী বিন্যাস সামঞ্জস্যহীন। লাইব্রেরির মান খুবই অনুন্নত এবং প্রশিক্ষণ ও শিক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সুযোগ সুবিধার সংকটও প্রকট। কোনটিতেই আন্তঃবিভাগীয় চিকিৎসার সুযোগ নেই।

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ

ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ডেন্টাল অনুষদ শুধু উচ্চ শিক্ষার নিম্নলিখিত কোর্স সমূহ (সারণি-১) পরিচালনা করে।

সারণি -১ : ডেন্টাল চিকিৎসায় উচ্চ শিক্ষার কোর্স সমূহ

কোর্স	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ স্থল	বিশ্ববিদ্যালয়
ডি.ডি.এস	এক বছর	ঢাকা ডেন্টাল কলেজ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিএসএমএমইউ
এম.ডি.এস (ক) ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল (খ) কনজারভেটিভ ডেনটিস্ট্রি ও এন্ডোডনটিক্স (গ) প্রস্থ ডনটিক্স	৩ বছর	বিএসএমএমইউ	বিএসএমএমইউ
এম.এস. ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল	৩ বছর	বিএসএমএমইউ	বিএসএমএমইউ
এফ.সি.পি.এস.			
(ক) কনসারভেটিভ ডেনটিস্ট ও এন্ডোডন্টিক্স (খ) ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি (গ) প্রস্থডনটিক্স (ঘ) অর্থোডনট্রিক্স			বি.সি.পি.এস.
এম.সি.পি.এস.			বি.সি.পি.এস

প্রতি বছর ৪০ জন শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার কোর্সসমূহে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান।

উচ্চ শিক্ষার মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বি.এস.এম.এম.ইউ.তে ভৌত অবকাঠামোর নিদারুণ সংকট লক্ষনীয়। এখানে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম স্থানের অভাব পরিলক্ষিত, শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৬ জন, গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা মাত্র ১০০ এবং যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণের সংকট প্রকট।

৭.০ নার্সিং শিক্ষা

চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থায় নার্সিং পেশার গুরুত্ব অপরিসীম। হাসপাতাল ছাড়াও কমিউনিটি পর্যায়ে নার্সিং সেবা সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশে নার্সিং পেশা ও শিক্ষা যথেষ্ট উপেক্ষিত। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা অপ্রতুল, দেশে বর্তমানে ডাক্তার-নার্স অনুপাত ১ঃ০.৬। এই অনুপাত গ্রহণযোগ্য মানের সেবা প্রদানের পরিপন্থী। বর্তমানে দেশে প্রতি বছর ২০০০ ডাক্তার তৈরি হয়; সে তুলনায় কিন্তু নার্স তৈরি হয় মাত্র ৮০০। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সার্বিক চিকিৎসা সেবার মানের দ্রুত অবনতি ঘটবে।

দেশে ৩৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৪৪টি প্রতিষ্ঠান ডিপ্লোমা পর্যায়ে নার্সিং শিক্ষা প্রদান করে থাকে। সরকারি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলি ফরিদপুর মেডিকেল কলেজসহ ৮টি পুরাতন মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত এবং বছরে ৫০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করে থাকে (সারণি-১)। এতদ্ব্যতীত ১১টি পুরাতন জেলায় একটি করে নার্সিং ইনস্টিটিউট রয়েছে যার প্রতিটিতে বছরে ২৫ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। ১৮টি নতুন জেলায় অবস্থিত নার্সিং স্কুলগুলির প্রত্যেকটি বছরে ২০ জন করে শিক্ষার্থী গ্রহণ করে। ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালসহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মোট ৫টি নার্সিং-ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে (সারণি-২)। দেশের একমাত্র নার্সিং কলেজ (সরকারি খাতে) ঢাকায় অবস্থিত। অন্য একটি নার্সিং কলেজ বর্তমানে বগুড়ায় নির্মাণাধীন।

সারণি - ১ : ৯টি সরকারি মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত ৯টি নার্সিং ইনস্টিটিউটের আসন সংখ্যা

ক্রমিক	নার্সিং ইনস্টিটিউট এর নাম	আসন সংখ্যা
১.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৮০
২.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	২০
৩.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ	২৫
৪.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী	৫০
৫.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর	৫০
৬.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম	৫০
৭.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল	৫০
৮.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট	৫০
৯.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর	২৫
মোট		৫০০

সারণি - ২ : অন্যান্য নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

আর্মড ফোর্সেস নার্সিং ইনস্টিটিউট	সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস.
০৫ বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট	১. নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুমুদিনী হাসপাতাল, মির্জাপুর, টাংগাইল। ২. নার্সিং ইনস্টিটিউট, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, ঢাকা। ৩. নার্সিং ইনস্টিটিউট, চন্দ্রঘোনা মিশন হাসপাতাল, চট্টগ্রাম। ৪. নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাজশাহী মিশন হাসপাতাল, রাজশাহী। ৫. নার্সিং ইনস্টিটিউট, জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ। ৬. কলেজ অব নার্সিং, মহাখালি, ঢাকা।
পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং এবং বিএসসি, পিএইচএন (২ বছর)	কলেজ অব নার্সিং, মহাখালি, ঢাকা। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন)
৬টি বিশেষজ্ঞ কোর্স	১. অর্থোপেডিক কোর্স, আরআইএইচডি, ঢাকা। ২. সাইকিয়াট্রিক কোর্স, পাবনা। ৩. পেডিয়াট্রিক কোর্স, বিএসএমএমইউ, ঢাকা। ৪. অফথালমোলজী কোর্স, এনআইও, ঢাকা। ৫. চেস্ট ডিজিসেস কোর্স, আইডিসিএইচ, ঢাকা। ৬. আইসিইউ/সিসিইউ/এনআইসিভিডি, ঢাকা।

নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও স্কুলগুলি ৩ বছর মেয়াদি বুনিয়াদি নার্সিং কোর্স (Basic Nursing Course) সহ ১ বছরের ধাত্রী বিষয়ক (Midwifery) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নার্সিং ডিপ্লোমা প্রদান করে। এছাড়া ৬টি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে ১ বছর মেয়াদি বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ কোর্স (Specialization course) পরিচালিত হয়। নার্সিং কলেজ বুনিয়াদোত্তর নার্সিং (Post-Basic Nursing) পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্নাতক নার্সিং (BSc Nursing) ও স্নাতক জনস্বাস্থ্য নার্সিং (BSc Public Health Nursing), স্নাতকোত্তর নিদানিক নার্সিং (MSc Clinical Nursing) ডিগ্রি প্রদান করে। কিছুসংখ্যক নার্স NIPSOM ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে মাস্টার অব সায়েন্স (MSc) ও মাস্টার অব পাবলিক হেলথ্ (MPH) পর্যায়ের সনদ লাভ করেছেন। নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অনুপাত সামঞ্জস্যহীন। শিক্ষার্থীদের মাত্র ১০% পুরুষ। নার্সিং শিক্ষার সার্বিক চিত্র খুবই করুণ (সারণি-৩)।

সারণি ৩ : নার্সিং শিক্ষা

ক্রমিক	ইনডিকেটরস	বিবরণ	
১.	নার্সিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা	সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট - ৩৮ আর্মড ফোর্সেস নার্সিং ইনস্টিটিউট - ০১ বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট - ০৫	মোট নার্সিং ইনস্টিটিউট - ৪৪
২.	কোর্সের সময়	৩ বছর বেসিক নার্সিং এবং ১ বছর মিডওয়াইফারি/অর্থোপেডিক নার্সিং	
৩.	ছাত্রের সংখ্যা (ডিপ্লোমা নার্সিং) অনুমোদিত আসন	১,১৩৫ (৪ বছরের প্রোগ্রাম)	
৪.	নার্সিং ইনস্টিটিউট হতে বার্ষিক	৮০০-১০০০	
৫.	পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং বিএসসি পাবলিক হেলথ নার্সিং	৬০+৬০=১২০ (অনুমোদিত পদ) ৫ জন বিদেশি/বেসরকারি ছাত্র	
৬.	রেজিস্ট্রার্ড নার্সেস মিডওয়াইফের সংখ্যা	১৭,২৩৩ - ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত ১৫,১৬৪	
৭.	ডিগ্রিধারী	বিএসসি নার্সিং : ৪৭৫- ৭৭-৭৮ সাল হতে ৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত বিএসসি, পিএইচএস : ৩৮০ মোট : ৮৫৫	
৮.	মোট এমএসসি + এমপিএইচ	৪৯+৯=৫৮ (ভারত, ইউকে, বাংলাদেশ) ৩৬ - বাংলাদেশ।	
৯.	শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত	(ক) ১:৩৬ (নার্সিং ইনস্টিটিউট) (খ) ১:১৭ (নার্সিং কলেজ) (গ) ১:২৫ (বেসরকারি স্কুল) সর্টেজ- ৪৪২	
১০.	শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত (আন্তর্জাতিক মানের)	১:৬-৮	
১১.	পুরুষ ছাত্র (বেসিক নার্সিং)	১০% একমাত্র ৮টি মেডিকেল কলেজে সংযুক্ত নার্সিং ইনস্টিটিউট।	

৭.১ কলেজ অব নার্সিং :

তিন একর জমিতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারযোগ্য স্থান ৬৫,৫০০ বর্গফুট। সর্বমোট ১৫ জন অনুষদ সদস্য নিদানিক নার্সিং (Clinical Nursing) এবং জনস্বাস্থ্য নার্সিং (Public Health Nursing)-এর BSc ও MSc পর্যায়ের ১২৫ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত রয়েছে।

Development Fund for International Development (DFID)-এর সহায়তায় ১৯৯৮ সালে প্রণীত নার্সিং শিক্ষা কারিকুলাম ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ২০০০-২০০১ থেকে কার্যকর হয়েছে। কারিকুলাম বাস্তবায়ন কমিটি এই কারিকুলাম সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণে নিয়োজিত এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনে সক্রিয় রয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানের ১১৪৮ বর্গফুটের গ্রন্থাগার এবং এর ৯২৩০টি বই ও জার্নালের কপি চাহিদার তুলনায় স্বল্প। গ্রন্থাগার তত্ত্বাবধায়নে লোকবল অপ্রতুল। ফটোকপি, ইন্টারনেট এবং Networking সুবিধাবিবর্জিত এই পাঠাগারে আসনসংখ্যা খুবই সীমিত। আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষার নানা উপকরণের সংগ্রহও সীমিত। ট্রেনিং ও গবেষণার সুযোগও নগণ্য।

৭.২ নার্সিং ইনস্টিটিউটসমূহ :

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত নার্সিং ইনস্টিটিউটসমূহের ৫৯,২১০ বর্গফুটের ভৌত অবকাঠামো রয়েছে। এছাড়াও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, বরিশাল মেডিকেল কলেজ ও খুলনা মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামোর পরিমাণ যথাক্রমে ৪১,৫০০, ৫৭,০১০, ৫৭,০১০ এবং ৫৭,০১০ বর্গফুট। অন্যান্য নার্সিং ইনস্টিটিউটের ভৌত অবকাঠামো ২৯,৪৭৩ বর্গফুটের মতো। প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিসর বেশ কম।

নার্সিং ইনস্টিটিউট ও স্কুলসমূহে শিক্ষকের সংকট ছাড়াও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে লোকবলের অসামঞ্জস্য রয়েছে—যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত নার্সিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাত ৩৩:১ এবং ১৮টি ইনস্টিটিউটে এই অনুপাত গড়ে ১২.৫:১।

একমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত ইনস্টিটিউটে ১২০০ বর্গফুটের গ্রন্থাগার ছাড়া অধিকাংশ ইনস্টিটিউটে লাইব্রেরির স্থানসংকট প্রকট। সিলেটে এর পরিমাণ মাত্র ১৯২ বর্গফুট। কোন প্রতিষ্ঠানে পুস্তকসংগ্রহের সংখ্যা ২০০টির বেশি নয়। এককভাবে সর্বোচ্চ সংগ্রহের সংখ্যা মাত্র ১৪০৯।

যদিও বর্তমানে কারিকুলামে সক্রিয় শিক্ষা (Active training) এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (Primary Health Care)-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তবু-ও বাস্তবে নার্সিং শিক্ষা মূলত নোটনির্ভর ও মুখস্থকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অধিকাংশ ইনস্টিটিউশন দ্বিতীয় (Secondary) এবং তৃতীয় (Tertiary care) পর্যায়ের সেবামূলক হাসপাতাল সংযুক্ত হওয়ায় প্রতিরোধ (Preventive) ও Promotive বিষয়গুলির শিক্ষা মূলত তাত্ত্বিক পর্যায়েই থেকে যায়। শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ইংরেজিজ্ঞান খুবই সামান্য।

২০০১ এবং ২০০২ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, শতকরা ১ জন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরও ইংরেজিতে কথাবলা, লেখা ও শিক্ষকতার দক্ষতা নেই; যদিও ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রাখার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে শিক্ষার্থীদের বর্তমান ইংরেজিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে ৬টি টেক্সট বইকে বাংলায় অনুবাদ করার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রশিক্ষণকালীন সহায়তার (Facilitation) অভাবে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের যথাবিধি সমন্বয় হয় না। কথোপকথন দক্ষতা (Communication skill) নার্সিং পেশার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও শিক্ষাসূচিতে এর গুরুত্ব খুব কমই দেওয়া হয়েছে এবং বাস্তবে এর চর্চা একেবারেই নেই।

বর্তমানে নার্সিং কাউন্সিল ডিপ্লোমা নার্সিংয়ের পরীক্ষা পরিচালনা, মূল্যায়ন ও সনদ প্রদান করে থাকে। লিখিত ও মৌখিক বার্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে উত্তীর্ণ ও চূড়ান্ত সনদ প্রদান করা হয়। পরীক্ষাসমূহের মূল্যায়ন চেতনানির্ভর (Subjective) এবং তা গতানুগতিক পদ্ধতিতে সাধিত হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষা বা কোর্সচলাকালীন মূল্যায়নের (Formative Assessment) কোন বিধান বর্তমান পদ্ধতিতে নেই।

৮.৩ অবকাঠামো :

১৯৬২ সালে দেশে সর্বপ্রথম সরকারি পরিচালনায় ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি ঢাকার মহাখালিতে স্থাপিত হয়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরশিপ ডিপ্লোমার জন্য স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী সময়ে আরও পাঁচটি অনুষদ খোলা হলেও এবং ১ বছরের কোর্স ৩ বছরে রূপান্তরিত হলেও শিক্ষকের পদের সংখ্যা প্রারম্ভিক পর্যায়ের ১২ জনে সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমানে ১০-১২ জন শিক্ষককে প্রেষণে নিয়োগদান করে অত্যন্ত সীমাবদ্ধতার মাঝে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে রাজশাহীতে স্থাপিত দ্বিতীয় সরকারি ইনস্টিটিউটের অবস্থাও অনুরূপ। সম্প্রতি এই খাতে বেসরকারি উদ্যোগে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে সাভারে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনটির নিজস্ব ভৌত অবকাঠামো নেই এবং এগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক সংকট বিদ্যমান। প্রশিক্ষণসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সুযোগ সুবিধাও সীমিত। ফিজিওথেরাপি ছাড়া মেডিকেল কৌশলীদের উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা অর্জনের বর্তমানে কোন সুযোগ নেই। ফিজিওথেরাপি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গণবিশ্ববিদ্যালয়, স্টেট ইউনিভার্সিটি ও পিপলস ইউনিভার্সিটির অধীন স্নাতক পর্যায়ের BSc (Physiotherapy) কোর্স চালু রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ চার বছর মেয়াদি এই সকল কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন NITOR এবং গণবিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ হেলথ্ প্রফেশনাল ইনস্টিটিউটসহ গণবিশ্ববিদ্যালয়, স্টেট ইউনিভার্সিটি ও পিপলস্ ইউনিভার্সিটি স্ব-স্ব কোর্স পরিচালনা করেন। প্রতি ছয় মাস অন্তর ১৫০ থেকে ২০০ জন স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

৯.০ দেশজ ঐতিহ্যবাহী/প্রাক-আধুনিক (Traditional) চিকিৎসা শিক্ষা

৯.১ ভূমিকা :

জনসাধারণের মধ্যে হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রচলিতভাবে জনপ্রিয় থাকলেও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে এই ঐতিহ্যে ভাঁটা পড়ে। বিশ্বব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী রোগসমূহের প্রকোপবৃদ্ধি ও ক্ষেত্রবিশেষ আধুনিক চিকিৎসার অকার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত চিকিৎসা একটি বিকাশমান বিজ্ঞান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আমাদের দেশেও আবহমানকাল থেকে নানা ঐতিহ্যগত ও বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। জনগণের ক্রমাগত চাহিদার পটভূমিতে এই সকল চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসক তৈরি সময়ের দাবিতে পরিণত হচ্ছে।

বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডিপ্লোমা ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে।

৯.২ শিক্ষা কার্যক্রম :

দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ এই সকল বিষয়ে ডিপ্লোমা মানের চিকিৎসা শিক্ষা চালু আছে। ১৯৮৬ সালে সর্বপ্রথম বেসরকারি পর্যায়ে হোমিওপ্যাথিক স্নাতক কোর্স চালু হয়। ১৯৮৯ সালে ঢাকায় সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও সরকারি আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকারিভাবে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি ও জীববিজ্ঞান ফ্যাকালটির অধীন এই কলেজ দুটিতে পাঁচ বছর মেয়াদি কোর্স সম্পন্ন করার পর স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর কোর্সসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের যে-কোন একটিতে প্রথম বিভাগসহ সর্বনিম্ন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা কোর্সসমূহে ভর্তি হন। প্রাথমিকভাবে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ও সার্জারি (BHMS), আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ও সার্জারি (BAMS) এবং ইউনানি মেডিসিন ও সার্জারি (BUMS) বিষয়ে ১০০ জন এবং অন্য দুটিতে ৫০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা থাকলেও কয়েক বছর পর অবকাঠামো ও শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়। স্নাতক উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ১ বছর ইন্টার্নিশিপ সম্পন্ন করার মাধ্যমে পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করে BHAUMS রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল কর্তৃক সনদ লাভ করেন।

৯.৩ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা :

স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম :

অবকাঠামো : ঢাকায় ৩ একর জমিতে সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল অবস্থিত। হাসপাতালে আন্ত:বিভাগীয় ও বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা সুবিধা থাকলেও রোগ নির্ণয়ের এবং শিক্ষা দানের সুযোগ সুবিধা নিতান্ত সীমিত।

৮.০ মেডিকেল প্রযুক্তি শিক্ষা

৮.১ ভূমিকা ও সংগঠন :

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় মেডিকেল কৌশলীদের (Technologists) ভূমিকা অবিচ্ছেদ্য। সহায়ক লোকবল হিসেবে এই কৌশলীগণ হাসাপাতাল, ক্লিনিক, ল্যাবরেটরি ও মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান করেন। বর্তমানে ৭টি বিষয়ে মেডিকেল কৌশলী শিক্ষা প্রদান করা হয় (সারণি-১)।

সারণি - ১ : মেডিকেল কৌশলী (ডিপ্লোমা) শিক্ষার বিষয়সমূহ

1.	Medical Technologist (Laboratory Medicine)
2.	Medical Technologist (Pharmacy)
3.	Medical Technologist (Radiology & Imaging)
4.	Medical Technologist (Dentistry)
5.	Medical Technologist (Physiotherapy)
6.	Medical Technologist (Sanitary Inspector Training)
7.	Medical Technologist (Radiotherapy)

দুটি সরকারি ও ৬টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (সারণি-২) বর্তমানে এই সকল বিষয়ে Diploma কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ফার্মেসি ব্যতীত বাকি ৫টি বিষয়ে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ (State Medical Faculty of Bangladesh) ডিপ্লোমা প্রদান ও নিবন্ধন করে। বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল (Bangladesh Pharmacy Council) ফার্মাসিস্টদের ডিপ্লোমা প্রদান ও নিবন্ধন করে।

সারণি ২ : মেডিকেল কৌশলী (ডিপ্লোমা) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১.	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মহাখালি, ঢাকা।
২.	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, রাজশাহী।
৩.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল টেকনোলজি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৪.	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মিরপুর, ঢাকা।
৫.	বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
৬.	জনতা ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, বগুড়া।
৭.	গ্রীন ভিউ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিজ্ঞান বিষয়ে ১ম বিভাগে এস.এস.সি. উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। সকল কোর্স ৩ বছর মেয়াদি। বৃহৎ দলীয় শিক্ষা (Large group teaching), ক্ষুদ্র দলীয় শিক্ষা (Small group teaching), প্রদর্শন (Demonstration) এবং মাঠ প্রশিক্ষণ (Field training)-এর মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। মূল্যায়নের জন্য লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সকল ক্ষেত্রে কোর্স চলাকালীন মূল্যায়নের (Formative assessment) বিধান ও গ্রেডিং (Grading) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাৎসরিক একবার চূড়ান্ত পরীক্ষা ও ৬ মাস পর সাপ্লিমেন্টারি (Supplementary) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ২০০১ সালে প্রণীত এই শিক্ষাসূচি বর্তমানে পরীক্ষাধীনভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কোর্সটি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সমতা লাভ করেছে।

৮.২ প্রশাসনিক কাঠামো :

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ (State Medical Faculty) ও ফার্মেসি কাউন্সিল (Pharmacy Council) স্ব-স্ব এখতিয়ারাধীন বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ, ডিপ্লোমা প্রদান ও নিবন্ধন করে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনে মূলনীতি নির্ধারণ ও অনুমোদন প্রদানসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকবে।

৩০০-৪০০ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ২২ জন। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের কোন আবাসন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীদের কোন বৃত্তি ও ইন্টার্নিদের কোন ভাতার ব্যবস্থাও নেই।

বেসরকারি পর্যায়ে মাত্র একটি স্নাতক পর্যায়ের কলেজে ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলেও অবকাঠামো, শিক্ষার উপকরণ এবং সুযোগ-সুবিধা খুবই সামান্য।

ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম :

৩২টি ডিপ্লোমা কলেজ শিক্ষার্থীদের চার বছর কোর্স সমাপনান্তে ডিপ্লোমা সনদ প্রদান করে। কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ।

হোমিওপ্যাথি বিষয়ে দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। দেশে প্রায় ৩০ হাজার ডিপ্লোমা ও ৫০০ স্নাতক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রয়েছেন। সরকারি পর্যায়ে মাত্র ১৫টি জেলায় একজন করে চিকিৎসক অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত আছেন।

৯.৪ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম :

১৯৮৯ সালে ঢাকায় ৩ একর জমিতে সর্বপ্রথম দেশজ চিকিৎসালয় স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রি কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাঁচ বছরের কোর্সসমূহের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্তত একটিতে দ্বিতীয় ও একটিতে প্রথম বিভাগ থাকা আবশ্যক। প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ২৮। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের কোন আবাসন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীদের কোন বৃত্তি ও ইন্টার্নিদের কোন ভাতার ব্যবস্থাও নেই। সংযুক্ত হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের এবং কলেজে শিক্ষা উপকরণের সুযোগ সুবিধা খুবই সীমিত।

স্নাতক পর্যায়ের এই কলেজ ছাড়াও দেশে ১১টা ইউনানি ও ৭টি আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে।

দেশে বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার রেজিস্ট্রার্ড ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক রয়েছেন। জেলা পর্যায়ে ১৫ জন করে চিকিৎসক অস্থায়ীভাবে সরকারি পদে নিয়োজিত ছাড়া অধিকাংশই স্বনিয়োজিত।

দেশজ চিকিৎসা ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা অর্জন ও প্রসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, প্রযুক্তিসংগ্রহ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। স্বল্পমেয়াদে বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আবাসন ও শিক্ষার সুযোগ সুবিধার সংকটমোচন করা দরকার। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত আধুনিক উপকরণ ও প্রযুক্তি সংগ্রহ করা দরকার। সরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও ইন্টার্নি ভাতা প্রদানে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের বৃত্তি চালু করার উদ্যোগগ্রহণও আবশ্যক। বেসরকারি ডিপ্লোমা পর্যায়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের জন্য সরকারি আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাগ্রহণ এই প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নসহায়ক হবে। মধ্যম মেয়াদে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান ও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগে একটি করে সরকারি স্নাতক পর্যায়ের কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিপ্লোমা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের জন্যে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে। ডিপ্লোমা প্রাপ্ত চিকিৎসকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিচর্যার অধীন কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। দীর্ঘ মেয়াদে প্রচলিত চিকিৎসায় নিয়োজিত জনসম্পদের মান-উন্নয়ন, দক্ষতাবৃদ্ধি, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষাসূচিকে আধুনিক করা এবং মূল্যায়নকে কার্যকর করা এবং সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ধ্যান-ধারণার প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সার্বিকভাবে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানিসহ যে-সকল প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যা বর্তমানে কাঠামোভুক্ত হয়েছে সেগুলোর নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রয়োজন। অগ্রসরমাণ বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে এই সকল বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার কার্যকর অংশের সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ সার্বিক চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত শিক্ষা উন্নয়নের জন্যে সুপারিশমালা

জাতির চাহিদা ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সক্ষম জনবল গড়ে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অভিন্ন জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ। কালক্রমে এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অব্যাহত ধারাবাহিকতাও অত্যাবশ্যক। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক উপযুক্ত শিক্ষাসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যথার্থ অবকাঠামো অপরিহার্য। তবে, শিক্ষাসংক্রান্ত এই সকল বৈষয়িক উপকরণের পাশাপাশি আদর্শ-চরিত্র (Role model)ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, আগ্রহী ও নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থী এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক দক্ষ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কম নয়। সে কারণেই সন্তোষজনক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে নাগরিক, পেশাজীবী, ব্যবস্থাপক ও নীতিনির্ধারক সমন্বয়ে জাতীয় অঙ্গীকার গড়তে হবে।

১০.০ স্নাতকপূর্ব মেডিকেল শিক্ষা উন্নয়নের কৌশল

১০.১ মানবসম্পদ উন্নয়ন :

দেশে বর্তমানে কর্মরত ২৮৫৩৭ জন চিকিৎসকের হিসেবে চিকিৎসক-জনসংখ্যার অনুপাত ১:৪৬৫৪। তবে গ্রামীণ জনসংখ্যার জন্য এই অনুপাত আরও বেশী। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী (১৪%) প্রতি বছরে জনসংখ্যা বাড়ে ২২ লক্ষ। এই হার আগামী দুই দশক বলবৎ থাকবে বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমান হারে গড়ে প্রতিবছর ২০০০ জন নতুন ডাক্তার সৃষ্ট হতে থাকলে চিকিৎসক-জনসংখ্যা অনুপাতের সামান্যই উন্নতি ঘটবে। ২০২০ সালের মধ্যে চিকিৎসক-জনসংখ্যার অনুপাত অভিপ্রেত মাত্রায় (১:৩০০০) নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মধ্যম হারের বৃদ্ধি ও মধ্যম হার টিকে থাকা অনুসারে [Medium survival rate (0.975)] এই উৎপাদন নিম্নরূপ হতে পারে (সারণি- ১) [Px.(1-Dx/Px)+Ax) ফর্মুলায় নির্ণীত যেখানে Px = বর্ণিত বছরে বিদ্যমান চিকিৎসক Dx = বর্ণিত বছরে drop-out এবং Ax = বর্ণিত বছরে উৎপাদন]।

সারণি ১ : প্রাক্কলিত চিকিৎসকের সংখ্যার অভিক্ষেপণ

বছর	সরকারি খাতে উৎপাদন	বেসরকারি খাতে উৎপাদন	মোট উৎপাদন	গত বছরে	বর্তমান বছরে
২০০২	১২০০	৮০০	২০০০	২৬৫৩৭.০০	২৮৫৩৭.০০
২০০৩	১২০০	৮০০	২০০০	২৭৯৬৬.২৬	২৯৯৬৬.২৬
২০০৪	১২০০	৮০০	২০০০	২৯৩৬৬.৯৩	৩১৩৬৬.৯৩
২০০৫	১২০০	৮০০	২০০০	৩০৭৩৯.৫৯	৩২৭৩৯.৫৯
২০০৬	১২০০	৮০০	২০০০	৩২০৮৪.৮০	৩৪০৮৪.৮০
২০০৭	১২০০	১২০০	২৪০০	৩৩৪০৩.১০	৩৫৮০৩.১০
২০০৮	১৫০০	১২০০	২৭০০	৩৫০৮৭.০৪	৩৭৭৮৭.০৪
২০০৯	১৫০০	১২০০	২৭০০	৩৭০৩১.৩০	৩৯৭৩১.৩০
২০১০	১৫০০	১২০০	২৭০০	৩৮৯৩৬.৬৭	৪১৬৩৬.৬৭
২০১১	১৫০০	১২০০	২৭০০	৪০৮০৩.৯৪	৪৩৫০৩.৯৪
২০১২	১৫০০	১৬৮০	৩১৮০	৪২৬৩৩.৮৬	৪৫৮১৩.৮৬
২০১৩	১৫০০	১৬৮০	৩১৮০	৪৪৮৯৭.৫৮	৪৮০৭৭.৫৮
২০১৪	১৫০০	১৬৮০	৩১৮০	৪৭১১৬.৩২	৫০২৯৬.৩২
২০১৫	১৫০০	১৬৮০	৩১৮০	৪৯২৯০.৭০	৫২৪৭০.৭০
২০১৬	১৫০০	১৬৮০	৩১৮০	৫৩৫০৮.৬৮	৫৬৬৮৮.৬৮
২০১৭	১৫০০	১৬৮০	৩১৮০	৫৫৫৫৪.৯১	৫৮৭৩৪.৯১
২০১৮	১৫০০	১৬৮০	৩১৮০	৫৭৫৬০.২১	৬০৭৪০.২১
২০১৯	১৫০০	১৬৮০	৩১৮০	৫৭৫৬০.২১	৬০৭৪০.২১
২০২০	১৫০০	১৬৮০	৩১৮০	৫৯৫২৫.৪০	৬২৭০৫.৪০

এই হার (সারণি-১) অর্জন করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতকে শক্তিশালী করা দরকার। স্বল্প মেয়াদে সরকারি পর্যায়ে নতুন পাঁচটি মেডিকেল কলেজের নিজস্ব অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হলে সরকারি খাতে এই হার সহজেই অর্জন করা সম্ভব। বেসরকারি খাতকে অভিপ্রেত পর্যায়ে আনতে হলে পর্যাপ্ত নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই লক্ষে মধ্যম মেয়াদে বেসরকারি খাতকে সরকারি খাতে সমানুপাতিক করার জন্য সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনার দ্রুত অনুসন্ধান, যাচাই ও অনুপ্রেরণা দেওয়া দরকার। দেশের বিনিয়োগ ও চিকিৎসা সেবাখাতকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে

মান ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে এই খাতের সম্প্রসারণ চিকিৎসাসেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। চিকিৎসা সেবার যথার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার ।

১০.২ কাঠামোগত পরিবর্তন :

বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষা উন্নয়নকল্পে একটি যুগোপযোগী পরিবর্তন ও সংস্কারসাধন একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার একটি জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাংলাদেশের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি একীভূত মানব ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করবে। প্রস্তাবিত জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস থাকবে এবং সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তার বহিঃক্যাম্পাস হিসেবে গণ্য হতে হবে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংবিধি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে।

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের সমস্ত মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একাডেমিক কর্তৃত্ব থাকবে। শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষাসূচি প্রণয়ন, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত শিক্ষার বিষয়বস্তু, অনুষদ নির্বাচন, সংরক্ষণ, শিক্ষার সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা নিয়ন্ত্রণ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত সরকারি ও অধিভুক্ত বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট স্বশাসিত ব্যবস্থাপনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। এইরূপ অভিন্ন অভ্যন্তরীণ (Internal) মানব ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও স্বায়ত্তশাসন শিক্ষার সুষম মান অর্জন, সংরক্ষণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

বাহ্যিক (External) মান নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল সর্বোচ্চ ভূমিকায় নিয়োজিত থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষামান ব্যবস্থাপনা কাঠামো

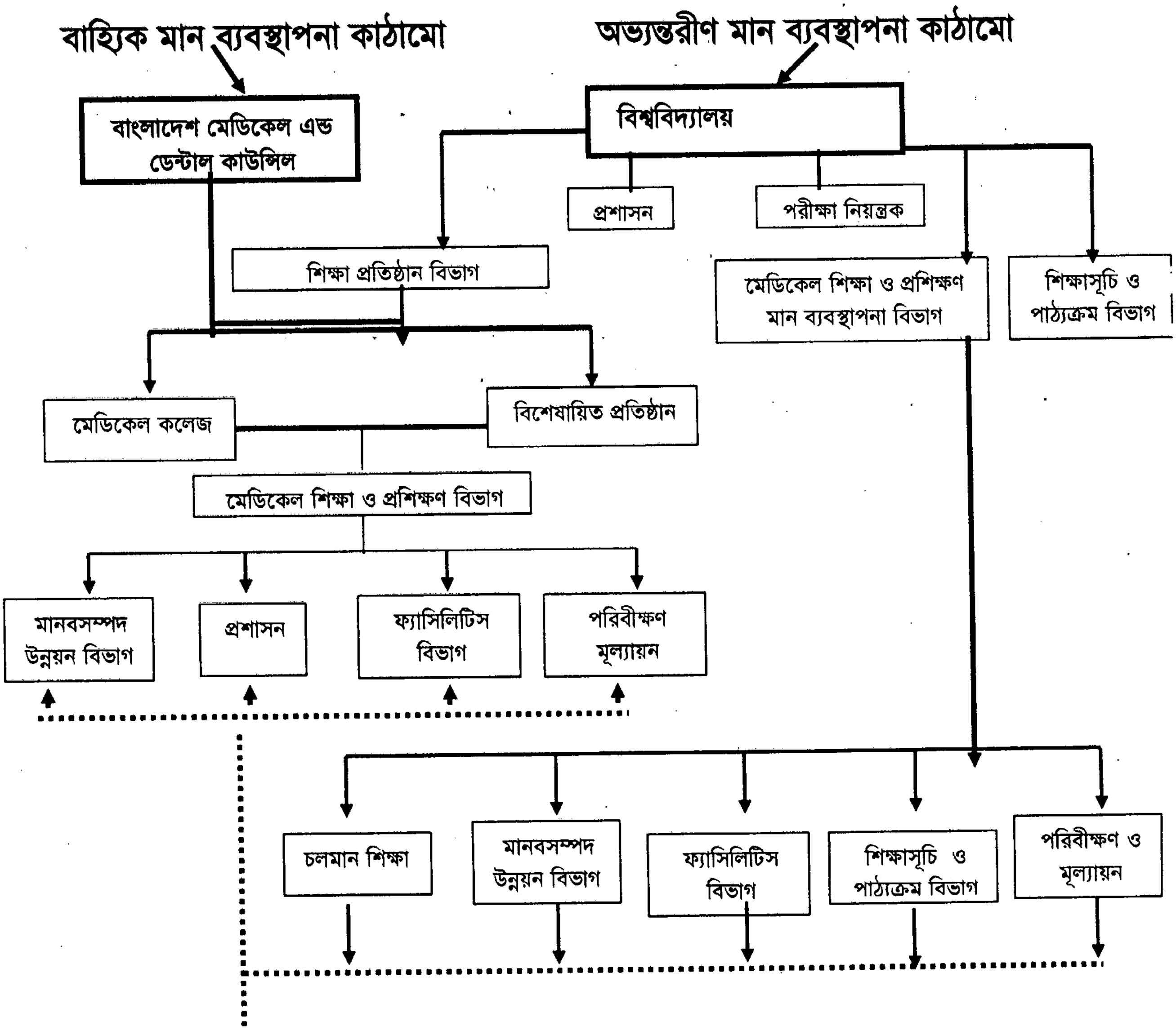

১০.৩ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন :

সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণধর্মী মনোভাব পরিবর্তন করে সহায়কধর্মী (Facilitatory) মনোভাবের চর্চা আবশ্যক। বিভাগসমূহকে কাঠামোগতভাবে সক্রিয় করে তোলা, এবং সেবা মনোভাবাপন্ন করে দলীয়ভাবে (Team approach) পরিচালনা করা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুষমতা ও কার্যকর গতিশীলতা আনার জন্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ স্থাপন করা দরকার। বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে বিদ্যমান মেডিকেল এডুকেশন ইউনিটের কার্যপরিধির আওতায় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করে সার্বিক স্থানীয় মানব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু (Focal point) হিসেবে মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালন, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে পারা যায়। ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে Learning Organisation এর ধারা প্রচলন করতে হবে ।

১০.৪ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশাসন :

শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সহকারী অধ্যাপক থেকে শুরু করে অধ্যাপক পর্যন্ত পদে নিয়োগের জন্য প্রতি স্তরে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর আওতায় স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের জন্য সরকারি কর্মকমিশনকে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রাথমিক সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে রেখে পরবর্তী পদোন্নয়নের বিষয়টি যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা (Track record) ও বিশেষজ্ঞ মতামত (Peer review) ভিত্তিক স্বচ্ছ, ন্যায়ভিত্তিক ও বৈধ প্রক্রিয়ায় সাধন করলে শিক্ষকতার মান, জবাবদিহিতা ও অনুষদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে একটি কার্যকর ব্যক্তিগত কর্মমান বিচার (Personal appraisal) পদ্ধতি গড়ে তোলাও আবশ্যক। বেসরকারি ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকমিশনের পরিবর্তে শক্তিশালী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর আওতায় স্বীকৃত হতে হবে। স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হলে বিশ্ববিদালয়ের মান ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও অনুষদে নিয়োগদানে সম্মতি প্রদান করবে এবং পদোন্নতিসহ অনুষদ সংরক্ষণের সকল কর্মকাণ্ডের নিবিড় পরিবীক্ষণ করবে।

১০.৫. শিক্ষকদের পদায়ন

শিক্ষকদের পদায়নের সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি থাকা দরকার। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের মতামত ও প্রতিক্রিয়া কার্যকর থাকা দরকার। উপযুক্তভাবে রক্ষিত দক্ষতার রেকর্ড (Track record) এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

১০.৬ অবকাঠামোগত পরিবর্তন

মেডিকেল কলেজসমূহের অবকাঠামো পর্যাপ্ত ও সুষম করা দরকার। প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য অবকাঠামো না থাকলে প্রতিষ্ঠানের অনুমতি প্রদান অভিপ্রেত নয়। স্থাপিত মেডিকেল কলেজসমূহে ক্লাশরুম, গবেষণাগার ও ক্লিনিক্যাল শিক্ষণ ছাড়াও গবেষণা, প্রশাসন ও শিক্ষকগণের জন্য যথাযথ স্থান সংকুলান করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি সর্বজনস্বীকৃত গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণ এবং তা অর্জনের জন্য জাতীয় লক্ষ্য ও সময়সীমা নির্ধারণ প্রয়োজন। আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসনসমস্যার নিরসনও এই লক্ষ্যসীমাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি কলেজসংযুক্ত হাসপাতালকে স্বীকৃতমানে উন্নত করা এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উন্নত প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা দরকার। এই লক্ষ্যে প্রয়োজন–

(১) যথাযথ ভৌত অবকাঠামো নির্ধারণ, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রশাসন, আবাসন (অবসর ও বিনোদন সুবিধাসহ)।

(২) উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন ও সংগ্রহ।

(৩) অবকাঠামো সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নিয়মিত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

১০.৭ শিক্ষাসূচি (curriculum)এবং পাঠ্যপুস্তক (text-book) উন্নয়ন

শিক্ষাসূচিকে যথাযথ কার্যকর রাখার জন্য এ লক্ষ্যে অব্যাহত নিরীক্ষা আবশ্যক। শিক্ষাসূচি পরিকল্পনায় data-base অবলম্বন অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সক্ষম বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জন্সসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি শিক্ষাসুচি বিভাগ স্থাপন প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানের মূল কার্যপরিধি হবে শিক্ষাসূচি পুনর্মূল্যায়ন (curriculum review) ও পরিকল্পনার (planning) সংগঠন ও সহযোগিতা এবং শিক্ষাসুচি বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রমাণভিত্তিক জাতীয় কার্যপ্রণালী বিধি (Evidence-based National Practice Guideline) প্রণয়ন করা।

১০.৮ শিক্ষাসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি :

শিক্ষাসূচিতে পর্যায়ক্রমে সমন্বিত (Integrated), শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক (student centred) ও ফলাফলভিত্তিক (outcome based) শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করতে হবে। বুনিয়াদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারিক অংশবিশেষকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ক্ষুদ্র দলীয় শিক্ষাদান (Small group teaching), মতামত আদান-প্রদান ভিত্তিক শিক্ষাদান (interactive teaching), কার্যসম্পাদন ভিত্তিক সক্রিয় স্বশিক্ষা লাভ (task-based active self-learning) সহশিক্ষকের সহায়ক (Facilitatory) ভূমিকা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিতে হবে। সমস্যাভিত্তিক শিক্ষা (Problem oriented learning), প্রথার প্রচলনও আবশ্যক। শিক্ষায় সর্বত্র উপযুক্ত জ্ঞান (Knowledge), আচরণ (Attitude) ও দক্ষতাকে (Skill) অগ্রগণ্যতা দিতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে মানসম্মত চিকিৎসক তৈরি করতে হলে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম রাখা আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যৌক্তিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। শিক্ষাসূচিতেও পেশাসংক্রান্ত ইংরেজি (Business E nglish) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১০.৯ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া :

শিক্ষাসূচি বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীর কোর্সচলাকালীন মূল্যায়নের (Formative) এবং চূড়ান্ত মূল্যায়নের (Summative Assessment) বিধান রাখতে হবে। ধাপে ধাপে সমগ্র প্রক্রিয়াকে উদ্দেশ্যনির্ভর (Objective) ভাবে সংগঠিত (Structured) করতে হবে। চূড়ান্ত ফলাফলে ১০% কোর্সচলাকালীন (Formative) মূল্যায়ন ও ৯০% চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Assessment) থেকে হতে হবে। কোর্সচলাকালীন মূল্যায়নে অনুপযুক্ত বিবেচিতে প্রার্থী চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না । লিখিত পরীক্ষায় সমান অংশ MCQ ও SAQ ধরনের হবে। সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন (Peer Assessment) পদ্ধতির প্রচলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকেও কাঠামোগতভাবে মূল্যায়ন (Assessment) প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের কর্মমান (Performance) মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া চালু করা দরকার। পদোন্নতি ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে তাদের কর্মমানকে (Performance) গুরুত্বপূর্ণ মূল্যমান (Weightage) দেওয়া আবশ্যক। সকল পর্যায়ের মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করতে হবে যার মাধ্যমে সুষম ও তুলনাযোগ্য পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার নথি (Track record) সংরক্ষণ ও বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

১০.১০ শিক্ষাসূচির বিষয়বস্তু :

শিক্ষাসূচির বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক, চাহিদানির্ভর ও পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক (Comprehensive) হওয়া আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের চাহিদাসম্মত গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে কারিকুলামে জীব-চিকিৎসা শাস্ত্রীয় (Biomedical) বিষয়বস্তু ছাড়াও সমাজবিজ্ঞান (Sociology), নৃতত্ত্ব (Anthropology), মানবতাবাদ (Humanism), দর্শন (Philoshopy), চিকিৎসাবিষয়ক নীতিশাস্ত্র (Medical Ethics), আচরণ বিজ্ঞান (Behavioral science), কথোপকথন দক্ষতা (Communication skills) ও জৈব-পরিসংখ্যানের (Bio-statistics) প্রাসঙ্গিক ও পেশাসম্পৃক্ত অংশের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। পারিবারিক পর্যায়ে দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক চিকিৎসাশাস্ত্র (Family Medicine) বিষয়টি গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্নাতক (MBBS) পর্যায়ে প্রাথমিক (Primary) ও চলনশীল পর্যায়ের (Ambulatory care setting) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সার্বিক সক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্য নির্ধারিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকালের মেয়াদ সর্বনিম্ন যথাক্রমে ৪১/২ বছর ও ১১/২ বছর করা আবশ্যক। প্রশিক্ষণ কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাসপাতালসমূহের বহির্বিভাগ এবং প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল (জেলা ও উপজেলা) হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা, আইনকানুন ও সেবার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ কারিকুলামে সন্নিবেশ করা দরকার।

১০.১১ পরিবীক্ষণ :

সমগ্র মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা মানানুযায়ী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণের কাঠামোগত প্রক্রিয়া থাকতে হবে। মেডিকেল শিক্ষা এমন একটি পেশাগত শিক্ষা যার সামগ্রিক গুরুত্ব অপরিসীম ও সংবেদনশীল। সনদ প্রদানের পর সংশোধনমূলক প্রক্রিয়ার সুযোগ না থাকায় পেশাগত মান নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে নিবিড় পরিবীক্ষণের কোন বিকল্প নেই। নিবিড় পরিবীক্ষণ কঠোর মানব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতিজনিত ক্ষতি (system loss) সহনীয় মাত্রায় সীমাবদ্ধ করতে কঠোর মানব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা অপরিহার্য।

অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ কাঠামো — **বাহ্যিক পরিবীক্ষণ কাঠামো**

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মান ব্যবস্থাপনা বিভাগ → স্থানীয় মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল → স্থানীয় মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

স্থানীয় মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ → বিষয়ভিত্তিক বিভাগ

কাঠামোগতভাবে সাময়িক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, নিয়মিত পরিদর্শন ও সংলাপের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় কাঠামোগত ও চেতনানির্ভর প্রণালীসমূহ অবলম্বন করা উচিত হবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানসমূহকে দৃষ্টান্তমূলক/সন্তোষজনক/সংশোধনমূলক ও অসংশোধনমূলক হিসেবে মূল্যায়ন করা উচিত। অসংশোধনযোগ্য মানের প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদন রহিত করা আবশ্যক।

১০.১২ শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগসুবিধা

এ বিষয় অনস্বীকার্য যে, শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা ও শিক্ষার মানের সাথে শিক্ষকের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় স্বার্থে শিক্ষকতায় পেশাজীবী চেতনার বিকাশ অপরিহার্য। পেশাজীবী চেতনার বিকাশে শিক্ষকতা পেশাকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে লাভজনক (Gainful) এবং সম্মানজনক করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পেশাকে লাভজনক ও সম্মানজনক না করা গেলে এই পেশায় উন্নতমানের প্রার্থীদের আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না এবং তাদেরকে পেশায় উৎকর্ষ সাধনেও অনুপ্রাণিত করা যাবে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষা, পিছিয়ে পড়বে জাতি।

বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক সামান্য এবং মর্যাদা সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে মেডিকেল বিষয়ের শিক্ষকরাও ক্ষেত্রবিশেষে আর্থিক স্বচ্ছলতার সন্ধানে শিক্ষার তুলনায় চিকিৎসা পেশার প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। শিক্ষকের পদমর্যাদা চিকিৎসকদের আর্থিক সুযোগ সন্ধানের সহায়ক হয় বলে অনেকে চিকিৎসা পেশায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষকতার পদে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী হন। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত উৎকর্ষ সাধন করতে হলে এই অবস্থার দ্রুত অবসান প্রয়োজন। যদিও মেডিকেল শিক্ষকগণের চিকিৎসা পেশার সাথে সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক,তবুও তাদের শিক্ষকতায় অধিক সময় ব্যয় করা সংগত। সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত চিকিৎসা পেশার আবশ্যকতা কমাতে বেতন কাঠামোকে উন্নত করা ও সামাজিক সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা দরকার। মেডিকেল কলেজ সমূহের স্বায়ত্তশাসন ও ফ্যাকালটিসমূহে সার্বক্ষণিকের (full time) পাশাপাশি খণ্ডকালীন (part time) নিয়োগের ব্যবস্থা, সংযুক্ত হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সেবা ও শিক্ষাকার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে পর্যায়ভুক্ত করা (Consultant/Professor) এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসা পেশার ক্ষেত্রে সীমানা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। উপজেলা, জেলা ও অন্যান্য হাসপাতালের বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসকগণকে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পদমর্যাদা অনুযায়ী খণ্ডকালীন (part time) শিক্ষক নিয়োগ করা যায়। মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত হাসপাতালে সমতাবিধান সাপেক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ের পরামর্শক (Consultant) ও অধ্যাপক (Professor) পর্যায়ের পদ সৃষ্টি করে সেবা ও শিক্ষাকে সমন্বিত করা যায়। সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে আবাসন, পরিবহন,গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অগ্রগণ্য।

১১.০ উচ্চতর পর্যায়ের মেডিকেল শিক্ষা উন্নয়নের কৌশল

১১.১ কাঠামোগত সংস্কার :

প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও সামগ্রিক (Comprehensive) করার জন্য চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থার সাথে জনবল প্রশিক্ষণের একটি সমন্বিত ও সবল কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। এই লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি মান ব্যবস্থাপনা (Quality Management) বিভাগ গড়ে তোলা আবশ্যক। এই বিভাগের মূল দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড হবে শিক্ষাব্যবস্থার যথাযথ সংগঠন ও মান নিশ্চয়তা বিধান এবং আভ্যন্তরীণ মান নিয়ন্ত্রণের সার্বিক কাঠামো গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতিজনিত ক্ষতি (System loss) সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে এনে একটি কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই বিভাগের অধীন একটি মানবসম্পদ (HRD) শাখা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। এই শাখা মেডিকেল কলেজ ও সংযুক্ত হাসপাতালসমূহের মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের (Medical Education and Training Department) মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান নিশ্চয়তা বিধান করে আভ্যন্তরীণ মান নিয়ন্ত্রণের (Quality Control) দায়িত্ব পালন করবে। উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থিতা নির্বাচনে মেধা ও দক্ষতার পাশাপাশি আচরণ ও প্রবণতাকে যৌক্তিকভাবে বিচার করা দরকার।

প্রশিক্ষণকালকে যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং একে (১) সনদ প্রদানপূর্ব (Pre-certification), (২) সনদ প্রদানোত্তর (Post-certification) এবং বৈদেশিক (Foreign Training) পর্যায়ে বিন্যস্ত করতে হবে। সনদ প্রদান পূর্ব (Pre-certification) প্রশিক্ষণকালকে স্তরীভূত (Tiering) করে প্রত্যেক স্তরের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান (Essential Knowledge), দক্ষতা (Skill) এবং আচরণ (Attitude) নির্ধারণ করে মডিউল (Module) তৈরির মাধ্যমে সার্বিক প্রশিক্ষণকালকে আনুষ্ঠানিক কাঠামোয় বিন্যস্ত করা আবশ্যক। যেমন :-

১। জ্ঞানগত (Knowledge) কাঠামোয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

- ১. Etiopathogenesis এবং Pathophysiology
- ২. Symptomatology
- ৩. Therapeutic intervention

২। নিদানিক দক্ষতা (Clinical skill) কাঠামোয় -

- ১. উপযুক্ত ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক সৃষ্টি,
- ২. নিদানিক তথ্য সংগ্রহ, বাছাই, বিশ্লেষণ (Interpretation) ও নির্বাচন,
- ৩. সমস্যা চিহ্নিতকরণ,
- ৪. সমস্যা সমাধানে কার্যকর ও উপযোগী পরিকল্পনা কৌশল নির্ধারণ,
- ৫. উপস্থাপন দক্ষতাসহ প্রয়োজনীয় কথোপকথন দক্ষতা(Communication skill),
- ৬. পরিবীক্ষণ ও অনুসরণ (Follow-up) কৌশল নির্ধারণ ও প্রতিপালন,
- ৭. জরুরী জীবনরক্ষাকারী পদ্ধতির প্রয়োগ থাকা দরকার।

এবং

৩। আচরণ কাঠামোয়-

- ১. মানবিক (Humanistic Approach) দৃষ্টিভঙ্গি গঠন,
- ২. পেশাজীবী চেতনার বিকাশ (Professionalism) ,
- ৩. নীতি শাস্ত্রের (Ethics) নিয়মিত চর্চা নিশ্চিত করা।

এইসব বিষয়সহ প্রশিক্ষণের মূল কাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন। সকল পর্যায়ে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা (Evidence-based Medicine) এবং সমস্যাভিত্তিক জ্ঞানার্জনের (Problem-based learning) পদ্ধতি প্রচলন করা দরকার।

বর্তমানে প্রচলিত পর্যায়ক্রমিক Flexenerian Model-এর পরিবর্তে বুনিয়াদি ও ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহকে সমন্বিত করে সমন্বিত শিক্ষা (Integrated teaching) পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইরূপ সমন্বয়ের মাধ্যমে বুনিয়াদি বিজ্ঞানের বাহুল্য অংশ পরিহারে এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনে তার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা মূল বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ ও অনুধাবনে যথার্থ অনুপ্রাণিত হবে।

চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থার বাহুল্য-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর করার জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দ্বিস্তরবিশিষ্ট পদ্ধতির প্রচলন করা দরকার। প্রাথমিক স্তরে Medicine, Surgery, Gynaecology & Obstetrics এবং Paediatrics শাখায় (Broad based) শিক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়ের সেবার (Secondary care level) বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলবে।

পরবর্তী স্তরে উক্ত শাখাসমূহের অনুশাখা (Sub-speciality) সমূহে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তৃতীয় পর্যায়ের সেবা (Tertiary care level) পর্যায় যথা Cardiology, Gastroenterology, Urology, Paediatric Surgery, Neonatology, Infertility ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলবে।

প্রশিক্ষণকে কাঠামোভুক্ত করে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকর করা প্রয়োজন। উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষায় আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি, যথা– কর্মকাণ্ডের নথি (Log book), বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (Multiple choice) এবং সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন (Short Eassay Questions), পরিবর্তিত আকারের রচনামূলক প্রশ্ন [Modified Essay Question (MEQ)], উদ্দেশ্যমূলকভাবে গৃহীত ব্যবহারিক (Objectively Structured Practical) এবং নিদানিক পরীক্ষা (Clinical Examination) (OSPE/OSCE), নিদানিক দক্ষতার প্রত্যক্ষ মূল্যায়ন (Practical Assessment of Clinical Examination and Skill) (PACES) এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে গৃহীত দীর্ঘ পরীক্ষা (Objectively Structured Long Examination Record) (OSLER) পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি ও ব্যক্তি চেতনা নির্ভর মৌখিক পরীক্ষা ব্যবস্থার অবসান হওয়া দরকার। সকল পর্যায়ে গঠনকালীন ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের (Formative/Summative Assessment) বিধান রাখা আবশ্যক। কোর্স চলাকালীন মূল্যায়নে অনুপযুক্ত বিবেচিত প্রার্থী চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না। মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতিরও প্রচলন করতে হবে। সামগ্রিক ট্রেনিং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানবব্যবস্থাপনা বিভাগের মানবসম্পদ উন্নয়ন শাখা।

চিকিৎসা ব্যবস্থাকে হালনাগাদ রাখার ক্ষেত্রে অব্যাহত (continuing education) চলমান শিক্ষার বিকল্প নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর এবং জনগণের সন্তোষপূর্ণ করতে হলে অব্যাহত শিক্ষাকে কাঠামোভুক্ত করতে হবে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জন্সসহ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধীন একটি অব্যাহত (continuing education) শিক্ষাবিভাগ গঠন প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সূচিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত সকল পর্যায়ের কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা হালনাগাদ ও প্রাসঙ্গিককরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য ও সহজসাধ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা অতীব জরুরি।

ব্যবস্থাপনার মূলনীতিতে নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ পরিবর্তন করে সহায়ক (Supportive) আচরণ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। ব্যবস্থাপনাকে কঠোরভাবে কাঠামোভিত্তিক (Structured) করে নিবীড় পরিবীক্ষণ, মূল্যায়নের মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development) সমন্বিত করে সামগ্রিক মান ব্যবস্থাপনা (Total quality management) প্রতিষ্ঠা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুষদ গঠনের ও সংরক্ষণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান অন্যতম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘসূত্রী সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে স্বায়ত্তশাসন প্রদান একান্ত জরুরি। একটি সমন্বিত ও জাতীয় লক্ষ্যভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আনা দরকার।

প্রতিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় মানব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি করে চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ (Education and Training Department) গঠন করতে হবে। এই বিভাগের মূল দায়িত্ব হবে মান নিশ্চয়তা (Quality Assurance) ও অভ্যন্তরীণ মাননিয়ন্ত্রণ (Quality Control)।

স্থানীয় চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ (Medical education and training department) তার মানবসম্পদ (HRD) শাখার মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণে, অনুষদ গঠন ও সংরক্ষণে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ, ন্যায়সঙ্গত (Equitable) ও কার্যকর (Valid) নীতিমালা প্রচলনের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষা সংগঠনে নিয়োজিত থাকবে। কাঠামোগতভাবে ব্যক্তিগত কর্মগুণ বিচার (Performance appraisal) ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে মান নিশ্চয়তা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। অনুষদ গঠন ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। অনুষদসংক্রান্ত সকল ব্যবস্থাপনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে ও সম্মতিতে হতে হবে।

নথিভুক্তকরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন (Recording & Reporting) : ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে এবং একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় নৈর্ব্যক্তিক পন্থায় নির্ধারিত কর্মকাণ্ড নথিভুক্তকরণের ও প্রতিবেদন প্রণয়নের রীতি কার্যকর করতে হবে। এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হবে এবং যথাযথ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে। অসন্তোষজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদন রহিত করে মানব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১১.২ অবকাঠামো উন্নয়ন :

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে নিবিড় এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ক্লাসরুম, গবেষণাগার, সম্মেলন কক্ষ, নিদানিক ও ব্যবহারিক প্রদর্শন কক্ষ (Clinical and p ractical demonstration room), দক্ষতা গড়ার কেন্দ্র (Skill centre), অস্ত্রোপচার কক্ষ (Operation theater), বহির্বিভাগ ও Procedure Room সহ শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থী এবং শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের কার্যকর উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের কেন্দ্র হিসেবে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে উচ্চমানের কেন্দ্র (Centre of Excellence) হিসেবে গঠন করার উদ্যোগ নিতে হবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত অগ্রসরমানতা নিশ্চিত করতে হবে।

ক্রমবর্ধমান চাহিদার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণমূলক পদের সংখ্যা বাড়ানোও অপরিহার্য। প্রশিক্ষণকে বাস্তবসম্মত ও চাহিদানুযায়ী করার লক্ষ্যে বহির্বিভাগকে প্রশিক্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং থানা ও জেলা হাসপাতালসমূহে মাঠপর্যায়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ ও নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক হতে হবে। নিয়মিত নথিভুক্তকরণ (Recording) ও প্রতিবেদন প্রণয়নের (Reporting) মাধ্যমে অনুমোদন বহাল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.৩ পাঠক্রম উন্নয়ন :

পাঠক্রম উন্নয়ন শিক্ষার মান সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাঠক্রমকে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম বিভাগকে এই দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। পাঠক্রম বাস্তবানুগ, চাহিদাসম্মত ও শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী কেন্দ্রিক হওয়া দরকার। সমস্যাভিত্তিক শিক্ষা (Problem-based teaching), স্বশিক্ষা (Self-learning) এবং সমন্বিত শিক্ষা (Integrated teaching) ভিত্তিক শিক্ষাসূচিতে (Curriculum) কোর্সচলাকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative Assessment) মূল্যায়নের বিধান রাখতে হবে। প্রশিক্ষণকালকে চাহিদানুযায়ী যৌক্তিকভাবে দীর্ঘ করতে হবে এবং মূল্যায়নে স্বীকৃত, স্বচ্ছ, ন্যায়ভিত্তিক ও বৈধ (Valid) প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। মূল্যায়নের সর্বপর্যায়ে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করতে হবে।

দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাতে-কলমে (Hands-on) এবং কর্মকালীন (On the job training) প্রশিক্ষণের বিধান রাখতে হবে। প্রশিক্ষণকে নির্দিষ্ট জ্ঞান (Knowledge), আচরণ (Attitude) এবং দক্ষতা (Skill) ভিত্তিক মডিউলের (Module) কাঠামোয় বিন্যস্ত করে কঠোর মূল্যায়নের আওতায় আনতে হবে। প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে অন্ত:বিভাগীয় রোগীর ব্যবস্থাপনা (In-patient management), বহির্বিভাগীয় রোগীর ব্যবস্থাপনা (Out-patient management), শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ (Participation in academic programme) যথা : বক্তৃতা, জার্নাল ক্লাব, ওয়ার্ড ঘুরে দেখা, ক্লিনিক্যাল মিটিং (Lecture, journal club, rounds, clinical meeting) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রশিক্ষণকালকে সনদপূর্ব (Pre-certification), সনদোত্তর (Post-certification) এবং বৈদেশীয় (Foreign training) হিসাবে স্তরীভূত করা দরকার। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত আঞ্চলিক ও বৈদেশীয় অংশীদার নির্বাচন করে দীর্ঘমেয়াদি দ্বিপাক্ষিক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। সকল বৈদেশীয় প্রশিক্ষণ প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত এবং দেশে তার ব্যবহার ও হস্তান্তর সুনিশ্চিত করা দরকার।

১১.৪ পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা :

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নে পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে এই পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন অনিয়মিত, শিথিল এবং অকার্যকর। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতায় মান ব্যবস্থাপনা (Quality management) এবং শিক্ষাসূচি (Curriculum) শাখা ছাড়াও অন্যান্য সম্পৃক্ত বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে। এই পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শনে উদ্দেশ্যমুখী ও কাঠামোগতভাবে নথীভুক্তিকরণ (Recording) ও প্রতিবেদন প্রণয়নে (Reporting) এবং মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করতে হবে।

প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে এবং একটি নির্দিষ্ট ছকে (Structured) নথিভুক্ত (Recorded) ও প্রতিবেদনাধীন (Reporting) করার ফলে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন যথার্থ কার্যকর হবে।

১১.৫ বিবিধ :

উচ্চ শিক্ষায় অনুশাখা (Subspecialty) চালু করার ব্যাপারে জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত (বিশেষ করে কাজের পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ) ও প্রয়োজন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। শুধু পর্যাপ্তভাবে উপযুক্ত বিবেচিত হলে অনুশাখা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর অনুমতি দেওয়া উচিত। বুনিয়াদি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকের ঘাটতি পূরণের জন্যে এই সকল বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরবর্তী সরাসরি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা অতীব জরুরি।

হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় ক্লিনিক্যাল টিউটর ও প্রশিক্ষক নিয়োগ করা দরকার। মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও কার্যকর করার জন্য মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগ চালু করতে হবে।

১২.০ জনস্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে করণীয়

National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM)-এর কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে বিভাগসমূহকে পুনর্বিন্যাস ও উপযোগী লোকবলে সজ্জিত করা দরকার। শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পদমর্যাদানুযায়ী সঠিকভাবে বিভাজন করা দরকার। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এখানেও স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটির ভৌত অবকাঠামো পুনঃপরিকল্পনা ও সম্প্রসারণ এবং গবেষণাগার, লাইব্রেরি ও প্রশিক্ষণকক্ষসহ আবাসন সমস্যার দ্রুত উন্নতি করা দরকার। ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ পরিবর্তন অভিপ্রেত। কারিকুলামকে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক রাখা দরকার। মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও অন্যান্য শিক্ষার অনুরূপ আধুনিক, স্বচ্ছ, ন্যায়ভিত্তিক, কার্যকর ও নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়ার প্রচলন করতে হবে। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নথিভুক্তকরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পরিদর্শনের (Recording, Reporting, Inspection) মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। চলমান শিক্ষাকে কাঠামোভুক্ত করাও একান্ত জরুরি। জনস্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে সার্বিক জনস্বাস্থ্য রক্ষায় আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে একটি উপযুক্ত গবেষণাসহায়ক অবকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি একটি জরুরি পদক্ষেপ। জনস্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণের বিষয়টি জোরদার করতে দেশীয় ও বৈদেশীয় সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করাও গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.০ ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা উন্নয়নের কৌশল

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি ১০৩২৮০ জনের জন্য একজন ডেন্টাল সার্জন রয়েছেন। এই অনুপাত উন্নত দেশে ১০,০০০ জনের জন্য ১ জন হলেও বাংলাদেশ আগামী ২০২০ সাল নাগাদ ২০,০০০ জনের জন্য একজন ডেন্টাল সার্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে পারে। সেই লক্ষ্যে প্রতি পাঁচ বছরের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ (সারণি-১) :

সারণি - ১ : প্রাক্কলিত ডেন্টাল সার্জনের সংখ্যার অভিক্ষেপণ

বছর	জনসংখ্যা	ডেন্টাল সার্জন-দন্তের জনবল	ডেন্টাল সার্জনের চাহিদা
২০০২	১৩২.৮৩	১ : ১০৩,২৮০	১২৮৬
২০০৫	১৪০.৫১	১ : ১০০,০০০	১৪৫১
২০১০	১৫১.০৩	১ : ৭০,০০০	২১৫৭
২০১৫	১৬১.৬৬	১ : ৫০,০০০	৩২৩৩
২০২০	১৭২.২৪	১ : ২০,০০০	৮৬১২

এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং বর্তমানের ৭৫% Survival rate-এ প্রতি বছর ৬০০ জন ডেন্টাল সার্জন সৃষ্টি করতে হলে বর্তমান ক্ষমতা ৬ গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সাথে সাথে মান উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সরকারি পর্যায়

(ক) **শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি :**

১. ঢাকা ডেন্টাল কলেজের শিক্ষার্থী ভর্তিসংখ্যা বর্তমানে ৬০ থেকে উন্নত করে ২০০৪ সাল থেকে ১০০ করা দরকার।

২. রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ডেন্টাল ইউনিটকে পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজে রূপান্তরিত করে শিক্ষার্থী ভর্তিসংখ্যা ২০০৭ সাল হতে ৫০-এ উন্নীত করতে হবে।

৩. বাকি পাঁচটি পুরাতন মেডিকেল কলেজের সাথে ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেকটিতে ২০১০ সাল থেকে ৫০ জন করে ভর্তির ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(খ) **অবকাঠামোর উন্নয়ন :** প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যানুযায়ী ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রয়োজন। একই সাথে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের পদানুযায়ী আনুপাতিক বিন্যাস নিশ্চিত করা দরকার। গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারসহ বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগে প্রশিক্ষণের সুযোগ পর্যাপ্ত করা দরকার। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কর্তব্য।

(গ) **অনুষদ গঠন ও সংরক্ষণ :** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে চাহিদানুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও সঠিক জনবল ব্যবস্থাপনা আধুনিক রীতিসম্মত করতে হবে।

(ঘ) **শিক্ষার মান উন্নয়ন :** শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি নির্ধারণ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা দরকার। শিক্ষার মূল্যায়নে মেডিকেল শিক্ষায় ন্যায় আধুনিক পদ্ধতির অবলম্বন অপরিহার্য।

(ঙ) **শিক্ষা ব্যবস্থাপনা :** শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মেডিকেল শিক্ষার মতো আধুনিক ও কার্যকর রীতিনীতির প্রচলন আবশ্যক। এক্ষেত্রে স্বয়ত্তশাসনসহ মেডিকেল শিক্ষার অনুরূপ মানব্যবস্থাপনা কাঠামোভুক্ত করা দরকার। নিয়মিত নথিভুক্তকরণ (Recording), প্রতিবেদন প্রণয়ন (Reporting) ও পরিদর্শন (Inspection)-এর মাধ্যমে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সচেষ্ট হতে হবে।

বেসরকারি খাত

সরকারি খাতের পরিপূরক হিসেবে মানবসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে যথাযথ উৎসাহ প্রদান ও পরিপুষ্ট করা দরকার। তবে এক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত অবকাঠামো ও সুযোগসুবিধা সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুমোদন দান করতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকেও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো একক ও সমন্বিত মানব্যবস্থাপনার অধীনস্থ করতে হবে।

ডেন্টাল চিকিৎসার উচ্চতর শিক্ষা : ডেন্টাল চিকিৎসার উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেন্টাল ফ্যাকাল্টিকে আধুনিক ও শক্তিশালী করতে হবে। প্রয়োজনীয় বিভাগসমূহ সন্নিবেশসহ কমিউনিটি ও প্রিভেন্টিভ ডেনটিস্ট্রিকে (Dentistry) উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

১৪.০ নার্সিং শিক্ষা উন্নয়নের কৌশল

বাংলাদেশের বর্তমানে ২৮,৫৩৭ জন ডাক্তার ও ১৭,০৫৬ জন নার্সের বিবেচনায় ডাক্তার-নার্স অনুপাত ১:০.৬। উৎপাদনের মধ্যম গতিতে ২০২০ সাল নাগাদ দেশে ডাক্তারের সংখ্যা ৬২,৭০৫-তে উন্নীত হলে বর্তমান অনুপাত সংরক্ষণে ২০২০ সাল নাগাদ বর্তমানের অধিক আরও ২০,৫৬৭ জন নার্স তৈরির প্রয়োজন। এই অনুপাত ১:১-এ উত্তীর্ণ করতে হলে ঐ সময় নাগাদ নার্সের প্রয়োজন ৬২,৭০৫ জন; যা অর্জন করতে হলে বর্তমান উৎপাদন গতিকে ৩ গুণ বর্ধিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জিত হলেও ২০২০ সাল নাগাদ ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যার অনুপাত অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছবে না। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট হলে বিদ্যমান অবকাঠামোর বহুগুণ সম্প্রসারণ প্রয়োজন। সরকারি প্রচেষ্টায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে উর্ধ্বমুখী (Vertical) সম্প্রসারণ সম্ভব। এছাড়াও জেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল বা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দের বিষয়টি যৌক্তিকভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এইরূপ ভৌতকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি খাতে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। ২০০৫ সালের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫% বাড়ানো আবশ্যক। সরকারি উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে বেসরকারি পর্যায়ের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা আবশ্যিক করতে হবে।

শিক্ষকের সংখ্যা ও তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকতার মান উন্নয়নের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে মহাখালীস্থ কলেজ অব নার্সিং (College of Nursing)-এর প্রয়োজনীয় সংস্কার, মান ও ভৌতঅবকাঠামোর উন্নয়নসহ শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। আশু নির্মীয়মান অপর কলেজটিও অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে চালু করা প্রয়োজন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে বর্তমানের ১:২৭ থেকে ২০০৫ সাল নাগাদ ১:২০, ২০১০ সাল নাগাদ ১:১৫ এবং ২০১৫ সাল নাগাদ ১:১২-তে উন্নীত করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিক্ষার মূল্যায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে এ লক্ষ্যে একটি মান নিশ্চয়তা প্রকল্প (Quality Assurance Project) হাতে নেওয়া প্রয়োজন। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে কার্যকর করার জন্যে কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যায় টিউটর নার্স (Tutor Nurse) নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাত্ত্বিক বিষয়সমূহকে প্রশিক্ষণের সাথে সমন্বিত করতে হবে। শিক্ষার্থী নার্সদের কাজের চাপ কমিয়ে প্রশিক্ষণকে জোরদার করা দরকার।

শিক্ষাসূচি আরও বাস্তবমুখী ও ব্যবহারিক করা প্রয়োজন এবং কথোপকথন দক্ষতাসহ অন্যান্য সামাজিক দক্ষতা (Social skills)-কে শিক্ষাসূচির অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। মূল্যায়ন পদ্ধতিতে গঠনকালীন মূল্যায়ন (Formative Assessment)-কে মেডিকেল শিক্ষার অনুরূপ গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। গ্রন্থাগারসমূহকে কার্যকর শিক্ষার উপযোগী করে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য।

নার্সিং পেশার মর্যাদা বাড়াতে ও পেশার গুণগত মান সমৃদ্ধ করতে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২য় বিভাগ নির্ধারণ করতে হবে। চলমান বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রাখার লক্ষ্যে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অব্যাহত রাখা জরুরি, তবে বর্তমানে এ বিষয়ে বিদ্যমান মৌলিক গুণগত অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষ্যে নার্সিং কোর্সেও প্রারম্ভিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। নার্সিং পেশায় নিয়োজিত বিশেষ করে শিক্ষকতায় নিয়োজিতদের বেতন কাঠামো ও পারিশ্রমিক পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। নার্সিং পেশাকে সম্মানজনক ও কার্যকর করার জন্যে এটি একটি জরুরি পদক্ষেপ।

স্বশিক্ষা (Self-directed) এবং আজীবন শিক্ষা (Life-long learning) রীতির প্রচলন করার মাধ্যমে চলমান শিক্ষা নিশ্চিত করা দরকার। এ লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মকালীন শিক্ষা এবং দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা দরকার।

সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও মানসম্মত ভাবে এগিয়ে আসার পরিবেশ সৃষ্টি না করতে পারলে শুধু সরকারি প্রয়াসে ২০২০ সাল নাগাদ প্রয়োজনীয় সংখ্যায় নার্স তৈরি একটি দুরূহ কর্মে পরিণত হবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো ছাড়াও উন্নত মানের নার্স তৈরির উদ্যোগ নেওয়া গেলে নার্সিং জনশক্তি রপ্তানিও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি বিরাট সম্ভাবনাময় খাত হতে পারে। এক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী যৌথ উদ্যোগের সুযোগসন্ধান ও সার্বিক কর্মসংস্থান উন্নয়নের পথে একটি বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা দরকার।

হাসপাতালে সেবাদান ছাড়াও তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাদানে সক্ষম কমিউনিটি নার্স (Community Nurse) তৈরির উদ্যোগ নেওয়া দরকার। তৃণমূল পর্যায়ে নার্সিং সেবা বিস্তৃত করার মাধ্যমে হাসপাতালে অবস্থানের ব্যয়ভার হ্রাস এবং হাসপাতালে সীমিত সংখ্যক শয্যার উপর্যুপরি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক রোগীর সেবাপ্রদান সম্ভব হবে।

১৫.০ মেডিকেল কৌশলী শিক্ষা উন্নয়নের কৌশল

সমস্যা নিরসনের উপায় : বর্তমানে দেশে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ১২,৪৪১ জন মেডিকেল কৌশলী রয়েছেন। এই সংখ্যা নিতান্ত অপ্রতুল। দেশীয় চাহিদা ছাড়া বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিতে এই খাতের বিশেষ সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১০-১৫% ও বেসরকারি খাতে ৫% বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দেশের বিদ্যমান চাহিদা পূরণ ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে এই সেক্টরেও পরিমিত মানবসম্পদ উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। সরকারি দুটি প্রতিষ্ঠানে শুধু শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতি সেশনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২০০ থেকে ৩০০ এবং ১৭৫ থেকে ২৫০-তে উন্নীত করা যায়। সরকারি খাতের আরও উন্নয়ন ঘটাতে হলে নতুন অবকাঠামো গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে বর্তমানে যে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকের ১৮ মাসব্যাপী কোর্স পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিচালনা করে তা আরও উন্নত ও কার্যকর করে এবং ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি কর্তৃক পরিচালিত ১ বছর মেয়াদি নিবিড় টিকাদান (EPI) প্রশিক্ষণের সাথে সমন্বিত করে মেডিকেল কৌশলী (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অত্যাবশ্যক সার্ভিস প্যাকেজ) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করা দরকার। বর্তমানে ১৮টি জেলায় অবস্থিত Family Welfare Visitor Training Institute কে (FWVTI) যথাযথ উন্নতকরণ ও উপযোগী শিক্ষাসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিলে তৃণমূল পর্যায়ে সেবাব্যবস্থা উন্নত করা সম্ভব। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা পর্যায়ে অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার।

বেসরকারি খাতের উন্নতিকল্পে –

১। স্বল্পমূল্যে জমি বরাদ্দ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহদান;

২। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুপ্রেরণা যোগান;

৩। শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির প্রচলন, এবং

৪। সরকারি অনুমোদনের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিটের পরিমাণ হ্রাস

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানোন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত ব্যয়বরাদ্দ ও পদক্ষেপ অব্যাহত রাখতে হবে, বিশেষ করে শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, শিক্ষা উপকরণ, গবেষণা বৃত্তি ও আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নথিভুক্তকরণ (Recording), প্রতিবেদন প্রণয়ন (Reporting), পরিদর্শন (Inspection) সহ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে উপযুক্ত মান ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা আবশ্যক। মেডিকেল কৌশলীদের ক্যারিয়ার গঠন ও এই বিষয়ে উন্নত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্যে মেডিকেল কৌশল বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার প্রবর্তন করা দরকার। এই লক্ষ্যে বর্তমানে চালু মৌলিক উচ্চমাধ্যমিক সমমানের ডিপ্লোমা কোর্স পরবর্তী ব্যাচেলর অব সায়েন্স (মেডিকেল টেকনোলজি) ও মাস্টার অব সায়েন্স (মেডিকেল টেকনোলজি) সহ পিএইচ.ডি কোর্সসমূহ চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল টেকনোলজি ফ্যাকাল্টি চালুকরণের যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে তা দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই খাতে উচ্চতর দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন মানবসম্পদ উৎপাদন সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা যাচাই জনশক্তি উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

১৬.০ স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণার উন্নয়ন কৌশল

স্বাস্থ্যসেবা এবং এই সংক্রান্ত শিক্ষার উন্নয়নে গবেষণার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমস্যাবলির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন, সমস্যা সমাধানে উপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকারিতা নিরূপণে চলমান ও ধারাবাহিক গবেষণার ভিত্তি গড়ে তোলা দরকার। উচ্চ শিক্ষাকে ফলপ্রসূ ও জাতীয় উন্নয়নকে সমৃদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়নের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, কার্যবিধি ও কৃষ্টি গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে

জাতীয় গবেষণানীতি প্রণয়নের পাশাপাশি উপযুক্ত ব্যয়বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থে অগ্রগণ্যতা বিচারের মাধ্যমে তা বন্টন করতে হবে। গবেষণার বিষয় হিসেবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য, শীর্ষ দশটি রোগ-ব্যাধি, মারাত্মক দশটি রোগ-ব্যাধি, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রার্থী ও সেবাকর্মী আচরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত শিক্ষার উপাদান ও মান, পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ এবং প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাসংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়নকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে যৌক্তিকভাবে সন্নিবেশ করতে হবে। গবেষণা প্রকল্প নির্বাচনে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও পূর্ববর্তী গবেষণায় লব্ধ ফলাফল বিবেচনায় আনতে হবে। নার্সিং, মেডিকেল কৌশলী ও প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণাকে গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৭.০ উপসংহার

স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোসহ অন্যান্য বৈষয়িক উপকরণের উন্নয়নের পাশাপাশি প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছা, নিষ্ঠা ও কর্মপ্রাচুর্য। স্বাস্যসেবার পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সর্বদাই জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় প্রেষণা।

মূল রচনা :

প্রফেসর এম. এ. হাদী; ডা: সাইফুল ইসলাম।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা

১. ভূমিকা

মাদ্‌রাসা শিক্ষার সূচনা বিশ্বনবী (স.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকেই। প্রিয় নবী (স.)-এর হিজরত পূর্বকালে মক্কা মুকাররামায় 'দারুল আরকামে' এবং হিজরতের পরে মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নাবাবীতে এই শিক্ষাধারা অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীকালে ইসলামের ব্যাপক বিস্তার লাভের সাথে সাথে এ শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রচলিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা রাসূলুল্লাহ্ (স.) প্রবর্তিত সেই শিক্ষাধারার উত্তরাধিকার।

২. মাদ্‌রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় জাগতিক ও পারলৌকিক শিক্ষা পরস্পর পরিপূরক। এ শিক্ষাব্যবস্থার দুটি বিশেষত্বের একটি হচ্ছে মৌল বা চিরন্তন, আর অন্যটি হচ্ছে পরিবর্তনশীল বা সংস্কারযোগ্য। প্রথমটি কুরআন-সুন্নাহ প্রদর্শিত তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সর্বক্ষেত্রে তদনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক সকল কার্য আল্লাহ্‌কে কেন্দ্র করেই আবর্তন করার সর্বোচ্চ প্রয়াস। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এমন একটি বিধিবদ্ধ চলমান প্রক্রিয়া যার সাহায্যে স্থান-কাল ভেদে যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জন। বস্তুত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির এ যুগে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে পৃথক না ভেবে সর্বপ্রকার ইহজাগতিক শিক্ষার প্রেরণাদাতা ও পূর্ণতা দানকারীরূপেই বিবেচনা করা যায়। এ শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে উক্ত বিশেষত্ব দুটির আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন। এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদেরকে ইহলোক-পারলৌকিক জ্ঞানে দক্ষ ও দ্বীনী জীবন-যাপনে অভ্যস্থ রেখে রাষ্ট্র ও সমাজের আদর্শ নাগরিক এবং সীরাতে-সূরতে প্রকৃত মুমিনরূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৩. উপমহাদেশে ও বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার পটভূমি

উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে কুরআন সুন্নাহভিত্তিক এই শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। এ সময় মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮০ সালে উত্তর ভারতের মোল্লা মাজদুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিমগণ একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে তদানীন্তন ভারতের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নিকট উপস্থিত হন। হেস্টিংস তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন। এর ফলেই কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল মাদ্‌রাসা ঐ কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসাই ধারাবাহিকতা বহন করছে। বৃটিশ ও পাকিস্তানি শাসনামলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে এ শিক্ষার উন্নয়ন সাধন ও একে যুগোপযোগীকরণ এবং সাধারণ শিক্ষার সাথে এ শিক্ষার বৈষম্য নিরসনকল্পে বহু কমিটি/কমিশন গঠিত হয়েছে। এ সব কমিটির কার্যক্রমের সুপারিশের আলোকে এ শিক্ষাধারার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

৪. মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি-২০০২

ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান সরকার ২০০২ সালে প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানকে আহবায়ক করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি মাদ্‌রাসা শিক্ষাসংস্কার কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি স্বল্পতম সময়ে মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়নে কতিপয় যুগান্তকারী সুপারিশসহ রিপোর্ট সরকার বরাবর দাখিল করেন। সেই সুপারিশালার কিছু কিছু জোট সরকার ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছেন এবং কিছু কিছু বিষয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

এগুলোর অন্যতম হচ্ছে ফাযিলকে ব্যাচেলর ও কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করার সুপারিশ। এ সুপারিশ বাস্ত বায়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সময়সাপেক্ষ বিবেচিত হওয়ায় আপাতত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার দায়িত্ব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮০-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর শর্তে গাজীপুর মাদ্‌রাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সাময়িকভাবে ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজও অবিলম্বে শুরু করার কথা বলা হয়।

৫. এক নজরে বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা

(ক) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত মাদ্‌রাসা, যথা: ইবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদ্‌রাসার পরিসংখ্যান ও স্তর বিন্যাস :

১. ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা, (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান) সংযুক্ত ইবতেদায়িসহ সংখ্যা -১৮,২৬৮

২. দাখিল মাদ্‌রাসা, (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমমান) সংখ্যা - ৯,২০৬

৩. আলিম মাদ্‌রাসা, (উচ্চ মাধ্যমিক-এর সমমান) সংখ্যা - ১,১৮০

৪. ফাযিল মাদ্‌রাসা, (স্নাতক-এর সমমান) সংখ্যা - ১,১৮০

৫. কামিল মাদ্‌রাসা, (মাস্টার্স-এর সমমান) সংখ্যা - ১৮০

উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত মাদ্‌রাসার মধ্যে পৃথক মহিলা মাদ্‌রাসা এবং বিজ্ঞান, কম্পিউটার কারিগরি শিক্ষা বিষয়ের মাদ্‌রাসাও রয়েছে।

(খ) এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ধারায় বেশ কিছু মাদ্‌রাসা রয়েছে, যথা-

১. কাওমি মাদ্‌রাসা।

২. মাযার ও মসজিদভিত্তিক/স্বতন্ত্র মক্তব, ফোরকানিয়া ও হাফেযি মাদ্‌রাসা।

৩. কিন্ডারগার্টেন মাদ্‌রাসা।

এগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং কোন সরকারি অনুদান পায় না।

৬. মাদ্‌রাসা অবকাঠামো

বর্তমানে মাদ্‌রাসার অবকাঠামোগত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বহু সমস্যা বিদ্যমান। এ সব সমস্যার সমাধান একান্ত আবশ্যক।

বর্তমান অবকাঠামো	অবকাঠামোগত সমস্যা	সুপারিশকৃত অবকাঠামো
• **ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা :** শ্রেণীকক্ষ - ৫টি **মোট - ৫টি**	প্রধানশিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের কক্ষ না থাকায় প্রশাসনিক ও একাডেমিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।	• **ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা :** শ্রেণীকক্ষ - ৫টি পৃথক কক্ষ - ১টি **মোট - ৬টি**
*** দাখিল মাদ্‌রাসা :** **(ইবতেদায়িসহ)** শ্রেণীকক্ষ - ১০টি সুপারের কক্ষ - ১টি শিক্ষক মিলনায়তন - ১টি **মোট - ১২টি**	সহ-সুপারের কক্ষ, ছাত্র/ছাত্রী মিলনায়তন ও লাইব্রেরি কক্ষ না থাকায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যহত হচ্ছে।	*** দাখিল মাদ্‌রাসা :** **(ইবতেদায়িসহ)** শ্রেণীকক্ষ - ১০টি সুপারের কক্ষ - ১টি সহ-সুপারের কক্ষ - ১টি শিক্ষক মিলনায়তন - ১টি ছাত্র/ছাত্রী মিলনায়তন - ১টি লাইব্রেরি কক্ষ - ১টি **মোট - ১৫টি**
		দাখিল মাদ্‌রাসায় যদি বিজ্ঞান, কম্পিউটার বা ভোকেশনাল গ্রুপ থাকে সেক্ষেত্রে পৃথকভাবে গ্রুপভিত্তিক প্রয়োজনীয় কক্ষ থাকবে।

*** আলিম মাদ্‌রাসা :** **(ইবতেদায়ি ও দাখিলসহ)** শ্রেণীকক্ষ - ১২টি অধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি শিক্ষক মিলনায়তন - ১টি **মোট - ১৪টি**	ছাত্র/ছাত্রী মিলনায়তন, অফিস স্টাফ ও লাইব্রেরির জন্য কক্ষ না থাকায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যহত হয়।	*** আলিম মাদ্‌রাসা :** **(ইবতেদায়ি ও দাখিলসহ)** শ্রেণীকক্ষ - ১২টি অধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি শিক্ষক মিলনায়তন - ১টি ছাত্র/ছাত্রী মিলনায়তন - ১টি অফিস স্টাফ কক্ষ - ১টি লাইব্রেরি কক্ষ - ১টি **মোট - ১৭টি**
		আলিম স্তরে বিজ্ঞান, কম্পিউটার, ভোকেশনাল বা অন্য গ্রুপ থাকলে পৃথকভাবে গ্রুপভিত্তিক কক্ষ থাকতে হবে।
*** ফাযিল মাদ্‌রাসা :** **(ইবতেদায়ি, দাখিল ও আলিমসহ)** শ্রেণীকক্ষ - ১৪টি অধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি উপাধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি শিক্ষক মিলনায়তন - ১টি ছাত্র/ছাত্রী মিলনায়তন - ১টি লাইব্রেরি কক্ষ - ১টি **মোট - ১৯টি**	ফাযিল মাদ্‌রাসায় ছাত্র/ছাত্রী মিলনায়তন, ও অডিটোরিয়াম না থাকায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা, অবকাশ বিনোদন ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।	*** ফাযিল মাদ্‌রাসা :** **(ইবতেদায়ি, দাখিল ও আলিমসহ)** শ্রেণীকক্ষ - ১৪টি অধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি উপাধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি শিক্ষক মিলনায়তন - ১টি ছাত্র/ছাত্রী মিলনায়তন - ১টি লাইব্রেরি কক্ষ - ১টি অফিস স্টাফ কক্ষ - ১টি অডিটোরিয়াম - ১টি **মোট - ২১টি**
		পৃথক গ্রুপ থাকলে গ্রুপভিত্তিক এবং অনার্স চালু হলে এর জন্য পৃথক কক্ষ থাকবে।
*** কামিল মাদ্‌রাসা :** **(ইবতেদায়ি, দাখিল, আলিম ও ফাযিলসহ)** শ্রেণীকক্ষ - ১৬টি অধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি উপাধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি শিক্ষক মিলনায়তন - ১টি লাইব্রেরি কক্ষ - ১টি অফিস স্টাফ কক্ষ - ১টি **মোট - ২১টি**	কামিল মাদ্‌রাসার ছাত্র/ছাত্রী মিলনায়তন, এবং অডিটোরিয়াম না থাকায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা অবকাশ, বিনোদন ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হয়।	*** কামিল মাদ্‌রাসা :** **(ইবতেদায়ি, দাখিল, আলিম ও ফাযিলসহ)** শ্রেণীকক্ষ - ১৬টি অধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি উপাধ্যক্ষ কক্ষ - ১টি শিক্ষক মিলনায়তন - ১টি ছাত্র/ছাত্রী মিলনায়তন- ১টি লাইব্রেরি কক্ষ - ১টি অফিস স্টাফ কক্ষ - ১টি অডিটোরিয়াম - ১টি **মোট - ২৩টি**
		পৃথক গ্রুপ/বিভাগ থাকলে প্রয়োজনীয় পৃথক কক্ষ থাকবে।

৭. মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ

মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ কাঠামোতে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান আবশ্যক। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সুষ্ঠুভাবে মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হল।

বিদ্যমান পরিচালনা পরিষদ	সমস্যা	সুপারিশকৃত পরিচালনা পরিষদ
ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা বর্তমান পরিচালনা পরিষদ : মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৭৯ইং সনের রেগুলেশনে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি অরগানাইজিং কমিটি প্রাথমিকভাবে গঠন করার কথা বলা আছে-যা মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদন দেয়।	ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা অর্গানাইজিং কমিটি গঠনের কথা উক্ত রেগুলেশনে উল্লেখ আছে। পরবর্তী পর্যায়ে নিয়মিত কমিটি গঠন সম্পর্কে উক্ত রেগুলেশনে কোন বিধি উল্লেখ না থাকায় সমস্যা সৃষ্টি হয়।	মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৭৯ইং সনের রেগুলেশন মোতাবেক ৯ সদস্যবিশিষ্ট অরগানাইজিং কমিটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য বহাল থাকবে। তবে নিম্নলিখিতভাবে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি নিয়মিত পরিচালনা পরিষদ থাকবে। সভাপতি-স্থানীয় পর্যায় (দাখিল/ এস.এস.সি. পাশের নিচে নয় - ১ জন সহ-সভাপতি - ১ জন ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক সদস্য- ২ জন শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য- ১ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য - ১ জন বিদ্যোৎসাহী সদস্য - ১ জন দাতা সদস্য - ১ জন প্রতিষ্ঠান প্রধান (সদস্য-সচিব)- ১ জন মোট = ৯ জন

- দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদ্‌রাসার পরিচালনা পরিষদ সম্পর্কে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৭৯ইং সনের রেগুলেশনের মধ্যে এডহক কমিটি, ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি ও ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের কমিটির কথা বলা আছে।

সদস্য :

উক্ত রেগুলেশনে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভের বহু পরেও নির্দিষ্ট অংকের নগদ অর্থ বা জিনিসপত্র দানের মাধ্যমে "প্রতিষ্ঠাতা" মনোনীত হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে যা প্রতিষ্ঠালগ্নে 'প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা'র গুরুত্ব হ্রাস করে। উক্ত রেগুলেশনে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডিতে বিদ্যোৎসাহী পদে নিরক্ষর ব্যক্তির মনোনয়ন লাভের সম্ভাবনা থেকে যায়। এর সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশ বিবেচনা করা যায়ঃ

সুপারিশ :

(ক) দাখিল মাদ্‌রাসার ম্যানেজিং কমিটির বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কমপক্ষে দাখিল/ এস.এস.সি উত্তীর্ণ হতে হবে।

(খ) আলিম মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কমপক্ষে ফাযিল/স্নাতক উত্তীর্ণ হতে হবে।

(গ) ফাযিল ও কামিল মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কমপক্ষে ফাযিল/স্নাতক উত্তীর্ণ হতে হবে।

(ঘ) মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা বলতে প্রতিষ্ঠালগ্নে বিধি মোতাবেক যিনি/যাঁরা প্রতিষ্ঠা করবেন, তিনি/তাঁরা প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য হবেন। পরবর্তীতে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে কেউ প্রতিষ্ঠাতা গণ্য হতে পারবেন না। তবে তিনি দাতা গণ্য হতে পারবেন।

(ঙ) ট্রাস্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি চালু থাকবে।

(চ) বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ ধরনের কমিটি গঠন করতে পারবে।

৮. মাদ্‌রাসা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধায়ন

বিদ্যমান ব্যবস্থায় মাদ্‌রাসা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানে মাদ্‌রাসা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড উভয়ই নানামুখী জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার সম্মুখীন হয়। নতুন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ন্যায় মাদ্‌রাসার স্বীকৃতি নবায়নের জন্যও মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্‌রাসা বোর্ডের নিকট আবেদন জানান এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বোর্ডের চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার, পরিদর্শক স্তর অনুসারে নিজেরা পরিদর্শনে যান কিংবা বোর্ডের বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কোন অফিসারকে পরিদর্শনে পাঠান অথবা সংশ্লিষ্ট মাদ্‌রাসার সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, আঞ্চলিক শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জেলা প্রশাসক কিংবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে পরিদর্শনের দায়িত্ব দেন। অনেক ক্ষেত্রে পরিদর্শনের জন্য তাঁদেরকে সময় বেধে দেয়া হয় না। তাঁরা পরিদর্শনের দায়িত্ব পেয়েও ক্ষেত্রবিশেষে বিলম্ব করেন। তাছাড়া তাঁরা নিজেদের প্রধান অফিসিয়াল দায়িত্বের বাইরে মাদ্‌রাসা পরিদর্শনে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। অপর দিকে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের স্বল্প সংখ্যক অফিসার দেশের হাজার হাজার মাদ্‌রাসা পরিদর্শনে নিয়োজিত থাকলে বোর্ডের রুটিন মাফিক কাজের চরম ব্যাঘাত ঘটে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বিত ও সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মাদ্‌রাসার স্তর অনুসারে পরিদর্শকদের পদমর্যাদা থাকা বাঞ্ছনীয়। সুনির্দিষ্টভাবে মাদ্‌রাসা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধায়নের নিম্নরূপ সুপারিশ করা হল:

(ক)	ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা	ঃ	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পরিদর্শন করবেন। প্রয়োজনে জেলা শিক্ষা অফিসার / সহকারী পরিদর্শক, আঞ্চলিক মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড পরিদর্শন করবেন।
(খ)	দাখিল মাদ্‌রাসা	ঃ	সহকারী পরিদর্শক, আঞ্চলিক মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড / জেলা শিক্ষা অফিসার / উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক শিক্ষা পরিদপ্তর পরিদর্শন করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড / মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর পরিদর্শন করবেন।
(গ)	আলিম মাদ্‌রাসা	ঃ	উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক শিক্ষা পরিদপ্তর অথবা মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড অথবা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর পরিদর্শন করবেন।
(ঘ)	ফাযিল ও কামিল মাদ্‌রাসা	ঃ	চেয়ারম্যান, মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ফাযিল মাদ্‌রাসা পরিদর্শন করবেন। চেয়ারম্যান, মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যৌথভাবে কামিল মাদ্‌রাসা পরিদর্শন করবেন। তবে ফাযিল ও কামিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
(ঙ)	দাখিল মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের জন্য মহিলা পরিদর্শক / কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।		

৯. মাদ্‌রাসার স্টাফিং প্যাটার্ন/জনবল কাঠামো

নিম্নবর্ণিত মাদ্‌রাসায় বর্তমানে স্টাফিং প্যাটার্নে বৈষম্য বিদ্যমান। বৈষম্য দূরীকরণের জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষাসংস্কার কমিটির নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনটি বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হল।

স্কুল/কলেজ	মাদ্‌রাসা	সুপারিশ	অভিজ্ঞতা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
* বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বর্তমানে ৬১৫০/- বেতন স্কেলভুক্ত। [বিএড ও স্নাতক/ স্নাতকোত্তর এবং ১২ বছরের অভিজ্ঞতা]	একই মানের দাখিল মাদ্‌রাসার সুপার বর্তমানে ৪৩০০/- বেতন স্কেলভুক্ত। [কামিল/সমমানের এবং ১০ বছরের অভিজ্ঞতা]	দাখিল মাদ্‌রাসার সুপার বর্তমানে ৪৩০০/- বেতনস্কেল ধার্য করার সুপারিশ করা হল।	দাখিল স্তরের মাদ্‌রাসায় কমপক্ষে ১০ বছরের শিক্ষকতা/প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বিধি বহাল থাকবে।	বাংলা, ইংরেজি ভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞানসহ ২য় শ্রেণীর কামিল/আরবি বা ইসলামিক স্টাডিজে ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স।
* বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের বেতনস্কেল ৪৮০০/-। [বিএড ও স্নাতক এবং ১২ বছরের অভিজ্ঞতা]	দাখিল মাদ্‌রাসার সহকারি সুপারের বেতনস্কেল ৩৪০০/। [দ্বিতীয় শ্রেণীর কামিল/সমমান এবং ৫ বছরের অভিজ্ঞতা]	দাখিল মাদ্‌রাসার সহকারী সুপারের বেতনস্কেল ৪৮০০/- টাকা ধার্য করার সুপারিশ করা হল।	দাখিল স্তরের মাদ্‌রাসা শিক্ষকতায় ০৭ বছরের অভিজ্ঞতা।	বাংলা, ইংরেজি ভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞানসহ ২য় শ্রেণীর কামিল/আরবি বা ইসলামিক স্টাডিজে ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স।

* বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ইন্টারমিডিয়েট কলেজ)-এর অধ্যক্ষ ৭২০০/- বেতনস্কেল পান। [অনার্সসহ মাস্টার্স অথবা ডিগ্রিসহ ১ম শ্রেণীর মাস্টার্স এবং ১০ বছরের অভিজ্ঞতা]	আলিম মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ এর বেতনস্কেল ৬১৫০/-। [বাংলা, ইংরেজি ভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর কামিল/সমমান এবং ৮ বছরের অভিজ্ঞতা]	আলিম মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে বেতনস্কেল ৭২০০/- টাকা ধার্য্য করার সুপারিশ করা হল।	দাখিল মাদ্‌রাসায় ৮ বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অথবা মাদ্‌রাসায় প্রভাষক পদে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা।	বাংলা, ইংরেজি ভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞানসহ ২য় শ্রেণীর কামিল/আরবী বা ইসলামিক স্টাডিজে ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স।
* উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের জন্য প্রদর্শকের পদে বেতনভাতা দেওয়া হয়।	আলিম মাদ্‌রাসার বিজ্ঞান বিভাগের প্রদর্শকের বেতন ভাতা দেওয়া হয় না।	আলিম মাদ্‌রাসার বিজ্ঞান বিভাগের প্রদর্শক পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হল।	-	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স বা স্নাতক এবং একটি ব্যতীত সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণী।
* উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ানের বেতনভুক্ত পদ আছে।	আলিম মাদ্‌রাসায় সহকারি লাইব্রেরিয়ানের পদ নাই।	আলিম মাদ্‌রাসায় সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হল।	-	দ্বিতীয় শ্রেণীর ফাযিল ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা।
* উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদ ৪টি।	আলিম মাদ্‌রাসার বেতনভুক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ ২টি।	আলিম মাদ্‌রাসার চতুর্থ শ্রেণীর ৪টি পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হল।	-	৮ম শ্রেণী পাস।

১০. মাদ্‌রাসা শিক্ষা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

মাদ্‌রাসা শিক্ষা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অনেক সমস্যা ও বৈষম্য রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮২৬৮টি ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা রয়েছে। কিন্তু একটিও সরকারি ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা নেই। বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩৭৭০৯টি। অনুরূপভাবে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে প্রায় ২০ হাজারের মতো। এ সব রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের অনুরূপ ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সাধারণ শিক্ষাধারার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ যে সব সরকারি সুযোগ-সুবিধা পান, এগুলো থেকে ইবতেদায়ি স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ বঞ্চিত। এই বৈষম্যের অবসানকল্পে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হল :

১. সাধারণ শিক্ষাধারার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ যে সব সরকারি সুযোগ-সুবিধা পান, মাদ্‌রাসা শিক্ষাধারার ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের সে সব সুযোগ-সুবিধা সমভাবে প্রদানের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

২. পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষাধারার আনুপাতিক সংখ্যক ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা জাতীয়করণ করা;

৩. সাধারণ শিক্ষাধারায় অর্থের পরিমাণ ও সংখ্যার বৈষম্য দূর করা;

৪. ২০০৩ সাল থেকে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছেন। উক্ত দুই ধারার সকল পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের জন্য সরকারের ব্যয় কমানো, পাঠ্যবই প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাপনা সহজকরণের লক্ষ্যে ইবতেদায়ি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলা, ইংরেজি ও গণিত তিনটি পাঠ্যপুস্তক এক ও অভিন্ন করা প্রয়োজন। এই পাঠ্যপুস্তক তিনটি দই ধারার-মাদ্‌রাসা ও সাধারণ ধারার বিষয় বিশেষজ্ঞগণের যৌথ রচনা ও সম্পাদনায় প্রকাশ করা আবশ্যক;

৫. বর্তমানে দাখিল স্তরে হিফয শাখা নামে একটি শাখা চালু আছে। বস্তুত কুরআন হিফযের উপযুক্ত সময় হচ্ছে শৈশবকাল তথা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সময়কাল যা অভিজ্ঞতার নিরিখে বাস্তব ও যৌক্তিক বিবেচিত হয়। এ কারণেই দাখিল স্তরের হিফয শাখা স্থানান্তর করে তা ইবতেদায়ি স্তরে চালু করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় মাদ্‌রাসার ইবতেদায়ি স্তরে দুটি শাখা থাকবে। একটি ইবতেদায়ি সাধারণ শাখা আর অন্যটি ইবেতদায়ি হিফয শাখা। তবে ইবতেদায়ি হিফয শাখার জন্য বিদ্যমান জনবলের অতিরিক্ত একজন 'হাফিযে কুরআন' নিয়োগ করতে হবে;

৬. সাধারণ শিক্ষাধারায় জাতীয়ভাবে গৃহীত নিম্ন মাধ্যমিক (৮ম শ্রেণী) বৃত্তি-ব্যবস্থাপনার অনুরূপ মাদ্‌রাসার ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি ব্যবস্থাপনা সমান করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল বৈষম্যের অবসান করা;

৭. মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষার লক্ষ্যে দেশের মাদ্‌রাসাগুলোর পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাবহির্ভূত করে একটি স্বতন্ত্র 'মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা;

৮. মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যমান কারিকুলাম ও টেক্সটবুক উইং শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করা আবশ্যক। এ উইংয়ে প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জনবলের পদ সৃষ্টি করে ইবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরিমার্জন ও পরিশোধন করা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে স্বতন্ত্রভাবে 'জাতীয় মাদ্‌রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড স্থাপন করা;

৯. দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত যে সব মাদ্‌রাসায় প্রতি শ্রেণীতে ৬০ জনের ঊর্ধ্বে শিক্ষার্থী আছে, সে সব মাদ্‌রাসায় সাধারণ শিক্ষাধারার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ শ্রেণীশাখা খোলার ব্যবস্থা করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা;

১০. মাদ্‌রাসা প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স এবং বিষয় শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স বাধ্যতামূলক করা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের জন্য প্রয়োজনীয় বর্ধিত স্কেলের ব্যবস্থা করা;

১১. শিক্ষকদের প্রত্যেকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ব্যবস্থা রাখা;

১২. মাদ্‌রাসা শিক্ষাধারায় দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে কামিল পর্যন্ত সকল স্তরে সহশিক্ষা প্রথা বন্ধ করা এবং নারী শিক্ষার জন্য সকল স্তরে পৃথক মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি করা;

১৩. ১৯৮৩ সনের এনাম কমিশনের রিপোর্টে সরকারি কলেজের স্টাফিং প্যাটার্নে এবং সমমানের সরকারি মাদ্‌রাসার স্টাফিং প্যাটার্নে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে-তা অনভিপ্রেত। উক্ত বৈষম্য অবসানকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা :

(ক) সরকারি মাদ্‌রাসায় ফাযিল স্তরে অনুমোদিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য সরকারি কলেজের ডিগ্রি স্তরের অনুরূপ একটি সহযোগী অধ্যাপক, একটি সহকারী অধ্যাপক ও দু'টি প্রভাষকের পদ সৃষ্টি করা;

(খ) সরকারি মাদ্‌রাসায় কামিল স্তরে অনুমোদিত হাদিস, তাফসির, ফিক্‌হ ও আদব বিষয়ে প্রতিটিতে সরকারি কলেজের মাস্টার্স স্তরের বিষয়ের অনুরূপ অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকসহ প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা এবং সরকারি কামিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষের পদ অধ্যাপক মানে উন্নীত করা;

১৪. বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার ও বি.সি.এস. (টেকনিক্যাল শিক্ষা) ক্যাডারে অনুরূপ বি.সি.এস. (মাদ্‌রাসা শিক্ষা) ক্যাডার সৃষ্টি করা;

১৫. শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি সরকারি গার্লস কলেজ, একটি সরকারি বয়েজ কলেজ ও একটি সরকারি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা, কিন্তু প্রথম দুটি বাস্তবায়িত হলেও তৃতীয়টি বাস্তবায়িত হয় নি। দেশের বর্তমান বাস্তবতার আলোকে প্রতিটি জেলায় একটি সরকারি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক;

১৬. ১৯৮৫ সালে দাখিল স্তরকে মাধ্যমিক স্তরের এবং ১৯৮৭ সালে আলিম স্তরকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমমান প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি ফাযিলকে ব্যাচেলর এবং কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করা হয় নি। ফলে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রিধারীগণ যথাক্রমে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পন্ন করেও ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের মান পাচ্ছে না। এ সমস্যার সমাধানকল্পে অবিলম্বে ফাযিলকে ব্যাচেলর ও কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করা আবশ্যক। এ সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সময়সাপেক্ষ বিবেচিত হওয়ায় সুপারিশ এই যে আপাতত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার দায়িত্ব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮০-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর শর্তে গাজীপুর মাদ্‌রাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সাময়িকভাবে ন্যস্ত করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজও অবিলম্বে শুরু করা হোক।

১৭. মাদ্‌রাসা পাঠ্যক্রমে সাধারণ মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী) একই মানের বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এ সব বিষয়ের বই ও একই রাখতে হবে। এ সুপারিশ কার্যকর করার জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার্থীদের পরে শিক্ষকগণই হচ্ছেন যে-কোন শিক্ষা ব্যবস্থার বৃহত্তর ও সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষকগণই যে-কোন শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। এ কারণেই শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতির প্রসঙ্গটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এ প্রস্তুতির প্রয়োজনে শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান ও শিখনপদ্ধতি সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞান ও কুশলতা অর্জন করা অপরিহার্য। ১৭৮০ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মাদ্‌রাসা শিক্ষাধারায় হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলেও মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ইত:পূর্বে গড়ে ওঠে নি।

মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আরও বাস্তবধর্মী, জীবনঘনিষ্ঠ, আকর্ষণীয়, ফলপ্রসু এবং এর শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী ও ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঁচটি ধারা বিদ্যমান :

(ক) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

(গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

(ঘ) শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

(ঙ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

এই পাঁচটি ধারায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। যেমন :

(ক)	প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)	-	৫৪টি
(খ)	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	-	১১টি
(গ)	দূরশিক্ষণ (বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)	-	১টি
(ঘ)	শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই.ই.আর)	-	১টি
(ঙ)	টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজ	-	১টি
(চ)	ভোকেশনাল ট্রেনিং কলেজ	-	১টি
(ছ)	শারীরিক শিক্ষা কলেজ	-	১টি
(জ)	এইচএসটিটিআই	-	৫টি।

সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগে অনেকগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। মাদ্‌রাসা শিক্ষকদের জন্য এতদিন কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট না থাকলেও সম্প্রতি সরকারি উদ্যোগে গাজীপুরস্থ বোর্ড বাজারে মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে দাখিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা ৮,০০০-এর অধিক। এবতেদায়ি মাদ্‌রাসার সংখ্যা প্রায় ১৮,০০০ হাজার। এ সব মাদ্‌রাসায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মরত আছেন। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে কোনক্রমেই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রশিক্ষিত করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, দেশের ৫৪টি পিটিআই-এ এবতেদায়ি মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। অনুরূপভাবে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে দাখিল স্তরের মাদ্‌রাসার সাধারণ বিষয়ের শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। (এ ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশ বিবেচনা করা যায়)।

সুপারিশ

১. মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণের সি-ইন-এমএড, বিএমএড ও এমএমএড-এর শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা প্রশিক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিকশিত ও সমৃদ্ধ করার অব্যাহত প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে;

২. প্রশিক্ষকদের অবশ্যই বিএমএড বা এমএমএড ডিগ্রি থাকতে হবে। তাছাড়া প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে;

৩. প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশে ও বিদেশে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

৪. সি-ইন-এমএড ও বিএমএড প্রশিক্ষণের মেয়াদ এক বছর হবে;

৫. প্রশিক্ষণহীন কর্মরত তরুণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত;

৬. প্রশিক্ষণকালে কমপক্ষে তিনমাস ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাদ্রাসাসমূহের সহযোগিতা লাভের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

৭. প্রশিক্ষণ সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন;

৮. ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য যে দুটি বিষয় নির্বাচন করতে হয় সে দুটি প্রশিক্ষণার্থী ছাত্র-জীবনে শিক্ষা লাভ করেছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;

৯. নৈতিক, মানসিক, শারীরিক গুণসম্পন্ন, পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণীত হওয়া উচিত;

১০. প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক সহায়তা দিতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালে সবেতন ছুটি মঞ্জুর করতে হবে;

১১. প্রশিক্ষণ হবে সার্বক্ষণিক এবং প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে;

১২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (এবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল) বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে;

১৩. মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংখ্যা প্রয়োজনানুপাতে আরও বাড়াতে হবে;

১৪. বেসরকারি-সরকারি নির্বিশেষে সকল মাদ্রাসার শিক্ষকের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৫. কর্মরত শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। নতুন শিক্ষাক্রম ও পরিবর্তিত পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সিনিয়র মাদ্রাসা প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নায়েমে অব্যাহত রাখতে হবে এবং দাখিল মাদ্রাসা প্রধানদের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে HSTTI ও MTTI করতে হবে;

১৬. শিক্ষণীয় বিষয় ও পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য ন্যায্য ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, সর্বোচ্চ পিরিয়ডের ন্যায্য সংখ্যা নির্ধারণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহসহ উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রশিক্ষণের জ্ঞান সঠিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য তদারকির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

১৭. ১৯৯৫ সনে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পিপিএর ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলাম সংক্রান্ত সাব-কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হল (সুপারিশ কপি সংযুক্ত)।

মাদ্‌রাসা শিক্ষায় গবেষণা

জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষার উন্নয়ন। পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে শিক্ষার ধরন, পদ্ধতি, বিষয়ও পরিবর্তনশীল। এর কোন্‌টি সময়োপযোগী আর কোন্‌টি উপযোগী নয় তা নির্ণয় করতে গবেষণা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। তাই বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ব থেকেই গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় গবেষণার কোন ব্যবস্থা নেই। এজন্য নায়েম, বি.আই.ডি.এস ও আই.ই.আর.-এর অনুরূপ বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে মাদ্‌রাসা শিক্ষা গবেষণা সেল নামে একটি গবেষণা সেল খোলা আবশ্যক।

মূল রচনা :

প্রফেসর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান; প্রফেসর মনসুরুর রহমান; মাহবুবুর রহমান।

'নারীকে শিক্ষার মূল ধারায় আনয়ন'

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইন নারীর জন্য সমতাভিত্তিক, গুণগত ও সমমানের শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সাংবিধানিক এই স্বীকৃতি বিভিন্ন সময়ে সরকার প্রণীত নীতিমালাসমূহ, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৯০ সালে জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত সার্বজনীন বিশ্বশিক্ষা সম্মেলন, ১৯৯৫ সালে বেইজিং ঘোষণা এবং ২০০০ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং বর্তমান সরকারের শিক্ষা কমিশন-২০০৩-এর নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে এই উপকমিটির সুপারিশমালা প্রণীত হলো।

উদ্দেশ্য

পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে আটক নারীকে সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সহায়ক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার মূলধারায় আনতে হবে। নারীকে ভিন্ন মানের শিক্ষাব্যবস্থায় আবদ্ধ না রেখে জাতীয় উন্নয়নে তাদের সমঅবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষা অধিকতর সুসমন্বিত করতে হবে যাতে নারী আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং পুরুষের সমকক্ষ শিক্ষামান অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালায় নারীর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ডাকার কর্মপরিকল্পনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নারীশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, ডাকার কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন ধারা ও অনুচ্ছেদে নারীশিক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে ডাকার কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো, যাতে দেখা যায় নারীশিক্ষা প্রসারে ও নারীপুরুষ সমতা বিধানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর প্রতিটি রাষ্ট্র ও সমাজ। মোট ৬টি লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে প্রায় প্রতিটিতেই নারীশিক্ষার উল্লেখ রয়েছে। এবং ৫নং লক্ষ্য সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্বারোপ করেছে, যেমন :

২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করতে হবে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে এ বিষয়ে সমতা অর্জন করতে হবে। মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা অর্জনে মেয়েদের পূর্ণ ও সমপ্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উপর জোর দিতে হবে।

আবার ৭.খ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের মধ্যে যাতে সকল শিশু শিক্ষা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। মেয়ে শিশু, যেসব শিশু কষ্টকর জীবন যাপন করছে বা বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভুক্ত শিশু সকলেই যাতে বিনা ব্যয়ে মানসম্মত ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পায় এবং তা সম্পূর্ণ করতে পারে এটা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে ২০১০ সাল নাগাদ বয়স্ক নিরক্ষরতার ৫০% দূর করতে হবে এবং সকল বয়স্ক ব্যক্তির জন্য মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা লাভের সমান প্রবেশাধিকার অর্জন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৭.ঘ ডাকার কর্মপরিকল্পনা)

যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার ফলে বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার গত ক' বছরে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির কথা বলা হলেও বিদ্যমান নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয় নি। এখনো নারী-পুরুষ বৈষম্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নের সূচক লক্ষ্য করা গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট অনুল্লেখযোগ্য। সরকারের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা এখানে কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পেয়েছি যা বিশেষ করে, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অবস্থানকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলবে। যেমন:

প্রাথমিক পর্যায়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা মাত্র ৩৬% । রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা মাত্র ২৬.৯%, নন-রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ৪৬.৫% এবং অন্যান্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০.৭% । অর্থাৎ দেখা যায়, মোট ৭৮.১২৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের গড় শতকরা হার মাত্র ৩৬ ভাগ।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার শতকরা ৪৯.৫ ভাগ। রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৯.৩ ভাগ, নন-রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৮.৯ ভাগ, অন্যান্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৬.৭% । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে মেয়েদের ভর্তির শতকরা হার ৪৯.১ ভাগ।

মাধ্যমিক পর্যায়

মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারি মহিলা প্রতিষ্ঠান ১৪৭টি এবং ২০১৮টি বেসরকারি মহিলা প্রতিষ্ঠান। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার ৪৫.৯% এবং বেসরকারি পর্যায়ে এই হার ৫২.৭% । নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে বেসরকারি মহিলা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৫৬টি।

মাধ্যমিক শিক্ষার গ্রামীণ পর্যায়ে মহিলা শিক্ষকের হার শতকরা ১১.৯ ভাগ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৫৩.৬% । শহরাঞ্চলে এই হার যথাক্রমে ৩৪.৬% ও ৫১.৩% ।

নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের শতকরা হার ১৬.১ ভাগ, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৩৪.৯ ভাগ এবং বেসরকারি পর্যায়ে মহিলা শিক্ষকের হার ১৫.৭ ভাগ।

নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের (৬ষ্ট শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) ঝরে পড়ার হার ১৭.২%, মাধ্যমিক পর্যায়ে (নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী) এই ঝরে পড়ার হার ৫৪.৮% ।

কলেজ

উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের মাত্র ৭টি সরকারি কলেজ এবং ৩০৯টি বেসরকারি মহিলা কলেজ। সরকারি পর্যায়ে মহিলা শিক্ষকের হার ৩৭.৭% বেসরকারি পর্যায়ে ২০% । ছাত্রীসংখ্যার হার সরকারি পর্যায়ে ৬৭.৪% এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৫০.৫% ।

ডিগ্রি (পাস) কলেজগুলোর মধ্যে সরকারি মহিলা কলেজ ৩৮টি এবং বেসরকারি মহিলা কলেজ ৯৬টি। মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা সরকারি কলেজে ১৮.৪% এবং বেসরকারি কলেজে ১৬.৬% । ছাত্রীসংখ্যা যথাক্রমে ৪২.৯% ও ৩৪.৮% ।

ডিগ্রি (সম্মান) সরকারি মহিলা কলেজ ১২টি, এবং বেসরকারি মহিলা কলেজ ৩টি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মহিলা শিক্ষকের হার যথাক্রমে ১৬.৬% ও ২৩.১৭% । ছাত্রীসংখ্যা যথাক্রমে ৩৪.৬% ও ৩৬.৪% ।

মাস্টার্স পর্যায়ে সরকারি মহিলা কলেজের সংখ্যা ৮টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৫টি। মহিলা শিক্ষকের হার যথাক্রমে ৩০.১% এবং ৩০% । ছাত্রীসংখ্যার হার যথাক্রমে ৩৬.৯% ও ২৬.৭% ।

মাদ্রাসা

দাখিল, আলিম ও ফাজিল পর্যায়ে বেসরকারি মহিলা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ৭০১টি, ৬১টি ও ২১টি। মহিলা শিক্ষকের হার যথাক্রমে ৫.৪৮%, ৩.২৭% এবং ২.৬% । ছাত্রী হার যথাক্রমে ৪৯.৪%, ৪০% এবং ৩২.২% । এবতেদায়ি (প্রাথমিক) পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির হার ৩৯.৯৭% । উল্লেখ্য, মাদ্রাসা শিক্ষায় কোনো পর্যায়েই কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ১৩.৮% এবং সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫.৯%, বেসরকারি পর্যায়ে ছাত্রী হার ২৬.৩% এবং সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হার ২৪% ।

এ সব তথ্য ২০০১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী (সূত্র: বেনবেইস, জাতীয় শিক্ষা সমীক্ষা, নভেম্বর, ২০০২)।

উল্লিখিত তথ্য প্রমাণাদিতে দেখা যায়, বিশেষ করে, নারীশিক্ষা প্রসারে তুলনামূলক চিত্র খুব আশাব্যঞ্জক নয়। উপরন্তু, সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে মেয়েশিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদি, ছাত্র-ছাত্রীদের আনুপতিক হার এখন পর্যন্ত আলাদাভাবে করা হয় নি। আশার কথা, এ পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং নারীকে শিক্ষার মূল ধারায় আনয়নের জন্য গঠিত উপকমিটির কার্যক্রম ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

নারীশিক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষা কমিশনের পূর্বের রিপোর্ট সমূহের সারাংশ

পূর্বের সকল শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-বিশেষত ২০০০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারীশিক্ষাকে একটি সেক্টোরাল ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে সমাধানকল্পে বিচ্ছিন্ন কিছু পদক্ষেপ নেবার সুপারিশ করা হয়েছে। লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যানের অভাবে তা কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যমূলক পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব ও কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় এবং এসব অন্তরায় কীভাবে মোকাবেলা করা হবে সেজন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কৌশল পূর্বের শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় নি।

নারীশিক্ষার মূলনীতি

(ক) "নারীকে শিক্ষার মূলধারায় আনয়ন" নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শিক্ষার সকল সেক্টরের জন্য আবশ্যক বলে বিবেচিত হবে। এই উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তর ও শাখায় বৈষম্য ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনের লক্ষ্যে সময় ভিত্তিক (Time Frame) কৌশলাদি নির্ধারণ করা।

(খ) বর্তমান শিক্ষা কমিটির প্রতিটি উপকমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশমালায় শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ও ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ নীতি, বিধান ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার দিকনির্দেশনা প্রস্তুত করা।

(গ) ২০০৫ সালে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান শিক্ষাবৈষম্যের হার হ্রাস করা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি ও পাঠ শেষ করার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন করে সমতা আনার ঘোষণা দেওয়া এবং তা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া।

(ঘ) কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলি স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরি, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমতা নিশ্চিত করা।

(ঙ) শিক্ষার সকল স্তরে (প্রাথমিক থেকে উচ্চতম পর্যায়) ও সকল শাখায় (মানবিক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পেশামূলক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি) নারীর অবস্থানগত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনের জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশগম্যতা (accessibility) নিশ্চিত করা।

(চ) শিক্ষার সকল পর্যায়ে বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য সময়রেখা (Time Frame) নির্ধারণ করা।

(ছ) বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচিসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচি, বিশেষ করে , পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান যে-কোনো দূরত্ব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিসমূহে সম সুবিধা নারীকে প্রদান করা।

(জ) নারীসমাজকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সমঅধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা; সাধারণ শিক্ষাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য সকল প্রকার আনুষঙ্গিক সুবিধা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

(ঝ) নারীশিক্ষার প্রকৃত অগ্রগতি নির্ধারণ শিক্ষার প্রতিটি শাখায় লিঙ্গভিত্তিক উপাত্ত (gender desegregated data) তৈরির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

কাঠামোগত সমস্যা নিরসন

(ক) 'মেয়ে শিক্ষার্থী বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শুধু মেয়েদের স্কুলে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। শিক্ষার্থীর অনুপাতে মেয়েদের জন্য স্কুলের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

(খ) সকল ছাত্রাবাস ও হোস্টেলের মধ্যে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ হোস্টেল নারী শিক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ করতে হবে যাতে নারী সেই সকল শিক্ষালয়ে পড়াশোনা করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীসময়ে প্রয়োজনবোধে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেলের সংখ্যা সমান করতে হবে।

(গ) প্রত্যেক শিক্ষালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে তাদের টয়লেটের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সেগুলোতে মেয়েদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) প্রাথমিক পর্যায়ে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নারীশিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, তাদের জন্য বাসস্থান এবং যথাযথ নিরাপত্তা ও প্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) সকল বিদ্যালয়ে মেয়েদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় বিশেষ সুবিধা থাকতে হবে। মেয়েরা যেহেতু ভবিষ্যতের মা এবং বাংলাদেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মা অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার শিকার, সুতরাং প্রতি বিদ্যালয়ে মেয়েদের পর্যাপ্ত খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ দিতে হবে, যাতে তারা নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিক সচেতন হতে পারে।

নারীশিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত নিম্নলিখিত ইস্যুগুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

নারীশিক্ষার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি

(ক) আধুনিক গণমাধ্যম এবং লোকায়ত জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার (indigenous knowledge and traditional method) মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে নারীশিক্ষার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(খ) ছাত্রীদের শিক্ষায়তন থেকে ঝরে পড়া রোধের জন্য পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, শিক্ষালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান ও ক্ষেত্রবিশেষে বৃত্তিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

(গ) পরিবারের নারীনির্যাতন ও শিক্ষালয়ে যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা ও সম্ভাব্য যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে শিক্ষক/কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে।

পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

(ক) প্রতি বিষয়ের শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও সার্বিক শিক্ষার মান পর্যালোচনা ও পরীক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কমিটি/উপ-কমিটিতে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে করে শিক্ষার বিষয়বস্তুতে নারীর পরিপ্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

(খ) শিক্ষার সকল স্তরে বিশেষ করে ইংরেজি, বাংলা ও সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করে লিঙ্গ বৈষম্য সূচক ভাবধারা বা নারীর সমঅধিকারের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করে অনুরূপ বিষয়সমূহ পরিবর্তন করে নারীর প্রতি ইতিবাচক সমঅধিকারমূলক ও সমাজে নারী-পুরুষের সমান ভূমিকা ও দায়িত্বের প্রতিফলন করতে হবে।

(গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অধিক সংখ্যক মহিয়সী নারীর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ঘ) উপমহাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম মাধ্যমিক পাঠের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নীতি নির্ধারণ ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC)

(ক) শিক্ষাসংক্রান্ত সকল নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে যথা মন্ত্রণালয় থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড/কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে অধিক মহিলা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকের নিয়মিত শিক্ষা প্রদান এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষার মান ইত্যাদি পরিবীক্ষণের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC) ও অন্যান্য মনিটরিং কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম। অনুরূপভাবে, যে কোনো কমিটিতে বিশেষত মেয়েদের স্কুলে চারভাগের তিনভাগ সদস্য শিক্ষার্থীদের মায়েদের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হবে।

(গ) বর্তমানে অভিভাবক হিসেবে পিতার নামের পাশে মায়ের নাম লেখার বিধান চালু হলেও মাকে অভিভাবকের কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এমন কি পিতার অবর্তমানেও ভাই কিংবা পরিবারের অপরাপর পুরুষ সদস্যকে শিক্ষার্থীর অভিভাবক রূপে গণ্য করা হয়। এই নীতির পরিবর্তন করে মাতা ও পিতাকে শিক্ষার্থীর যুগ্ম অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পিতার অবর্তমানে মাকে মুখ্য অভিভাবক রূপে গণ্য করতে হবে।

অন্যান্য প্রেরণামূলক ব্যবস্থা

(ক) সরকারি নীতি অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক হলেও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অনেক মাতাপিতা মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে দরিদ্র পরিবারের ছাত্রীকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের ব্যাপক অংশ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১.২৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থী। এ ধরনের শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মেয়ে। এই বিরাট সংখ্যক মেয়ে যাতে পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগ পায় তার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট নীতি থাকতে হবে এবং মন্ত্রণালয়কে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে, সরকারি ও নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিনা মূল্যে সরকারি বই বিতরণের ব্যবস্থা আছে। অনুরূপভাবে এ সকল শিক্ষাব্যবস্থার অধীনস্থ শিক্ষার্থীরাও যেন বিনা মূল্যে বই পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) মেয়েদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি ও পেশাদারি শিক্ষায় (যথা- সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসা, আইন, ব্যবসায় প্রশাসন, কম্পিউটার ইত্যাদি) উৎসাহী করার জন্য বিশেষ বৃত্তি তহবিল গঠনের জন্য ব্যক্তি খাতকে (যেমন: ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) অন্যান্য দেশের মতো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা শিক্ষা তহবিলে প্রদত্ত অনুদানকে tax rebate-এর আওতায় এনে অনুপ্রাণিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

মাদ্‌রাসা শিক্ষায় নারী

ধর্মীয় শিক্ষার বর্তমান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পুরুষের পাশাপাশি বাংলাদেশে বহু মেয়ে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। বলা যায় মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করতে হবে। বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার আলোকে পূর্বের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনসহ বর্তমান শিক্ষা কমিশনও মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জীববধারণ ও পেশা সংক্রান্ত কাজকর্মে পারদর্শী হবার ও বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জনের পরামর্শ দিয়েছে। এই কমিটিও তার সঙ্গে একমত পোষণ করে। মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদেরও পুরুষের অনুরূপ জীবিকা অর্জনে আত্মনির্ভরশীল হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীরা অবহেলিত এবং যথাযথ মানের শিক্ষা অর্জন থেকে তারা বঞ্চিত। বর্তমান কমিশনের সদস্যগণ মহিলা মাদ্‌রাসার শিক্ষার পরিবেশ ও মান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন মহিলা মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উদ্বেগ ও সমস্যা চিহ্নিত করে যার আশু সমাধান করা প্রয়োজন।

মহিলা মাদ্‌রাসা পরিদর্শন করে বর্তমান উপকমিটি বিশেষ কিছু উদ্বেগ (concern) চিহ্নিত করে

(ক) ছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে মাদ্‌রাসায় বিশেষত আবাসিক মাদ্‌রাসাগুলোতে ক্লাস ঘর ও বাসস্থান অত্যন্ত অপ্রতুল।

(খ) ছেলেদের মাদ্‌রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ থাকলেও মেয়েদের মাদ্‌রাসায় অনুরূপ সুযোগ না থাকায় ভবিষ্যতে ছাত্রীরা চিকিৎসা বা বিজ্ঞানের কোন শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভে সক্ষম হয় না।

(গ) দাখিল ও আলিম পাঠ্যক্রমে ইংরেজি শিক্ষা এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি সমমানের করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(ঘ) মহিলা মাদ্‌রাসায় কোন লাইব্রেরি না থাকায় মেয়েদের রেফারেন্স বই ব্যবহার ও সাধারণ জ্ঞান লাভের সুযোগ নেই।

(ঙ) মাদ্‌রাসার মেয়েদের টিভি প্রোগ্রাম দেখতে দেওয়া হয় না, যা তাদের শুধু বাস্তবে জীবন বিচ্ছিন্ন ও জ্ঞানহীন করে তাই নয়, কোন প্রকার বিনোদনেরও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটিই সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের পরিপন্থী।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বাস্তবতার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমস্যা সমাধানের জন্য অত্র উপ-কমিটি সুপারিশ করছে।

মূল রচনা :

মিসেস সালমা খান; মিসেস রাশেদা কে চৌধুরী; মিসেস রোয়েনা হোসেন।

তথ্যপ্রযুক্তি(আই টি) শিক্ষা

১. তথ্যপ্রযুক্তি (আই টি) শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

১.১ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ৫১টি কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট আছে। এসব কলেজে ৪ বছর মেয়াদি ডিগ্রি দেওয়া হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলোর সিলেবাস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত। সিলেবাসগুলোতে রচনামূলক বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বেশির ভাগ কলেজে ল্যাব সুবিধা অত্যন্ত কম। বাৎসরিক পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পরীক্ষার ফল পেতে অনেক দেরি হয়। অধিকাংশ শিক্ষক খণ্ডকালীন হিসাবে কর্মরত। কলেজগুলোতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কম বেতনে নিম্নমানের শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরীক্ষাগুলোর ফলাফল প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হিসাবে দেওয়া হয়। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা।

১.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে ঢাকা শহরে পঞ্চাশোর্ধ্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তথ্য প্রযুক্তিতে ৪ বছর মেয়াদি বি.এস.সি অথবা বি.এস-সি (প্রকৌশল) ডিগ্রি দেওয়া হয়। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় বছরে ৩ বার ছাত্র ভর্তি করে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বছরে ২ বার ছাত্রভর্তি করে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা সিলেবাস এবং গ্রেডিং পদ্ধতি রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ল্যাব সুবিধা যথেষ্ট নয়, অথচ সিলেবাসে প্রচুর ল্যাব কোর্স রয়েছে। বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে তিনবার পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টার্ম বা সেমিস্টার সিস্টেম হওয়াতে সেশন জট কম। প্রতিটি সেমিস্টারে মিড-টার্ম, ক্লাস টেস্ট, অ্যাসাইনমেন্ট এবং ফাইনাল পরীক্ষা নেওয়ার সিস্টেম চালু রয়েছে। ফলাফল প্রকাশ অত্যন্ত দ্রুত হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন দুই ধরনের শিক্ষক পাওয়া যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চাকুরিবিধি নেই। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। চার পাঁচটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ কোটায় ছাত্রভর্তি করতে পারে। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব একটা ছাত্র পাওয়া যায় না। অনেক প্রতিষ্ঠান চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছাত্রভর্তি করে। অথচ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পরে মানসম্মত শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষক হিসাবে যারা আছেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত। এম,এস,সি এবং পি.এইচডি ধারী শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। সকল প্রতিষ্ঠান একই মানের নয়। ছাত্র ভর্তি করার সময় খুব একটা যাচাই বাচাই করা হয় না। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার কমে যাচ্ছে; কেননা চাকরি প্রাপ্তির তেমন সুযোগ-সুবিধা নেই। দুই একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এস,সি ডিগ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি ইত্যাদি ডিপার্টমেন্ট চালু রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণ, তবে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ইংরেজিতে লিখতে হয়।

১.৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৫-৬টিতে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিগ্রি দেওয়া হয়। এইচ.এস.সি পর্যায়ে ভাল রেজাল্ট করা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বছরে ১ বার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সিলেবাস রয়েছে। লক্ষণীয় যে, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোনো মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে, যা বর্তমান বিশ্বের সাথে সঙ্গতিহীন। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডিং পদ্ধতির পরিবর্তে মার্কসের শতকরা হিসাবে ছাত্রদের মূল্যায়ন করা হয়। এই কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে পড়াশোনা করতে গেলে সমস্যায় পড়তে হয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার সিস্টেম, আবার কোথাও কোথাও বাৎসরিক সিস্টেম চালু রয়েছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট পাওয়ার জন্য ৪-৬ মাস অপেক্ষা করতে হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ অনুষ্ঠান, পরীক্ষাগ্রহণ ও ফলপ্রকাশ নিয়মিত হয় না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পূর্ণ কোটায় ছাত্র পাওয়া যায়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হয় বলে সবসময় সঠিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োজিত হন না। দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়েছে পাবলিক

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যার কারণে সেশন জট কমানো সম্ভব হচ্ছে না। অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ছাত্ররা যথা সময়ে কোর্স শেষ করে। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রিতরূপ। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ইংরেজিতে উত্তর লিখতে হয়।

১.৪ টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট

ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন কলেজ ও প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগ রয়েছে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী এস.এস.সি পাশ করার পর এই ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তি হয়। ছাত্র ছাত্রীরা এস.এস.সি-তে ১ম বিভাগ বা ২য় বিভাগপ্রাপ্ত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাস কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত। এই সিলেবাসগুলো পুরোনো এবং বর্তমান চাহিদার সাথে বেমানান। চার বছরের ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দেওয়া হয়। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা। পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলায় লিখে থাকে। এই সব প্রতিষ্ঠানের পাঠদান পদ্ধতি কাম্য মানের কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা বই পড়ে, যা নিম্নমানের। সরকারি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো তাদের ছাত্র ভর্তির কোটা পূরণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত বেসরকারি ইনিস্টিটিউটগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কোটা পূরণ করতে পারে না। এ সব ইনিস্টিটিউটের প্রথম তিন বছরের পরীক্ষা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে হয়। শেষ বছরের পরীক্ষা বোর্ডের অধীনে হয়। এ সব ইনিস্টিটিউটে গ্রেডিং পদ্ধতির পরিবর্তে সনাতন পদ্ধতি চালু আছে।

১.৫ বি আই টি

বিআইটিগুলোতে চার বছর মেয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বি আই টি বছরে একবার পূর্ণ কোঠায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে থাকে। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রিত। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ইংরেজিতে লিখতে হয়। গ্রেডিং পদ্ধতির পরিবর্তে বাংলাদেশের সনাতন পরীক্ষা সিস্টেম চালু রয়েছে। খুব ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না। বর্তমানে যারা শিক্ষক হিসাবে রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই Computer Graduate নয়। তবে আস্তে আস্তে Computer Graduate কে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

১.৬ Oriented Training Centre :

নট্রামস ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অনুমোদিত কম্পিউটার ট্রেনিং কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কম্পিউটার দিয়ে ১০-১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষিত বেকার যুবকেরা এখানে ছাত্র-ছাত্রী হয়ে থাকেন। শিক্ষকরা কোন রকমে Word processing এবং Computer trouble shooting-এর কাজ জানে। তারা Computer Graduate না হয়েও নিজেকে Computer Engineer হিসাবে দাবি করেন। এছাড়া APTECH, NIIT এবং IBCS premix সহ প্রতিষ্ঠানগুলো কম্পিউটার বিষয়ে B.Sc এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রি দিয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ডকালীন। কোন কোন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ডিগ্রিপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

২. সমস্যাবলি

২.১ তথ্য প্রযুক্তিতে পড়াশোনা করার পর যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকাতে দেশে প্রকৃত অর্থে বিশেষজ্ঞ তৈরি হচ্ছে না। পড়াশোনা করার পর সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য কোন ক্ষেত্র নেই। এইচ.এস.সি এবং এস.এস.সি পর্যায়ে কম্পিউটারকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কম্পিউটার ভীতি রয়েছে।

২.২ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসাবে যারা আছেন তাদের ICT বিষয়ে যথাযোগ্য জ্ঞানের অভাব রয়েছে। কিছু লোক IT পড়াশোনা ছাড়াই নিজেকে IT পেশাজীবী হিসাবে দাবি করে। তারা সজ্ঞানে অন্যের মেধাকে চুরি করে অন্যের আবিস্কৃত S/W-কে নিজের বলে চালায় এবং সরকারের বিভিন্ন সভায় নিজেকে IT বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থাপন করে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়ার চেষ্টা করে।

২.৩ একাডেমিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার কোন সমন্বয় নেই বললেই চলে।

২.৪ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ICT বিষয়ে গবেষণা ও অনুশীলন নেই।

২.৫ সরকারের জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা কীভাবে বাস্তবায়ন করবে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনার অভাব।

২.৬ সরকারের নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নের কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নেই।

২.৭ বিশ্বের সাথে যোগাযোগের জন্য high speed submarine cable communication এর অভাব।

২.৮ সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে Computer ভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে manual system চালু রাখা।

২.৯ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোক্তার অভাব।

২.১০ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সক্রিয় নয়।

২.১১ BCC এর সাথে Computer Graduate রা সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত নন।

২.১২ ICT field এ বাংলাদেশ ব্যাংকের loan এর proper monitoring-এর অভাব।

২.১৩ দেশের বিবদমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিদেশি বিনিয়োগের অভাব।

২.১৪ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সঠিকভাবে মনিটরিং করা হয় না।

৩. সুপারিশসমূহ

৩.১ শিক্ষকদের সম্মানী বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের সম্মানী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে নির্ধারণ না করে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।

৩.২ নীতি নির্ধারকদের ICT ক্ষেত্রে পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যাতে ICT ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে না পারেন সেজন্য সঠিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

৩.৩ সরকারি নীতিগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন।

৩.৪ প্রাথমিকভাবে সরকারি কাজগুলোকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিয়ে তাদের সাথে বাংলাদেশের Computer Graduate-দের সম্পৃক্ত করা। তাতে দেশীয় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা যাবে।

৩.৫ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অফিস এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে automation এর আওতায় এনে ICT sector-কে দেশের মধ্যে উৎসাহিত করা। দেশের মধ্যে উৎসাহিত করার পর High speed communication backbone-এর মাধ্যমে বিদেশের কাজগুলোকে নিয়ে আসা।

৩.৬ সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ। প্রাথমিকভাবে জেলা পর্যায়ের সরকারি স্কুল ও কলেজগুলোতে কম্পিউটার দিয়ে এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পর্যায়ে কম্পিউটারকে উৎসাহিত করা যায়।

৩.৭ সরকার এ কাজগুলো বেসরকারি খাতে প্রাথমিক ভাবে ছেড়ে দিতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সঠিক ভাবে মনিটরিং করা দরকার।

৩.৮ বিদেশে যে সব বাংলাদেশী সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের স্বল্পকালীন (৬ মাস) সময়ের জন্য দেশে আমন্ত্রণ করে এনে এখানকার কম্পিউটার স্তরে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিলে তা খুবই ফলপ্রসু হবে।

৩.৯ দেশে শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের মধ্যে চাকুরিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মূল রচনা :

মুহম্মদ নুরুল হুদা

শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি

১. ভূমিকা

অদূর অতীতে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী দূরশিক্ষণ বা Distance Education-এর উত্থান ঘটেছে। ক্রমবর্ধমান শিক্ষা-চাহিদা যে সব ক্ষেত্রে সনাতন বা প্রচলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ করা প্রায় অসম্ভব, সে সব ক্ষেত্রে দূরশিক্ষণকে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসতে থাকে। দূরশিক্ষণে স্থানীয় প্রয়োজন ও আঞ্চলিক পরিবেশ প্রাধান্য পেতে থাকে। প্রথম যুগে দূরশিক্ষণের কাঠামো, আধেয় ইত্যাদিতে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। তবে এ পার্থক্য সত্ত্বেও দূরশিক্ষণের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কিছু সাধারণ মিলও ছিল।

২. দূরশিক্ষণ কি ?

দূরশিক্ষণ বা Distance Education (DE) বা Open and Distance Learning (ODL)-এর একক কোন সংজ্ঞার্থ নেই। তবে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো যে-শিক্ষাব্যবস্থায় থাকে, তাই দূরশিক্ষণ নামে পরিচিত।

ক. **শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিচ্ছিন্নতা :** দূরশিক্ষায় (DE বা ODL) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। এ বিচ্ছিন্নতা সময় ও স্থানের ক্ষেত্রে হতে পারে অথবা একই সঙ্গে উভয়ক্ষেত্রেই হতে পারে।

খ. **প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন (Institutional accreditation) :** দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে শিখনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমর্থিত ও অনুমোদিত হতে হয়। একজন স্বউদ্যোগেও লেখাপড়া করতে পারেন; কিন্তু তিনি দূরশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নন এজন্য যে তার প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ও অনুমোদন নেই।

গ. **মিশ্র যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার :** দূরশিক্ষায় বহু ও মিশ্র যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠচর্চা পরিচালিত হয়। মুদ্রিত বইপত্র ছাড়া রেডিও, টেলিভিশন সম্প্রচার, অডিও, ভিডিও, কম্পিউটার লার্নিং, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইল প্রভৃতির মাধ্যমে দূরশিক্ষা পরিচালিত হয়। তবে এগুলো ব্যবহারের পূর্বাহ্নে উদ্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য এর উপযোগিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তা ব্যবহারের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

ঘ. **দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ :** অডিও/ভিডিও সম্প্রচারে শিক্ষার্থী সাধারণভাবে নিস্ক্রিয় থাকে, যদিও শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক মতামত বিনিময়ের সুযোগ থাকে।

ঙ. অপরপক্ষে টিউটোরিয়াল সেশনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মুখোমুখি হন এবং এতে মতামত বিনিময়ের সুযোগ হয়।

চ. **শিল্প প্রক্রিয়ার ব্যবহার :** বৃহৎ শিল্প পরিচালনায় যেমন শ্রম বিভাজন (Division of labour) প্রয়োজন হয় তেমনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ও বিশাল আকারে DE বা ODL পরিচালনায় শ্রম বিভাজন প্রয়োজন এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মদক্ষ ব্যক্তির (দূরশিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, গ্রাফিক ডিজাইনার, প্রচারমাধ্যম বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি) সমাবেশ করতে হয়। সেজন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়ক জনশক্তি ও পাঠক্রম উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ দল প্রয়োজন।

৩. কেন দূরশিক্ষণ প্রয়োজন ?

- মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট-ছোট জনগোষ্ঠী অথবা যে সব স্থানে জনবসতি অত্যন্ত পাতলা বা যে সব দেশের ভৌগোলিক আকার বিরাট (যেমন : অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, উত্তর আমেরিকা) সে সব দেশের/স্থানের শিক্ষার্থীদের জন্য দূরশিক্ষণ অত্যন্ত উপযোগী।
- কর্মজীবী মানুষ যাঁদের কর্মস্থলে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থেকে সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব নয়, তাদের জন্য দূরশিক্ষণ অত্যন্ত উপযোগী।
- যাঁরা যথাসময়ে নানা কারণে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন নি, সে সব বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।
- স্কুল/কলেজের শিক্ষকবৃন্দের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য। দূরে নিজের কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করেই তাঁরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনমতো কাজে লাগাতে পারেন।

- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার সমস্যার প্রেক্ষাপটে দূরশিক্ষাপদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। যে বিশাল জনগোষ্ঠী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে না তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা যায়।

  সকল মানুষের জন্য কর্মের ক্ষেত্র অন্বেষণ করা এবং দূরশিক্ষার মাধ্যমে সে সকল কর্মের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উপযোগী করে তোলা সম্ভব। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সকল পেশার মানুষকে দূরশিক্ষার আওতায় আনা প্রয়োজন। সেটি সফল হলে সত্যিকার অর্থে দেশের মানুষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে। জনশক্তি উন্নয়নের প্রকল্পসমূহ আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। দূরশিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র দেশের মানুষকে অতি অল্প সময়ে কর্মক্ষম মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

- শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। জাতীয় জীবনে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হলে উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা যেমন প্রয়োজন তেমনি সেই শিক্ষাব্যবস্থার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার সর্বাধিক সুফল অর্জন করা দরকার। দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সর্বাধিক সুফল জনকল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে।
- মানুষের কর্মকুশলতা, জ্ঞান ও দক্ষতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঙ্গে প্রতিনিয়ত পরিচিতি রাখার মাধ্যম হতে পারে দূরশিক্ষা। অন্য কোন মাধ্যমে এটি সম্ভব নয়। তাই জ্ঞান ও দক্ষতাকে সব সময় সময়োপযোগী করতে হলে দূরশিক্ষা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সব বয়সের মানুষকে দূর শিক্ষার মাধ্যমে এমন সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব।
- যেহেতু বিশাল সংখ্যক ব্যক্তি স্বস্থান ত্যাগ না করে একসাথে দূরশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তাই এ ব্যবস্থায় মাথাপিছু ব্যয় হয় খুবই সামান্য।
- বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিশেষ পাঠক্রম প্রণয়ন করে শিক্ষাদান সম্ভব।
- জ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

এরকম আরও অনেক উদ্দেশ্য দূরশিক্ষণ দ্বারা সাধিত হতে পারে।

৪. দূরশিক্ষণের উদ্ভব ও বিকাশ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় "Boston Gazette"-এ একজন সর্টহ্যান্ড শিক্ষকের একটি বিজ্ঞপ্তি এ ভাবে প্রকাশিত হয় :

Any person who wishes to study shorthand may have several lessons sent him weekly and he would be as perfectly instructed as the person who lives in Boston। যাগাযোগের মাধ্যমে শর্টহ্যান্ডে শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি এ বিজ্ঞাপনটি পত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রথম লিপিবদ্ধ প্রমাণ।

সাঁটলিপির একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন পিটম্যান। তিনি ১৮৪০-এর দিকে সাঁটলিপি বিষয়ক কোর্স নিয়মিতভাবে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে দিতে থাকেন। এটি ছিল দ্বিমুখী যোগাযোগ। এর থেকেই আমেরিকা ও ইউরোপে ব্যাপকভাবে Correspondence কোর্সের প্রচলন হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই সুচারুরূপে দূরশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়। বিভিন্নধর্মী বিষয় এ সময়ই আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপে যোগাযোগের মাধ্যমে পঠন-পাঠন শুরু হয়। এ সময় থেকেই শিক্ষাবিদরা শিক্ষাদানের উপকরণ তৈরিতে এবং এগুলোর বিতরণে মনোযোগ দেন।

শিক্ষিত জনশক্তির অভাব পূরণের জন্য ১৯২০ থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে দূরশিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কোর্সের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নব নব কোর্স ডিজাইন ও কাঠামো তৈরি করা হয়। দূরশিক্ষায় কারিগরি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। খণ্ডকালীন correspondence course-এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স সম্পৃক্ত করা হয়। British Open University প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন ব্রিটেনে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করা হয়।

৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দূরশিক্ষণ কী ভূমিকা রাখতে পারে ?

- দেশের সকল মানুষকে সাক্ষর করা দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশের সকল নিরক্ষরকে সাক্ষর করা সম্ভব। দূরশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে এতে ব্যয়ও হবে অনেক কম।
- প্রতিটি মানুষকে যদি স্বাস্থ্যসচেতন করে তোলা যায় তাহলে রোগব্যাধি অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। স্বাস্থ্যবিধি না জানার ফলে সাধারণ মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়। সকল মানুষের জন্য দূরশিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।
- একইভাবে সাধারণ মনুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। পরিবেশ কি, কেন পরিবেশ রক্ষা প্রয়োজন এবং কীভাবে তা সম্ভব, এক কথায় পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত আধুনিক ধারণা দূরশিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া দেশের স্বার্থে প্রয়োজন।
- দূরশিক্ষার মাধ্যমে প্রাইমারি শিক্ষা স্বল্পতম ব্যয়ে প্রদান করা যায়। যে সব শিক্ষার্থী স্কুলে যেতে পারে না দূরশিক্ষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাদান সম্ভব।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির কয়েক লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্বল্পসময়ের মধ্যে ও স্বল্পব্যয়ে সাধারণ প্রশিক্ষণ ও বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, পরিবেশ, বিজ্ঞান) প্রশিক্ষণদান কেবলমাত্র দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব। অন্যদিকে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ের (বিশেষ করে ভাষা, গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান) পাঠদান করার ব্যবস্থা করলে কেবল যে শিক্ষার মান উন্নত হবে তাই নয়, এর ফলে গ্রাম ও শহরের স্কুলশিক্ষার বৈষম্য কমবে।
- দূরশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করাও সম্ভব।
- প্রাইমারি ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার হাজার হাজার সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সহজে প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে।
- শিক্ষা যেহেতু একটি অব্যাহত কার্যক্রম সেজন্য প্রতি ৬ মাস বা এক বছর শেষে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক সকল পর্যায়ের শিক্ষকের একটি সংক্ষিপ্ত টেনিং প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এটি যাঁরা বি.এড. সিএড ট্রেনিং করেছেন তাঁদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। ট্রেনিং দূরশিক্ষণের মাধ্যমে স্বল্পতম ব্যয়ে করা সম্ভব। এতে শিক্ষকদের নিজ বিষয়ে সর্বাধুনিক রাখা সম্ভব হবে।
- সমগ্র জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক করা অত্যন্ত জরুরি। বিজ্ঞানমনস্কতা জীবনকে সহজ ও সুন্দর করতে পারে। তাই দূরশিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধির প্রোগ্রাম পরিচালনা করা যেতে পারে।
- সারা দেশকে একটি জ্ঞাননির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ হিসাবে গড়ে তোলার এক মাধ্যম কম্পিউটার ও ইন্টারনেট। এ সবের ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ে যে ফল পাওয়া যাবে তা হবে সুদূরপ্রসারী।

৬. দূরশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো

এর জন্য প্রয়োজন দূরশিক্ষণের জন্য নিবেদিত (dedicated) একটি টি-ভি চ্যানেল। স্বভাবতই কিছু অবকাঠামোগত সুবিধা এবং একদল পরিকল্পনাকারী, শিক্ষক ও স্বল্পসংখ্যক সহায়ক জনশক্তি প্রয়োজন হবে। কিন্তু এ সবের জন্য যে ব্যয় হবে তার থেকে যে ফল (return) পাওয়া যাবে তা অনেকগুণ বেশি। দূরশিক্ষণের জন্য কিছু সহায়ক সেবা (Support Services) প্রয়োজন।

সহায়ক সেবা (Support Services) :

আনুষ্ঠানিক ক্লাশকক্ষ–শিক্ষার চাইতে দূরশিক্ষণের শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি সহায়ক সেবা প্রয়োজন। এর জন্য দূরশিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠানের একটি শক্ত, সুসংগঠিত প্রশাসনিক অবকাঠামো দরকার হয়। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত শিক্ষাদান ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রশাসনের কর্তব্য- শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন, শিক্ষাসামগ্রী শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছান, শিক্ষার্থী, টিউটরদের যাবতীয় রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ, শিক্ষার্থীদের মার্কস ও গ্রেড সংরক্ষণ এমন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয় প্রশাসনকে।

শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষাদান- অধিকাংশ দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি শিক্ষকদের থেকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সহায়তা পান। শিক্ষকরা খণ্ডকালীন অথবা সার্বক্ষণিক হতে পারেন। সপ্তাহে/পক্ষকালে একবার শিক্ষার্থীরা ক্লাশে যোগ দেন।

পরামর্শদান- টিউটরগণ কোর্স/প্রোগ্রাম সম্পর্কিত তথ্য শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করেন। লেখাপড়া সম্পর্কে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। পরামর্শদান মুখোমুখি, পত্র যোগাযোগ, টেলিযোগের মাধ্যমে হতে পারে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা পরামর্শদানের অন্যতম লক্ষ্য।

৭. বাংলাদেশে দূরশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

বাংলাদেশে দূরশিক্ষণের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এটি সরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণের পূর্বজ ধারা আছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন কোর্স ও ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এ সবের ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি স্কুল বা অনুষদ কাজ করছে। এগুলো হচ্ছে–ওপেন স্কুল, স্কুল অব এডুকেশন, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ, স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুর‍্যাল ডিভেলপমেন্ট, স্কুল অব বিজনেস।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতপক্ষে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ২ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি কোর্স দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলি কোর্স প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য খুবই উপযোগী।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য অবকাঠামোগত ব্যবস্থা যথেষ্ট বিস্তৃত, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অবকাঠামো

(১) প্রধান ক্যাম্পাস-বোর্ডবাজার, গাজীপুর;

(২) রিজিওনাল রিসোর্স সেন্টার- ১২টি;

(৩) লোকাল কো-অর্ডিনেটিং সেন্টার- ৮০টি;

(৪) টিউটোরিয়াল সেন্টারের সংখ্যা প্রায় ৭০০টি। সমগ্র দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর.আর.সি ও লোকাল কো-অর্ডিনেটিং সেন্টারগুলো কাজ করে। টিউটোরিয়াল সেন্টারে শিক্ষার্থীরা মাসে দুইদিন শিক্ষকের মুখোমুখি উপস্থিত হয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা পেয়ে থাকে;

(৫) স্কুল বা অনুষদের সংখ্যা ৬টি;

(৬) উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্যবৃন্দের দপ্তরসমূহ, ৬টি স্কুল, ১০টি সহায়তাকারী দপ্তর (Divisions) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাস গাজীপুরে অবস্থিত;

(৭) প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছাড়া আর যে বিভাগগুলো প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করে সেগুলো হচ্ছে–

   (ক) প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিং বিভাগ বা মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ;

   (খ) স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস বা শিক্ষার্থী সহায়তাদানকারী বিভাগ;

   (গ) পরীক্ষা বিভাগ;

   (ঘ) অর্থ বিভাগ;

প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিং বিভাগ (PPD) বই মুদ্রণ ও বিতরণ তদারকির কাজ করে থাকে। শিক্ষার্থীর হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এ বিভাগের। Student Support Service (SSS)-এর কাজ শিক্ষার্থী ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, টিউটোরিয়াল ক্লাশ অনুষ্ঠান, টিউটর নিয়োগ ইত্যাদি তদারক করা এবং পরীক্ষাসংক্রান্ত সমুদয় দায়দায়িত্ব বহন করে পরীক্ষা বিভাগ।

প্রকৃতপক্ষে অবকাঠামো বিচারে এ বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায় যদিও প্রশাসনিক সমস্যা কিছু রয়েছে। এ সব সমস্যা কিছু উদ্যোগ নিলেই সমাধান করা যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অব্যবহৃত অবকাঠামো ব্যবহার করে দূরশিক্ষণের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

৮. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় : বর্তমান অবস্থা ও সমস্যাবলি

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ লক্ষের বেশি। তাছাড়া সমগ্র দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিব্যাপ্ত হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কাজ পরিচালনা একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যাগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়–

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা অরও উন্নত হওয়ার অবকাশ আছে। দূরশিক্ষণ পরিচালনার জন্য যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল কর্মীবাহিনীর (উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, ও তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৮০০) মধ্যে এখনও তার অভাব আছে।

খ. মূল ক্যাম্পাসের সঙ্গে ১২টি আর আর সি. ৮০টি লোকাল কো-অর্ডিনেটিং সেন্টারের যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। প্রযুক্তি নির্ভরতা যেখানে সমস্যা কমিয়ে আনতে পারে সেক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার এ ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে।

গ. সময়মতো শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছে না। আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর মুদ্রণ ব্যবস্থায় এটি কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু বই মুদ্রণের প্রক্রিয়া বেশ দীর্ঘ। যদিও ছাপাখানা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত তবুও অনেক সময়ই তারা মানসম্মত নয় এবং এগুলো সময়মত বই সরবরাহ করতে পারে না। ফলে বই মুদ্রণে দেরি হয় এবং প্রোগ্রাম বিপর্যস্ত হয়।

ঘ. ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, টিউটোরিয়াল ক্লাশ পরিচালনা, টিউটর নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে।

ঙ. শিক্ষার্থীদের বইপুস্তক প্রদান ছাড়া Audio/Video সহায়তা দেবার কথা। বিটিভিতে ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। কিন্তু নতুন অনুষ্ঠান রেকর্ডের পরিমাণ খুবই কম। সম্প্রসারিত সুযোগ-সুবিধা থাকলেও মিডিয়া বিভাগের যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি অব্যবহৃত থাকছে।

চ. পরীক্ষা বিভাগের কর্মকাণ্ড প্রায়ই ধীরগতিসম্পন্ন। এখানে এখন পর্যন্ত প্রয়োজনমাফিক পর্যাপ্ত ও কার্যক্ষম Software ব্যবহৃত হয় না। প্রচলিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের উদ্যমের এখানে ঘাটতি রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে সময়মতো কখনও ফলাফল প্রকাশিত হয় নি। ফলাফল প্রকাশে দেরি হওয়ার কারণে সেশন জ্যাম তৈরি হচ্ছে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে শিক্ষার্থীরা পাশ করে প্রচলিত ব্যবস্থার অধীন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সময়াভাবে ভর্তি হতে পারে না।

ছ. বিভিন্নক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

৯. সম্ভাব্য সমাধান

(ক) দূরশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় জড়িত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) দূরশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একদল উপযুক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তা তৈরি করা প্রয়োজন। সকলকে বিদেশে পাঠিয়ে ট্রেনিং দেওয়া ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার তাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এতদসংক্রান্ত একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

(গ) মূল ক্যাম্পাসের সঙ্গে আর আর সি এবং এল সি ও গুলোর আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত করা। টিসি (টিউটোরিয়াল সেন্টার) গুলো যাতে সহজে আর আর সি এবং এল সি ও এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

(ঘ) শিক্ষার্থীর হাতে সঠিক সময়ে বই তুলে দেবার জন্য টেণ্ডার, আর্থিক ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা প্রয়োজন এবং এতে যেন সময়ক্ষেপণ না হয় তার ব্যবস্থা করা।

উন্নত প্রেসের সাহায্যে স্বল্পতম সময়ে মুদ্রণ কাজ শেষ করা। বিতরণের ব্যবস্থা উন্নত করা। বর্তমানে ডাকঘরের মাধ্যমে প্রতিটি টিসিতে বই পাঠানোর পরিবর্তে সরাসরি ট্রাকে করে আর আর সি-তে বই পাঠালে সময় অনেক বেঁচে যায়। প্রয়োজনে আর আর সি-তে বইয়ের একটি আপৎকালীন স্টক গড়ে তোলা যায়।

(ঙ) সঠিক সময়ে ফলাফল প্রকাশের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার খাতা মূল ক্যাম্পাসে না নিয়ে এসে প্রতিটি আর আর সি-তে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করে Fax যোগে পরীক্ষা বিভাগে নম্বর পাঠানো যায়। এতে ২/৩ দিনের মধ্যেই একটি বিষয়ের সমুদয় খাতা মূল্যায়ন করা যায়। এভাবে শেষ পরীক্ষার ৭ দিনের মধ্যে নম্বর একত্র করে ফলাফল প্রকাশ করা যায়। এ ধরনের আরও উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া ব্যবহার করা সম্ভব।

(চ) অডিও/ভিডিওর ব্যবহার নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র চ্যানেল ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া।

(ছ) আর আর সি এবং এল সিও গুলোকে আরও কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া (যেমন-সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠাগার, ভিডিও ক্যাসেট দেখার ব্যবস্থা, টেলি কনফারেন্সিং ব্যবস্থা ইত্যাদি)।

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু সমাজ/রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম প্রবর্তন করে সেহেতু নতুন নতুন প্রোগ্রাম প্রবর্তন করা প্রয়োজন এবং যে প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে অকার্যকর (রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে) সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া জরুরি।

(ঝ) অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামগুলো কার্যকরভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

(ঞ) একটি টি-ভি চ্যানেল কেবলমাত্র দূরশিক্ষণের জন্য নিবেদিত (dedicated) রাখার ব্যবস্থা করলে একসাথে সারাদেশে একই প্রোগ্রাম চালানো যেতে পারে।

(ট) বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে ই-মেইল যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন, তাহলে শিক্ষার্থীরা অনেক উৎসাহ পাবে।

বস্তুত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবকাঠামো রয়েছে তা এখানে-ওখানে খানিকটে সংস্কার করে দূরশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও উন্নত করা সম্ভব।

মূল রচনা :

প্রফেসর মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা

১.০ শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

'গ্রন্থাগার' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। গ্রন্থাগার জ্ঞান ও তথ্যসম্পদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্যের সংগে এক ও অভিন্ন। তাই প্রত্যেক দেশেই স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গ্রন্থাগার স্থাপনের বিষয়টিও একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে নেওয়া হয়।

উন্নত ও অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ মানের গ্রন্থাগার স্থাপন ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা কল্পনাও করা যায় না। এসব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলোকে শিক্ষা কর্মসূচি, শিক্ষাদান ও শিখন পদ্ধতির (Teaching and learning methods) সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন (relationship) করে শিক্ষার গুণগত মান সুনিশ্চিত করা হয়। তারা গ্রন্থাগার-স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি একাডেমিক অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

একটি দেশের নাগরিকদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমেই রিডিং সোসাইটি গড়ে ওঠে। পাঠাভ্যাস ও জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে আছে নিবিড় সম্পর্ক। একটি দেশের অবকাঠামোর উন্নয়ন দৃশ্যমান, পাঠাভ্যাসের ফলে জাতীয় যে উন্নয়ন ঘটে সেটা অদৃশ্যমান, কিন্তু উপলব্ধি করা যায়। ব্যাপক পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে জাতির মন ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে এবং এর প্রতিফলন ঘটে সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণার কর্মপ্রবাহে। বর্তমান যুগ জ্ঞান ও তথ্য বিস্ফোরণের যুগ। গ্রন্থ বা তথ্য সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হয় দেশের নাগরিকদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বিকাশের মাধ্যমে। পাঠাভ্যাস গড়ে উঠলে রিডিং সোসাইটি গড়ে ওঠে। আর এই পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ও শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগার সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আজকাল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্কুলে 'Developmental reading' একটি বিষয় হিসেবে পাঠ দেওয়া হয়ে থাকে। এসব দেশে 'Teaching of Reading'-এর উপর অজস্র বইও প্রকাশিত হয়। তাদের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের মতো Teacher Librarian নিয়োগ করা হয়। এসব স্কুলের গ্রন্থাগারিকগণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস সৃষ্টির জন্য নানা ধরনের রেফারেন্স পুস্তকাদির ব্যবহারসহ 'Reading, Writing'-এর কলাকৌশল শিখানোর মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একজন সচেতন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। শিক্ষার্থী স্কুল হতেই অভিধান, বিশ্বকোষসহ নানাপ্রকার রেফারেন্স বই ব্যবহার করতে শিখে, শিখে এ্যাসাইনমেন্ট, টার্ম-পেপার রচনার কলাকৌশল। এছাড়া প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন এ্যাসাইনমেন্ট, প্রজেক্ট দিয়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সংগে যোগসূত্র স্থাপন করে থাকেন। বলা হয়ে থাকে একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে পড়তে শিখে (Learning to Read); কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে একজন শিক্ষার্থী শেখার জন্য পড়ে (Reading to Learn)। এ স্তরে প্রতিটি শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বিশ্ব-জ্ঞানরাজ্যের সাথে পরিচিতি লাভ করতে থাকবে এবং এর চরম বিকাশ ঘটবে উচ্চ শিক্ষা স্তরে। এরূপ গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ফলে দেশ পায় ভাল শিক্ষক, নেতা, বিজ্ঞানী, গবেষক, ধর্মীয় চিন্তাবিদ বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। এজন্যই বলা হয়ে থাকে- 'Teacher should lead their students beyond the contents of their textbooks। শিক্ষার অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ। এ কাজটি স্কুল থেকেই শুরু হবে, আর এটা সম্ভব পাঠ্যপুস্তক সংশ্লিষ্ট ও বহির্ভূত গ্রন্থাগারে সংগৃহীত অসংখ্য পুস্তকাদি পঠন-পাঠনের মাধ্যমে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর উচ্চশিক্ষা স্তর। উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সেক্টর ও সাব সেক্টরের জন্য বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি, নেতৃত্ব সৃষ্টি ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টিই প্রধানতম। উচ্চ শিক্ষার এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও তথ্য সেবার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ভূমিকা পালন করে থাকে। উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান অর্জন আধুনিক ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণে নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন নয়, যদি সত্যিকার অর্থে আধুনিক গ্রন্থাগার সেবা সুনিশ্চিত করা না যায়। একটি নতুন বিভাগ স্থাপন না করলে শিক্ষা কার্যক্রমের কোনই ক্ষতি হবে না, কিন্তু ক্ষতি হবে যদি গ্রন্থাগার সার্ভিসকে বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনাকে অবহেলা করা হয় বা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২.০ বাংলাদেশ শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও সমস্যাবলি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রন্থাগারকে বলা হয়ে থাকে "Library is an institute in an institute" একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, পরিকল্পনা, দক্ষ জনশক্তি, অর্থ, দ্রব্য-সামগ্রী (man, material, money)। এটা গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাধীন পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলোর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যাগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করবো।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে হলে গ্রন্থাগারগুলোকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভাজন করা যায়। এগুলো হচ্ছে– প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে গ্রন্থাগার, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে গ্রন্থাগার, কলেজ শিক্ষা পর্যায়ে গ্রন্থাগার, মাদ্রাসা শিক্ষায় গ্রন্থাগার, কারিগরি শিক্ষায় গ্রন্থাগার, বিশেষায়িত ও শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

২.১ প্রাথমিক শিক্ষায় গ্রন্থাগার

প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

আমরা উপরে বলেছি যে একজন শিক্ষার্থীর পাঠ্য বইয়ের সাথে সাথে পাঠ্যপুস্তক সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য রেফারেন্স বই যেমন অভিধান, বিশ্বকোষ বিশেষ করে শিশু বিশ্বকোষ, ইত্যাদির সাথে পরিচয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে শিক্ষকদের জন্য নতুন নতুন বই-পুস্তক প্রয়োজন, বিশেষ করে শিক্ষাদান ও শিখন পদ্ধতি, শিক্ষাক্রমসহ শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকার অনুবিধি (provision) নেই। আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে আগামী এক দশক/দুই দশকের মধ্যেও গ্রন্থাগারের জন্য একটি কক্ষ (শ্রেণীকক্ষের সমান), আসবাবপত্র, একজন গ্রন্থাগারিক দেওয়া সম্ভব হবে না হয়তো বা। অথচ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বইপুস্তকের সঙ্গে পরিচয় ও শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও শিখনের নানা উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ছোট একটি গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। এমতাবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কীভাবে গ্রন্থাগার সেবা সৃষ্টি করা যায় সে সম্পর্কে কৌশল উদ্ভাবন জরুরি।

প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট(পিটিআই) গ্রন্থাগার

বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৩টি সরকারি ও ১টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরি ও প্রাথমিক শিক্ষায় কর্ম-গবেষণা (Action-research) করা পিটিআইগুলোর দায়িত্ব। শিক্ষক/শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের শিক্ষাদান ও কর্মগবেষণায় সহায়তা করার জন্য সরকারের প্রতিটি পিটিআই-এ গ্রন্থাগার পরিচালনার অনুবিধি (provision) রয়েছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগার-এর জন্য একজন সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বেশিরভাগ পিটিআই-এ গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা একটি করে কক্ষও আছে।

পিটিআইগুলো দেশের উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের সমমানের। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোর সহকারী গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রমের চেয়ে পিটিআইগুলোর সহকারী গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম নিম্ন হওয়ায় গ্রন্থাগারকর্মীরা পিটিআই গ্রন্থাগারে চাকুরি করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে এখানে ৮০% পদ শূন্য। এ ছাড়া গ্রন্থাগারগুলোতে আছে স্থানাভাব ও আসবাবপত্রের অভাব। কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাবে পুস্তকাদির ক্যাটালগও হয় নি।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) গ্রন্থাগার

প্রাথমিক শিক্ষক, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (NAPE)", ময়মনসিংহ ১৯৭৬ সাল হতে কাজ করছে। এই জাতীয় একাডেমীতে একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। এই গ্রন্থাগারে সমস্যা স্থান, আসবাবপত্র ও ইকুইপমেন্টের অপ্রতুলতা। জাতীয় একাডেমী হলেও গ্রন্থাগারে এখনও ইন্টারনেট সংযোগ নেই। গ্রন্থাগারে কোন দেশী-বিদেশী শিক্ষা জার্নালও সংগ্রহ করা হয় না। প্রতিষ্ঠানের বাজেটে বই-পুস্তকাদির জন্য কোন আলাদা খাতও নেই। প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় মর্যাদা পেলেও গ্রন্থাগারটি সে মর্যাদা পায় নি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গ্রন্থাগার

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই অধিদপ্তরে প্রায় শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকর্তারা কাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে গ্রন্থাগার স্থান পায় নি। তবে জনবল কাঠামোতে একটি তৃতীয় শ্রেণীর ডকুমেন্টেশন অফিসারের পদ আছে। আমাদের জানামতে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী গ্রন্থাগারে বর্তমানে কর্মরত নেই।

অধিদপ্তরটি বিশাল ক্যাম্পাসে অবস্থিত হলেও কর্তৃপক্ষ নিচতলার একটি খুবই ছোট কক্ষে ঠাসাঠাসি করে কিছু বই ও রিপোর্ট মজুদ রেখেছে। এটাই অধিদপ্তরের গ্রন্থাগার হিসেবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে সংস্থাটিতে কোন গ্রন্থাগার সার্ভিস নেই।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রন্থাগার

প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষায় নীতিনির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদির কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এখানে ছোট একটি কক্ষে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে যা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। গ্রন্থাগারে আছে একজন গ্রন্থাগারিক (প্রথম শ্রেণী), কিন্তু আর কোন গ্রন্থাগার কর্মী নেই, নেই ইন্টারনেট সংযোগ ও কম্পিউটারের সুযোগ-সুবিধা। বইপুস্তক ক্রয়ের জন্য কোন বাজেটও নেই।

২.২ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে গ্রন্থাগার

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বর্তমানে বাংলাদেশে ১৬১৬৬ (ব্যানবেইস-২০০১) বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। কোন সময়েই বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রকৃত অর্থে গ্রন্থাগার স্থাপনের অনুবিধি (Provision) ছিল না। তবে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করেন মাত্র। মাঝে মাঝে সরকারি অর্থে বইপুস্তক সংগ্রহ করে স্কুলে বিতরণও করা হয়ে থাকে। আবার কোন সময় বই ক্রয়ের জন্য অর্থও বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বইগুলো প্রধান শিক্ষকের কক্ষে কিংবা শিক্ষকদের বসার কক্ষে ২/৪টি আলমারীতে ঠাসাঠাসি করে সংরক্ষণ করে থাকেন। এই হলো স্কুল গ্রন্থাগারের চিত্র। অক্টোবর ১৯৯৫ সালে বেসরকারি স্কুলের জনবল কাঠামোতে (Staffing Pattern) সহকারী শিক্ষকের মর্যাদায় ৩৪০০/- বেতনক্রমে ১টি করে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু পদগুলো পূরণের জন্য মাউশি কিংবা মন্ত্রণালয় হতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি বিধায় কাজীর গরু কেতাবেই রয়ে গেছে।

মাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১৯৮৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগার কর্মীর পদ ছিল। ১৯৮৩ সালে পদগুলো বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখন কোন গ্রন্থাগার সেবা নেই।

মাধ্যমিক স্তরে মাদ্রাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার

আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরে দাখিল মাদরাসায় গ্রন্থাগার স্থাপনের কোন বিধি (Provision)নেই। যদিও মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়নের সময় নামে মাত্র তিনশত কিংবা ততোধিক বই কেনার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুরূহ। মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে সরকারি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (১৩টি), সরকারি টেক্সটাইল ভোকেশনাল সেন্টার (২৮টি), বেসরকারি এসএসসি ভোকেশনাল স্কুল (৮০১টি)। শুধু টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে গ্রন্থাগার ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার নেই। উল্লেখ্য যে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের গ্রন্থাগারকর্মীর বেতনক্রম নিম্নতর।

২.৩ কলেজ শিক্ষায় গ্রন্থাগার

আমাদের দেশের কলেজগুলোকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ (সাধারণ ও ক্যাডেট), ডিগ্রি কলেজ, অনার্স কলেজ ও মাস্টার্স কলেজ–এই চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আবার পরিচালনার দিক দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি কলেজ–এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়াও রয়েছে এই স্তরে কিছুসংখ্যক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ গ্রন্থাগার

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪৭৪টি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ রয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে গ্রন্থাগার ও একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগারিক থাকার প্রবিধি রয়েছে। উল্লেখ্য স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান) হলে বেতনক্রম ৩৪০০/- (পদবি হবে সহকারী গ্রন্থাগারিক) এবং স্নাতকোত্তর (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান) হলে বেতনক্রম টা ৪৩০০/-(প্রভাষক সমতুল্য পদবি হবে গ্রন্থাগারিক)। কিন্তু বর্তমানে প্রায় ৭০% কলেজে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগারিক নেই। প্রায় কলেজেই নেই গ্রন্থাগারের জন্য কোন ভবন/কক্ষ, আসবাবপত্র এবং প্রয়োজনীয় সংগ্রহ, গ্রন্থাগারের জন্য সরকারি বরাদ্দ নেই বললেই চলে। কলেজ কর্তৃপক্ষের বাজেট নগণ্য ও অনিয়মিত।

বেসরকারি ডিগ্রি (পাস/অনার্স) এবং মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজ গ্রন্থাগার

বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে বর্তমানে ৭২৬টি ডিগ্রি (পাস) কলেজ, ২০টি ডিগ্রি (অনার্স) এবং ৪০টি মাস্টার্স কলেজ রয়েছে। এই কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণাধীন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক প্রত্যেকটি কলেজে গ্রন্থাগার থাকা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক থাকার অনুবিধি রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৫০% কলেজে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের ক্যাটেগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের করা হয় নি। অথচ ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটরদের (বেতনক্রম ৩৪০০/-) শিক্ষকদের ক্যাটেগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (অথচ একই বেতনক্রমের সহকারী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক ক্যাটেগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতে উল্লিখিত গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সরকারি নিয়োগবিধিতে যোগ্যতার মধ্যে বিদ্যমান ভিন্নতা একটি সমস্যা। কোন ডিগ্রি বা অনার্স কলেজেই শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বইপুস্তক নেই। বইগুলো ক্যাটালগহীন, কারণ কোন কলেজেই কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র গ্রন্থাগারের জন্য সংগ্রহ করেন নি। তাছাড়া আছে পর্যাপ্ত পাঠকক্ষের অভাব, আসবাবপত্রের অভাব ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা হলো কলেজগুলোর ক্যাটেগরি অনুযায়ী (পাস/অনার্স/মাস্টার্স) গ্রন্থাগারে জনবল কাঠামো প্রণীত হয় নি। কোন গ্রন্থাগারেই গ্রন্থাগারকর্মীর (৩য় শ্রেণী ও ৪র্থ শ্রেণী) পদ নেই।

সিনিয়র মাদরাসায় গ্রন্থাগার

দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০৮৭টি আলিম মাদরাসা, ১০২৯টি ফাজিল মাদরাসা এবং ১৪১টি কামিল মাদরাসা আছে। সরকারি বিধি অনুযায়ী আলিম মাদরাসায় গ্রন্থাগার থাকার কোন অনুবিধি (Provision)নেই। তবে সিনিয়র মাদরাসা অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল মাদরাসায় গ্রন্থাগার স্থাপনের অনুবিধি রয়েছে। বর্তমানে ৯৫% সিনিয়র মাদরাসায় উপযুক্ত পেশাদারী গ্রন্থাগারকর্মী নেই। শিক্ষাক্রম সংশ্লিষ্ট বইপুস্তকাদির যথেষ্ট অভাবও রয়েছে। গ্রন্থাগারের জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ নেই। আছে স্থানাভাব ও আসবাবপত্রের স্বল্পতা।

সরকারি কলেজ গ্রন্থাগার

বর্তমানে (ব্যানবেইস-২০০১) বাংলাদেশে ১১টি সরকারি উচ্চমাধ্যমিক কলেজ, ১৪২টি ডিগ্রি (পাস) কলেজ, ৫৫টি ডিগ্রি (অনার্স) কলেজ এবং ৪৩টি মাস্টার্স কলেজ আছে। ১৯৪৭ সনে ৪টি সরকারি কলেজ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে সরকারি কলেজের সংখ্যা ২৫১টি। ১৯৮৩ সালে Martial Law Committee on Organizational Setup ১১৮টি কলেজে (১০৫টি সাধারণ কলেজ, ১টি আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস কলেজ, ২টি আলিয়া মাদ্রাসা ও ১০টি টিটিসিসহ) প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকের পদ ১১৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ ১১৯টি এবং ২টি করে স্কিল্ড বেয়ারারের পদ সৃষ্টি করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মাউশি/শিক্ষা মন্ত্রণালয় পদগুলো পূরণের জন্য কোন উদ্যোগই গ্রহণ করে নি। শুধু কলেজ জাতীয়করণের সময় ২০ জন প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারিক ছিল। এছাড়া বাকি ১৩৫টি কলেজে এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগারের জন্য জনবল কাঠামো ঘোষণা করা হয় নি বা পদ সৃষ্টি করা হয় নি। জাতীয়করণের সময় কিছু বেসরকারি কলেজে গ্রন্থাগারকর্মী ছিল (বিভিন্ন পদবিতে বিভিন্ন বেতনক্রমে, বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতায়), তারা কলেজে আছে।

প্রায় ৮০% সরকারি কলেজে আলাদা কোন গ্রন্থাগার ভবন নেই, বাজেট অপ্রতুল, গ্রন্থাগার উপযোগী আসবাবপত্র নেই, ইন্টারনেট সংযোগ তো দূরের কথা। এছাড়া আরও বড় সমস্যা হলো গ্রন্থাগারিকদের সারা জীবনে পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০০ সনের বিধিতে গ্রন্থাগারিক (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড), সহকারী গ্রন্থাগারিকদের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বেতন পাচ্ছেন গেজেটেড অফিসার হিসেবে, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের দিচ্ছেন কর্মচারীর মর্যাদা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি বিধি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতে ভিন্নতা রয়েছে।

ক্যাডেট কলেজ গ্রন্থাগার

সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে ১০টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। এই কলেজগুলোর গ্রন্থাগারের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে গ্রন্থাগারিকের পদোন্নতির ব্যবস্থা নেই।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর গ্রন্থাগার

ঢাকাস্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। দেশের এসব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য সহকারী অধ্যাপক সমতুল্য একটি Library Development Officer (LDO) এর পদ রয়েছে। পদটি প্রায় এক দশক ধরে শূন্য। LDO-এর দায়িত্ব হলো অধিদপ্তরে একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা করা এবং দেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসার গ্রন্থাগারগুলো তত্ত্বাবধান করা।

২.৪ কারিগরি শিক্ষায় গ্রন্থাগার

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রয়েছে ২০টি সরকারি ও ৭টি বেসরকারি পলিকেটনিক ইনস্টিটিউট। সরকারিগুলোতে সরকারি কলেজের মতো গ্রন্থাগারিক-১, সহকারী গ্রন্থাগারিক-১, বুক-সটার-২ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি কলেজের মতো বেতনক্রম দেওয়া হয় নি। তাছাড়া গ্রন্থাগারগুলোর জন্য নিয়মিত বাজেট নেই। স্থান সমস্যা আছে। গ্রন্থাগারগুলোতে ক্যাটালগও শ্রেণীকরণের সিস্টেম নেই। ৫০% গ্রন্থাগারে পদ শূন্য।

এছাড়া ১৬টি সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে গ্রন্থাগার থাকার বিধি রয়েছে। এগুলোতে গ্রন্থাগারিকের পদ-১টি, সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ-১টি রয়েছে। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতনক্রম নিম্নতর। প্রায় বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই পদগুলো শূন্য। এর পাশাপাশি রয়েছে ঢাকায় ১টি গ্লাস সিরামিক ইনস্টিটিউট, এবং একটি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট। এদুটি প্রতিষ্ঠানেও গ্রন্থাগার আছে–আছে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকের পদ ও ৪র্থ শ্রেণীর একটি বুক সর্টারের পদ। গ্রন্থাগারগুলোতে সংগ্রহ খুবই অপর্যাপ্ত, ক্যাটালগ হয় নি। আছে স্থানাভাবও। ইন্টারনেট সংযোগ নেই।

উল্লেখ্য উপরের প্রতিষ্ঠানগুলো এসএসসির পর ২-৪ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এগুলোর মর্যাদা সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোর চেয়ে উচ্চ। কিন্তু গ্রন্থাগারকে সেভাবে দেখা হয় নি।

এছাড়া রয়েছে ঢাকায় ১টি কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি এবং ১টি কলেজ অব লেদার টেকনোলজি। কলেজ দুটো ডিগ্রি দিচ্ছে। এখানে গ্রন্থাগার রয়েছে। এখানে ৩য় শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকের পদ-১টি, সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ-১টি ও ১টি এম.এল.এস.এস-এর পদ রয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থাগার দুটোকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের গ্রন্থাগারের মর্যাদাও দেওয়া হয় নি। গ্রন্থাগারগুলোতে সংগ্রহ অপ্রতুল, কোন আন্তর্জাতিক জার্নাল সংগ্রহ করা হয় না। ক্যাটালগ ছাড়াই গ্রন্থাগারগুলো চলছে। স্থান সমস্যা, আসবাব সমস্যা আছে। গ্রন্থাগারকর্মীদের পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৫৫টি বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট রয়েছে। সরকার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার স্থাপনের অনুবিধি রেখেছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সহকারী গ্রন্থাগারিক পদও সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু পদগুলোর বেতনক্রম ও মর্যাদা সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হতে নিম্ন। ৮০% পদ শূন্য। প্রকৃত বিবেচনায় এসব প্রতিষ্ঠানে কোন গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে নি।

২.৫ মেডিকেল শিক্ষা ও শিক্ষা সেবাদানে গ্রন্থাগার

বর্তমানে বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৩টি সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ১টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ, ১টি সরকারি নার্সিং কলেজ, ১টি সরকারি হোমিওপ্যাথি কলেজ, ২টি সরকারি আয়ুর্বেদিক কলেজ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৩৮টি সরকারি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। সরকারি প্রতিটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকার বিধি রয়েছে। তবে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ও মর্যাদা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর সমতুল্য। অর্থাৎ এগুলোকে সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ গ্রন্থাগারের মর্যাদাও দেওয়া হয় নি। কোন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়েই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর কোন আন্তর্জাতিক জার্নাল রাখা হয় না। এছাড়াও রয়েছে বই-পুস্তকের দারুণ অভাব, আছে স্থান সমস্যা। কোন মেডিক্যাল কলেজ গ্রন্থাগারেই ইন্টারনেট সেবা নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি হলেও এর গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা সেকেলে। নিম্ন বেতনক্রমের কারণে উচ্চ শিক্ষিত গ্রন্থাগারকর্মীরা এ সব প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতে আগ্রহী হয় না। গ্রন্থাগারে বাজেট বরাদ্দ উল্লেখ করার মতো নয়। নার্সিং কলেজে রয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর একটি সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ। এই প্রতিষ্ঠানেও গ্রন্থাগারের অবস্থা আরও খারাপ।

ন্যাশনাল হেলথ্ লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার (NHLDC) স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তরাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এই গ্রন্থাগারে মোট ৩৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ভিত্তিতে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে Medical Information System গড়ে তোলা এবং NHLDC জাতীয় Focal Point হিসেবে কাজ করা এবং আন্তর্জাতিক Health Information System সংগে সহযোগিতা করা। এতসব

উদ্দেশ্য থাকলেও NHLDC সেন্টারটি সেভাবে গড়ে তোলা হয় নি। এই জাতীয় গ্রন্থাগারটির সংগ্রহ এখনো বিশ হাজারের অধিক হবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক জার্নাল রাখা হয় না। কোন Medical Abstract বের করা হয় না। তাছাড়া রয়েছে বাজেটের অপ্রতুলতা। প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক কাঠামো খুবই দুর্বল। কর্মকর্তাদের পদের সংখ্যা খুবই কম এবং বেতনক্রম নিম্ন। এই গ্রন্থাগারটি অন্যান্য উন্নত কিংবা অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশের মেডিক্যাল গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়।

এছাড়া Institute of Diseases of the Chest Hospital, Rehabilitation Institute and Hospital for the Disabled, -এই প্রতিষ্ঠান গুলো হাসপাতাল পরিচালনার পাশাপাশি উচ্চতর চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজ করে থাকে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক স্টাফ রয়েছে। এজন্য এসব প্রতিষ্ঠানে একটি করে গ্রন্থাগার পরিচালনার বিধি রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলোর জনবল কাঠামো, বেতনক্রম ও মর্যাদা ক্রুটিপূর্ণ এবং স্থান ও আসবাবপত্রের যথেষ্ট অপ্রতুলতা বিদ্যমান। গবেষণা কার্যক্রম থাকলেও গ্রন্থাগারগুলোতে ইন্টারনেটের কোন ব্যবস্থা নেই।

অন্যদিকে Institute of Public Health, Institute of Cardiovascular, Diseases Institute of Ophthalmology, Institute of Public Health, Nutrition, Food Science প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন গ্রন্থাগার নেই। নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোতেও কোন গ্রন্থাগার স্থাপনের বিধি নেই।

২.৬ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বর্তমানে দেশে ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এই দু'ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর বর্তমান অবস্থা নিম্নে বিধৃত হলো :

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রত্যেকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে গ্রন্থাগার স্থাপনের বিধান রয়েছে। ফলে প্রত্যেকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টগুলোতে গ্রন্থাগারিককে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য। ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মধ্যে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৬টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, জনবল কাঠামো, সংগ্রহ ও সামগ্রিক গুণগত বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবস্থা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক ভাল। তবে সমস্যাও কম নয়। ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অন্যান্য ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মতো ভৌত অবকাঠামো, লোকবল, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সুবিধাদি ঐসব গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত নেই। বর্তমানে ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ) গ্রন্থাগারিকের পদে পেশায় প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক রয়েছে। বাকী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা নামে সাময়িক পদ সৃষ্টি করে কোন প্রফেসরকে বসিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। এছাড়া ICT যুগে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই তাদের সংগ্রহকে কম্পিউটারাইজড করতে পারে নি। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই ইন্টারনেট সংযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন পর্যন্ত ইউনিয়ন ক্যাটালগও তৈরি করতে পারে নি কিংবা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারভিত্তিক Information system গড়ে তুলতে পারে নি। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক জার্নালের সংগ্রহ খুবই কম। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নাল সংগ্রহ নেই (নতুনগুলোতে)। এছাড়া এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জনবল কাঠামো (Staffing Pattern) এক এক রকমের। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ইনস্টিটিউট আছে। এই ইনস্টিটিউটগুলোর গ্রন্থাগারে জনবল কাঠামোতে ভিন্নতা আরও বেশি। গ্রন্থাগারের সরকারি বাজেট বরাদ্দ ও নিজস্ব সম্পদ আহরণেও কোন একক মান নেই। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে সেমিনার গ্রন্থাগার আছে–অনেক বিভাগে কোন গ্রন্থাগার সহকারী নেই।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রচেষ্টা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্ব পায় নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাড়া করা বাড়িতে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগার ছোট একটি কক্ষে কেরানি পদমর্যাদার গ্রন্থাগার কর্মী দিয়ে পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯৯২-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার ক্যাটেগরিতে গ্রন্থাগারিকের কোন পদ নেই (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টে গ্রন্থাগারিকের পদের সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে) এবং গ্রন্থাগার স্থাপন/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন কথারই উল্লেখ নেই। সম্ভবত এই কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপনে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

২.৭ শিক্ষায় বিশেষ/গবেষণা গ্রন্থাগার

উপরিউক্ত গ্রন্থাগারগুলো ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বেশকিছু বিশেষ/গবেষণা গ্রন্থাগার রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যানবেইস গ্রন্থাগার, নায়েম গ্রন্থাগার, এনসিটিবি গ্রন্থাগার, ইউজিসি গ্রন্থাগার এবং বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড গুলোর গ্রন্থাগার।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) গ্রন্থাগার

বাংলাদেশে ১৯৭৭ সনের পূর্বে শিক্ষা তথ্য ও শিক্ষা পরিসংখ্যান সরবরাহ করার জন্য আলাদা কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৯৭৭ সালে উক্ত দুটি ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সরকার ব্যানবেইস প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের শিক্ষার গ্রন্থাগারগুলো (Educational library) নিয়ে একটি National Educational Information system (NATEIS) গড়ে তোলা এবং পরিসংখ্যানের জন্য Educational Management Information system (EMIS) সৃষ্টি করা। কিন্তু EMIS উন্নয়ন প্রচেষ্টা থাকলেও গ্রন্থাগারভিত্তিক নেটওয়ার্ক NATEIS গড়ে তোলার কোন উদ্যোগই নেওয়া হয় নি। শিক্ষা বিভাগের গ্রন্থাগারের সবচেয়ে ভাল জনবল কাঠামো (Staffing Pattern) আছে ব্যানবেইসে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও পরিকল্পনা না থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানটি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সাফল্য দেখাতে পারে নি। বর্তমানে গ্রন্থাগারটির সংগ্রহ প্রায় ২৩৫০০। এখানে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞের পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। অপরদিকে সিনিয়র পর্যায়ে দুটি পদে নন-প্রফেসনাল নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষাবিষয়ক কোন আন্তর্জাতিক জার্নাল সংগ্রহ করা হয় না। বাজেট-ও অপ্রতুল। গ্রন্থাগারটির এখনও কম্পিউটারায়ন করা হয় নি।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) গ্রন্থাগার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট নায়েম-এর গ্রন্থাগারটি ১৯৫৯ সনে স্থাপিত হয়। বর্তমানে সংগ্রহ সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০। গ্রন্থাগারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় জ্ঞান ও তথ্যসম্পদ দিয়ে সহায়তা করে থাকে। গ্রন্থাগারটি চারদশক পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি এখনও কম্পিউটারাইজড করা হয় নি। দৈনিক গড়ে প্রায় তিনশত পাঠক থাকলেও ৪০/৫০ জনের বেশি বসার জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না। অর্থের অভাবে কোন শিক্ষা বিষয়ক জার্নাল সংগ্রহ করা হয় না। বইয়ের জন্য অর্থসংস্থান অপ্রতুল। বিপিএটিসি ও নায়েম একই ধরনের কাজ করলেও বিপিএটিতে গ্রন্থাগারে রয়েছে পঞ্চাশের অধিক স্টাফ, বিশাল গ্রন্থাগার ভবন, পর্যাপ্ত বাজেট। অথচ নায়েম গ্রন্থাগারে ৮ জন স্টাফ মাত্র, আবার দুই শিফটে পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারিকের সারা জীবনে পদোন্নতির ব্যবস্থা নেই।

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন গ্রন্থাগার

১৯৭৩ সালে ইউজিসি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এই গ্রন্থাগারটি ইউজিসি-র কর্মকর্তা, গবেষকসহ উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষা ও গবেষকদের তথ্য সেবা দিয়ে থাকে। গ্রন্থাগারটি ১৯৯৫ সালে নতুন ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। ইউজিসি গ্রন্থাগারটি দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলেও তা সফল হয় নি। এর সংগ্রহ মাত্র ১৪০০০। ইউজিসিকে কেন্দ্র করে Bangladesh Education and Research Network (BERNET) গড়ে তোলার লক্ষ্য থাকলেও তার অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। ইউজিসি-এর গ্রন্থাগারটিতে আছে স্থানসমস্যা। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপর কোন প্রফেশনাল জার্নাল রাখা হয় না। গুণগতমান বিচারে সংগ্রহ সন্তোষজনক নয়।

উপরিউক্ত বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রত্যেকটিতে গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয় নি। এগুলোতে আছে স্থানাভাব, আসবাবপত্রের সমস্যা, গ্রন্থাগারকর্মীদের মর্যাদা ও বেতনক্রমে অসমঞ্জস্য এবং খুবই অপ্রতুল কর্মচারীর সংখ্যা।

৩.০ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ

৩.১ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য ন্যূনতম ১টি কক্ষ, গ্রন্থাগারকর্মী, আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব নয় হয়তো বা। এমতাবস্থায় আমাদের সুপারিশ হলো:

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষককে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার উপর স্বল্পকালীন একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। যাতে তিনি প্রশিক্ষণ শেষে একটি শেল্‌ফে/আলমারিতে এক হাজার বইয়ের একটি সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা করতে পারেন। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে ১টি করে শেল্‌ফ/আলমারি দিতে হবে যেটি শিক্ষকদের বসার স্থানেই আপাতত রাখা যাবে।

(খ) পিটিআই-এর কারিকুলামে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার উপর একটি ইউনিট অন্তর্ভুক্ত করা-যাতে প্রত্যেক শিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থী ছোট একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।

(গ) যেসব এনজিও-এর গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের কর্মসূচি রয়েছে তাদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সহযোগিতা সৃষ্টি করা। এভাবে ঐসব এনজিও-এর ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সেবা (বই বিতরণ ও ফেরৎ) গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঘ) সরকারি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারগুলোকে সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর সম মর্যাদা দেওয়া এবং সেরূপ জনবল কাঠামো সৃষ্টি করা। পিটিআই গ্রন্থাগারের জন্য পিটিআই-এর বার্ষিক মোট আবর্তক বাজেটের কিছু অংশ বাজেট গ্রন্থাগারের বই-পুস্তক, জার্নাল, ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা। অনতিবিলম্বে পিটিআইগুলোর সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ পূরণ করতে হবে।

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নেপ (NAPE) একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। নেপ-এর গ্রন্থাগারটিও জাতীয় মানের হওয়া উচিত। নেপ-এর গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার যেহেতু অন্যান্য বিভাগের মত একটি বিভাগ, সেহেতু গ্রন্থাগার কর্মকর্তাদের মর্যাদা, বেতনক্রম ও জনবল কাঠামো সেরূপ হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারের জন্য নেপ-এর বাৎসরিক মোট আবর্তক বাজেটের ন্যূনতম কিছু অংশ বইপুস্তক, জার্নাল সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। গ্রন্থাগারটির ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটারায়ন করা জরুরি।

(চ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য জরুরিভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সৃষ্টি করা। মাউশির মতো এখানে ১টি Library Development Officer পদ সৃষ্টিসহ লাইব্রেরি পরিচালনার জন্য ৭/৮ জনের লোকবল কাঠামো সৃষ্টি করা। এই গ্রন্থাগারটি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাইমারি এডুকেশন লাইব্রেরি হিসেবে কাজ করবে এবং এই সাব-সেক্টরের গ্রন্থাগারগুলোর তত্ত্বাবধান করবে। গ্রন্থাগারের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন

(ক) সরকারি বা বেসরকারি প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি করে গ্রন্থাগার সৃষ্টি এবং অন্তত একজন গ্রন্থাগার সহকারী ও একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নিয়োগ দেওয়ার আশু ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) অক্টোবর ১৯৯৫ সালে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সৃষ্ট সহকারী গ্রন্থাগারিক পদগুলো পূরণের জন্য সরকারি আদেশ জারী করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(গ) প্রতিটি বিদ্যালয় প্রয়োজনে সরকারি মঞ্জুরীকৃত পদ ছাড়াও নিজস্ব অর্থে একজন গ্রন্থাগার সহকারী নিয়োগ করতে পরে।

(ঘ) সরকারের পক্ষ থেকে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১টি সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ ও ১টি গ্রন্থাগার সহকারীর পদ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।

(ঙ) মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানেও ১টি সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং যেগুলোতে নিম্নবেতন ক্রমের পদ রয়েছে সেগুলোতে সমতা নিয়ে আসতে হবে।

(চ) মাধ্যমিক পর্যায়ে দাখিল মাদরাসাগুলোতে সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

(ছ) সরকার মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানে ভবন তৈরি করে দিচ্ছে। গ্রন্থাগারের জন্য অনুরূপ ভবন/কক্ষ তৈরি করা অত্যাবশক। গ্রন্থাগারের ন্যূনতম আয়তন হবে এমন যেখানে একটি সেকশনের (৪০জন) শিক্ষার্থী একত্রে পাঠকক্ষে বসে পড়তে পারে। এর সঙ্গে থাকবে গ্রন্থাগারিকের দফতর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থান।

৩.৩ কলেজ পর্যায়ের গ্রন্থাগার উন্নয়ন

কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে সুপারিশগুলো প্রদত্ত হলো :

উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ গ্রন্থাগার

(ক) সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর জন্য সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণ করতে হবে এবং যেসব সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের সাংগঠনিক কাঠামোতে গ্রন্থাগারের জন্য পদ সৃষ্টি করা হয় নি সেগুলোতে অবিলম্বে পদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর জনবল কাঠামো সরকারি কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেসরকারি কলেজগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ছাড়া অনুমোদন করা যাবে না।

(গ) সরকার সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ গ্রন্থাগার ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রন্থাগারের জন্য বইপুস্তক ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য সহায়তা দিবে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষও অন্য কোন সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যায় কিনা তা যাচাই করে দেখবে।

(ঘ) পলিটেকনিক, মনোটেকনিক.ইত্যাদি. প্রতিষ্ঠানের (মাধ্যমিকের পর ২-৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) গ্রন্থাগারগুলোর জন্য ন্যূন্যতম উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের গ্রন্থাগারের সমমানের জনবল কাঠামো সৃষ্টি (গ্রন্থাগারিক ১ম শ্রেণী-১, সহকারী গ্রন্থাগারিক (২য় শ্রেণী-১, বুক সটার (৪র্থ শ্রেণী)-১ করতে হবে।

(ঙ) সরকার সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন তৈরি করে দিয়ে থাকে। তেমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার ভবনও সরকার তৈরি করে দেবে।

ডিগ্রি (পাস/অনার্স) ও মাস্টার্স ডিগ্রি কলেজ গ্রন্থাগার

(ক) এ পর্যায়ের ১৩৫টি সরকারি কলেজে গ্রন্থাগারের জন্য লোকবল সৃষ্টি করা আবশ্যক।

(খ) বেশির ভাগ জাতীয়করণকৃত সরকারি কলেজে গ্রন্থাগার ভবন নেই। এসব কলেজে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করতে হবে।

(গ) সরকারি কলেজে গ্রন্থাগারের জন্য এককালীন অর্থ বরাদ্দ না করে শিক্ষা কর্মসূচি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনা করে বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

(ঘ) সরকারি কলেজে গ্রন্থাগারিকদের কর্মজীবনে পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে ডিগ্রি (অনার্স) কলেজে সহকারী অধ্যাপক সমতুল্য একটি সিনিয়র গ্রন্থাগারিকের পদ ও স্নাতকোত্তর কলেজে একটি সিনিয়র গ্রন্থাগারিক ও একটি প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদ (সহযোগী অধ্যাপক সমতুল্য) সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(ঙ) যে সব কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স রয়েছে এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার হাজারের অধিক সেসব কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য প্রতিহাজার ছাত্রের জন্য ১জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী এবং প্রতি দুই হাজার ছাত্রের জন্য ১ একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা আবশ্যক। তবে এর সংখ্যা বর্তমান জনবল কাঠামো ছাড়া ১০ জনের বেশি হবে না (৩য় শ্রেণীর-৭, চতুর্থ শ্রেণী-৩)।

(চ) বেসরকারি ডিগ্রি (পাশ), ডিগ্রি (অনার্স) ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলোতে বর্তমান সরকারি কলেজ গ্রন্থাগারে যে স্টাফিং প্যাটার্ন রয়েছে সেটি অনুসরণ করতে হবে। সরকার এসব কলেজে গ্রন্থাগার ভবন তৈরি করে দেবে এবং গ্রন্থাগারে বই সংগ্রহে ও ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দেবে।

(ছ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(জ) একটি কলেজের ১০% শিক্ষার্থী যাতে একসঙ্গে গ্রন্থাগারে বসে পড়তে পারে সেরূপ স্থানের ব্যবস্থা থাকবে। এর অতিরিক্ত থাকবে বই রাখার স্থান, গ্রন্থাগারিকের দফতর ও কর্মচারীদের কাজের জায়গা।

৩.৪ ডিগ্রি পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার

সরকারি কলেজ অব লেদার টেকনোলজি (ঢাকা) ও কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি (ঢাকা)-এর গ্রন্থাগারকে সরকারি ডিগ্রি (অনার্স) কলেজের সমমর্যাদা দিতে হবে। এবং এর গ্রন্থাগারের জন্য সরকারি ডিগ্রি (অনার্স) কলেজের অনুরূপ বেতনক্রম ও লোকবল কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে।

৩.৫ মেডিক্যাল শিক্ষার গ্রন্থাগার উন্নয়ন

সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ গ্রন্থাগারগুলোতে সরকারি মাস্টার্স কলেজের অনুরূপ জনবল কাঠামো ও বেতনক্রম হবে এবং বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক জার্নাল সংগ্রহ করতে হবে। ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে।

৩.৬ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(ক) যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক গ্রন্থাগার ভবন নেই সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করা;

(খ) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক মানের গ্রন্থাগার গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনবল কাঠামোর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর জন্য একক ও স্টান্ডার্ড জনবল কাঠামো সৃষ্টি করা;

(গ) গ্রন্থাগারগুলোর সেবা আধুনিক ও দ্রুততর করার জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে কম্পিউটারায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোতে কম্পিউটার ডাটাবেইজ তৈরির জন্য একটি একক ও স্টান্ডার্ড সফটওয়ার তৈরি করা;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে সম্পদ ভাগাভাগির (Resource Sharing) জন্য আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে এবং একটি কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন ক্যাটালগ/ডাটাবেইজ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য ইউজিসির ERNET প্রকল্পকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নায়েমের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ছ) নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারের জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আবর্তক বাজেটের প্রয়োজন মাফিক গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে এবং পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য-ও যথোপযুক্ত পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করতে হবে, যাতে করে দেশী বিদেশী বই-পুস্তক ক্রয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল সংগ্রহ করা যায়।

বেরসকারি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার উন্নয়ন

(ক) প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অনুরূপ জনবল কাঠামো অনুসরণ করতে হবে।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী কোন বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি কোর্সের পাঠ্যক্রমের জন্য অন্ততপক্ষে ২৫০০ বই (২০০-২৫০ টাইটেল) গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থাকতে হবে। এবং প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ১০টি আন্তর্জাতিক জার্নাল নিয়মিতভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম ১০% শিক্ষার্থী (কমপক্ষে ১০০ জনের জন্য) এক সঙ্গে গ্রন্থাগারে বসে পাঠ করতে পারে এমন পাঠকক্ষ থাকতে হবে। এর সঙ্গে আলাদাভাবে থাকবে পুস্তক সংরক্ষণের স্থান, গ্রন্থাগারিকের অফিস, ডেপুটি গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের অফিস কক্ষ, প্রসেসিং কক্ষ, ল্যান্ডিং এরিয়া, কম্পিউটার কক্ষ ও প্রসাধনী কক্ষ।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মোট পরিচালন ব্যয়ের ১০% (নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হলে) এবং ৫% (পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় হলে) গ্রন্থাগারের পুস্তক ও জার্নাল খাতে বরাদ্দ রাখতে হবে।

(ঙ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টে রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার পদগুলোর সঙ্গে গ্রন্থাগারিক-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। এজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যেতে পারে।

৩.৬ **শিক্ষায় বিশেষ/গবেষণা গ্রন্থাগার উন্নয়ন**

(ক) ব্যানবেইস-এর দুটি দায়িত্বের মধ্যে শিক্ষায় পরিসংখ্যান সেবার ক্ষেত্রে কিছু কাজ হলেও গ্রন্থাগারভিত্তিক NATEIS বা জাতীয় শিক্ষা তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি। এ লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(খ) নায়েম গ্রন্থাগার, নেপ গ্রন্থাগার, এনসিটিবি গ্রন্থাগার, ইউজিসি গ্রন্থাগারগুলিকে আধুনিক মানের সেবাদানকারী উচ্চমানের গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক।

(গ) ইউজিসি গ্রন্থাগারকে ERNET এর National Focal Point করে উন্নয়ন প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক বাস্তবায়ন করে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর নেটওয়ার্ক সফল করে তুলতে হবে।

৩.৭ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন গ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় একটি গ্রন্থাগার উন্নয়ন কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

(ক) এই কমিটি নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়নের তত্ত্বাবধান করবে। এই কমিটিতে সকল স্তরের প্রশাসক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কমিটি বছরে তিনবার সভায় মিলিত হবে ও গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য নীতি ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে।

(খ) এই কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক স্তরের গ্রন্থাগারের জন্য (স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) গবেষণা গ্রন্থাগারের জাতীয় স্টান্ডার্ড তৈরি করতে হবে।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা

ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো দেশের বিভিন্ন সেক্টর ও সাব সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি সৃষ্টি করা। সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পেশাগত দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানে প্রশিক্ষিত মানুষ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষা আবশ্যক। এটা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এবিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দেশের বিভিন্নধর্মী বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলোর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য পেশাজীবী, আধা-পেশাজীবী ও প্যারা-পেশাজীবী জনশক্তি সৃষ্টি করা এবং চাহিদা মোতাবেক শিক্ষক ও গবেষক তৈরি করা।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৯৮৮ সাল হতে এই বিষয়ে বি.এ (অনার্স) ও মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করছে। এই কোর্স খোলার কারণে একই বিভাগে ১৯৫৯ সালে চালু করা এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স এবং ১৯৭৬ সনে চালু করা এম.এ প্রিলিমিনারি কোর্স বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯১ সাল থেকে এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স এবং ১৯৯৩ সাল থেকে বি.এস.এস (অনার্স) ও এম.এস.এস. কোর্স চালু করে। দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতি বছর ১০০-১২০ জন মাস্টার্স ডিগ্রিধারী বের হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একবছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে। বর্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি ১১টি ইনস্টিটিউট ডিপ্লোমা কোর্সে পাঠদান করছে। প্রতিবছর গড়ে ৩৫০ জন ডিপ্লোমাধারী তৈরি হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পেশাজীবীদের সংগঠন) উচ্চ মাধ্যমিক সনদধারীদের জন্য ৬ মাসব্যাপী সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করে। এই প্রতিষ্ঠান হতে প্রতি বছর গড়ে ১০০ জন প্যারা-পেশাজীবী বের হচেছ। এছাড়া দেশের প্রায় ডজন খানেক ডিগ্রি কলেজে ডিগ্রি (পাস) পর্যায়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ৩ পেপার পড়ানো হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যাসমূহ

১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের কারিকুলাম আরও উন্নত করা দরকার এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের সাথে সাথে দক্ষতা অর্জনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

২. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যে মানের Teaching Aids, Computer Lab থাকা আবশ্যক সেসব গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে নেই।

৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দের M.Phil ও Ph.D প্রোগ্রামে তত্ত্বাবধান করা ও উচ্চতর গবেষণা কোর্সসমূহ পরিচালনে অনীহা লক্ষ্য করা যায়।

৫. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই ভৌত সুযোগ–সুবিধা অপ্রতুল। এগুলির মধ্যে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই ভাড়া বাড়িতে চলে এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়।

৬. দেশে যে পরিমাণ গ্রন্থাগার কর্মীর চাহিদা রয়েছে সে তুলনায় প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার যোগান অপ্রতুল।

৭. দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের In-Service প্রশিক্ষণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে সুপারিশ

১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে ইন্টারনেট সংযোগসহ ২৫টি কম্পিউটার সম্বলিত কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা–যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার ডাটাবেইজ তৈরি শিখতে পারে।

২. গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের যেসব শিক্ষকের পিএইচডি রয়েছে তাঁদের এমফিল গবেষক/ পিএইচডি গবেষককে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতাসম্পন্ন স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এম.পিও ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত ১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ চালু করা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভাগ চালু করতে হবে যাতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুণগতমানের শিক্ষার জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।

৫. অবিলম্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)-তে শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরও জোরদার ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

মূল রচনা :

ড. হারুন-অর-রশীদ; মো: আতিকুল ইসলাম পাঠান।

শেষের কথা

শেষ করার আগে প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করা প্রয়োজন। বিষয়গুলি এর পূর্বে আলোচনা করার অবকাশ ছিল না।

সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন

(ক) **বাস্তবায়ন সেল গঠন :** দৃশ্যত কমিশন একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে, এর সুপারিশও রয়েছে অনেক। এ সব সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কত সময় প্রয়োজন হতে পারে তা কমিশন সবক্ষেত্রে নির্ধারণ করে নি। সুপারিশগুলি স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন। এছাড়া সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হবে। কত অর্থ প্রয়োজন হতে পারে তাও কমিশনের পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। অথচ প্রতিটি সুপারিশের বাস্তবায়নকাল ও এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সম্ভাব্য কোন্ সূত্র থেকে সে অর্থ সংগৃহীত হতে পারে সে বিষয়গুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। এ জন্য কমিশন সুপারিশ করছে যে, এ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে গ্রহণ করে একটি বাস্তবায়ন সেল গঠন করা হোক। এই সেলের দায়িত্ব হবে–

১. সুপরিশগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করা।

২. সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং কোন সূত্র থেকে সে অর্থ সংগৃহীত হতে পারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সে বিষয়গুলি নির্ধারণ করা।

(খ) **স্থায়ী শিক্ষা কমিশন :** আমাদের দেশে ইত:পূর্বে বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন বা শিক্ষাসংস্কার কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সামগ্রিকভাবে কোনটিই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় নি। এর ফলে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ যেন এক হালবিহীন নৌকা, ঢেউয়ের তালে তালে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। এছাড়া কোন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন জাতীয়ভাবে পুরোপুরি গৃহীত না হওয়ায় নতুন শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রয়োজন হয়েছে। অপরপক্ষে বার বার এ ধরনের শিক্ষা কমিশন গঠন জনমনে নানান প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। এছাড়া এ কথা মনে রাখা দরকার যে শিক্ষা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। আবার প্রতি দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটে। এ সব কারণে বর্তমান শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করছে যে, জাতীয়ভাবে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা হোক। কমিশনের কাজ হবে মূলত–

১. শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. চলমান গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা নিরূপণ ও তার প্রতিকারের সুপারিশ করা;

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন চিন্তাচেতনার উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ করা;

৪. দেশ-বিদেশে শিক্ষাবিষয়ক নতুন চিন্তাভাবনা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা এবং প্রয়োজনবোধে এ সব ভাবনা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা।

উল্লেখ্য যে, চীনদেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এমন কমিশন গঠিত হওয়ার পর সেদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সমন্বয়

এ প্রতিবেদনে অপর একটি বিষয় অনালোচিত রয়ে গেছে। বিষয়টি হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুটি বাদ দিয়েও অনেক মন্ত্রণালয় আছে যাদের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা, গবেষণা বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। এ সব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে প্রধান বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় প্রভৃতি (আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে)। যদিও কমিশন বিষয়টি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেনি তবুও কমিশন মনে করে যে, এগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন যাতে এদের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে অনাবশ্যক পৌন:পুনিকতা না থাকে এবং সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার হয়। তাই কমিশন সুপারিশ করছে যে এসব মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা, গবেষণা বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে এরূপ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন।

পরিশিষ্ট-১ : জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ এর গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং-শিমশা:৭/৮শিক্ষানীতি-২/২০০২-১৮ তারিখ: ১৪-০১-২০০৩ইং

অফিস আদেশ

বিগত ২১.১০.২০০২ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা পর্যালোচনা করে উপযুক্ত সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত শিক্ষাবিদ/কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে :

১। প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। প্রফেসর ডঃ এস.এম.এ ফায়েজ ,ভাইস চ্যান্সেলর,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।
৫। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৬। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৭। প্রফেসর ডঃ মোঃ আলী মুর্ত্তজা, ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮। প্রফেসর এম.এ হাদী, ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯। প্রফেসর ডঃ এম.শমসের আলী, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০। ডঃ হাফিজ জি. এ সিদ্দিকী, ভাইস চ্যান্সেলর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১১। প্রফেসর ডঃ বজলুল মবিন চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১২। প্রফেসর ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩। প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৪। জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৫। জনাব আবদুর রফিক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৬। প্রফেসর এম. শরিফুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ এবং অধ্যক্ষ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।
১৭। প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৮। অধ্যক্ষ, আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা।
১৯। অধ্যক্ষ, ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল।
২০। জনাব ইয়াসমিন মোর্শেদ, প্রিন্সিপাল, স্কলাসটিকা।
২১। জনাব সালমা খান, প্রাক্তন যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন।
২২। জনাব সবদার আলী, প্রধান শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
২৩। জনাব মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।
২৪। জনাব মো: আবদুল ওয়াহাব, যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
শিক্ষা সচিব।

বিতরণ :

১। প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। প্রফেসর ডঃ এস.এম.এ ফায়েজ ,ভাইস চ্যান্সেলর,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।
৫। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৬। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৭। প্রফেসর ডঃ মোঃ আলী মুর্ত্তজা, ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮। প্রফেসর এম.এ হাদী, ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯। প্রফেসর ডঃ এম.শমসের আলী, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০। ডঃ হাফিজ জি. এ সিদ্দিকী, ভাইস চ্যান্সেলর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১১। প্রফেসর ডঃ বজলুল মবিন চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১২। প্রফেসর ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩। প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৪। জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৫। জনাব আবদুর রফিক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৬। প্রফেসর এম. শরিফুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ এবং অধ্যক্ষ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।
১৭। প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৮। অধ্যক্ষ, আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা।
১৯। অধ্যক্ষ, ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল।
২০। জনাব ইয়াসমিন মোর্শেদ, প্রিন্সিপাল, স্কলাসটিকা।
২১। জনাব সালমা খান, প্রাক্তন যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন।
২২। জনাব সবদার আলী, প্রধান শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
২৩। জনাব মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।
২৪। জনাব মো: আবদুল ওয়াহাব, যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

নং-শিমশা:৭/৮শিক্ষানীতি-২/২০০২-১৮ তারিখ: ১৪-০১-২০০৩ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব এর ব্যক্তিগত সহকারী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সহকারী সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা-১৫, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. লাইব্রেরীয়ান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (গার্ড ফাইলে সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।

স্বাক্ষরিত
(মো: জিয়াউর রহমান খান)
সিনিয়র সহাকারী সচিব
ফোন: ৮৬১-৮৬৩৮।

পরিশিষ্ট-২ : উপকমিটিসমূহের গঠন

শিক্ষা কমিশনের বিভিন্ন উপকমিটির সদস্যগণের তালিকা

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা উপকমিটি

১.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	আহবায়ক
২.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
৩.	এস,এম, হায়দার, সাবেক সদস্য (অর্থ), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৪.	জনাব রাশেদা কে চৌধুরী, পরিচালক, CAMPE।	সদস্য
৫.	জনাব রফিকুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহসানিয়া মিশন।	সদস্য
৬.	জনাব ডঃ আনোয়ারুল আজিজ,প্রাক্তন ভাইস-প্রিন্সিপাল, টিটি, কলেজ, ঢাকা।	সদস্য

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা উপকমিটি

১.	প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	আহবায়ক
২.	অধ্যাপক ডঃ ইকবাল আজিজ মুত্তাকী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩.	প্রফেসর মাজহারুল হান্নান, ট্রেজারার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।	সদস্য
৪.	প্রফেসর আনোয়ার আলী, সাবেক অধ্যাপক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৫.	অধ্যাপক খন্দকার আবদুল হান্নান, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৬.	প্রফেসর খলিলুর রহমান, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা।	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। অধ্যক্ষ, এ.কে. হাইস্কুল ও কলেজ, দনিয়া, ঢাকা।	সদস্য
৮.	জনাব সবদার আলী, প্রধান শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৯.	জনাব নজরুল ইসলাম, মহাসচিব বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি এবং সহকারী শিক্ষক, কোর্ট একাডেমি রাজশাহী।	সদস্য
১০.	জনাব ইসাহাক হোসেন, অধ্যক্ষ, মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
১১.	বেগম জাকিয়া আখতার, এম.ডি.এস, নায়েম।	সদস্য

(গ) উচ্চ শিক্ষা উপকমিটি

১.	প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, চেয়ারম্যান, শিক্ষা কমিশন, ২০০৩।	আহবায়ক
২.	প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।	সদস্য
৩.	প্রফেসর ডঃ এস, এম, এ, ফায়েজ, ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৪.	প্রফেসর ডঃ এম. এরশাদুল বারী, ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৫.	প্রফেসর ডঃ বজলুল মবিন চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য
৬.	প্রফেসর জসীম উদ্দিন আহমেদ, ভাইস চ্যান্সেলর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
৭.	প্রফেসর ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। (প্রাক্তন উপ-ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	সদস্য
৮.	প্রফেসর ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৯.	প্রফেসর ডঃ খলিলুর রহমান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
১০.	প্রফেসর ডঃ এ. এম. হারুন-অর-রশিদ, প্রাক্তন অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
১১.	প্রফেসর ডঃ সৈয়দ হুমায়ুন কবির, প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১২.	প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, ট্রেজারার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
১৩.	প্রফেসর শামসে আরা হোসেন, অধ্যক্ষ, সিদ্বেশ্বরী মহিলা কলেজ, বেইলী রোড, ঢাকা।	সদস্য

(ঘ) কৃষি শিক্ষা বিষয়ক উপকমিটি

১. প্রফেসর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। (১৫.১.২০০৩ থেকে ৩১.৮.২০০৩ তারিখ পর্যন্ত) — আহবায়ক
২. প্রফেসর ডঃ মোঃ আবদুল হালিম খান, ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (০১.৯.২০০৩ থেকে কমিশনের কার্যকাল পর্যন্ত আহবায়ক) — সদস্য ও আহবায়ক
৩. প্রফেসর ডঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম, ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। — সদস্য
৪. প্রফেসর ডঃ এ,এম ফারুক, ভাইসচ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — সদস্য
৫. প্রফেসর ডঃ এ কে এম আবদুল হান্নান ভুইয়া, ভাইস-চ্যান্সেলর্র, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী। — সদস্য

(ঙ) প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা উপকমিটি

১. প্রফেসর ডঃ মোঃ আলী মুর্ত্তাজা, ভাইসচ্যান্সেলর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — আহবায়ক
২. জনাব আবদুর রফিক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। — সদস্য
৩. প্রফেসর মোঃ আবুল বাশার, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। — সদস্য
৪. ডঃ মোঃ ইদ্রিস আলী, চেয়ারম্যান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। — সদস্য
৫. প্রফেসর ডঃ হামিদা বানু, প্রাক্তন মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। — সদস্য
৬. প্রফেসর ডঃ কায়কোবাদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা — সদস্য
৭. ডঃ লুৎফর রহমান, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা। — সদস্য

(চ) চিকিৎসা শিক্ষা উপকমিটি

১. ডাঃ এম.এ হাদী, ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়,শাহবাগ, ঢাকা। — আহবায়ক
২. প্রিন্সিপাল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা। — সদস্য
৩. প্রফেসর ডাঃ আখতারুজ্জামান, প্রিন্সিপাল, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা। — সদস্য
৪. ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা। — সদস্য
৫. প্রফেসর ডাঃ মাহমুদুর রহমান, সাবেক প্রিন্সিপাল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা। — সদস্য
৬. প্রফেসর ডাঃ আলাউদ্দিন, ইএনটি, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল — সদস্য
৭. প্রিন্সিপাল, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা। — সদস্য
৮. ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়,শাহবাগ, ঢাকা। — সদস্য

(ছ) মাদ্রাসা শিক্ষা উপকমিটি

১. প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ভাইসচ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। — আহবায়ক
২. প্রিন্সিপাল, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা। — সদস্য
৩. অধ্যাপক ডঃ ফজলুর রহমান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। — সদস্য
৪. চেয়ারম্যান, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা — সদস্য
৫. মাওলানা যায়নুল আবেদীন, প্রিন্সিপাল তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা — সদস্য
৬. প্রফেসর মাহবুবুর রহমান, পরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা। — সদস্য
৭. মাওলানা আবদুল লতিফ, মহাসচিব, জমিয়তুল মুদাররেছিন, ৫৪এ/বি মহাখালী, ঢাকা-১২১২। — সদস্য
৮. প্রফেসর মজিবুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড — সদস্য
৯. অধ্যাপক হামিদা পারভিন, মদিনাতুল উলুম মহিলা কামিল মাদ্রাসা, ফার্মগেইট, ঢাকা। — সদস্য

(জ) নারী শিক্ষা উপকমিটি

১.	জনাব সালমা খান, সদস্য,ন্যাশনাল কমিশন অন ওমেন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন)	আহবায়ক
২.	রাশেদা কে চৌধুরী, পরিচালক, ক্যাম্পে।	সদস্য
৩.	ডঃ কানিজ সিদ্দিকী, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি	সদস্য
৪.	প্রফেসর রাশিদা বেগম, সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	সদস্য
৫.	প্রফেসর এম. শরিফুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ এবং অধ্যক্ষ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৬.	প্রিন্সিপাল, ভিকারুন্নেসা স্কুল এন্ড কলেজ	সদস্য
৭.	জনাব রহিমা খন্দকার, প্রধান শিক্ষিকা, ইসলামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর।	সদস্য
৮.	জনাব ইয়াসমিন মুর্শেদ, চেয়ারম্যান, স্কলাসটিকা	সদস্য

(ঝ) বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি ও দূর শিক্ষা উপকমিটি

১.	প্রফেসর ডঃ এম.শমসের আলী, (প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর,উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর,) ভাইস-চ্যান্সেলর, সাউথইষ্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	আহবায়ক
২.	প্রফেসর ডঃ মোঃ আলী মুর্ত্তাজা, ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩.	প্রফেসর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৪.	প্রফেসর এম.এ বাশার, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৫.	প্রফেসর খলিলুর রহমান, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৬.	প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, উপাধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ	সদস্য
৭.	প্রফেসর ডঃ হামিদা বানু, প্রাক্তন মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।১৩ দীননাথ সেন লেন, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।	সদস্য
৮.	ডঃ মোঃ ইদ্রিস আলী, চেয়ারম্যান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ আবদুর রফিক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।	

(ঞ) শিক্ষা প্রশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা উপকমিটি

১.	জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্রাক্তন সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	আহবায়ক
২.	প্রফেসর ডঃ এম.শমসের আলী, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর,উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।	সদস্য
৩.	চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৫.	প্রফেসর এম. শরিফুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ এবং অধ্যক্ষ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি এবং অধ্যক্ষ, এ.কে. হাইস্কুল ও কলেজ, দনিয়া, ঢাকা।	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ সবদার আলী, প্রধান শিক্ষক, মনিপুর হাইস্কুল, ঢাকা।	সদস্য।

(ট) শিক্ষায় অর্থায়ন বিষয়ক উপকমিটি

১.	ডঃ হাফিজ জি.এ সিদ্দিকী, ভাইস চ্যান্সেলর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	আহবায়ক
২.	জনাব আবদুর রফিক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩.	প্রফেসর এম.এ শামছুল হক, ভাইস-চ্যান্সেলর, সিটি বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৪.	প্রফেসর ডঃ বজলুল মবিন চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি ,ঢাকা ।	সদস্য
৫.	প্রফেসর ডঃ আসাদুজ্জামান, পরিচালক (গবেষণা), বি,আই,ডি,এস	সদস্য
৬.	ডঃ আবদুর রব, স্কুল অব বিজনেস, ব্রাক, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য

(ঠ) বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা বিষয়ক উপকমিটি

১.	ডঃ হাফিজ জি. এ সিদ্দিকী, ভাইস চ্যান্সেলর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	আহবায়ক
২.	প্রফেসর ডঃ কে এম মোহসীন, সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।	সদস্য
৩.	প্রফেসর ডঃ বজলুল মবিন চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য
৪.	জনাব ইয়াসমিন মোর্শেদ, চেয়ারম্যান, স্কলাসটিকা স্কুল, গুলশান, ঢাকা।	সদস্য
৫.	কর্নেল সোহরাব, প্রিন্সিপাল, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৬.	ডঃ আবদুর রব, ব্রাক ইউনিভার্সিটি, মহাখালি, ঢাকা।	সদস্য

(ড) কলেজ শিক্ষা : সমীক্ষা

জনাব আফজালুর রহমান, প্রভাষক, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।

পরিশিষ্ট-৩ : পরামর্শকদের নামের তালিকা

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তাকারী পরামর্শকগণের তালিকা

১. প্রফেসর ডঃ ইকবাল মাহমুদ, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২. জনাব মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

৩. প্রফেসর শামসুল কবীর, প্রাক্তন পরিচালক, নায়েম।

৪. প্রফেসর মুহম্মদ আনসার উজ্জামান, ডীন, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

৫. জনাব মুহাম্মদ নুরুল হুদা, সহকারী অধ্যাপক, ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রতিবেদন সম্পাদনা

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

কপি এডিটর

১. প্রফেসর আহমেদ কবীর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২. প্রফেসর মোঃ সাঈদ-উর রহমান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩. প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৪ : গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

বিষয় : প্রাইমারী শিক্ষা বিষয়ক উপকমিটির সাথে আলোচনা

সভার স্থান : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর সভাকক্ষ, ধানমন্ডি, ঢাকা
তারিখ : ১৬-০৭-২০০৩

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধূরী প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা ও (বর্তমানে কনসালটেন্ট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা) এবং সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
৩.	ড: মো: আনোয়ারুল আজিজ পরিচালক (অব), নেপ, ময়মনসিংহ।
৪.	জনাব এস. এম. হায়দার প্রাক্তন সদস্য, এন.সি.টি.বি।
৫.	বেগম রাশেদা কে চৌধুরী সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
৬.	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

বিষয় : শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা

সভার স্থান: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর সভাকক্ষ, ধানমন্ডি, ঢাকা
তারিখ: ১৩-০৯-২০০৩

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	জনাব মু: আবদুর রব পরিচালক, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৩.	জনাব মুহাম্মদ আলী আকবর সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৪.	জনাব কে.এম. ফরিদ উদ্দিন খান অধ্যক্ষ, বাদশাহ ফয়সাল ইনস্টিটিউট ও কলেজ সদস্য।

৫. জনাব আ: মালেক পাটওয়ারী
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।

৬. জনাব মুহাম্মদ আবদুল হালিম
প্রভাষক, আইডিয়েল টিচার্স কলেজ, উত্তরা, ঢাকা।

৭. জনাব এ.বি.এম. খায়রুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, ঢাকা।

৮. জনাব মো: মনজুরুল হক
অধ্যক্ষ, আই.ই.এফ. স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।

৯. জনাব মুহাম্মদ শামীমুল বারী
পাবলিকেশাস অফিসার, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।

১০. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

বিষয় : বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের সাথে সভা

সভার স্থান : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর সভাকক্ষ, ধানমন্ডি, ঢাকা
তারিখ : ১৭-০৯-২০০৩

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	জনাব অগ্নিশ্বর মন্ডল সহকারী প্রধান শিক্ষক, চর নটাখোলা উচ্চ বিদ্যালয়, চরহাজিগঞ্জ, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর।
৩.	জনাব উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সহকারী প্রধান শিক্ষক, পিঞ্জুরী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
৪.	জনাব আবু ইউসুফ প্রধান শিক্ষক, নতুন জুরাইন কে.এম. মাঈনুদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়, শ্যামপুর, ঢাকা।
৫.	জনাব খন্দকার মো: ইউনুস সহকারী প্রধান শিক্ষক, ইসদাইর রাবেয়া হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়নগঞ্জ।
৬.	জনাব মো: সামছুল আলম প্রধান শিক্ষক, এমদাদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, দোহার, ঢাকা।
৭.	জনাব মো: নূরুল ইসলাম সুপার, বরামা বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা।
৮.	জনাব মো: আলফাজ উদ্দিন প্রধান শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়।
৯.	জনাব মো: বিলায়েত হোসেন সুপার, আইন পুর দাখিল (আলিম) মাদ্রাসা, নগরকান্দা, ফরিদপুর।
১০.	জনাব আহমদ আলী সুপার, বীর গাঁও ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রসা, মনোহরদী, নরসিংদী।

১১. জনাব শৈলেন্দ্র নাথ তালুকদার
প্রধান শিক্ষক, এম.ডব্লিউ উচ্চ বিদ্যালয়, আলমাস নগর, নারায়নগঞ্জ।

১২. জনাব মো: আলমখান প্রাশি
প্রধান শিক্ষক, সৈয়দপুর বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়নগঞ্জ।

১৩. জনাব মো: আহসান উদ্দিন সরকার
প্রধান শিক্ষক, তাজউদ্দিন আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাপাসিয়া।

১৪. জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ
সহকারী প্রধান শিক্ষক, আই.পি.এইচ. উচ্চ বিদ্যালয়, মহাখালী, ঢাকা।

১৫. জনাব মো: হারিছ মিঞা
প্রধান শিক্ষক, কয়ের উচ্চ বিদ্যালয়।

১৬. জনাব মো: আজহারুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।

১৭. জনাব মো: আজিজুল হক
সহকারী প্রধান শিক্ষক, আলীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কালকিনি, মাদারীপুর।

১৮. জনাব মো: শামছুল হক
তত্ত্বাবধায়ক, ডাংগা দাখিল মাদ্রাসা, নরসিংদী।

১৯. জনাব মো: আফজাল হোসাইন
প্রধান শিক্ষক, ধানকোড়া গিরীশ ইন্সটিটিউট, ধানকোড়া, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।

২০. জনাব আলমগীর হোসাইন
সুপারিনটেনডেন্ট, দক্ষিণ রমজান পুর দাখিল মাদ্রসা, কালকিনি, মাদারীপুর।

২১. জনাব মো: মুজিবুর রহমান
প্রধান শিক্ষক, তালমা নাজিমুদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়, নগরকান্দা, ফরিদপুর।

২২. জনাব মো: মজিবুর রহমান
প্রধান শিক্ষক, মোগদা পাড়া, এইচ.জি.জি.এস স্মৃতি বিদ্যালয়, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

২৩. জনাব আবুল কালাম আজাদ
প্রধান শিক্ষক, শিমুলিয়া এল.পি. হাই স্কুল, সাভার, ঢাকা।

২৪. জনাব মো: আবদুল রব মিয়া
প্রধান শিক্ষক, তালেবপুর আদর্শ হাই স্কুল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

২৫. জনাব মো: শওকত আলী
সুপার (ভারপ্রাপ্ত), করপাড়া ইউনিয়ন দাখিল মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ।

২৬. জনাব মো: মোতালেব হোসেন
সহকারী প্রধান শিক্ষক, ইসলামগঞ্জ আশরাফ আলী উচ্চ বিদ্যালয়।

২৭. জনাব মো: আবুল হোসেন
প্রধান শিক্ষক, চর হাজীগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর।

২৮. জনাব বাবু অজিত কুমার সাহা
প্রধান শিক্ষক, বি.এম. উচ্চ বিদ্যালয়, বন্দর, নারয়নগঞ্জ।

২৯. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

বিষয় : প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ও প্রাইমারী শিক্ষা অফিসারদের সাথে আলোচনা

সভার স্থান : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) সভাকক্ষ
তারিখ : ০৮-১০-২০০৩

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	প্রফেসর ডঃ মোঃ আলী মুর্ত্তাজা উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩.	প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
৪.	প্রফেসর এম.শরীফুল ইসলাম প্রধান সমন্বয়কারী, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোট।
৫.	প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমেদ কনসালটেন্ট, ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসটেন্স প্রজেক্ট।
৬.	জনাব সবদার আলী প্রধান শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।
৭.	জনাব মোঃ সেলিম ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষক সমিতি।
৮.	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব সদস্য সচিব, শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
৯.	জনাব এডঃ আবদুল আজিজ সরকার জাতীয় শ্রেষ্ট বিদ্যাৎসাহী'৯৭।
১০.	মিসেস মাকসুদা বেগম থানা শিক্ষা অফিসার, সূত্রাপুর, ঢাকা।
১১.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পরিচালক, নায়েম, ঢাকা।
১২.	জনাব কাজী রফিকুল আলম নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহছানিয়া মিশন।
১৩.	মিসেস সুলতানা রাজিয়া আহমেদী বেগম থানা শিক্ষা অফিসার, রমনা, ঢাকা।
১৪.	মিসেস আসমা খাতুন সাধারণ সম্পাদক, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।
১৫.	মিসেস সুরাইয়া বেগম সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, কোতয়ালী, ঢাকা।
১৬.	জনাব এম. হাসান শাহরিয়ার সারি আরা এডুকেশন এক্সটেনশন সেল।

১৭. মিসেস রাশেদা কে চৌধুরী
গণস্বাক্ষরতা অভিযান।

১৮. মিসেস এইচডি জানতু বরিয়ারজা
ই.ই.সি।

১৯. মিসেস রোয়েনা হোসেন
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), ভিকারুননেছা নুন স্কুল, ঢাকা।

২০. মিসেস রওশন জাহান
প্রধান শিক্ষক, বাড্ডা সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়।

২১. জনাব মোঃ সরওয়ার জাহান
প্রধানশিক্ষক, চালাবন্দ রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়, গুলশান।

২২. জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
প্রাক্তন পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

২৩. জনাব মোঃ ওলিয়ার রহমান
প্রধান শিক্ষক, সড়ক ও জনপথ শহীদ স্মৃতি রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।

২৪. মিসেস সৈয়দা মাহফুজা বেগম
থানা শিক্ষা অফিসার, গুলশান, ঢাকা।

২৫. মিসেস শাহিন আরা বেগম
থানা শিক্ষা অফিসার, সেনানিবাস, ঢাকা।

২৬. মিসেস নার্গিস সাজেদা সুলতান
থানা শিক্ষা অফিসার, লালবাগ, ঢাকা।

২৭. মিসেস মেহেরুননেছা
সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, লালবাগ, ঢাকা।

২৮. মিসেস খালেদা বেগম
সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, ধানমন্ডি, ঢাকা।

২৯. মিসেস তাছলিমা বেগম
সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, সুত্রাপুর, ঢাকা।

৩০. জনাব জসীম উদ্দিন আহমদ
প্রধান শিক্ষক, জিগাতলা সরকারী মহিলা প্রাঃ বিদ্যালয়, ঢাকা।

৩১. জনাব আক্তার হোসেন
উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়নগঞ্জ।

৩২. জনাব নাসির উদ্দিন আহমদ
উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

৩৩. মিসেস নাফিসা কবীর এ্যানি
থানা শিক্ষা অফিসার, মতিঝিল, ঢাকা।

৩৪. সাখাওয়াত এরশাদ
থানা শিক্ষা অফিসার, মিরপুর, ঢাকা।

৩৫. মিসেস শেলিনা আক্তার
প্রধান শিক্ষক, তেজগাও, ঢাকা।

৩৬. মিসেস রেহানা আক্তার
প্রধান শিক্ষক, লালবাগ, ঢাকা।

৩৭. মোঃ চাদ মিয়া
প্রধান শিক্ষক, মোহাম্মদপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৮. মিসেস তসলীমা খাতুন
প্রধানশিক্ষক, খল হাসান আদর্শ সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়।

৩৯. মিসেস পিয়ারা আক্তার
প্রাথমিক আইডিয়াল প্রাঃ বিঃ মতিঝিল, ঢাকা।

৪০. জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান মিঞা
প্রধান শিক্ষক, ভাষানটেক সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়, ঢাকা।

৪১. জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রধান শিক্ষক, হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সরকারী প্রাঃবিঃ।

৪২. জনাব সিরাজুল ইসলাম তাইফুর
সভাপতি, কেন্দ্রীয় এম বশির সরকারী প্রাঃ বিঃ।

৪৩. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
প্রধান শিক্ষক, রাঙ্গীছড়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়।

৪৪. জনাব মুহাঃ আঃ আউয়াল তালুকদার
প্রধানশিক্ষক, রোটারী সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪৫. প্রফেসর মুহাম্মাদ মনসুরুর রহমান
অধ্যক্ষ, সরকারী মাদ্রাসাই আলিয়া, ঢাকা।

৪৬. জনাব মোঃ আবদুল মজিদ
পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।

৪৭. ডঃ মোঃ আনোয়ারুল আজিজ
পরিচালক (অব:), নেপ. ময়মনসিংহ।

৪৮. ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান
উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪৯. জনাব মোঃ আবদুল মান্নান মিয়া
বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫০. মিসেস মেহেরুননেছা
উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫১. মিসেস সাহানা বেগম
উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫২. জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন
উপ-প্রধান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।

৫৩. মিসেস সুরাইয়া বেগম
সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, কোতয়ালী, ঢাকা।

৫৪. জনাব মুঃ রিয়াজুল ইসলাম
জাতীয় পরিদর্শক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫৫. জনাব আলোমতাজ চৌধুরী
সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, সুত্রাপুর, ঢাকা।

৫৬. মিসেস লুৎফুন নেছা
প্রধান শিক্ষক, পাইকপাড়া স্টাফ কোঃ রেজি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৫৭. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

বিষয় : বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের সাথে সভা

সভার স্থান : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর সভাকক্ষ, ধানমন্ডি, ঢাকা
তারিখ : ০৫-১১-২০০৩

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	জনাব মো: ফরিদুল ইসলাম অধ্যক্ষ, গোমনাতী মহাবিদ্যালয়, গোমনাতী, ডোমার, নীলফামারী।
৩.	জনাব দীনেশ চন্দ্র শীল উপাধ্যক্ষ, গুনবতী ডিগ্রী কলেজ, ডাকঘর: গুনবতী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
৪.	জনাব মো: খায়রুল ইসলাম অধ্যক্ষ, আক্কেলপুর এম.আর কলেজ, জায়পুরহাট।
৫.	জনাব মো: খালেকুজ্জামান অধ্যক্ষ, বিক্রমপুর কে.বি. ডিগ্রি কলেজ।
৬.	জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাস অধ্যক্ষ, মোংলা কলেজ, ডাকঘর: শেলাবুনিয়া, জেলা: বাগেরহাট।
৭.	জনাব মো: মকছেদ আলী প্রামানিক অধ্যক্ষ, বিল হালতী ত্রিমোহনী কলেজ, নাটোর।
৮.	জনাব হেরেম উল্যাহ আহছান অধ্যক্ষ, বড়চাপা মহাবিদ্যালয়, মনোহরদী, নরসিংদী।
৯.	জনাব জুলফিকার আহমেদ অধ্যক্ষ, মেট্রোপলিটন কলেজ, মাগুরা, রাজশাহী।
১০.	জনাব মো: সাদুল্লাহ হুসাইন অধ্যক্ষ, আয়েশা আইন উদ্দিন মহিলা কলেজ, শ্রীবরদী, শেরপুর।
১১.	জনাব মো: সিরাজ উদ্দিন অধ্যক্ষ, দিঘপাতিয়া এম.কে. কলেজ, দিঘপাতিয়া, নাটোর।
১২.	জনাব মো: আব্দুস সাত্তার অধ্যক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট, জেলা: নিলফামারী।
১৩.	জনাব সৈয়দ জাহাঙ্গীর হোসেন অধ্যক্ষ, কলসমরী ডিগ্রী কলেজ, ডাকঘর: কলসমরী, জেলা: বরিশাল।

১৪. জনাব মো: আব্দুল মতিন
অধ্যক্ষ, দুবলাগাড়ী কলেজ, মাস্কিড়া, বগুরা।

১৫. জনাব মো: মোজাম্মেল প্রধান
অধ্যক্ষ, নাগেশ্বরী মহিলা ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়।

১৬. জনাব আকবর আহমদ
অধ্যক্ষ, নানুপুর লায়লা কবির কলেজ, ভোলা।

১৭. জনাব মো: ফজলে রাব্বি
অধ্যক্ষ, বোরহান উদ্দিন মহিলা কলেজ, ভোলা।

১৮. জনাব মো: মোক্তার আলী
অধ্যক্ষ, সালেহা বেগম মহিলা কলেজ, হরিণাকুন্ড, ঝিনাইদহ।

১৯. প্রফেসর মো: আনোয়ার হোসেন
অধ্যক্ষ, সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর।

২০. জনাব মো: শাহজাহান তালুকদার
অধ্যক্ষ, মুলাদী কলেজ, মুলাদী, বরিশাল।

২১. জনাব মো: রফিক
অধ্যক্ষ, কর্ণফুলী কলেজ।

২২. জনাব শরীফ মু: আ: কাইয়ুম
অধ্যক্ষ, মাজদা বেগম মহিলা কলেজ, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।

২৩. জনাব আবুল হাশিম
উপাধ্যক্ষ, রাজৈর ডিগ্রি কলেজ, সিপাহী, মাদারীপুর।

২৪. জনাব নির্মল চন্দ্র সিকদার
অধ্যক্ষ, নিজাম উদ্দিন কলেজ, বরিশাল।

২৫. জনাব মো: কাঞ্চন আলী মোল্লা
অধ্যক্ষ, জেড.এ.ভূট্টো ডিগ্রি কলেজ, ঝালকাঠী।

২৬. জনাব মো: আব্দুল হামিদ
অধ্যক্ষ, আইডিয়াল ডিগ্রি কলেজ, ঝালকাঠী।

২৭. জনাব নূরুল হক হাওলাদার
উপাধ্যক্ষ, সরকারি ফজলুল হক কলেজ, চাখার।

২৮. জনাব মো: আবদুল মান্নান
উপাধ্যক্ষ, তাড়াশ ডিগ্রি কলেজ, তাড়াশ সিরাজগঞ্জ।

২৯. জনাব নাজমুল হোসেন বিশ্বাস
অধ্যক্ষ, হাজী জসীম উদ্দীন ডিগ্রি কলেজ, দুবলিয়া, পাবনা।

৩০. জনাব মো: একরাম হোসেন
অধ্যক্ষ, ভাদুঘর ডি.এস. কামিল মাদ্রাসা, বি-বাড়িয়া।

৩১. জনাব মো: সামছুল হক
অধ্যক্ষ, হাকিমুদ্দিন মাদ্রসা, ভোলা।

৩২. জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার উল্লাহ ভূঞা
অধ্যক্ষ, চিত্তড়া আছপারয়া ফাজিল মাদ্রসা।

৩৩. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

বিষয় : প্রকৌশল শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন এর আলোচনা সভা

সভার স্থান : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
তারিখ : ০৬-১১-২০০৩

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	প্রফেসর ড: মোহাম্মদ খোরশেদ আলম পানি সম্পদ কৌশল ও ডীন, পুরকৌশল অনুষদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩.	প্রফেসর ড: মো: ইদ্রীস আলী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৪.	প্রফেসর ড: মো: ফজলুল কবীর ডাব্লিউ.আর.ই এবং পরিচালক, স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার।
৫.	প্রফেসর ড: আলমগীর মজিবুল হক পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৬.	প্রফেসর মো: কামরুল ইসলাম যন্ত্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭.	জনাব মো: শাহজাহান রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮.	প্রফেসর মো: মোহর আলী, এম.এম.ই. বিভাগ ও ডীন, প্রকৌশল অনুষদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯.	বেগম রোয়েনা হোসেন অধ্যক্ষ, ভিকারুন নিসা নুন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা।
১০.	প্রফেসর ড: পিকে. মো: ওমর ফারুক চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১১.	প্রফেসর মো: কামরুল আহসান ইইই বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
১২.	প্রফেসর ড: মো: মাজহারুল হক পুরকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩.	প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক ভাইস-চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১৪.	প্রফেসর ড: মো: সাইফুল ইসলাম পুরকৌশল, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১৫.	প্রফেসর ড: শ্যামল কান্তি বিশ্বাস যন্ত্রকৌশল বিভাগ, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১৬. প্রফেসর মুহাম্মদ মনসুরুর রহমান
সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

১৭. প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী
স্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৮. প্রফেসর ড: মো: ইমতিয়াজ হোসেন
যন্ত্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯. প্রফেসর ড: মো: আবদুর রউফ
পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২০. প্রফেসর এস.এম.আর সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান (অব:), করিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

২১. প্রফেসর শহিদুল হাসান
ডীন, ইইই অনুষদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২২. প্রফেসর ড: নিতাই চন্দ্র দূতরু
অধ্যক্ষ, কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি, ঢাকা।

২৩. প্রফেসর ড: মো: ফজলুল করিম
অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজী, ঢাকা।

২৪. জনাব মো: আজহারুল ইসলাম
অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা।

২৫. জনাব মো: আইয়ুব আলী
অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিকস্, তেজগাঁও, ঢাকা।

২৬. কর্ণেল এম আজিজুর রহমান
কনসালটেন্ট, চেয়ারম্যানের অনুরোধে।

২৭. প্রফেসর শামসুল আলম
বিভাগীয় প্রধান, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

২৮. প্রফেসর ড: গাজী মো: খলিল
নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২৯. প্রফেসর মো: আবুল বাশার
মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩০. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

বিষয় : কৃষি শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন এর আলোচনা সভা

সভার স্থান : শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
তারিখ : ১৩-১১-২০০৩

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	প্রফেসর মোঃ আবদুল হালিম খান ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
৩.	প্রফেসর এ.এম ফারুক ভাইস-চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪.	জনাব মো: আব্দুস সাত্তার পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৫.	প্রফেসর ড: ইসমাইল হোসেন মিঞা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
৬.	প্রফেসর মো: রফিকুল হক ভূঞা ডীন, কৃষি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৭.	প্রফেসর স.ম. আলতাফ হোসেন কৃষি তত্ব বিদ্যা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৮.	ড: জাহাঙ্গীর আলম সদস্য পরিচালক, বাংলাদেম কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৯.	প্রফেসর ড: মো: আমিনুল ইসলাম ফিশারীজ বায়োলজী ও জেনেটিক বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
১০.	প্রফেসর ড: লুৎফর রহমান ফলিত বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
১১.	ডা: মো: সুলতান মহিউদ্দিন পরিচালক (সম্প্রসারণ), পশুসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২.	ড: নীতীশ দেবনাথ অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি কলেজ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
১৩.	প্রফেসর ড: মো: হাফেজুর রহমান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
১৪.	প্রফেসর ড: মনোজ মোহন সেন ডীন, ভেট অনুষদ।
১৫.	জনাব এ. কে. এম এনামুল হক মিঞা অতিরিক্ত পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর), ঢাকা।
১৬.	প্রফেসর মো: শামসুল হক চেয়ারম্যান, প্রাণ রসায়ন বিদ্যা।

১৭. জনাব মো: শাদাত উল্লা
উীন, কৃষি অনুষদ, এস.এ.ইউ।

১৮. প্রফেসর ড: আর.আই সরকার
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

১৯. ড: হাবিবুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

২০. প্রফেসর ড: মো: দৌলত হোসেন
ডীন, কৃষি প্রকৌশল ও করিগরী অনুযদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

২১. প্রফেসর ড: আব্দুল করিম
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

২২. প্রফেসর ড: মো: মোফাজ্জল হোসেন
পরিচালক (গবেষণা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

২৩. প্রফেসর ড: মো: নূরুল ইসলাম
ডেয়রী বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

২৪. ড: খান শহীদুল হক
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনিষ্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

২৫. প্রফেসর ডা: এম. এ. খালেক মিয়াঁ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শালনা, গাজীপুর।

২৬. প্রফেসর ড: মো: জিন্নাতুল আলম
জীবতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শালনা, গাজীপুর।

২৭. প্রফেসর ড: আব্দুল মান্নান আকন্দ
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শালনা, গাজীপুর।

২৮. ড: মো: আবদুর রাজ্জক
সদস্য পরিচালক (মৎস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, ফার্মগেট, ঢাকা।

২৯. ড: গাজী জসিম উদ্দিন আহমেদ
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, গাজীপুর।

৩০. ড: মোশাররফ হোসেন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফলিত গবেষণা বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর।

৩১. জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ
উপ-পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, ডিএই, পক্ষে মহাপরিচালক।

৩২. ড: সাহারুক আহম্মেদ
উপ-পরিচালক, ডিএই।

৩৩. জনাব এ. এম. এম. শামসুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, এগ্রিকালচার‍্যাল বোটানী বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৪. প্রফেসর কামালউদ্দীন আহমেদ
প্রাণ রসায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৫. প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন ভূঞা
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৬. প্রফেসর এম. জাহিদুল হক
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৭. প্রফেসর ড: মো: সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৮. জনাবা মমতাজ বেগম
উপ-প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

৩৯. কৃষিবিদ মো: রফিকুল ইসলাম
সহযোগী প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, কৃষি সম্প্রসারণ ও ইনফরমেশন সিপেম বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪০. প্রফেসর ড: মো: শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
ফলিত তত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪১. প্রফেসর ড: মো: ফেরদৌস মন্ডল
উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

৪২. প্রফেসর মো: ফজলুল করিম
কৃষিতত্ত, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪৩. জনাব মো: আতিকুল ইসলাম পাঠান
সহকারী পরিচালক, নায়েম, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৪৪. জনাব মো: রজ্জব আলী
সহকারী ।ধ্যাপক (কীটতত্ত্ব), শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪৫. জনাব মো: আকবর আলী
ট্রেজারার, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪৬. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

বিষয় : বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুল/মাদ্রাসা শিক্ষকদের সাথে সভা

সভার স্থান : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ধানমন্ডি, ঢাকা
তারিখ : ১৬-১১-২০০৩

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী

১. প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা
প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

২. বেগম রেহানা আক্তার
প্রধান শিক্ষকা, আর.এম. উচ্চ বিদ্যালয়, রায়পুর, নরসিংদী।

৩. জনাব মো: নাসির উদ্দিন খান
প্রধান শিক্ষক, বালাপুর নবীন চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়।

৪. জনাব মো: আ: রশিদ মিঞা
সহকারী প্রধান শিক্ষক, দৌলতপুর ইউ: উচ্চ বিদ্যালয়।

৫. জনাব মো: সাইফুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক, জামালপুর আর. এম. বিদ্যাপীঠ, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

৬. জনাব মো: তৈয়ব আলী
সহকারী প্রধান শিক্ষক, ধানমন্ডি গভ: বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা।

৭. জনাব মো: গিয়াস উদ্দিন
সহকারী প্রধান শিক্ষক, বটেশ্বর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, বেলাব, নরসিংদী।

৮. জনাব মো: আব্দুল গফুর মিঞা
সহকারী প্রধান শিক্ষক, ইস: উচ্চ বিদ্যালয়, ৩০, সোয়ারী ঘাট, ঢাকা।

৯. জনাব মো: হিলাল উদ্দিন
সহকারী সুপার, বড়চালা আমির উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

১০. জনাব মো: আবদুর রব ভূঞা
সুপার, মাছিমপুর আশরাফুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা, শিবপুর, নরসিংদী।

১১. জনাব মো: হাফিজ উদ্দিন
সুপার, বিনাবাইদ দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা, বেলাব, নরসিংদী।

১২. মাওলানা মো: ইসমাইল
সুপার, কাশীপুর নেছা: দাখিল মাদ্রাসা, শরীয়তপুর।

১৩. জনাব মো: মামুনুর রশীদ
সুপার, রাধাগঞ্জ সাধ: দাখিল মাদ্রসা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

১৪. জনাব মো: কুদ্‌রত উল্লাহ
সুপার, নরুন দাখিল মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

১৫. জনাব বিধান চন্দ্র রায়
প্রধান শিক্ষক, কুরশী মা: বি:, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

১৬. জনাব অজিৎ কুমার সরকার
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), ইসলামাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, দোহার, ঢাকা।

১৭. জনাব মো: রকীবুল হাসান
সহকারী প্রধান শিক্ষক, সূরূপী সানিনা বক্স উচ্চ বিদ্যালয়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।

১৮. জনাব মো: আকবর আলী
প্রধান শিক্ষক, মৃগী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ী।

১৯. জনাব মো: আলমাস মিয়া
সহকারী প্রধান শিক্ষক, ভেদরগঞ্জ হে: কা: পা: উচ্চ বিদ্যালয়, শরীয়তপুর।

২০. জনাব মো: শহিদুল্লাহ
সুপার, পাংশা প্রপার দাখিল মাদ্রাসা, পাংশা, রাজবাড়ী।

২১. জনাব রনজিত কুমার বিশ্বাস
সহকারী প্রধান শিক্ষক, কাঁচকুড়া উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা।

২২. জনাব মো: কাজী মুকবুল হোসেন
সহকারী প্রধান শিক্ষক, কবি নজরুল উচ্চ বিদ্যালয়, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

২৩. জনাব রমেশ চন্দ্র সূত্র ধর
সহকারী প্রধান শিক্ষক, পুনসহি উচ্চ বিদ্যালয়, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

২৪. জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র দাস
প্রধান শিক্ষক, কার্তিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নড়িয়া, শরীয়তপুর।

২৫. জনাব সহিস উদ্দিন আহমেদ
প্রধান শিক্ষক, রনছ-রুহিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জ।

২৬. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

বিষয় : উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন এর আলোচনা সভা

সভার স্থান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন কক্ষ
তারিখ : ০৪-১২-২০০৩, সময় : বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩.	জনাব আবু মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান, সরকারি জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।
৪.	জনাব মুহাম্মদ তসলিম উদ্দিন অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারি জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা এবং সেক্রেটারী স্টাফ কাউন্সিল, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।
৫.	ড. লায়লা নূর ইসলাম অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন, প্রানরসায়ন ও অনুপ্রান বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৬.	ড. আ. স. ম. উবাইদ উল্লাহ অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭.	ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮.	ড. রোকেয়া বেগম অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলমী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯.	জনাব আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী।
১০.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ ডীন, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১১.	ড. মো: আমিনুর রহমান মজুমদার অধ্যাপক, মৃতিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১২. ড. মো: আলী মুর্ত্তাজা
ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৩. প্রফেসর ড. মো: ফজলুল বারী
ওয়াটার রিসোর্স এন্ড এনার্জি বিভাগ।

১৪. প্রফেসর ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ
ভাইস চ্যান্সের (ভারপ্রাপ্ত), শাহজালালা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

১৫. অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৬. জনাব এম এম শাহীন এমপি
চেয়ারম্যান, ঠিকানা গ্রুফ অব পাবলিকেশনস এন্ড মিডিয়া।

১৭. ড. মো: বাহানুর রহমান
সহযোগী প্রফেসর, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ ও
মহা-সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন।

১৮. জনাব আব্দুল মালেক
সহযোগী অধ্যাপক, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯. জনাব শেখ সবদার আলী
প্রধান শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।

২০. জনাব সৈয়দ মো: হুমায়ুন কবির-
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২১. জনাব এ. জেড. এম. নওশের আলী খান
উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২২. ড. মোহাম্মদ মাসুম
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. জনাব কাজী শহীদুল্লাহ
ডীন, আর্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২৪. জনাব এনায়েত উল্লাহ খান
ভূগোল এবং পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২৫. প্রফেসর কে.এ.এম. শাহাদত হোসেন মন্ডল
উপ-উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬. জনাব রফিকুল ইসলাম
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৭. জনাব আফরাউজ জামান খান চৌধুরী
প্রফেসর, ফাইনান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

২৮. জনাব সৈয়দ রফিকুল আলম রুমী
প্রফেসর, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

২৯. জনাব নূরুল হোসেন চৌধূরী
প্রফেসর ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩০. জনাব মো: সাদেকুল ইসলাম
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩১. প্রফেসর ড. বজলুল মবিন চৌধুরী
ভাইস চ্যান্সেলর, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি ,ঢাকা

৩২. জনাব মুহাম্মদ ইব্রাহীম
প্রফেসর, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৩. জনাব এম. সলিমউল্লাহ খান
প্রফেসর, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৩৪. জনাব আ.ফ.ম. উবায়দুর রহমান
প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৩৫. ড. মো: আবদুল হাই
প্রফেসর, রাসায়ন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৩৬. ড. মো: সেকুল ইসলাম
চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিকাল বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৩৭. প্রফেসর জসীম উদ্দিন আহ্মদ
উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৩৮. প্রসের মো: খলিলুর রহমান
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৩৯. প্রফেসর এম. আমিনুল ইসলা
প্রো-ভিসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

৪০. অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ
ট্রেজারার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

৪১. প্রফেসর এস.এম.এ ফায়েজ,
উপাচার্য , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪২. প্রফেসর এ.জে.এম নুরুদ্দীন চৌধুরী
উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৩. জনাব মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪৪. জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
ডীন, কলা অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৫. প্রফেসর ইউসুফ হায়দার
প্রো-ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৬. মিসেস তাহমিনা হোসেন
বিভাগীয় প্রধান (বাংলা), ইডেন কলেজ।

৪৭. মিসেস দিলারা হাফিজ
অধ্যক্ষ, ইডেন গার্লস কলেজ।

৪৮. মিসেস জুলেখা খাতুন
প্রফেসর ইডেন গার্লর্স কলেজ, ঢাকা।

৪৯. জনাব ফিরোজা হোসেন
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৫০. ডঃ নজরুল ইসলাম
ডিসিপ্লিন প্রধান, ব্যবসা প্রশাসন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫১. জনাব আবু জাফর মাহমুদ
রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫২. ডঃ এম.এ সালেহ
ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৩. ডঃ এম আলাউদ্দিন
প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৪. ডঃ শান্তি রঞ্জন দাস
ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৫. ডঃ খন্দকার সাফায়েত হোসেন
প্রফেসর, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৬. ডঃ এ,এইচ,এম, ইয়াহইয়ার রহমান
প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৭. প্রফেসর আফতাব আহমদ
ভাইস-চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৮. অধ্যাপক আবুল খায়ের
রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৯. জনাব নূরুল ইসলাম মনি
সংসদ সদস্য এবং সভাপতি, বিজ্ঞান ও তথ্য এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

৬০. মেজর (অব:) আবদুল মান্নান
সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৮৯, তেজগাঁ-রমনা।

৬১. ড. মো: নিজামুল হক ভূইয়াঁ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৬২. অধ্যাপক ড. মো: মাজহারুল হক
বুয়েট, ঢাকা।

৬৩. প্রফেসর ড. মো: ইমতিয়াজ হোসেন
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট।

৬৪. ড. আসিফ নজরুল
আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৬৫. প্রফেসর ড. এ. কিউ. ফজলুল ওয়াহিদ
চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৬. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) গিয়াস উদ্দিন চৌধূরী বী.বি.
প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত।

৬৭. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

বিষয় : উচ্চ শিক্ষা প্রতিবেদনের উপর কমিশনের সভা

সভার স্থান : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)
তারিখঃ ১২-১২-২০০৩, সময়ঃ সকাল ০৯:৩০ ঘটিকা

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	ড. মো: আলী মুর্ত্তাজা ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩.	ড. সৈয়দ মো: হুমায়ুন কবির অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪.	জনাব গিয়াসউদ্দীন আহমদ প্রাক্তন পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
৫.	জনাব আবদুর রফিক প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৬.	মিসেস রোয়েনা হোসেন অধ্যক্ষ, ভিকারুননেছা নুন স্কুল, ঢাকা।
৭.	প্রফেসর ড. বজলুল মবিন চৌধুরী ভাইস চ্যান্সেলর, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি ,ঢাকা
৮.	প্রফেসর ড. হাফিজ জি.এ. সিদ্দিকী উপাচার্য, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
৯.	জনাব শেখ সবদার আলী প্রধান শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।
১০.	জনাব মো: আলতাফ হোসেন উপ-প্রধান, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা অধিদপ্তর।
১১.	ড. মো: আসাদুজ্জামান চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।
১২.	প্রফেসর এম.শরীফুল ইসলাম প্রধান সমন্বয়কারী, শিক্ষক কর্মচারী এক্যজোট এবং অধ্যক্ষ, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, ঢাকা।
১৩.	প্রফেসর সৈয়দা শামসে আরা হোসেন সিদ্বেশ্বরী গভর্নমেন্ট কলেজ, ঢাকা।
১৪.	প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ ট্রেজারার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫. প্রফেসর মো: খলিলুর রহমান
প্রো-ভিসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১৬. অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৭. জনাব আজিজ আহমেদ চৌধূরী
প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা ও
(বর্তমানে কনসালটেন্ট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা) এবং
সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

১৮. প্রফেসর জসিম উদ্দিন আহমেদ
উপাচার্য, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

১৯. জনাব মো: সেলিম ভূঁইয়া
মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।

২০. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

বিষয় : চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদনের উপর আলোচনা সভা

সভার স্থান : বিএসএমএমইউ-এর ডা: মিল্টন হল, ঢাকা
তারিখ : ১৫-১২-২০০৩, সকাল : ১১.০০ ঘটিকা

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী

১. প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা
প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

২. প্রফেসর ডাঃ এম.এ হাদী
ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩. ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৪. প্রিন্সিপাল
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।

৫. প্রিন্সিপাল
ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

৬. অধ্যাপক ডা: এম আলাউদ্দিন
চেয়ারম্যান, নাক কান গলা বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৭. ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী
গণস্বাস্থ্য হালপাতাল, সাভার, ঢাকা।

৮. অধ্যাপক মো: ফজলুল হক
বাড়ী # ১৭, সড়ক # ১৩ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা।

৯. অধ্যাপক আবু আহমেদ আশরাফ আলী
সার্জারী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

১০. অধ্যাপক এম এ মাজেদ
১৫২/২-বি, গ্রীন রোড, ঢাকা।

১১. অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান
পরিচালক, নিপসম, মহাখালী, ঢাকা।

১২. পরিচালক
সেন্টার ফর মেডিক্যাল এডুকেশন, আই.পি.এইচ. মহাখালী, ঢাকা।

১৩. অধ্যাপক মো: আবদুল্লাহ
অধ্যক্ষ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল, ঢাকা।

১৪. অধ্যাপক জাহাঙ্গীর কবির
পরিচালক, ন্যাশনাল কিডনী ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

১৫. অধ্যাপক মোজাম্মেল হক
বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ, ডিএমসিএইচ, ঢাকা।

১৬. অধ্যাপক মো: মোতাহার হোসেন
চেয়ারম্যান, এ্যানাটমি বিভাগ, ডিএমসিএইচ, ঢাকা।

১৭. অধ্যাপক খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ
এনাটমী বিভাগ, এসএসএমসি, ঢাকা।

১৮. অধ্যাপক নাইমা মোয়াজ্জেম
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল বিভাগ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

১৯. অধ্যাপক তারিক আল নাসির
প্যাথলজি বিভাগ, ডিএমসিএইচ, ঢাকা।

২০. অধ্যাপক এম এ ফয়েজ
মেডিসিন বিভাগ, ডিএমসিএইচ, ঢাকা।

২১. অধ্যাপক শামীম আহমেদ
নেফ্রোলজি বিভাগ, ডিএমসিএইচ, ঢাকা।

২২. অধ্যাপক মোঃ আবুল কাশেম খন্দকার
মেডিসিন বিভাগ, ডিএমসিএইচ, ঢাকা।

২৩. ডাঃ সৈয়দা আফরোজা
সহযোগী অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, ডিএমসিএইচ,ঢাকা।

২৪. ডাঃ আব্দুল হান্নান
সহযোগী অধ্যাপক, আইসিএমএইচ, মাতুয়াইল, ঢাকা।

২৫. ডাঃ শরফুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ, এসএসএমসি, ঢাকা।

২৬. অধ্যাপক খাদেমুল ইসলাম
সার্জারী বিভাগ, এসএসএমসি, ঢাকা।

২৭. প্রিন্সিপাল
কলেজ অব নার্সিং, মহাখালী, ঢাকা।

২৮. ডাঃ শাহ আলম
সহযোগী অধ্যাপক, মানসিক রোগ বিভাগ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

২৯. পরিচালক
আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৩০. অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ
ডীন, পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩১. ডাঃ জিন্নাত আরা বেগম
সহযোগী অধ্যাপ, ফার্মাকোলজী বিভাগ, ডিএমসিএইচ; ঢাকা।

৩২. অধ্যাপক সেলিম মোঃ জাহাঙ্গীর
এ্যানেসথেসিয়োলজি বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৩৩. অধ্যাপক হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী
চক্ষু বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ; ধানমন্ডি, ঢাকা।

৩৪. অধ্যাপক হাজেরা মাহতাব
বারডেম হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।

৩৫. মেঃ জেঃ (অব অধ্যাপক) জিয়া উদ্দিন আহমেদ
প্রিন্সিপাল, ওমেন্স মেডিকেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা।

৩৬. মেঃ জেঃ এএসএম মতিউর রহমান
কমান্ডেন্ট, এএফআইপি, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

৩৭. পরিচালক
নার্সিং সার্ভিসেস, ১৪/১৫, মতিঝিল ইস্পাহানী ভবন, সেবা পরিদপ্তর, ঢাকা।

৩৮. ডীন,
ফ্যাকালটি অব বেসিক সাইন্স, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৩৯. অধ্যাপক এ. জেড এম জাহিদ হোসেন
বিভাগীয় প্রধান, ইউরোলজী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

৪০. প্রিন্সিপাল
দেশজ ও আয়ুর্বেদীক মেডিকেল কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

৪১. ডাঃ নিলুফার বেগম
সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

৪২. অধ্যাপক আখতারুজ্জামান
ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

৪৩. অধ্যাপক মোঃ আবদুল জব্বার
কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

৪৪. অধ্যাপক কেএমএইচএস সিরাজুল হক
চেয়ারম্যান, কার্ডিওলজী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৪৫. অধ্যাপক হাবিবুর রহমান
নেফ্রোলজী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৪৬. অধ্যাপক একেএম আনোয়ারুল্লাহ
নিউরোলজী বিভাগ, বিএসএমএসইউ, ঢাকা।

৪৭. ডাঃ এটিএম মোশাররফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, নিউরো সার্জারী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৪৮. অধ্যাপক মোঃ সিরাজ উদ্দিন
চেয়ারম্যান, অর্থোপেডিক সার্জারী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৪৯. ডাঃ আফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, শিশু হেমাটোলজী বিভাগ, বিএসএমএসইউ, ঢাকা।

৫০. ডাঃ গোলাম মঈন উদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক, শিশু নেফ্রোলজী, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৫১. অধ্যাপক এএনএম আতাই রাব্বি
চেয়ারম্যান, সার্জারী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৫২. ডাঃ শাহাদাত হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৫৩. ডাঃ এমএ সালাম
সহযোগী অধ্যাপক, ইউরোলজী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৫৪. ডাঃ মোঃ সাজিদ হাসান
সহযোগী অধ্যাপক, ইউরোলজী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

৫৫. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।

বিষয় : বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের সাথে সভা

সভার স্থান : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী নায়েম, ঢাকা
তারিখ : ২৫-১২-২০০৩, সকাল: ১১.০০ ঘটিকা

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
১.	প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩।
২.	জনাব মোঃ মাসউদুর রহমান সহকারী শিক্ষক(ইংরেজী), উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
৩.	মুনিরা কাওকাব সহকারী শিক্ষক(ইংরেজী), উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
৪.	শামসুন নাহার সহকারী শিক্ষক(ইংরেজী), কামরুননেছা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
৫.	নাজমুন নাহার হোসেন সহকারী শিক্ষিকা, কামরুননেছা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
৬.	পারভীন ফজিলা প্রধান শিক্ষক, কামরুননেছা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
৭.	মোঃ এরশাদ উল্লাহ সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজী), এ,কে,হাই স্কুল এ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।
৮.	নাজির আহমদ সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজী), এ,কে,হাই স্কুল এ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

৯. শাহনাজ বেগম
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী), নবাবপুর সহকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

১০. কামরুন নাহার চৌধুরী
প্রধান শিক্ষক, নবাবপুর সহকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

১১. অজিত কুমার চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক, নবাবপুর সহকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

১২. অজিত কুমার চৌধুরী
সহকারী শিক্ষাক, নবাবপুর সহকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

১৩. এস. সুফিয়া হোসেন
ভিকারুন নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

১৪. নাজমুস শাহান
ভিকারুন নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

১৫. সৈয়দা দিল আফরোজ
ভিকারুন নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

১৬. মোর্শেদ আক্তার বানূ
সিনিয়র শিক্ষাক, সিদ্বেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

১৭. মাহমুদা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক, সিদ্বেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

১৮. হোসনে আরা বেগম
অধ্যক্ষ, আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

১৯. প্রসূন গোস্বামী
প্রভাষক, কদমতলা পূর্ব বাসাবো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

২০. মো: কলিমুল্লাহ
অধ্যক্ষ, কদমতলা পূর্ব বাসাবো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

২১. আবু সিদ্দিক আহমেদ
সিনিয়র শিক্ষক, কদমতলা পূর্ব বাসাবো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

২২. মো: আব্দুর রাজ্জাক
সহকারী শিক্ষক, আরমানিটোলা গভ: উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

২৩. এস.এম মেছবাহ উদ্দীন
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী), আরমানিটোলা গভ: উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

২৪. মোঃ মোস্তফা ভুইয়া
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী), আরমানিটোলা গভ: উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

২৫. সৈয়দ ওয়াজে উদ্দিন আহমেদ
সিনিয়র শিক্ষক, আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ।

২৬. আবদুল মালেক খান
সিনিয়র শিক্ষক, রায়ের বাজার হাইস্কুল, ঢাকা।

২৭. জালাল আহমেদ
প্রধান শিক্ষক, রায়ের বাজার হাইস্কুল, ঢাকা।

২৮. মোঃ আলী আসগর
কো-অর্ডিনেটর, উদয়ন উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা।

২৯. মোঃ এ লতিফ হাওলাদান
সহকারী প্রধান শিক্ষক, আরমানিটোলা গভঃ বালক বিদ্যালয়।

৩০. শেখ আবদুর রউফ
সিনিয়র শিক্ষক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল।

৩১. এ.কে.এম মোস্তফা কামাল
প্রধান শিক্ষক, ধানমন্ডি বয়েজ হাইস্কুল, ঢাকা।

৩২. মুঃ শাহাদাৎ হোসেন শরীফ
প্রধান শিক্ষক, ওয়েজ ধানমন্ডি হাইস্কুল, ঢাকা।

৩৩. মিসেস জুবাইরা জহির
সহকারী শিক্ষক, ধানমন্ডি গভঃ বয়েস উচ্চ বিদ্যালয়।

৩৪. মোল্লা দেলওয়ার হোসাইন
সহকারী শিক্ষক, ধানমন্ডি গভঃ বয়েস উচ্চ বিদ্যালয়।

৩৫. মোঃ গোলা আজম
সহকারী শিক্ষক, রায়ের বাজার হাইস্কুল, ঢাকা।

৩৬. জসিম উদ্দিন আহমদে
পিন্সিপ্যাল (ভারপ্রাপ্ত), অগ্রনী স্কুল এন্ড কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা।

৩৭. জাহাঙ্গীর তারেক
অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট।

৩৮. অধ্যাপক সদরুল আমিন
ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৯. অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪০. জাকিয়া আকতার
এম.ডি.এস, নায়েম ,ঢাকা।

৪১. শেখ সবদার আলী
প্রধান শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

৪২. গিয়াস উদ্দিন আহমদ
প্রাক্তন পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

৪৩. মোঃ আনোয়ার আলী
অবসরপ্রাপ্ত ডীন, ও ওপেন স্কুল, বাউবি।

৪৪. মোঃ মতিউর রহমান
আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

৪৫. মোঃ আল হেলাল উদ্দিন
আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

৪৬. মোঃ এ সালাম খান
আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

৪৭. শাহান আরা বেগম
পিন্সিপ্যাল (ভারপ্রাপ্ত), আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

৪৮. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

৪৯. মোঃ তাজুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

৫০. মোঃ গোলাম মোস্তফা
সিনিয়র শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

৫১. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সদস্য সচিব (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

পরিশিষ্ট-৫ : জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩
সচিবালয়

সদস্য সচিব	:		মো: আবদুল ওয়াহাব অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সহায়ক কর্মকর্তা	:	১.	মো: আবু ছাইদ শেখ সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
		২.	মো: আতিকুল ইসলাম পাঠান সহকারী পরিচালক, নায়েম।
গবেষণা সহকারী	:		এ. এইচ. এম. শামীম।
কম্পিউটার অপারেটর	:	১.	মো: আলমগীর হোসেন।
		২.	মো: নাজমুল আহসান।

ব্যানবেইস
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র